স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবন (১৯৪৭–১৯৭০)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের

অধীনে পি.এইচ.ডি. উপাধির শর্তপূরণে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

আশিস কুমার হীরা

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. অনন্যা বড়ুয়া

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অব আর্টস,

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়,

কলকাতা-৭০০০৩২

২০১৬

Certified that the Thesis entitled

স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবন (১৯৪৭-১৯৭০)
....

submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of.......Prof. Ananya Baruya.......and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the

Supervisor :

Dated :

Candidate :

Dated:

প্রস্তাবনা

দেশবিভাগের প্রেক্ষাপটে বাংলার প্রধান দুই সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে। একটি পর্যায়ে এসে উভয়ের একত্রে বসবাস করার অবস্থা থাকে না। ফলে অগণিত মানুষ তার বাসভূমি ছেড়ে নিজের দেশে পরবাসী হয়। এই ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের জীবন সংগ্রামের কাহিনি বাংলা উপন্যাসে কীভাবে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে তার স্বরূপ সন্ধানের জন্য 'স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবন (১৯৪৭-১৯৭০)' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি রচনায় মনোনিবেশ করি। এ সম্পর্কে খণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা হলেও পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান ও মূল্যায়ন অদ্যাবধি হয়নি। এই অসমাপ্ত কাজ শেষ করবার জন্য আমার এই প্রয়াস। সামগ্রিক মূল্যায়নের স্বার্থে বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা ঔপন্যাসিক থেকে অজ্ঞাত-অখ্যাত ঔপন্যাসিকের সৃষ্টিকেও গবেষণার প্রাথমিক উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেছি এবং ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ কাল পর্বের উদ্বাস্তুদের কাহিনি অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছি।

অভিসন্দর্ভটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা ড. অনন্যা বড়ুয়ার তত্ত্বাবধানে রচিত। গবেষণা কর্মের প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর তিল তিল পরিশ্রম ও সহানুভূতি ভিন্ন এ কাজ কিছুতেই সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না। তাঁর কাছে আমার সারা জীবনের ঋণ।

অনুসন্ধান ক্রিয়া সম্পন্ন করতে গিয়ে আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার, বাণীপুর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, লিটিল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি, উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, নিজস্ব সংগ্রহ এবং শুভানুধ্যায়ীদের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছি। এর জন্য প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

দেশভাগের সামাজিক এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান করতে গিয়ে উভয়বঙ্গের বহু নামী-অনামী মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি এদের মধ্যে পূর্ববঙ্গের ড. আনিসুজ্জামান, কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, হাসান আজিজুল হক, অধ্যাপক আবু মোহম্মদ দেলোয়ার, সমাজতাত্ত্বিক যতীন বালা, বদরুদ্দিন উমর, চিত্রশিল্পী শাওন আকন্দ, অবাঙালি মোহাজের ইউনুস বাকী প্রমুখ।

এ বঙ্গে যাদের সঙ্গে কথা বলেছি তাদের মধ্যে রয়েছেন কথাসাহিত্যিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর, যতীন বালা, মনোরঞ্জন ব্যাপারী, ঐতিহাসিক হোসেনুর রহমান, সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধীর বিশ্বাস, শচীন দাশ, অধ্যাপক গৌতম রায় প্রমুখ। সম্পত্তি বিনিময়কারী এবং

মরণজয়ী সংগ্রামে বেঁচে থাকা অনেক সাধারণ উদ্বাস্তুদের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় বুঝতে চেষ্টা করেছি উদ্বাস্তুদের জীবনের যন্ত্রণা। গবেষণাকে সার্বিক রূপদানের জন্য আমার অগ্রজ প্রতীম শ্রী রমেন্দ্রনাথ অধিকারী বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। শ্রী অর্ণব ভট্টাচার্য দ্রুততার সঙ্গে বর্ণ সংস্থাপন করে দিয়েছেন। উভয়ের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

বাংলা উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবনকে নানা আঙ্গিকে দেখতে গিয়ে তথ্য ও যুক্তি সহ মূল প্রতিপাদ্য উপস্থাপন করেছি। কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গেল, সেজন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী।

তারিখ :

গবেষকের স্বাক্ষর

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

মুখবন্ধ ১-৫

প্রথম অধ্যায়

দেশভাগ : উদ্বাস্তু জীবনের প্রেক্ষাপট ৬-১১৬

- উদ্বাস্তু আগমন : ক্যাম্প-কলোনি জীবন
- ১৯৪৬-১৯৭০ আগমনপর্বে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে উদ্বাস্তু জীবনের প্রভাব
- ১৯৪৬-১৯৭০ কালপর্বে আগত উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক অবস্থান
- ১৯৪৬-১৯৭০ কালপর্বে আগত উদ্বাস্তুদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর
- সম্পত্তি বিনিময় : নতুন ধারায় উদ্বাস্তু
- মুসলিম উদ্বাস্তু

দ্বিতীয় অধ্যায় ১১৭-১৬৯

বাংলা উপন্যাসে ক্যাম্প-কলোনি জীবন

তৃতীয় অধ্যায় ১৭০-২০৭

বাংলা উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবনের রূপান্তর

চতুর্থ অধ্যায় ২০৮-২৪২

বাংলা উপন্যাসে ছিন্নমূল মানুষের লড়াই-আন্দোলন

পঞ্চম অধ্যায় ২৪৩-২৭৬

বাংলা উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবনের স্মৃতি

ষষ্ঠ অধ্যায় ২৭৭-৩০৬

বাংলা উপন্যাসে উদ্বাস্তু নারীর সমস্যা ও সংকট

সপ্তম অধ্যায়

বাংলা উপন্যাসে সম্পত্তি বিনিময় প্রসঙ্গ ৩০৭-৩১৪

উপসংহার ৩১৫-৩২২

গ্রন্থপঞ্জি ৩২৩-৩৩৮

মুখবন্ধ

উদ্বাস্তু শব্দটি আটপৌরে। এর অর্থ 'ভিটেছাড়া'। মানব সভ্যতার ইতিহাসে ভিটেছাড়া কোনও নতুন ঘটনা নয়। মানুষ একস্থানে বংশ পরম্পরায় বাস করতে পারেনি। ইতিহাসের অনিবার্য ইঙ্গিতে তাকে বসত বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। মানুষ যখন মনে করে সে শারীরিক বা মানসিকভাবে বিপন্ন, তখনই বাস্তুত্যাগ করে। পরিস্থিতিটি তার কাছে বিকল্পহীন। বসতহারা এই মানুষই উদ্বাস্তু বা রিফিউজি। রিফিউজি শব্দটির দুটি বাংলা প্রতিশব্দ—

> একটি— শরণার্থী। এর আক্ষরিক অর্থ— কেউ একজন যিনি ঊর্ধ্বতন শক্তির শরণ নিয়েছেন; অর্থাৎ আশ্রয় বা নিরাপত্তা প্রার্থনা করেছেন।

অন্য প্রতিশব্দটি হলো উদ্বাস্তু; যার মানে গৃহহীন; বাংলায় বাস্তু শব্দটিকে ভিটা বা ভিটে শব্দের সঙ্গে জুড়ে উল্লেখ করা হয়। উৎ উপসর্গের অর্থ উৎখাত হওয়া বা সরিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ উদ্বাস্তু তিনিই যাকে ভিটে বা ভিত্তিভূমি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেশ-কালের প্রেক্ষিতে ভিটেবাড়ি থেকে উৎখাতের কারণ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু গৃহহারা মানুষের যন্ত্রণা আর স্মৃতিকাতরতার কাহিনি সবদেশে সবকালে একসূত্রে গাঁথা।

সারা পৃথিবীতে নানা সময়ে নানা কারণে মানুষ বাস্তুত্যাগ করে দেশান্তরী হয়েছে।রাজনৈতিক উৎপীড়ন, গৃহযুদ্ধ, রাষ্ট্রবিপ্লব, অর্থনৈতিক বিপন্নতা, মহামারি, বন্যা ভূমিকম্পের মতো বিপর্যয়ে এক অঞ্চলের মানুষ অন্য অঞ্চলে, এক দেশের মানুষ অন্যদেশে চলে গিয়েছে যূথবদ্ধভাবে— ইতিহাসে এমন উদাহরণ অনেক। প্রাকৃতিক কারণেও মানুষ যখন উদ্বাস্তু হয়েছে, সেখানেও দেখা গিয়েছে পরোক্ষে মানুষেরই হাত রয়েছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় স্মরণকালের মধ্যে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণপ্রব্রাজন ঘটে ভারতীয় উপমহাদেশে। মানুষই এখানে মানুষের উচ্ছেদের কারণ। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা আর রাজনৈতিক নেতাদের লোভের ফলেই দেশটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত হয়; সেইসঙ্গে দেশান্তরী হয় অগণিত মানুষ।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়। দেশ বিভাজনের সঙ্গে মিশে গেল কোটি কোটি মানুষের চোখের জল, রক্তস্রোত। এক্ষেত্রে জাতির চেয়ে বড় হয়ে উঠল সম্প্রদায়; জাতীয় সংগ্রামকে ছাপিয়ে গেল সাম্প্রদায়িক জেহাদ। ব্রিটিশরা ক্ষমতায় থাকাকালীন ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা ঘটেছে বহুবার, কিন্তু দুই সম্প্রদায়ের আলাদা বসবাসের প্রশ্ন জাগেনি একবারের জন্যও।

ব্রিটিশ আসার আগে মুসলমানেরা টানা সাড়ে-পাঁচশো বছর ভারত শাসন করেছিল। এই সময়ে ধর্মান্তরও ঘটেছিল। কিন্তু এর মধ্যে সম্ভবত কোনও বলপ্রয়োগ ছিল না। এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে উচ্চবর্ণের মানুষদের ইসলামে ধর্মান্তরিত না-হওয়া। ধর্মের সংঘাতও ভারতবর্ষে প্রবলভাবে ছিল না। স্বাধীনতার কিছুকাল আগে থেকেই তা প্রবল হয়। কিছু মানুষ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। তার ফলে খণ্ডিত হয় দেশ।

১৯৪৬য়ের ১৬ আগস্ট মুসলিম লিগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নৃশংসতায় কলকাতায় ভয়াবহ দাঙ্গা হয়; হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি আক্রমণে তা তীব্র হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিকদের মতে জওহরলাল নেহরু কর্তৃক ক্যাবিনেট মিশনের প্ল্যান প্রত্যাখ্যানের কারণেই মুসলিম লিগ ডাইরেক্ট অ্যাকশন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে যার ক্রমপরিণতিতে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে। তাঁর অদূরদর্শিতা এবং আত্ম অহংকারই এই বিপর্যয়ের উৎস। এরপর নোয়াখালির দাঙ্গায় একতরফাভাবে শুরু হয় হিন্দু নিধন। এরই প্রতিক্রিয়ায় বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং উত্তরপ্রদেশের গড়মুক্তেশ্বরে চলে মুসলমান নিধন। পরিস্থিতির ভয়াবহতা দেখে ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন— ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারতীয় জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। ৪৭য়ের মার্চে তিনি ভারতে আসেন। দেশ-ভাগের ঘোষণা হয় ৩ জুন ১৯৪৭। স্বাধীনতা এলো তার আড়াই মাস পরে। দেশত্যাগের আগে ইংরেজরা ভারতভাগের পরিকল্পনা করে; হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে মুসলিম লিগকে। মুসলিম মানসে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ পৃথক রাষ্ট্রের দাবিকে জোরদার করে। এই আলাদা বসবাসের দাবির সম্ভাব্য কারণগুলি হলো—

প্রথমত, অবিভক্ত ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী শ্রেণির প্রবল প্রতিযোগিতার মধ্যে বসবাসের চেয়ে আলাদা বসবাস মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে অনেক সম্ভাবনাময় বলে মনে হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, উত্তর ও পশ্চিম ভারতে মুসলমান ভূস্বামী, ধনিক ও শিক্ষিত শ্রেণির আকাঙ্ক্ষা ছিল বাধাবন্ধহীন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমৃদ্ধি। এক্ষেত্রে ইচ্ছাপূরণের একমাত্র উপায় হয়ে ওঠে স্বতন্ত্র স্বাধীন বাসভূমি।

তৃতীয়ত, রাজনৈতিকভাবে মুসলিম লিগ ধর্মকে রাজনীতির মধ্যে টেনে আনে। সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকশ্রেণিকে কাছে টানতে লিগের কর্মসূচিতে স্থান পায় মহাজনী শোষণের অবসানের আশ্বাস।

মহামান্য সীমানা কমিশন এই প্রেক্ষিতে ভারতের মানচিত্রের উপর দিয়ে খাড়া লাইন টেনে দেয়; ভাগ হয় দেশ, যা আমাদের এই উপমহাদেশের বৃহত্তম বেদনা। পাকিস্তান গঠনের সময় মোহম্মদ

আলি জিন্নার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও সংখ্যালঘু নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের কোনও ব্যবস্থা হয়নি। ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নানাভাবে সংখ্যাগুরুর দ্বারা অত্যাচারিত হতে থাকে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও তারা নানাভাবে বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়। এই পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত হয়ে মানুষ দেশত্যাগ করতে শুরু করে। এতকাল যাদের শাসন করেছে, অনুগ্রহ করেছে, জান-প্রাণ-মান রক্ষা করেছে, তারাই আজ শাসকের দায়িত্ব পালন করছে— এই বিষয়টি উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অহমিকায় আঘাত করে। এই সময়ে হিন্দুরা মনেই করত না— কোনও মুসলমান দাঙ্গাবিরোধী, হিন্দু উচ্ছেদবিরোধী হতে পারে। উচ্চবর্গীয়রা নিম্নবর্গীয় হিন্দু ও মুসলিমদের সমবিচারে নিয়েছিল। তবে নমঃশূদ্র সম্প্রদায় নিজস্ব গোষ্ঠীবদ্ধতায় জমির উপর নির্ভর করে সচ্ছল গার্হস্থ্য হয়ে উঠেছিল। তাই স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই তারা দেশত্যাগ করেনি; এই সময়ে দেশত্যাগ করে মূলত উচ্চবর্ণের অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হিন্দুরা। নিম্নবর্গীয়দের দেশ না ছাড়ার সম্ভাব্য কারণ হতে পারে—

১. দেশভাগের ভবিষ্যৎ প্রভাব সম্পর্কে অপবর্গীয়দের সম্যক ধারণা ছিল না;
২. বর্ণহিন্দুরা মুসলিম ও দলিত হিন্দুদের আলাদা চোখে দেখতো না, ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।
৩. তপশিলি নেতা যোগেন মণ্ডল দলিত হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের সমন্বয় ঘটিয়ে নতুন এক সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন;
৪. বঙ্গের বৃহত্তম জনজাতি নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের বৃহত্তম অংশই ছিল প্রান্তিক চাষি। পূর্ববঙ্গের চাষবাস নির্ভর গ্রামীণ জীবন ত্যাগ করে দেশান্তরী হবার সাহস পায়নি।
৫. নিম্নবর্গের মানুষ চিরকাল উচ্চবর্ণের দ্বারা চালিত হয়েছে। তাই উচ্চবর্গীয়দের দেশত্যাগের সূচনায় অপবর্গীয়দের মনে হয়েছিল এই অবস্থায় তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বাড়বে।

পঞ্চাশের দশকের শেষভাগে ভদ্রহিন্দুরা যখন গৃহহারা, নিম্নবর্গীয়দের তখনও ভরসা ছিল মুসলিম শাসকশ্রেণি তাদের উপর আঘাত হানবে না। পাকিস্তান কায়েম করার সময় দলিত হিন্দু ও মুসলিমদের অভিন্ন স্বার্থের কথা বলা হয়েছিল। নিম্নবর্গের নেতা যোগেন মণ্ডল পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন। শোনা যায় জিন্নার সঙ্গে নাকি কথাও হয়েছিল নমঃশূদ্র সংখ্যাগরিষ্ঠ কয়েকটি জেলা তাদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে। জিন্না কথা রাখেন নি। তবু শ্রী মণ্ডল পাকিস্তানের মন্ত্রী হন। একসময়ে তিনি নিরাপত্তার কারণে দেশত্যাগ করেন। এই সময়ে নমঃশূদ্রদের একটি অংশ দেশত্যাগ করে; একটি বড়ো অংশ থেকেও যায়। এদের বেশিরভাগ গরিব কৃষক।

পঞ্চাশের দশকে পূর্ববঙ্গের বিরাট সংখ্যক মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণি দেশত্যাগ করে। এরা সকলেই অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল ছিল না, তবে সামাজিক সম্মানে তারা ছিল সবার আগে। এই সময়ে বিদ্যালয়গুলিতে সাম্প্রদায়িক প্রভাব বাড়তে থাকে, ফলে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক আলগা হতে আরম্ভ করে। শিক্ষিত হিন্দুদের অনুপস্থিতিতে পূর্ববঙ্গে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সংকট তৈরি হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এই সংকট মোচনের জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের একাংশ এবং নিম্নবর্গের হিন্দুরা এগিয়ে আসে, তাতে শিক্ষার মান যায় কমে।

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও শূন্যতা তৈরি হয়। হিন্দুদের দেশত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সারি, জারি, মারফতি, কথকতা, রামযাত্রা, বয়ানি, কিস্‌সা ইত্যাদি হাজারো লোকরঞ্জক অনুষ্ঠান আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। এই সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নিম্নবর্গীয় মুসলমানদের অংশগ্রহণ বন্ধ হয় আয়ুব খানের শাসনকালেই। কারণ মিলিটারি শাসকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য মোল্লাতন্ত্রের হাত শক্ত করা এবং তাদের প্রতিপত্তির ক্ষেত্র বিস্তারের প্রয়োজন হয়েছিল। এই উপমহাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হবার ফলে এই বিভাজন ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। তথাকথিত ইসলামিক সংস্কৃতির অজুহাতে মোল্লাতন্ত্র এই লোকায়ত সংস্কৃতিকে উচ্ছেদের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। ফলে দেশত্যাগী মানুষের সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে।

পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুদের দেশত্যাগকে সময়ের নিরিখে অনেকগুলি পর্যায়ে ভাগ করা যায়—

১. স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ের দেশত্যাগ;

২. স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের দেশত্যাগ;

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন স্বাধীনতার পূর্বেই যারা দেশত্যাগ করে তাদের সঙ্গে স্বাধীনতা সমকালে কিংবা পরবর্তী সময়ের উদ্বাস্তুদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভেদ ছিল, আবার স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যারা দেশত্যাগ করে তাদের শ্রেণিগত ও সামাজিক পরিচয়ের ভিন্নতা ছিল। বিভিন্ন পর্যায়ে দেশত্যাগের কারণও ছিল ভিন্ন ভিন্ন।

বঙ্গবিভাজনে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা যেমন পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে আসে, তেমনি মুসলমানরা যায় পূর্ববঙ্গে। তবে যে বিপুল সংখ্যক হিন্দু পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করেছে, সেই তুলনায় অনেক কম সংখ্যক মুসলমান পূর্ববঙ্গে উদ্বাস্তু হয়ে যায়। ১৯৫১ র আদমশুমারি থেকে জানা যায় গোটা পাকিস্তানে ভারত থেকে ৭০ লক্ষ শরণার্থী গিয়েছিল। এর মধ্যে ৬৩ লক্ষই গিয়েছিল পশ্চিম

পাকিস্তানে; পূর্ব পাকিস্তানে ৭ লক্ষ। এই ৭ লক্ষের মধ্যে একটি বড়ো অংশ অবাঙালি মুসলমান। ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায় এই ৭ লক্ষের মধ্যে ৫ লক্ষই ভারতে ফিরে এসেছিল। বাকি দু'লক্ষের অনেকেই কিংবা তার উত্তরপ্রজন্ম ফিরে আসে ১৯৪৭ সালে এবং পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যেই কেবল মুসলমানরা দেশত্যাগ করে, পরবর্তী সময়ে তাদের দেশান্তর ঘটেনি। এর প্রমাণ মেলে পশ্চিমবঙ্গের জনগণনায়— ১৯৬১ সালে পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল সমগ্র জনগোষ্ঠীর ২০%, ১৯৭১ সালে ২০.৪৬%, ৮১সালে ২১.৫১%, ৯১ সালে ২৩.৬১%।

মুসলিম সম্প্রদায়ের দেশান্তর ঘটলেও তাদের ক্যাম্প-কলোনিতে থাকতে হয়নি; এককথায় উদ্বাস্তু জীবনের যন্ত্রণা তাদের বিশেষ ভোগ করতে হয়নি, বরং তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিকক্ষেত্রে সমৃদ্ধি লাভ করেছে।

উদ্বাস্তু সমস্যা এই উপমহাদেশের জনজীবন, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিকে বিপর্যস্ত করে তোলে। সাহিত্যেও তার প্রভাব পড়ে। বিভাগোত্তর বাংলা সাহিত্যের প্রায় প্রত্যেকটিতে তা উঠে এসেছে গভীরভাবে। দেশবিভাগ এবং বিভাগজনিত কারণে উদ্বাস্তুজীবনকে আশ্রয় করে রচিত হয়েছে অনেক উপন্যাস। উপন্যাসগুলিতে উদ্বাস্তু জীবনের নানা দিক বিম্বিত হয়েছে, বিভাগ পূর্ববর্তী হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের বিন্যাস, দুই সম্প্রদায়ের দাঙ্গা এবং ১৯৪৭ সালের দেশভাগের ছবি ফুটে উঠেছে উপন্যাসগুলিতে। বিভাগ পরবর্তী সময়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের দেশত্যাগ, শিয়ালদহ প্ল্যাটফর্ম, ক্যাম্প-কলোনি জীবন; পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ সংস্কৃতিকে তারা নানাভাবে আলোড়িত করেছে। অথচ উদ্বাস্তু জীবনাশ্রিত বাংলা উপন্যাস নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা হয়নি। যদিও এই জাতীয় উপন্যাসের সামাজিক ও সাহিত্যমূল্য নিয়ে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অত্যন্ত জরুরী। এই অভাব পূরণই আলোচ্য গবেষণার উদ্দেশ্য।

প্রথম অধ্যায়

দেশভাগ : উদ্বাস্তু জীবনের প্রেক্ষাপট

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ব্রিটিশের শাসন থেকে ভারতবর্ষের মুক্তি ঘটে। এই সময়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ভারতীয় উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান অনিবার্য করে তুলেছিল, সেই সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল দেশভাগ। ব্রিটিশেরা বুঝতে পেরেছিল দীর্ঘদিন তাদের পক্ষে ভারতকে শাসন করা সম্ভব নয়। তাই ভারত ভাগ করে এখান থেকে সাম্রাজ্য গুটিয়ে নেবার কথা ভাবতে শুরু করে। মূলত চারটি কারণে তাদের এই ভাবনা—

ক. আন্তর্জাতিক রাজনীতির চাপ;

খ. সাম্রাজ্যবাদের আভ্যন্তরিক সংকট;

গ. দেশের মধ্যে গণ-আন্দোলনের উত্তাল বাতাবরণ;

ঘ. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে অর্থনৈতিক বিপর্যয়।[১]

ভারতে বসবসকারী প্রধান দুই জাতি— হিন্দু ও মুসলমানের আলাদা বসবাসের দাবিকে মান্যতা দিতে এই ভাগাভাগি। এর ফলে বাঙালির দীর্ঘদিনের লালিত জাতিসত্তার বিভাজন ঘটে।

উনিশ শতকের শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তরা যে জাতিতত্ত্ব নির্মাণ করেছিল তারই একেবারে ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল মুসলিম লিগের দ্বিজাতি তত্ত্ব। এখানকার হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা জাতি শব্দটি প্রয়োগ করেছে খুবই শিথিলভাবে। জাতি বলতে তারা কখনও বুঝিয়েছে, কাস্ট, কখনও রেস, কখনও বা কম্যুনিটি এবং জাতি অর্থেই হিন্দু শব্দটির নির্বিচার প্রয়োগ ঘটিয়ে তারা হিন্দু আশা-আকাঙ্ক্ষাকেই বলেছে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা; হিন্দুমেলাই তাদের কাছে হয়েছে জাতীয় মেলা। আর এভাবেই তারা দ্বিজাতিতত্ত্বের বীজটি রোপণ করে। ইংরেজি পাঠ গ্রহণের সুযোগ যারা পেয়েছিল বা গ্রহণ করেছিল তারা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ। ধর্মীয় বিচারে সম্প্রদায়টির নাম হিন্দু। হিন্দুদেরই একটি অংশ যারা মূলত বর্ণহিন্দু বলে পরিচিত, অর্থবিত্তে প্রতিপত্তিশালী এই গোষ্ঠীর প্রভাব ছিল বাংলার সর্বত্র। এই প্রভাবশালী হিন্দুরা বিশ শতকের গোড়া থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে দেশকে স্বাধীন করতে চাইল। তাদের কাছে হিন্দুই হয়ে উঠল দেশ, হিন্দুই জাতি। দেশকে মা বলে বন্দনা করল; কিন্তু সেই মা কে সে তৈরি করে নিল হিন্দু দেবী দুর্গার আদলে— 'তংহি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী'...। দুর্গা বা কালীর নাম করে এবং গীতা স্পর্শ করে সে ইংরেজ তাড়ানোর শপথ নিল; একবারও ভাবল না যে, দুর্গা-কালী

বা গীতায় যারা বিশ্বাস করে না এ দেশটা তাদেরও[২]।

এই প্রবল হিন্দুত্ববাদের মধ্যেই মুসলিম সম্প্রদায় খুঁজে পেল হিন্দু বিদ্বেষের উপাদান। হিন্দুরা যখন শিবাজীকে নিয়ে মেতে উঠল, তখনই মুসলমানদের কাছে আওরঙ্গজেব বড় হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে হিন্দু-মুসলমানের চলার পথ আর এক থাকল না।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস অবশ্য বরাবরই দেশের মানুষের এক জাতিতত্ত্বের কথা বলেছে— হিন্দু আর মুসলমান কোনওমতেই আলাদা জাতি নয়, ব্রিটিশই তার ভেদনীতি প্রয়োগ করে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদের সৃষ্টি করেছে। বাস্তবিক অর্থে হিন্দু আর মুসলমান আলাদা জাতি না হলেও ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণে দু-য়ের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। দু-য়ের অসম বিকাশের ফলেই তৈরি হল ভেদ-বিভেদ। মুসলিম লিগ এই অপ্রিয় সত্যকে মোহিনী মিথ্যার আবরণে যে তত্ত্ব প্রকাশ করল তার নামই দ্বিজাতিতত্ত্ব।

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে হিন্দু মহাসভার নাগপুর অধিবেশনে বিনায়ক দামোদর সাভারকর প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন ‘We the Hindus are a nation by ourself’. জিন্না সাভারকরের কথার রেশ ধরে মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে সুস্পষ্ট ভাষায় বললেন— ভারতীয় মুসলমানরা শুধু একটা সম্প্রদায় নয়, তারাও একটি জাতি (Nation) এবং ব্রিটিশ ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতিরই বাস।[৩] দ্বিজাতিতত্ত্ব শোষিত-নিপীড়িত মানুষের শ্রেণিস্বার্থ ভুলিয়ে তাদের উগ্র হিন্দু কিংবা উগ্র মুসলমান বানিয়ে তোলে আর শোষকের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী শোষিতদের সহায়তায় গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষা করার সুযোগ পায়।[৪]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক থেকেই ভারতবর্ষে একটু একটু করে মুসলমান মধ্যবিত্তের উদ্ভব ঘটতে শুরু করে। এই মধ্যবিত্তরা আধুনিক শিক্ষার আলোকে প্রবেশ করতে শুরু করলে তার মধ্যে প্রবল হিন্দুত্বের উপস্থিতি লক্ষিত হয়। এই হিন্দু আধুনিকতার ধাক্কায় মুসলিম শ্রেণি তাদের আধুনিকতাকে মুসলমান বানিয়ে নিল। জাতিভেদে আধুনিকতার দুটি রূপ দেখা দিল— হিন্দু আধুনিকতা ও মুসলিম আধুনিকতা। একদিকে হিন্দু সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভুত্ব, অন্যদিকে আজন্ম লালিত সংস্কারের অজুহাতে মুসলিম সমাজকে অস্পৃশ্য করে রাখা এবং সামাজিক বঞ্চনা মুসলিম মানসে স্বাতন্ত্র্যবোধ আরও তীব্র ও তীক্ষ্ণ করে তোলে। নিম্নবর্গের হিন্দুদের সামাজিক অবস্থান উচ্চবর্গীয় হিন্দুদের চোখে মুসলমানদের তুলনায় কোনও অংশে আলাদা ছিল না, কিন্তু

চল্লিশের দশকের গোড়া থেকে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা, কাজিয়া-ফ্যাসাদ প্রবল আকার ধারণ করতে শুরু করে। তখন মুসলমানদের মোকাবিলা করবার জন্য হিন্দু ঐক্যের প্রয়োজন হয়। হিন্দু ঐক্যের ব্যবস্থা করতে হলে তো হিন্দুত্বের সংস্কার করতে হবে। আর হিন্দুত্বের সংস্কারের জন্য অস্পৃশ্যতা দূর করাই প্রথম করণীয় হয়ে দাঁড়ায়। শূদ্র কিংবা অন্ত্যজদের হাতে জল খেলে জাত যাবে, তাদের ছায়া মাড়ালে স্নান করে পবিত্র হতে হবে, দেবতার মন্দিরেও তাদের ঢুকতে দেওয়া হবে না, অথচ দাঙ্গার সময় নিজেদের রক্ষা করতে এই অন্ত্যজদেরই সব থেকে বেশি প্রয়োজন দেখা দিল। অস্পৃশ্যতার সংকট নিরসনের জন্য হিন্দু মহাসভার নেতারা উদ্যোগ গ্রহণ করল। গ্রামে গ্রামে সর্বজনীন পুজোর আয়োজন করা হয়, সেখানে ব্রাহ্মণ-শূদ্র নির্বিশেষে মন্দিরে ঢুকে পুজো করবে। হিন্দু মহাসভার এই উদ্যোগ অনেকাংশে সফল হয়। উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের বিবাদ ঘুচে গিয়ে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব প্রবলভাবে সামনে আসে। পাশাপাশি মুসলমানদের ধারণা হয় শুধু ধর্মেই নয়, আচারে-বিচারে, চিন্তা-চেতনায়, কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে, ব্যক্তির নামে ও নামকরণের রীতিতে তারা হিন্দুদের থেকে স্বতন্ত্র। আধুনিক রাষ্ট্রনীতির বিচারে একটি স্বতন্ত্র জাতির জন্য প্রয়োজন একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের। তাই মুসলমানদের জন্য চাই আলাদা একটি রাষ্ট্র—পাকিস্তান। ধর্ম পরিচয়ের ভিত্তিতে চিহ্নিত হয় হিন্দু-মুসলমানের বাসভূমি, ফলে বাধ্য হয়ে অগণিত মানুষ দেশত্যাগ করতে শুরু করে। পূর্ববঙ্গ ছাড়ে হিন্দুরা; পশ্চিমবঙ্গ (তথা ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল) থেকে দেশান্তরী হয় মুসলিম সম্প্রদায়। দেশভাগ ও বঙ্গবিভাজন নিশ্চিত হবার সময় থেকে দেশত্যাগের সূচনা হয়। র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের আগে যে 'নোশোনাল ডিভিশন' অনুসারে প্রশাসনিক কাজকর্ম শুরু হয়েছিল তার ভিত্তি ছিল ১৯৪১ সালের আদমসুমারি। তা থেকে সাধারণ মানুষের একটা ধারণা তৈরি হয়েছিল কোন জেলাগুলি কোন দেশের মধ্যে পড়বে। সেই সূত্র ধরে উভয়বঙ্গের মানুষ দেশত্যাগ শুরু করে।

সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের মোট আয়তনের শতকরা ৩৬.২০ ভাগ জমি ও মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩৫.১৪ জন লোক বরাদ্দ করা হয়। পূর্ববঙ্গের ভাগে শতকরা ৬৩.৮০ ভাগ জমি ও শতকরা ৬৪.৮৬ জন লোক ধার্য করা হয়। মোট মুসলমান জনসংখ্যার ১৬.০৬ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে এবং ৮৩.৯৪ শতাংশ পূর্ববঙ্গে বাস করবে। আবার অমুসলমান জনসংখ্যার ৫৮.২২ শতাংশকে পশ্চিমবঙ্গে এবং ৪১.৭৮ শতাংশকে পূর্ববঙ্গে বাস করতে হবে। এই হিসেব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যার সাম্প্রদায়িক অনুপাত হবে : ২৫.০১ শতাংশ এবং অমুসলমান ৭৪.৯৯ শতাংশ। পূর্ববঙ্গের ক্ষেত্রে এই অনুপাত দাঁড়াবে: মুসলমান ৭০.৮৩ শতাংশ, অমুসলমান ২৯.১৭ শতাংশ।[৫]

দেশবিভাগের প্রস্তুতি হিসেবে ১৯৪১ সালের জনগণনা অনুযায়ী মুসলিম প্রধান জেলাগুলিকে চিহ্নিত করা হয়—

i) Chittagong Division : Chittagong, Noakhali, Tippra;

ii) Dacca Division: Bakerganj, Dacca, Faridpur, Mymensingh,

iii) Presidency Division: Jessore, Mursidabad, Nadia;

iv) Rajshahi Division : Bogura, Dinajpur, Malda, Pabna, Rajshahi; Rangpur;[৬]

বাংলাভাগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবার পর সিরিল র‍্যাডক্লিফ ১৯৪৭ সালের ৮ জুলাই ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতে এসে পৌঁছলেন। যতটা সম্ভব কম সময়ের মধ্যে ভাগাভাগির কাজ শেষ করার কথা হয়। র‍্যাডক্লিফের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য নির্দিষ্ট করা হলো—

i) সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের ৬ জেলা;

ii) রাজশাহী বিভাগের রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনা জেলা;

iii) প্রেসিডেন্সি বিভাগের সমগ্র খুলনা (যশোর)।

পশ্চিমবঙ্গের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়—

i) সমগ্র বর্ধমান বিভাগ;

ii) প্রেসিডেন্সি বিভাগের কলিকাতা, ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ জেলা;

iii) রাজশাহী বিভাগের দার্জিলিং জেলা।

নদীয়া, যশোর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, মালদা জেলা বিভক্ত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্বপাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ক. নদীয়া জেলার ১২টি থানা পূর্বপাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। এগুলি যথাক্রমে আলমডাঙা, ভেড়ামারা, চন্দন গাঁ, খাকসা, কুমারখালি, মীরপুর, কুষ্টিয়া, গাঙ্গীন, দামুরহুদা, চুয়াডাঙা, জীবননগর ও মেহেরপুর। এর আয়তন ১৩৫২ বর্গ মাইল।

খ. দিনাজপুর জেলার ৯টি থানা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে আসে। এগুলি হলো— রায়পুর, ইটাহার, বংশীহরি, কেশমণ্ডী, তপন, গঙ্গারামপুর, কুমারগঞ্জ, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ, সংগ্রামপুর।

গ. পাঁচটি থানা ছাড়া সমগ্র জলপাইগুড়ি জেলা পশ্চিমবঙ্গের আওতায় আসে। এই পাঁচটি থানা হলো— বোদা, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় পাটগ্রাম, তেঁতুলিয়া। এর আয়তন ৬৭২ বর্গ মাইল।

ঘ. মালদা জেলার পাঁচটি থানা পূর্ববঙ্গে চলে যায়। এগুলি হলো— গোমস্তাপুর, নাচোল, নবাবগঞ্জ, শিবগঞ্জ, ভোলাহাট। এর আয়তন ৫৯৬ বর্গমাইল।

ঙ. সিলেট জেলার চারটি থানা বাদে সমগ্রটিই পূর্ববঙ্গের মধ্যে পড়ে।এগুলি হলো— পাথরকান্দি, বথবাড়ি, করিমগঞ্জ, বদরপুর।

চ. যশোর জেলার বনগাঁ ও গাইঘাটা— এই দুই থানা বাদে সমগ্রটি পূর্ববঙ্গের মধ্যে পড়ে। আয়তন- ৩১৯.৮ বর্গমাইল।

ছ. মুর্শিদাবাদ জেলার কোনও গোটা একটা থানা ভাগ হয়নি। এই জেলার কয়েকটি মৌজা পূর্ববঙ্গের মধ্যে পড়ে।[৭]

গোটা বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের বাসভূমি ছিল যৌথ প্রকৃতির। তাই এই ভাগাভাগিতে অনেক মুসলমান প্রধান অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গে, আবার হিন্দু প্রধান অঞ্চল পূর্ববঙ্গের মধ্যে চলে যায়। তা না হলে খুলনা এবং ফরিদপুরের দক্ষিণ অংশ পশ্চিমবঙ্গে পড়ত; মালদা ও মুর্শিদাবাদ চলে যেত পূর্ববঙ্গে। গোঁজামিলের এই ভাগাভাগিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশত্যাগ করে পুব থেকে পশ্চিমে; পশ্চিম থেকে পুবে চলে যায়। পুব দিকের যাত্রী মুসলিম, পশ্চিমের হিন্দু। তবে উভয় দিকের যাত্রীর সংখ্যাগত সমতা ছিল না। যে বিপুল সংখ্যক বাঙালি হিন্দু পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করেছে তত সংখ্যক মুসলমান পূর্ববঙ্গে যায়নি। যারা গিয়েছে তাদের অধিকাংশ অবাঙালি মোহাজের।

দেশত্যাগের সূচনা হয় ১৯৪৬ সালে নোয়াখালির দাঙ্গার পর থেকে। বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ এসেছে পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ পূর্ববঙ্গে গিয়েছে স্বাধীনতা সমকালে কিংবা তার অব্যবহিত পরে। পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমনের ধারা এখনও বর্তমান। গবেষণার কাল নির্দেশনা অনুসারে পাকিস্তান বিভাজিত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠিত হবার পূর্ব সময় পর্যন্ত উদ্বাস্তু জীবন নিয়ে আমরা আলোচনা করব। রাজনীতি, সমাজ-অর্থনীতি, রাষ্ট্রীয়নীতি নির্ধারণের চাপে উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে আগমন ঘটেছে বিভিন্ন সময়ে। বিশেষ বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে এই আগমনকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়—

i) **প্রথম পর্যায় :** ১৯৪৬-১৯৪৯;

ii) **দ্বিতীয় পর্যায় :** সেপ্টেম্বর ১৯৫০-১৯৫২;

iii) **তৃতীয় পর্যায় :** ১৫ অক্টোবর ১৯৫২-১৯৬০ (১৫ অক্টোবর ১৯৫২, পাসপোর্ট প্রথা চালু হয়);

iv) **চতুর্থ পর্যায় :** ১৯৬১-১৯৭০।

উদ্বাস্তু আগমনের প্রথম ধাপ (১৯৪৬-১৯৪৯) : প্রথম পর্যায়ে যারা দেশত্যাগ করেছে, তারা ছিল সমাজের উঁচু শ্রেণির মানুষ। দেশভাগের আগে থেকেই তাদের রাজধানী কলকাতার সঙ্গে যোগসূত্র

ছিল। অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ এই শ্রেণির মানুষ ছিল শতকরা পনেরো জন; যাদের অধীনে আশি শতাংশ জমির মালিকানা ছিল। নিজেরা সেই জমি চাষ করত না। তাদের জমিতে ফসল ফলাত গরিব মুসলমান ও নিম্নবর্গের হিন্দু। অধিকাংশ ব্যবসায়ের মালিকানা ছিল তাদের হাতে; সরকারি চাকরিতেও একক আধিপত্য থাকায় তাদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ছিল বংশ পরম্পরায়। বিশ শতকের শুরু থেকে সমাজ মনের গড়ন একটু একটু করে বদলাতে শুরু করে। মুসলিম সমাজের আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা, নিম্নবর্ণের হিন্দুদের শিক্ষার প্রতি অনুরাগ, সমৃদ্ধ এই বর্ণহিন্দুদের সমাজ জীবনের পক্ষে অস্বস্তিকর অবস্থা তৈরি করে। চল্লিশের দশকের প্রথম থেকেই এর রূপ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। পূর্ববঙ্গের নানা জায়গায় ঘটতে থাকে ছোটো খাটো দাঙ্গা। মুসলিম লিগের নানা ধরনের উস্কানিতে সাধারণ মুসলিম মনে ক্রমে সাম্প্রদায়িকতা বাড়তে থাকে। ১৯৪৬, ১৬ আগস্ট মুসলিম লিগ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেয়। ফলে কলকাতার ভয়াবহ দাঙ্গায় হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। এরপর ১ অক্টোবর শুরু হয় নোয়াখালির দাঙ্গা; কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর রাতে।

কলকাতা বন্দর শ্রমিকদের মধ্যে একটা বড়ো অংশ ছিল নোয়াখালি থেকে আসা মুসলমানেরা। তারা কলকাতার দাঙ্গাকে নির্বিচারে মুসলমান হত্যা বলে প্রচার করে। নোয়াখালিতে মুসলমান মৌলবাদের ঘাঁটি ছিল। তারা বন্দর শ্রমিকদের প্রচার কাজে লাগিয়ে দাঙ্গা বাধায়। সংগঠক হিসেবে গোলাম সরোয়ারের নাম পাওয়া যায়। সাধারণ চাষি এই দাঙ্গায় যোগ দেয়। এই যোগদানের পিছনে একটা অর্থনৈতিক কারণও ছিল। নোয়াখালিতে হিন্দুরা ছিল সংখ্যায় ১৮ শতাংশ, অথচ মোট জমির প্রায় ৭৫ শতাংশ জমি তাদের দখলে ছিল। মুসলমান চাষির উপর হিন্দু জমিদারের অত্যাচার সাধারণ মুসলমানের মনে বহুদিন ধরে ক্ষোভ জমিয়ে তুলেছিল। তার ফলে ঘটে এই দাঙ্গা।[৮] তবে এ সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেন তপন রায়চৌধুরী। তার মতে— কলকাতার সংবাদে ক্ষিপ্ত হয়ে মুসলিম সম্প্রদায় হিন্দু জনগণকে আক্রমণ করে, এরকম ভাবার কোনও কারণ নেই। কৃষক বিদ্রোহের অঙ্গ হিসাবে গ্রামাঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা ঘটেছে বহু বার, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে। কতকটা অর্থনৈতিক কারণে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। নাহলে পরস্পর নির্ভরতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পূর্ববঙ্গের এই সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ত। মোটকথা নোয়াখালির দাঙ্গা মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রাসন নয়, একজন ধান্দাবাজের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র; তিনি গোলাম সারওয়ার, পেশায় ছিলেন মোক্তার। নিতান্তই আদর্শগত কারণে প্রথমে তিনি দলবল নিয়ে গ্রামে জমিদারের প্রাসাদ আক্রমণ করেন। পরে তা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়ায়। এরমধ্যে লোভ বা বিদ্বেষের ব্যাপার ছিল না।[৯] তবে সাধারণ মানুষের সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত

সহযোগিতা ছাড়া এই ভয়াবহ দাঙ্গা একজন মানুষের ইন্ধনে হওয়া সম্ভব নয় বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন।

এই দাঙ্গার পর থেকেই পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের দেশছাড়া শুরু হয়। দাঙ্গা শুরু হবার এক সপ্তাহের মধ্যে কলকাতায় উদ্বাস্তুর সংখ্যা দাঁড়ায় ৪,০০০ এবং আগরতলায় ৫,০০০।[১০] এই পর্যায়ে আগত উদ্বাস্তুরা সম্ভ্রান্ত নায়েব, জমিদার, ডাক্তার, মোক্তার সম্পন্ন ব্যবসায়ী শ্রেণির। পরবর্তী সময়ে এরাই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি, সমাজনীতি এমনকী অর্থনীতিতে প্রতিষ্ঠা পায়। এদেরই একটি শ্রেণি সরকারি চাকরিতে অপশন বদলির সুযোগ নিয়েছিল। সুতরাং এই শ্রেণির কাছে দেশত্যাগ ছিল চাকরিতে বদলির শামিল। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা দরকার নিম্নবর্গীয়দের মধ্যে সরকারি চাকরিরত মানুষের সংখ্যা ছিল কম। যারা চাকরি করত তারাও অপশন বদলির সুযোগ গ্রহণ করেনি। কারণ কৃষির সঙ্গে তাদের যোগসূত্র থাকায় হঠাৎ করেই চাষের জমি-জায়গা হস্তান্তর করা সম্ভব হয়নি।[১১]

এই পর্বে দেশত্যাগের কারণগুলি নিম্নরূপ :

ক. যে সক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও সুযোগ সুবিধা উচ্চবিত্তরা ভোগ করতো, সে ক্ষেত্রগুলিতে অপেক্ষাকৃত নিচুস্তরের মানুষ দাবিদার হয়ে ওঠে;[১২]

খ. দেশবিভাগ পূববর্তী যে সামাজিক সম্মান তারা পেয়ে এসেছে তাতে ঘাটতি দেখা দিচ্ছিল। দেশ স্বাধীনের পরে মুসলিম সমাজ মনে করিয়ে দিয়েছে সামাজিকভাবে তারাও প্রতিষ্ঠিত হিন্দুদের সমকক্ষ;[১৩]

গ. ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থায় আমূল বদলের ফলে অনেক জমিদার-জোতদার-নায়েব শ্রেণি অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে। অথচ আভিজাত্যকে বজায় রাখতে ব্যয় সংকোচন সম্ভব ছিল না। নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে তারা দেশত্যাগকে শ্রেয় মনে করে;[১৪]

ঘ. যেহেতু মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দীর্ঘদিনের ঘৃণা ছিল, তাই রাজনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ও মানসিকভাবে নিগৃহীত হবার ভয়ে তারা দেশ ছাড়ে;

ঙ. নোয়াখালির দাঙ্গার ভয়াবহতা, বিশেষ করে নারী নিগ্রহের ঘটনা আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে;[১৫]

চ. পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে তাদের আত্মীয় স্বজন ছড়িয়ে ছিল। তাদের ভরসায় এরা দেশত্যাগ করে। বলে রাখা দরকার এদের অনেকেই ক্যাম্পে থাকেনি; উদ্বাস্তু হিসেবে নাম লেখায় নি;[১৬]

ছ. শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে হয়েছিল তারা পশ্চিমবঙ্গে গেলে কাজ খুঁজে পেতে কিংবা বেঁচে থাকতে কোনও অসুবিধা হবে না;

জ. দেশভাগ সমকালীন সময়ের নানরকম গুজব আর বিক্ষিপ্ত ঘটনা থেকে আতঙ্ক তৈরি হয়।

ফল দেশত্যাগ;[১৭]

ঝ. পক্ষপাতদুষ্ট প্রশাসন;[১৮]

ঞ. দেশের শাসনব্যবস্থায় হিন্দুদের প্রতিনিধি কম। সেনাবাহিনী ও পুলিশে হিন্দু অফিসারদের অপ্রতুলতা;[১৯]

ট. স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেওয়া মানুষেরাই পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক নেতৃত্বে ছিল। এদের মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায় মনে করতে লাগল ইংরেজরা চলে গেলে তাদের মুসলমানের অধীনে থাকতে হবে। তাই ক্ষমতাবান উচ্চবর্ণের মানুষ দেশত্যাগ করে[২০]।

এই পর্বে আতঙ্কের কারণে দেশ ছাড়ে হিন্দুরা। এর কিছুটা কাল্পনিক কিছুটা গুজব। এই সময়ে বড়ো আকারের দাঙ্গা না ঘটলেও প্রতিদিনের জীবনে লাঞ্ছনা ঘটেই চলেছিল। এছাড়াও ছিল হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসবের উপর আক্রমণ।[২১] স্বাধীনতার কয়েক দিনের মধ্যে ঢাকায় জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রার উপর হামলা হয়, বন্ধ করে দেওয়া হয় ধামরাইলের বিখ্যাত রথের মেলা। এই সময়ে গোপালগঞ্জে কালীমূর্তি ভাঙা নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়।[২২]

১৯৪৮ সালে ঢাকা সহ পূর্ববঙ্গে দুর্গাপুজোর সংখ্যা কমে গিয়েছিল কারণ—

i) সংখ্যালঘুর মনে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল;

ii) যাদের তত্ত্বাবধানে পুজোর আয়োজন হতো তাদের অনেকে ইতিমধ্যে দেশত্যাগ করেছে; যে পুজোগুলির আয়োজন করা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে পোস্টার পড়েছিল। বিজয়া দশমীর দিন বহু হিন্দুবাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছিল।[২৩]

স্বাধীনতার কেবলই পরে ব্যাপক হারে দাঙ্গা-হাঙ্গামা না হলেও সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক বর্জন বর্ধিষ্ণু হিন্দুর দেশত্যাগের অন্যতম কারণ। হিন্দুর জমির ফসল নষ্ট করে দেওয়া, ফসল কেটে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা প্রায়ই ঘটত। বাজার হাটে হিন্দুর দোকানে মুসলিম খরিদ্দারকে ঢুকতে নিষেধ করা হতো। ইউনিয়ন বোর্ডের কর ও আয়করের ক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রতি বৈষম্য দেখানো হয়েছিল বলে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় ডাঃ বিধান রায় অভিযোগ করেন। হিন্দু-ব্যবসায়ীদের উপর অতিরিক্ত কর বসানো হয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে। এই প্রেক্ষাপটে বহু মানুষ দেশত্যাগে বাধ্য হয়।[২৪] ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার প্রশ্নেও দেশত্যাগ করে অনেকে।

১৯৪৭-এ পাকিস্তান রাষ্ট্র স্থাপিত হয়। কিন্তু সরকার সেখানে আইনের শাসন প্রবর্তন করতে

সক্ষম হয় না। ফলে সংখ্যালঘুর মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু আগমন বাড়তে থাকে। পাকিস্তান গঠনের সময় মহম্মদ আলি জিন্নাহর প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের কোনও ব্যবস্থা হয়নি। সেজন্য সাধারণ মানুষের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে। এই অবস্থায় সংখ্যালঘু অত্যাচারিত হয়ে দেশত্যাগ করেছে।

নিজেদের বাসভূমি ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নেবার প্রবণতা বৃদ্ধির আরও একটি কারণ ছিল। হায়দরাবাদের নিজাম ভারতবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ায় ১৯৪৯ সালে ভারত সরকার সেখানে সৈন্য পাঠায়। ফলে নিজামশাহীর পতন হয়। রাজাকারদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এই সময়ে হায়দরাবাদ রাজ্যকে সামরিক শাসনের অধীনে রেখে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। এই ঘটনায় পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশের মনোভাব হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ হয়ে ওঠে। নানা স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পত্তি দখল, নারী নির্যাতন সহ নানা রকম শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারে তারা বিপন্ন বোধ করে এবং দেশ ছাড়তে শুরু করে।[২৫]

পাকিস্তান মুসলমান প্রধান ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত হবার পর সামাজিকভাবে লাঞ্ছিত মুসলিম সমাজ আধিপত্যের দাবি করল। তাদের শাসন ক্ষমতা এবং সামাজিক সম্মানের দাবি হিন্দু সম্প্রদায়কে বিচলিত করে তুলল। মুসলিমদের প্রকাশ্য উল্লাস ও আত্মপ্রত্যয় অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে আক্রমণাত্মক চেহারা নিয়েছিল। যে ছিল এতদিন শান্ত প্রজা, স্বাধীনতার পরে তার সুর চড়েছে। গেটের বাইরে থেকে যাকে বাড়ি ঢোকার অনুমতি গ্রহণ করতে হত, সে-ই বিনা অনুমতিতে অন্দরে ঢুকে বলেছে— কর্তা এখন পাকিস্তান হয়ে গেছে; মনে রেখো আমরা আর ছোট নেই।[২৬]

মোটামুটিভাবে ধরে নেওয়া হয় পঞ্চাশের দশকের আগে যারা দেশত্যাগ করে তারা পূর্ব পাকিস্তানে অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল ছিল। তাদের অনেকেই সরকারি সাহায্য নেয়নি, পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের উপর নির্ভর করে নি। পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিয়েছিল। অভ্যস্ত জীবন ছেড়ে তাদের যে ক্লেশ ভোগ করতে হয় তার জন্য তারা দেশ বিভাগকে দায়ী করে। তখন কংগ্রেস সরকার কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের উপর উদ্বাস্তুদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। পরবর্তী সময়ে সাধারণ উদ্বাস্তুদের এই ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি রাজনৈতিক ফায়দা তুলেছিল।[২৭] ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত যারা পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করেছিল গবেষক নীলাঞ্জনা চ্যাটার্জীর

কথায়, তাদের শতকরা ৬০জন ছিল অকৃষিজীবী[২৮]। ১৯৪৮-য়ের জুন মাসের মধ্যে পাকিস্তান ত্যাগ করে ১.১ মিলিয়ন হিন্দু। এর মধ্যে ৩৫০,০০০ শহুরে মধ্যবিত্ত, ৫,৫০,০০০ গ্রামীণ মধ্যবিত্ত ১,০০, ০০০ এর কিছু বেশি কৃষক এবং ১০০,০০০ এর কিছু কম কারিগর।[২৯]

উদ্বাস্তু আগমনের দ্বিতীয় ধাপ (সেপ্টেম্বর ১৯৫০-১৯৫২) : ১৯৪৯ সালের শেষ দিকে বাস্তুত্যাগে সাময়িক ভাটা পড়ে। কিন্তু ৫০-য়ের জানুয়ারি থেকে পূববঙ্গের খুলনা, ঢাকা, ফরিদপুর, রাজশাহী, বরিশাল সহ নানা জায়গায় নতুন করে দাঙ্গা শুরু হয়। এই সময়ে দেশত্যাগের মাত্রা বাড়তে থাকে। ১৯৫০ সালের মার্চ মাসেই এসেছিল ৭৫,০০০ মানুষ। ৫০-য়ের আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত শরণার্থী শিবিরে উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ :

আগস্ট— ৩৫,৫১৪

সেপ্টেম্বর— ১৪,৫৩৬

অক্টোবর— ৪,৭৫৪

নভেম্বর— ৯,৫৪৩

ডিসেম্বর— ৬,৫৮৯[৩০]

প্রথমদিকে বর্ধিষ্ণু শ্রেণির হিন্দু দেশত্যাগের পর তাদের জমি-জায়গা দখল করে নেয় এক শ্রেণির মুসলিম। এরপর তাদের নজরে পড়ে বাকি সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি ও নারীদের উপর। এই পর্যায়ে অত্যাচারের কৌশলেরও কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। সংখ্যালঘুদের মধ্যে যারা একটু অবস্থা সম্পন্ন, যাদের বাড়িতে যুবতী মেয়ে আছে তাদের বাড়িতে ডাকাতি হতে লাগল ঘন ঘন। এর মদতদাতা ছিল নতুন ক্ষমতার অধিকারী সেইসব মানুষ যারা দাঙ্গার সময় রক্ষকের ভূমিকা নিয়ে হিন্দুদের জমি-বাড়ি দখল করেছিল। ডাকাতরা ভয় দেখাতো— এরপরে দেশ না ছাড়লে একেবারে নিকেশ করে দেওয়া হবে।[৩১] ফলে হিন্দুরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে লাগল।

১৯৫০-য়ের জানুয়ারি থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা সংঘটিত হয়। দাঙ্গার সূত্রপাত হয় খুলনা জেলার বাগেহাটের কালশিরা গ্রামে। জনৈক দীপক ব্রহ্মের বাড়িতে কয়েকজন কমিউনিস্ট নেতা লুকিয়ে আছে বলে পুলিশের কাছে খবর ছিল। পুলিশ ধরতে এলে তারা পালিয়ে যায়। বাড়িতে খানাতল্লাশির অজুহাতে পুলিশ গৃহকত্রীকে ধর্ষণে উদ্যত হলে গ্রামবাসীদের আক্রমণে একজন পুলিশ নিহত হয়। তারা লাশও গায়েব করে ফেলে। পরের দিন বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে অত্যাচার শুরু

করে। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মুসলমানেরা পুলিশের সঙ্গে যোগ দেয়। ক্রমে তা ছড়িয়ে পড়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। ঘর-বাড়িতে আগুন দেওয়া, লুটপাট, নারী ধর্ষণের ঘটনায় হিন্দুরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এই অঞ্চলের ব্যাপক সংখ্যক মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে পাড়ি দেয় পশ্চিমবঙ্গের উদ্দেশ্যে।[৩২]

আব্দুল মোহাইমেনের মতে কালশিরার ঘটনার সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার সম্পর্ক ছিল না। ঘটনাটি ছিল পুলিশের সঙ্গে কমিউনিস্ট কর্মীদের সংঘর্ষ। কালশিরা গ্রামে অত্যাচারিত হিন্দুরা কলকাতায় গিয়ে ঘটনাটিকে সাম্প্রদায়িক রূপ দেয়। স্থানীয় লোকের সহানুভূতি আদায়ের জন্য বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করে। স্থানীয় পত্রিকাগুলি এই কাজে বিশেষ সহায়তা করে।[৩৩]

কালশিরার পর রাজশাহী, বরিশাল, ঢাকা, ফরিদপুর সহ পুর্ব পাকিস্তানের নানা জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। দলে দলে হিন্দু সীমান্ত অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেয়। তাদের দুর্দশা ছড়িয়ে পড়ার পর এ রাজ্যেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কলকাতা ও মুর্শিদাবাদে দাঙ্গা হয়। সন্ত্রস্ত মুসলিমরা পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে পূর্ব পাকিস্তানে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগী মুসলিম উদ্বাস্তু ছিল সংখ্যায় নগণ্য। তাদের অবস্থা দেখে পূর্ব পাকিস্তানে দ্বিতীয় দফায় দাঙ্গা ও হিন্দু বিতাড়ন শুরু হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের দৃষ্টান্ত তখন চোখের সামনে। তাই বেসরকারি উদ্যোগে দুইবঙ্গের মধ্যে হিন্দু মুসলিম জনবিনিময়ের একটা চেষ্টাও তখন হয়েছিল কিন্তু নেহরু ছিলেন এর ঘোরতর বিরোধী। তিনি লোক বিনিময় বা পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের জন্য কিছু এলাকার দাবির বিপক্ষে ছিলেন।[৩৪]

এই সময়ে হিন্দুদের মনোবল ভেঙে দিয়ে দেশত্যাগের জন্য পরিকল্পিত ভাবে আক্রমণ করা হতো। অনেকেই জানত কবে কোথায় দাঙ্গা হবে। বহু সহৃদয় মুসলমান হিন্দুদের সতর্ক করে দিয়ে জীবন বাঁচিয়েছিল। ১৯৫১-তে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল ৩.৫ মিলিয়ান।[৩৫] এই প্রেক্ষাপটে ১৯৫০-য়ের ৮ এপ্রিল সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে তাদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা দিতে ভারত ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তিটি নেহরু-লিয়াকত চুক্তি নামে পরিচিত। এই চুক্তির একটি নির্দিষ্ট অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো :—

> Shall ensure to the minorities througout its territories, complete equality of citizenship irrespective of religion, full sense of security in respect of life, culture, property and personal freedom of movement within each country and freedom of occupation, speech and worship.[৩৬]

নেহরু লিয়াকত চুক্তির প্রধান শর্তগুলি নিম্নরূপ :

i) উভয় দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি সাম্যনীতি সুনিশ্চিত করবে;

ii) ব্যক্তিগত সম্মানসহ জীবন, সংস্কৃতি ও সম্পত্তির পূর্ণ নিরাপত্তা রক্ষা করবে;

iii) সকল নাগরিকের স্বাধীনভাবে চলা ফেরা, পেশা গ্রহণ করবার অধিকার থাকবে;

iv) সংখ্যাগুরুর মতো সংখ্যালঘুরও রাষ্ট্রীয় জীবনে, রাজনীতিতে, সরকারি প্রশাসনে, সামরিক ও অসামরিক বিভাগে সেবা করার সুযোগ থাকবে;

v) বাস্তুত্যাগীর সম্পত্তি কারও দ্বারা দখল হয়ে থাকলে ১৯৫০ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে তিনি ফিরে এলে সম্পত্তি ফেরৎ দেওয়া হবে;

vi) ইচ্ছে করলে উভয় দেশের নাগরিক সম্পত্তি বিনিময় করে দেশত্যাগ করতে পারবে;

vii) জোর করে ধর্মান্তর বন্ধের আইনগত স্বীকৃতি।

নেহরু লিয়াকত চুক্তি অনুযায়ী দুই রাষ্ট্রের উদ্বাস্তুদের নিজেদের বাসভূমিতে স্থাবর সম্পত্তি ফিরে পাবার ব্যবস্থা হয়। তাতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের আগমন কিছুটা রোধ হয়। তবে প্রবাহ বন্ধ হয়নি। কারণ—

i) পাকিস্তানের প্রশাসনিক ব্যবস্থা হিন্দুদের মধ্যে নিরাপত্তার মনোভাব সৃষ্টি করতে পারেনি;

ii) ফেলে আসা সম্পত্তির অধিকার সুনিশ্চিত হয়নি;

iii) সংখ্যালঘুর প্রতি দেশের সাধারণ সংখ্যাগুরুর বিরূপ মনোভাব এই আইনে বদল হয়নি।

অন্যদিকে ভারতে আইনের শাসন বলবৎ থাকায় এখানে সহজেই চুক্তির শর্ত কার্যকর করা সম্ভব হয়। এই চুক্তির পর পশ্চিমবঙ্গ ও অসম রাজ্য থেকে নিরাপত্তার কারণে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলমানদের বাস্তুত্যাগ ঘটেনি।[৩৭] পূর্ব পাকিস্তানের চিত্র ছিল ভিন্ন। সেখানে প্রশাসনের পক্ষ থেকে চুক্তি কার্যকর করার কোনও প্রয়াস হয়নি। ১৯৫১-তে পাকিস্তানের আইন সভায় এমন সব আইন পাশ করা হলো যার ফলে সংখ্যালঘুরা স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়। বিশেষ করে দুটি আইনের প্রয়োগে হিন্দুরা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত হয়।—

i) East Bengal Evacuees Property (Restoration of Possession) Act of 1951;

ii) East Bengal Evacuees (Administration of Immovable Proparty) Act of 1951.[৩৮]

নেহরু লিয়াকত চুক্তির পর যারা পূর্ববঙ্গে ফিরে গিয়েছিল, তারা তাদের স্থাবর সম্পত্তি ফিরে পায়নি। ফলে কিছুদিন পরে আবার তারা উদ্বাস্তু হয়ে ফিরে আসে পশ্চিমবঙ্গে। যে সব মুসলমান পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম ছেড়েছিল তারাও আবার ফিরে আসে। শুধু তারাই ফেরেনি, তাদের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের অনেক

মুসলমানও ভারতে চলে আসে।[৩৯]

১৯৫১ সালে খুলনা অঞ্চলে ভীষণ এক ঘূর্ণিঝড় হয়। প্রচুর মানুষ মারা যায়; গবাদিপশু, ঘরবাড়ি ও ফসলের ক্ষতি হয়। ফলে ওই অঞ্চলে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটে, দেশত্যাগীর সংখ্যাও বাড়ে[৪০]। ৫১-তে সারা পূর্ববঙ্গ জুড়ে শস্যের ঘাটতি ছিল। ফলে ব্যাপক খাদ্যসংকট দেখা দেয়। সরকারি ত্রাণ ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু অধিকাংশ হিন্দুরা তা থেকে বঞ্চিত হয়, সেই কারণে বহু মানুষ দেশ ছাড়ে। কিন্তু ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে উদ্বাস্তুদের আসা অনেক কমে যায়।[৪১]

এই পর্বে যারা দেশত্যাগ করে তাদের সিংহভাগ নিম্নবর্গের; অর্থনৈতিক ভাবে বিপর্যস্ত। দেশভাগের অব্যবহিত পরে ভদ্রশ্রেণির হিন্দুর দেশত্যাগ নিম্নবর্গীয় যুগী, নাপিত, ধোপা, কামার, নমঃশূদ্রদের গ্রামীণ জীবনে বিশেষ প্রভাব ফেলেনি। এর সম্ভাব্য কারণগুলি নিম্নরূপ:

i) দেশভাগের ভবিষ্যৎ প্রভাব সম্পর্কে অপবর্গীয়দের সম্যক ধারণা ছিল না;.

ii) বর্ণ হিন্দুরা মুসলিম ও নিম্নবর্ণীয়দের বিশেষ আলাদা চোখে দেখতো না। ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল;

iii) তপশিলি নেতা যোগেন মণ্ডল দলিত হিন্দু ও মুসলিমদের সমন্বয়ে এক নতুন সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন;

iv) বঙ্গের বৃহত্তর জনজাতি নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ছিল প্রান্তিক চাষি। পূর্ববঙ্গের চাষবাস নির্ভর গ্রামীণ জীবন ত্যাগ করে তারা দেশান্তরী হবার সাহস পায়নি;

v) উচ্চবর্গীয়দের দেশত্যাগের সূচনায় নিম্নবর্ণের মানুষদের মনে হয়েছিল এই অবস্থায় তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বাড়বে।[৪২]

উচ্চবর্ণের কাছে মুসলমান ও নিম্নবর্গীয় হিন্দু সমানভাবে অচ্ছুৎ হিসেবে বিবেচিত ছিল। গৌরকিশোর ঘোষের ‘প্রেম নেই’ উপন্যাসে বিভাজনের এই রেখা সুস্পষ্ট হয়েছে পণ্ডিতমশাই-য়ের কথায়। পণ্ডিত মশাই মুসলমান ছাত্র ফটিককে জানান— সে যবন, আর ধনা চাঁড়াল, তারা দু’জনই অস্পৃশ্য। তারা ঘরে থাকতে তিনি জলস্পর্শ করতে পারবেন না। কিন্তু সেই চাঁড়ালকে যবন আপন করে দেশে রাখতে পারল না। এক্ষেত্রে দু’পক্ষের মিলিত সহবাস, সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা হয়নি। শুধু ধর্ম বৈষম্যের ফলে কৃষিজীবী-মৎস্যজীবী, কারিগর মুসলমানের কাছে নিম্নবর্গীয় হিন্দুরা আশ্রয় পেল না।

দুই সম্প্রদায়ের নিম্নবর্গীয়দের মধ্যে যাতে ঐক্য গড়ে উঠতে না পারে তার উদ্যোগ শুরু হয়েছিল দেশবিভাগের পূর্বেই। চল্লিশের দশকের গোড়া থেকে। হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব বুঝেছিল বাংলার মুসলমানদের সঙ্গে টক্কর দিতে হলে হিন্দুত্বের ছাতার তলায় জড়ো করতে হবে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের। তপশিলি সম্প্রদায়, যাদের উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মন্দিরে ঢুকতে দিত না, যাদের জল অচল মনে করতো, অস্তিত্বের সংকট মোচনে তারাই নিম্নবর্গীয়দের একমঞ্চে জায়গা দিল। এই সময় থেকে উঁচুনিচুর ব্যবধান একটু একটু করে ঘুচতে শুরু করে। ফলে চল্লিশের দশক থেকে বহুক্ষেত্রেই হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা পর্যবসিত হয় নিম্নবর্গীয় হিন্দুর সঙ্গে নিম্নবর্গীয় মুসলমানের দাঙ্গায়।[৪৩]

এসম্পর্কে জয়া চ্যাটার্জি তার Bengal Divided গ্রন্থে লিখেছেন :.

> In the early forties, when the movement to draw the low castes into Hindu politics was at its height, there were many incidents of violence involving low caste groups and Muslims.'[৪৪]

স্বাধীনতার কেবলই আগে পরে গোয়ালাদের সঙ্গে মুসলমানের, সাঁওতালদের সঙ্গে মুসলমানের, নমঃশূদ্রদের সঙ্গে মুসলমানের সংঘর্ষ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ১৩৬১ বঙ্গাব্দে গোপালগঞ্জ জেলার হাটভাড়িয়া রায়টের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। নমঃশূদ্রদের জমিতে মুসলমানের গরুর ধান খাওয়াকে কেন্দ্র করে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দাঙ্গা বাধে। ফলে এই অঞ্চল থেকে ব্যাপক সংখ্যক হিন্দু দেশত্যাগ করে। আনুমানিক এই সংখ্যা দশ হাজার।[৪৫]

নমঃশূদ্র নেতা তদানীন্তন পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী যোগেন মণ্ডল তপশিলি হিন্দুদের সঙ্গে মুসলিম লিগের রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। পাকিস্তান কায়েম হবার সময় লিগ দলিত হিন্দু ও মুসলিমদের অভিন্ন স্বার্থের কথা বলেছিল। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি বজায় থাকেনি। উৎপীড়নের মুখে বর্ণগত ভেদ ঘুচে গিয়ে মুখ্য হয়ে ওঠে ধর্মগত বিভেদ। ফলে যোগেন্দ্রনাথ পূর্ব পকিস্তান ত্যাগ করে গোপনে ভারতে চলে আসেন। তিনি ভারত থেকে ১৯৫০'য়ের অক্টোবরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের কাছে পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দেন। এই পত্রে তিনি জানান— শেষপর্যন্ত তিনি উপলব্ধি করেছেন পাকিস্তানের পরিকল্পিত নীতি অনুসারে Squeezing Hindus out of the Pakistan হয়ে চলেছে। তাই পাকিস্তানের হিন্দুরা কার্যত নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ছে। এই সময় থেকেই যোগেন্দ্রনাথ উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের ভেদাভেদ ঘুচিয়ে হিন্দুত্বের জিগির তোলেন। তাঁর মতে উচ্চবর্ণের হিন্দু হোক কিংবা তপশিলি জাতিভুক্ত হিন্দু হোক 'Pakistan is no place for Hindus to live'- মুসলিম লিগের চোখে

উচ্চবর্ণের নিম্নবর্ণের হিন্দু একাকার।[৪৬] যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের দেশ ছাড়ার ফলে দলিত হিন্দুর মনোবল ভেঙে যায়। তার দেশত্যাগ নিম্নবর্ণের দেশত্যাগের মাইল ফলক।

জমিদার, তালুকদার, উকিল, মাস্টার, ডাক্তারবাড়ি খালি হয়ে যেতে চাষি, কামার, কুমোর, জেলে, নাপিতরা নিরাশ্রয় বোধ করে। উচ্চবর্ণের অনুপস্থিতিতে অনেকে কাজ হারায়। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শতকরা ৩০ ভাগ উচ্চবর্গের সঙ্গে সরাসরি শ্রমবিপণনে যুক্ত ছিল। তাছাড়া নিজেদের উচ্চবর্গীয়দের কাছে ঘৃণার পাত্র জেনেও কেবলমাত্র হিন্দুত্বের দাবিতে সংকট কালে তারাই শেষ আশ্রয় বলে মনে করতো।[৪৭] মোটকথা এইপর্বে যারা উদ্বাস্তু হয়ে আসে তাদের সিংহভাগই তপশিলি শ্রেণির। তারা একদিকে যেমন দাঙ্গা, নারী নির্যাতন, প্রশাসনিক অত্যাচারের ফলে দেশ ছাড়ে, সেইসঙ্গে অর্থনীতি ও জীবিকার প্রশ্নে দেশত্যাগ করে। এর সঙ্গে যোগ হয় যোগেন মণ্ডলের গোপনে দেশত্যাগ।

তৃতীয় ধাপ : (১৫ অক্টোবর ১৯৫২-১৯৬০) : উদ্বাস্তু আগমনের ধারাবাহিকতা বজায় ছিল; এরই মধ্যে ১৯৫২ সালের ১৫ অক্টোবর পাকিস্তান সরকার একক ভাবে পাসপোর্ট প্রথা চালু করে, ফলে সংখ্যালঘুরা শঙ্কিত হয়। তাদের ধারণা হয় এর পরে আর যাতে সহজে কেউ দেশত্যাগ না করতে পারে তার জন্যে সরকারের এই কৌশল। ফলে দেশত্যাগের হিড়িক পড়ে যায়। পরে বাধ্য হয়ে ভারত পাসপোর্ট প্রথা চালু করে। ১৯৫৫-৬০-য়ের বিভিন্ন সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। ফলে সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। এই পর্বে আগত উদ্বাস্তুরা মূলত প্রান্তিক চাষি এবং খেটে খাওয়া মানুষ। ১৯৫২ ও ৫৪-তে পাকিস্তান আইন সভায় দুটি আইন পাশ হয়—

i) East Bengal Prevention of Transfer of Property and Removable of Documents and Records Act-1952;

ii) East Pakistan Disturbed Persons (Rehabilitation) ordinance of 1954.[৪৮]

১৯৪৪ সালের অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী সরকারের অনুমতি ছাড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের সম্পত্তি বিক্রি করতে পারবে না। সরকারি দপ্তর থেকে এই অনুমোদন পেতে নানারকম ঝামেলা পোহাতে হতো। ফলে অনেকেই জমি-জায়গা ফেলে রেখে দেশত্যাগ করে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বামফ্রন্ট জয়ী হয়। নির্বাচনে আইনসভায় ৭২ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য নির্বাচিত হয়। ফলে সংখ্যালঘুর মনোবল কিছুটা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই সরকারের আয়ু ছিল অতি অল্প দিনের। ’৫৮-তে সংবিধান বাতিল করে আয়ুব খান ক্ষমতা দখল করে এবং টানা দশ বছর সেখানে সেনা শাসন বজায় রাখে। ১৯৫৭তে Pakistan (Administration of Evacuees Property) Act XII of 1957 আইন

জারি করে। সুতরাং ১৯৫২ ও ৫৪-র আইনের সঙ্গে যুক্ত হয় আরও একটি বৈষম্যমূলক আইন। এইসব আইনের ক্ষমতা বলে প্রশাসনিক অত্যাচার এবং পুলিশি হয়রানি বাড়ে, সেইসঙ্গে বাড়তে থাকে সংখ্যালঘুর দেশত্যাগ।

চতুর্থ ধাপ (১৯৬১-৭০) : ষাটের দশকের প্রথম থেকে পূর্ব পাকিস্তানের নানা জায়গায় নতুন করে দাঙ্গা শুরু হয়। দাঙ্গা ব্যাপক আকার ধরেনি, তথাপি অঞ্চল বিশেষে তা হিন্দুদের দেশত্যাগকে প্রভাবিত করে। বিশেষ করে ১৯৬২ ও ৬৪-তে খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুরের নানা জায়গায় দাঙ্গা শুরু হয়। এই সময়ে পূর্ববঙ্গে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় মিলিতভাবে দাঙ্গা প্রতিরোধে এগিয়ে আসে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সমসাময়িক সময়ে দাঙ্গা বাধে ফলে মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক শক্তি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা দাঙ্গাকারীদের দমন করতে সক্ষম হওয়ায় সংখ্যালঘুরা ব্যাপক হারে দেশত্যাগের পথ অনুসরণ করেনি।[৪৯] ১৯৬৫-র সেপ্টেম্বর Defence of Pakistan ordinance চালু হওয়ায় সেখানকার হিন্দুদের দুরবস্থা বৃদ্ধি পায়। এরপর East Pakistan Enemy Property (Land and buildings) Administration and Disposal order of 1965 নির্দেশ জারি করা হয়। ফলে হিন্দু সম্পত্তি হস্তান্তরে নানা জটিলতা তৈরি হয়। হাজার হাজার একর হিন্দুর জমি-বাড়ি দখল হয়ে যায়। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সম্পত্তি বিক্রি করতে গেলে দেশত্যাগের প্রশ্ন তুলে পুলিশি হয়রানি শুরু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল বরকাত ও শফিক উজ্জামানের একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে— শত্রুসম্পত্তি ও অর্পিত সম্পত্তি আইনের দরুণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ২০ লক্ষ একরের বেশি জমি হারাতে হয়েছে।[৫০]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সময়কালে ব্যাপক সংখ্যক নারী লাঞ্ছিত হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে মেয়েরা স্বেচ্ছায় মুসলমানদের সঙ্গে ঘর বেঁধেছে। বিষয়টি হিন্দু মানসিকতায় আঘাত করেছে। সামাজিক সম্মান বাঁচাতে তার অভিভাবক ও আত্মীয়স্বজন দেশত্যাগ করেছে। ১৯৬১ থেকে ৬৫-র মধ্যে দশ লক্ষ উদ্বাস্তু পরিবার পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেয়। ১৯৬৯-য়ের ২৬ মার্চ আয়ুব খানকে পদচ্যুত করে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা দখল করে। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আসার পর দেশে সামরিক শাসন জারি করে। সামরিক বাহিনীর একনায়কতন্ত্র পূর্ব পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করে তোলে। ফলে দেশত্যাগ অব্যাহত থাকে। কিন্তু এই সময়ে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুরা একই পরিবারের সকলে একসঙ্গে দেশ ছাড়েনি। পরিবারের দু'একজনকে পাঠিয়েছিল জমি জায়গা কিংবা কাজের সন্ধানে। নিদেনপক্ষে তারা একটি বসতবাড়ি ভাড়া করে কাজের সন্ধানে নেমে পড়ে। রুজি-রোজগারের সামান্য

ব্যবস্থা হলেই বাকিদের পূর্ববঙ্গ থেকে চলে আসতে খবর পাঠায়। কমতে থাকে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু হিন্দুর সংখ্যা। স্বাধীনতা উত্তর পূর্ববঙ্গের আদমসুমারি অনুযায়ী হিন্দু জনসংখ্যার হার নিম্নরূপ—

সাল	**মোট জনসংখ্যার শতকরা হার**[৫১]		
১৯৫১	,,	,,	২২
১৯৬১	,,	,,	১৮.৫
১৯৭৪	,,	,,	১৩.৫
১৯৮১	,,	,,	১২.১
১৯৯১	,,	,,	১০.৫[৪৮]

পূর্ববঙ্গ বাদ দিয়ে পৃথিবীর আর কোথাও বিগত পঞ্চাশ বছরে সংখ্যালঘু এভাবে হ্রাস পায়নি।

আদমসুমারিভিত্তিক (পূর্ববঙ্গের) হিন্দু-মুসলমানের হ্রাস/বৃদ্ধির প্রবণতা

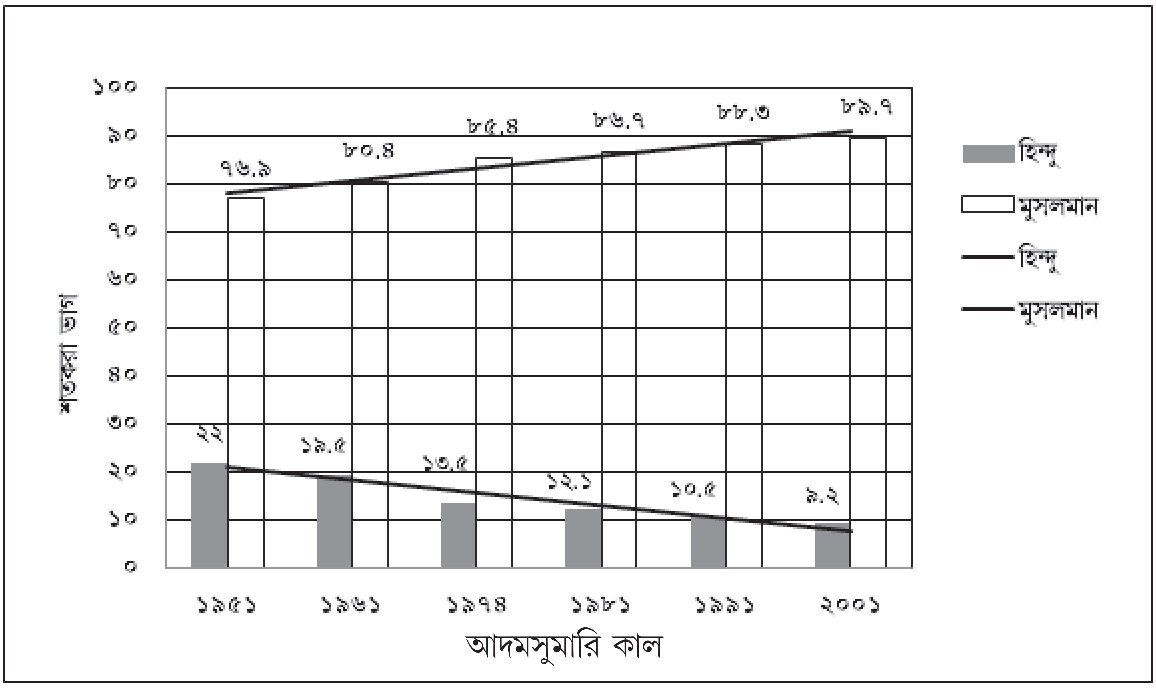

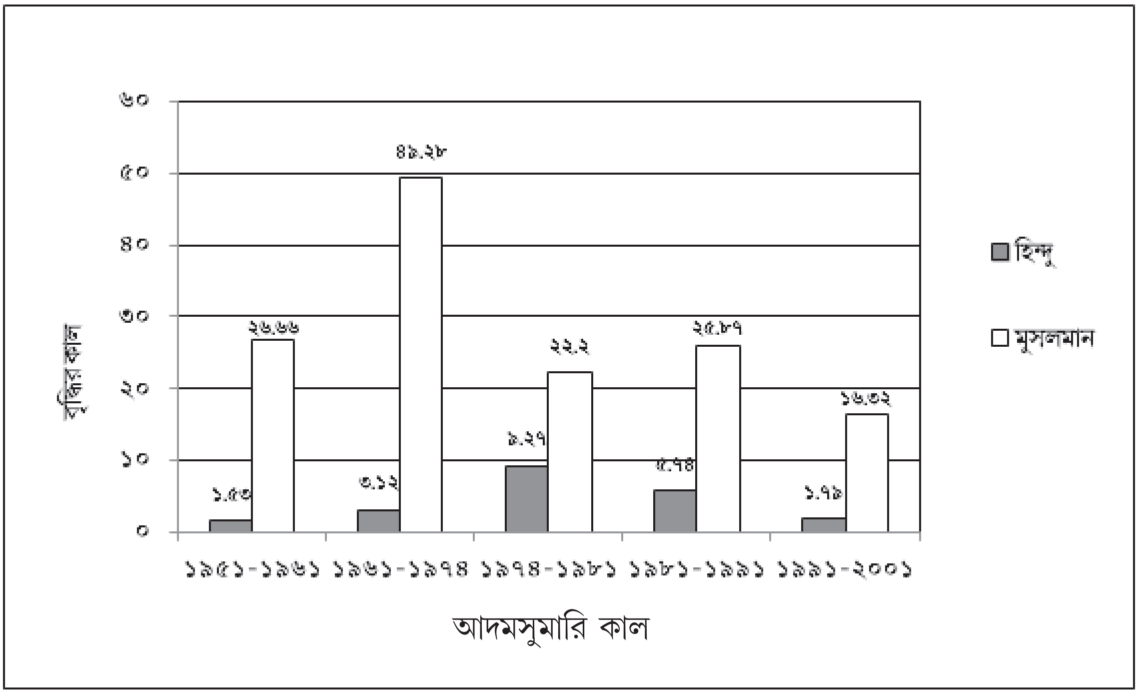

৬০
৫০
৪০
৩০
২০
১০
০
২৬.৬৬
৪৯.২৮
২২.২
২৫.৮৭
১৬.৩২
১.৫৩
৩.১২
৯.২৭
৫.৭৪
১.৭৯
হিন্দু
মুসলমান
১৯৫১-১৯৬১
১৯৬১-১৯৭৪
১৯৭৪-১৯৮১
১৯৮১-১৯৯১
১৯৯১-২০০১
আদমসুমারি কাল

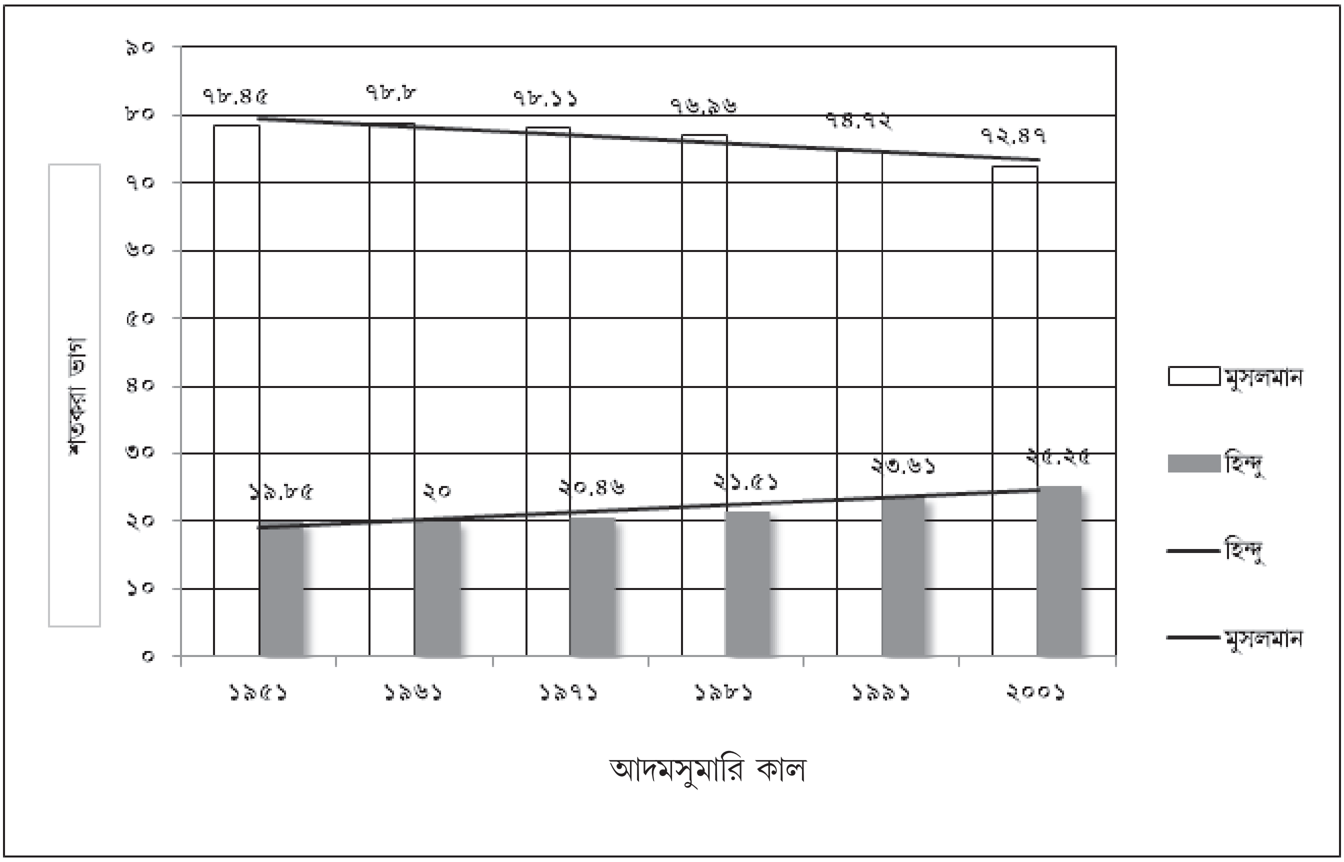

শতকরা ভাগ
৯০
৮০
৭০
৬০
৫০
৪০
৩০
২০
১০
০
৭৮.৪৫
৭৮.৮
৭৮.১১
৭৬.৯৬
৭৪.৭২
৭২.৪৭
১৯.৮৫
২০
২০.৪৬
২১.৫১
২৩.৬১
২৫.২৫
মুসলমান
হিন্দু
হিন্দু
মুসলমান
১৯৫১
১৯৬১
১৯৭১
১৯৮১
১৯৯১
২০০১
আদমসুমারি কাল

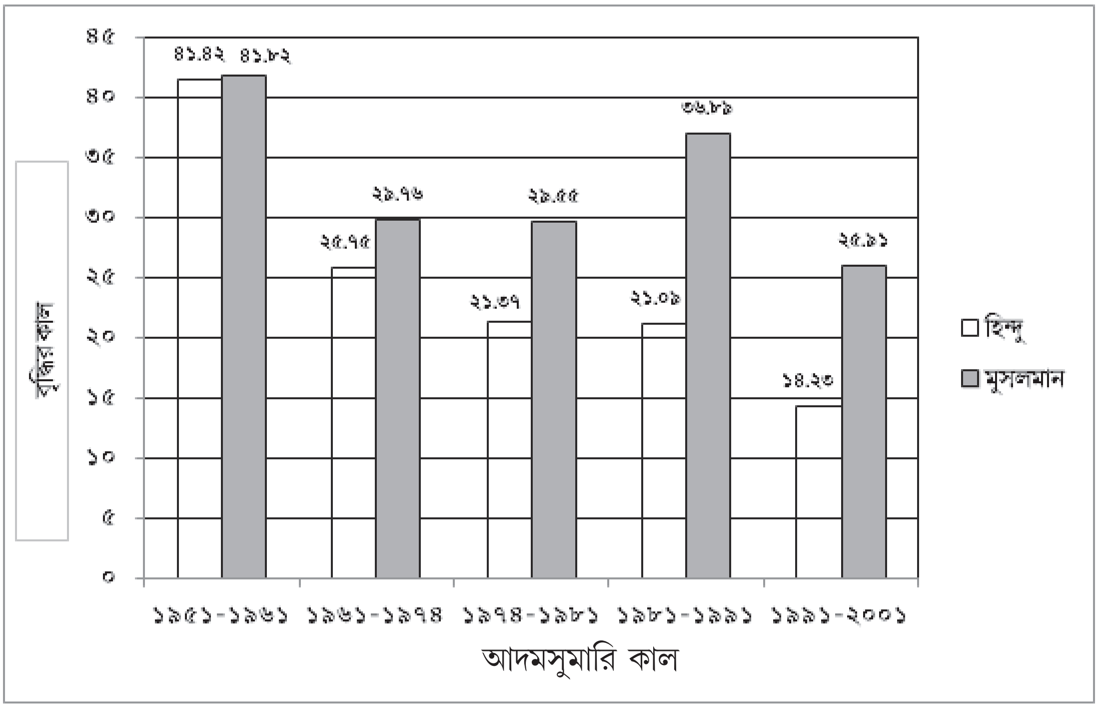

৪৫
৪০
৩৫
৩০
২৫
২০
১৫
১০
৫
০
৪১.৪২
৪১.৮২
২৫.৭৫
২৯.৭৬
২১.৩৭
২৯.৫৫
২১.০৯
৩৬.৮৯
১৪.২৩
২৫.৯১
বৃদ্ধির হার
১৯৫১-১৯৬১
১৯৬১-১৯৭৪
১৯৭৪-১৯৮১
১৯৮১-১৯৯১
১৯৯১-২০০১
আদমসুমারি কাল
হিন্দু
মুসলমান

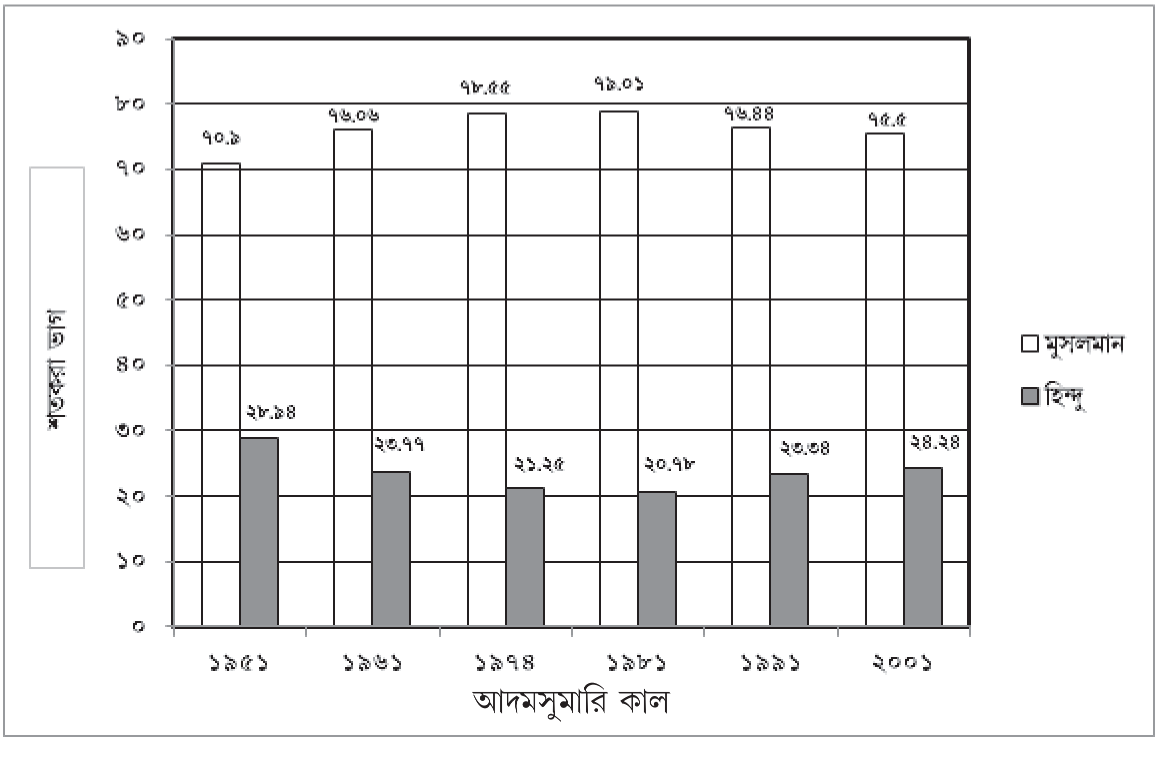

৯০
৮০
৭০
৬০
৫০
৪০
৩০
২০
১০
০
৭০.৯
৭৬.০৬
৭৮.৫৫
৭৯.০১
৭৬.৪৪
৭৫.৫
২৮.৯৪
২৩.৭৭
২১.২৫
২০.৭৮
২৩.৩৪
২৪.২৪
শতকরা ভাগ
১৯৫১
১৯৬১
১৯৭৪
১৯৮১
১৯৯১
২০০১
আদমসুমারি কাল
মুসলমান
হিন্দু

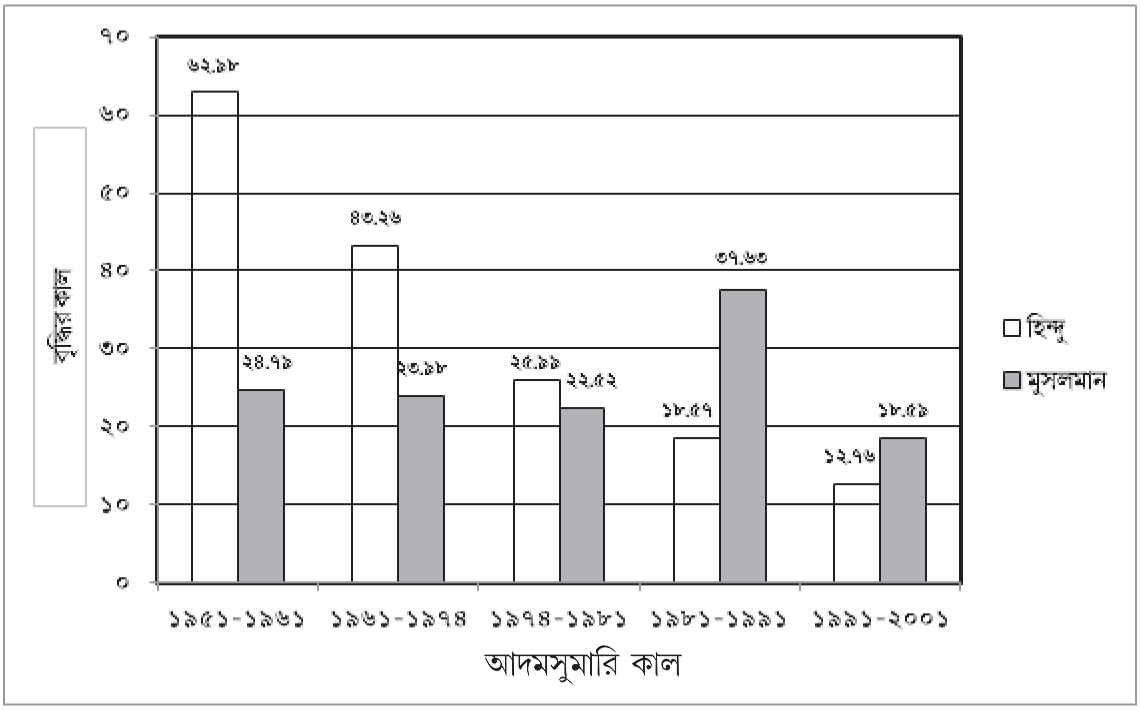

বৃদ্ধির হার
৬২.৯৮
৪৩.২৬
৩৭.৬৩
২৪.৭৯
২৩.৯৮
২৫.৯৯
২২.৫২
১৮.৫৭
১২.৭৬
১৮.৫৯
হিন্দু
মুসলমান
১৯৫১-১৯৬১
১৯৬১-১৯৭৪
১৯৭৪-১৯৮১
১৯৮১-১৯৯১
১৯৯১-২০০১
আদমসুমারি কাল

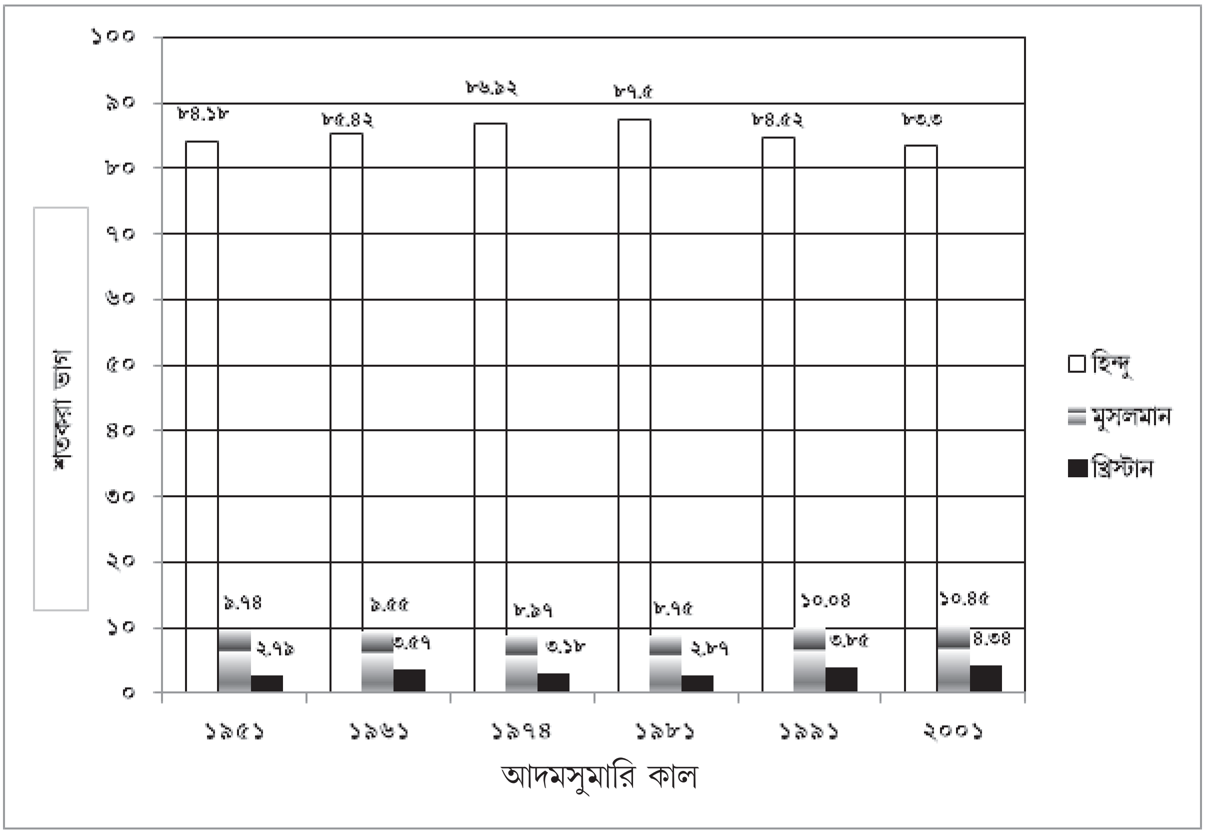

শতকরা ভাগ
৮৪.১৮
৮৫.৪২
৮৬.৯২
৮৭.৫
৮৪.৫২
৮৩.৩
৯.৭৪
৯.৫৫
৮.৯৭
৮.৭৫
১০.০৪
১০.৪৫
২.৭৯
৩.৫৭
৩.১৮
২.৮৭
৩.৮৫
৪.৩৪
হিন্দু
মুসলমান
খ্রিস্টান
১৯৫১
১৯৬১
১৯৭৪
১৯৮১
১৯৯১
২০০১
আদমসুমারি কাল

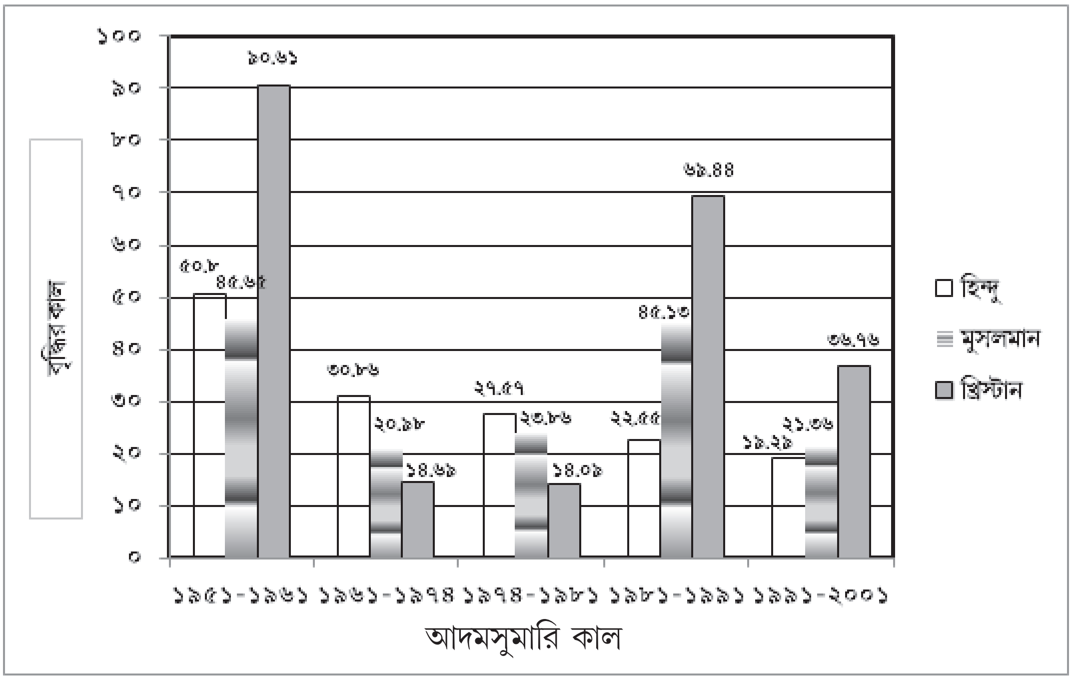
১০০
৯০
৮০
৭০
৬০
৫০
৪০
৩০
২০
১০
০
৯০.৬১
৫০.৮
৪৫.৬৮
৩০.৮৬
২০.৯৮
১৪.৬৯
২৭.৫৭
২৩.৮৬
১৪.০৯
২২.৫৫
৪৫.১৩
৬৯.৪৪
১৯.২৯
২১.৩৬
৩৬.৭৬
হিন্দু
মুসলমান
খ্রিস্টান
১৯৫১-১৯৬১
১৯৬১-১৯৭৪
১৯৭৪-১৯৮১
১৯৮১-১৯৯১
১৯৯১-২০০১
আদমসুমারি কাল

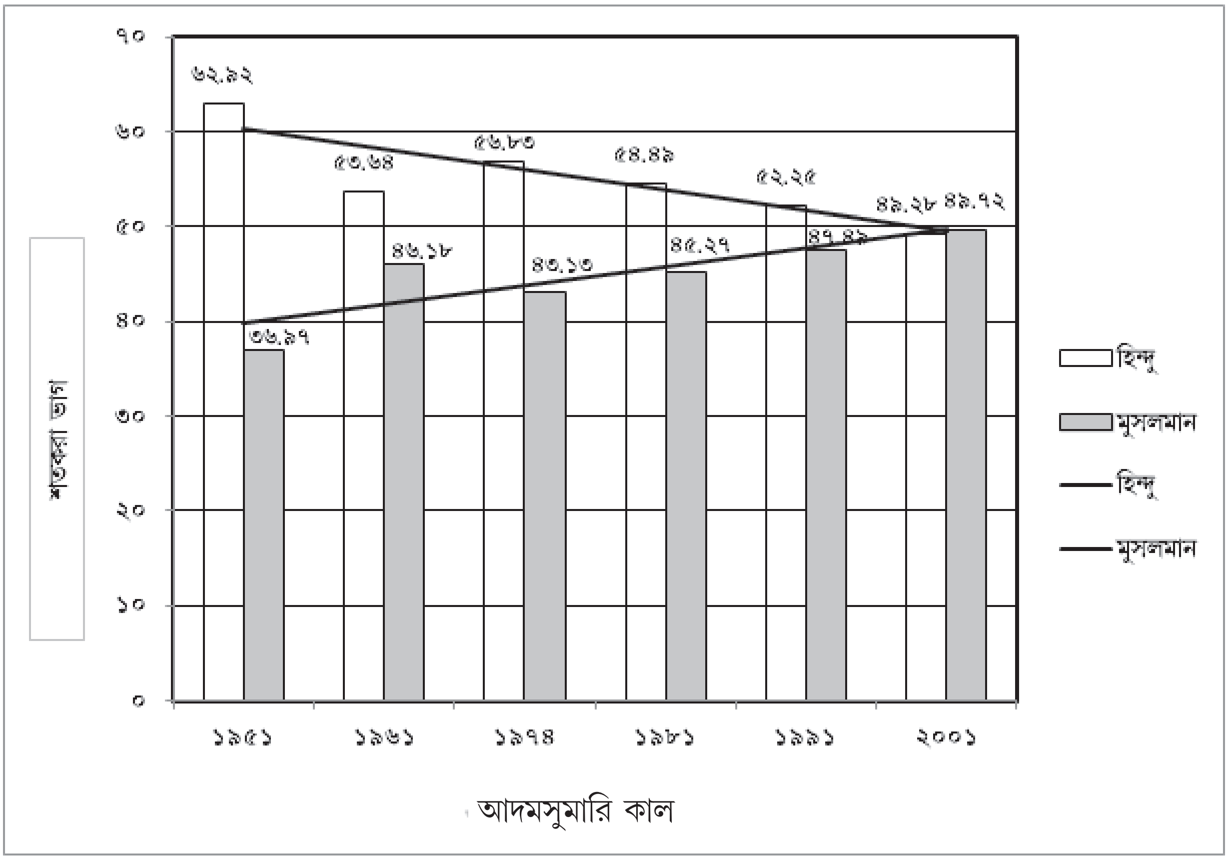
৭০
৬০
৫০
৪০
৩০
২০
১০
০
শতকরা ভাগ
৬২.৯২
৫৩.৬৪
৫৬.৮৩
৫৪.৪৯
৫২.২৫
৪৯.২৮
৪৯.৭২
৩৬.৯৭
৪৬.১৮
৪৩.১৩
৪৫.২৭
৪৭.৪২
হিন্দু
মুসলমান
হিন্দু
মুসলমান
১৯৫১
১৯৬১
১৯৭৪
১৯৮১
১৯৯১
২০০১
আদমসুমারি কাল

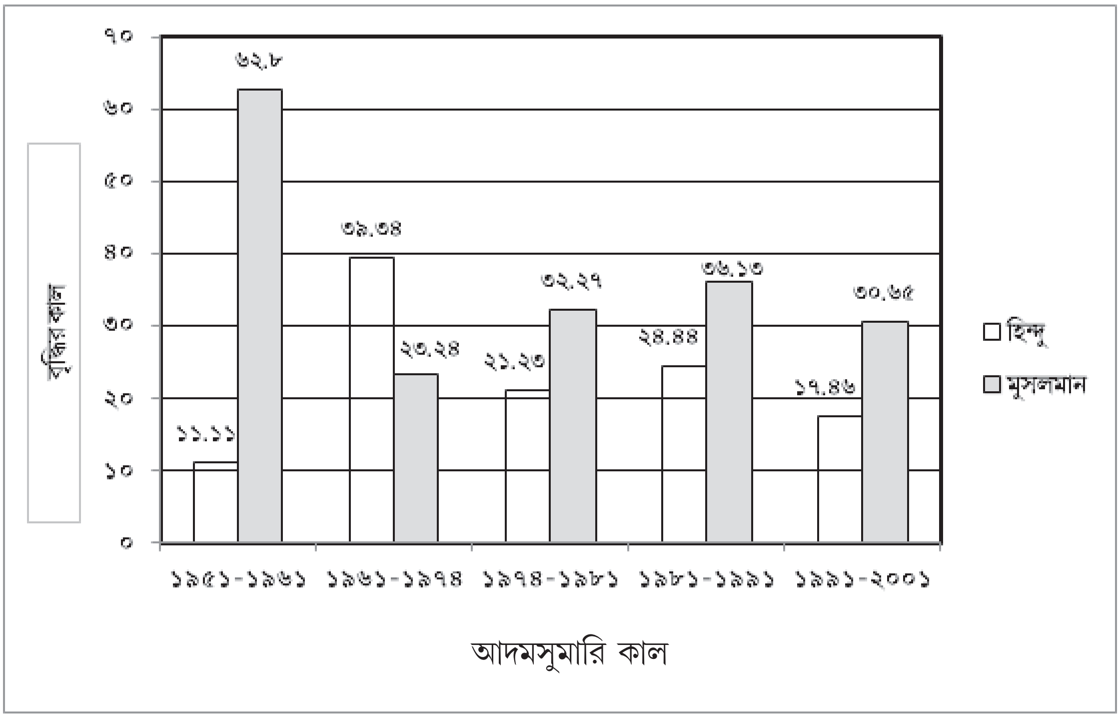
৭০
৬০
৫০
৪০
৩০
২০
১০
০
৬২.৮
৩৯.৩৪
২৩.২৪
২১.২৩
৩২.২৭
২৪.৪৪
৩৬.১৩
১৭.৪৬
৩০.৬৫
১১.১১
১৯৫১-১৯৬১
১৯৬১-১৯৭৪
১৯৭৪-১৯৮১
১৯৮১-১৯৯১
১৯৯১-২০০১
আদমসুমারি কাল
হিন্দু
মুসলমান

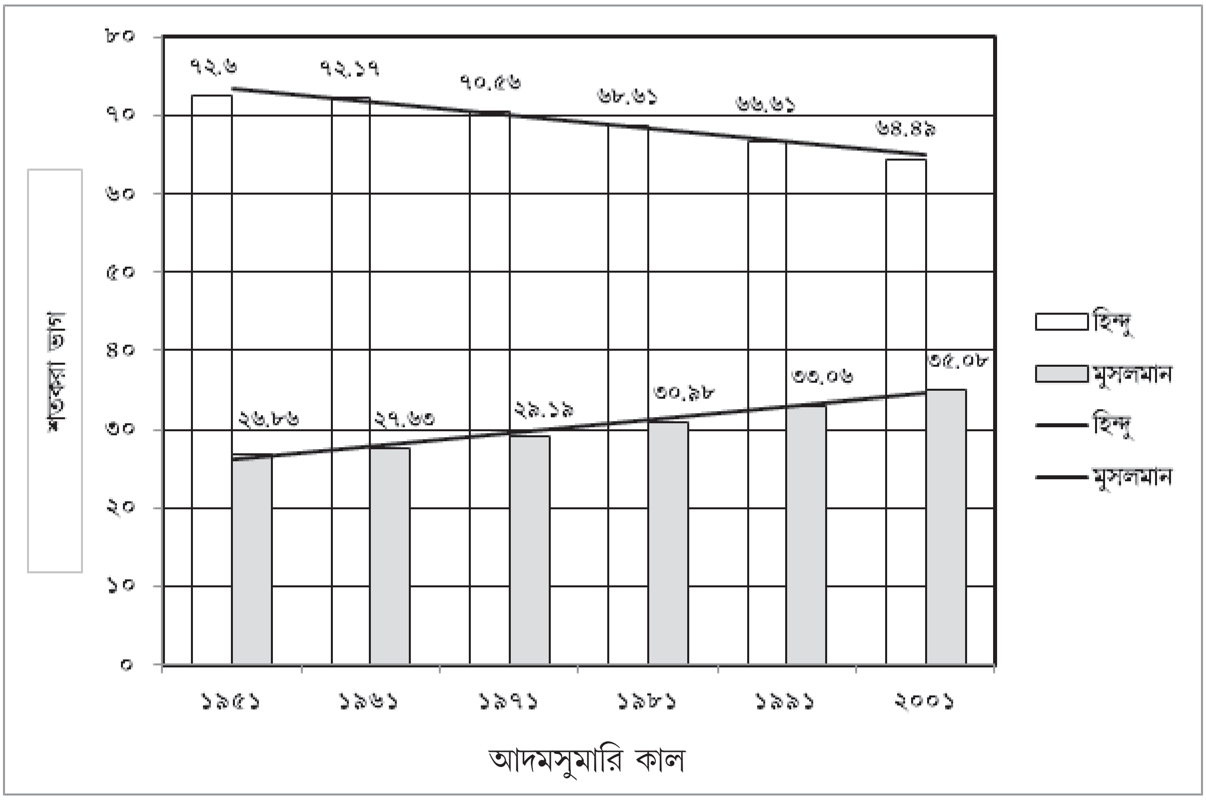
৮০
৭০
৬০
৫০
৪০
৩০
২০
১০
০
শতকরা ভাগ
৭২.৬
৭২.১৭
৭০.৫৬
৬৮.৬১
৬৬.৬১
৬৪.৪৯
২৬.৮৬
২৭.৬৩
২৯.১৯
৩০.৯৮
৩৩.০৬
৩৫.০৪
১৯৫১
১৯৬১
১৯৭১
১৯৮১
১৯৯১
২০০১
আদমসুমারি কাল
হিন্দু
মুসলমান
হিন্দু
মুসলমান

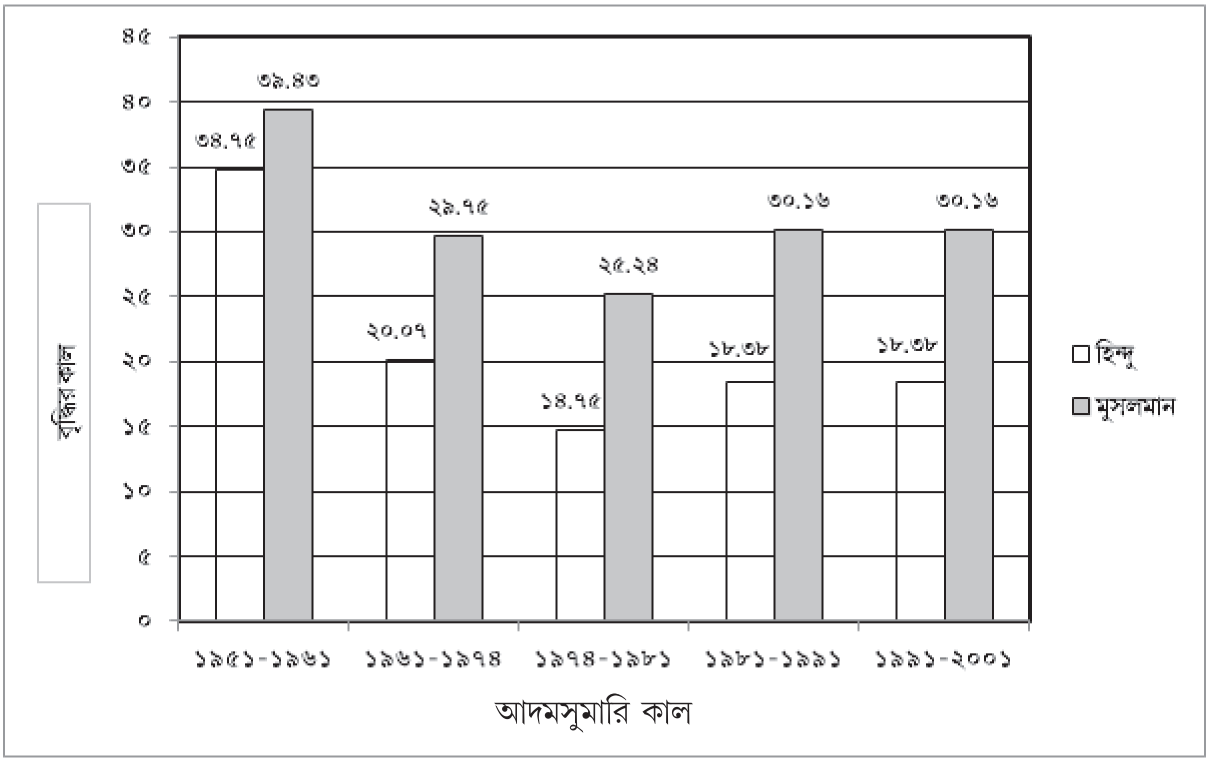
৪৫
৪০
৩৫
৩০
২৫
২০
১৫
১০
৫
০
৩৯.৪৩
৩৪.৭৫
২৯.৭৫
২৫.২৪
৩০.১৬
৩০.১৬
২০.০৭
১৮.৩৮
১৮.৩৮
১৪.৭৫
হিন্দু
মুসলমান
১৯৫১-১৯৬১
১৯৬১-১৯৭৪
১৯৭৪-১৯৮১
১৯৮১-১৯৯১
১৯৯১-২০০১
আদমসুমারি কাল

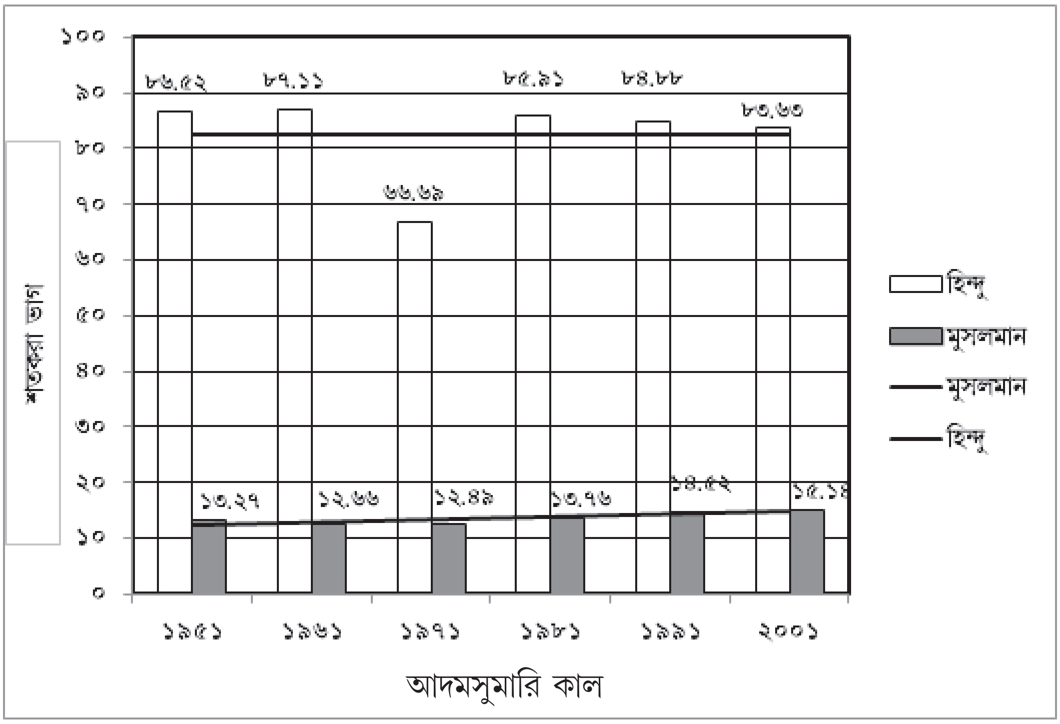
১০০
৯০
৮০
৭০
৬০
৫০
৪০
৩০
২০
১০
০
শতকরা ভাগ
৮৬.৫২
৮৭.১১
৬৬.৬৯
৮৫.৯১
৮৪.৮৮
৮৩.৬৩
১৩.২৭
১২.৬৬
১২.৪৯
১৩.৭৬
১৪.৫২
১৫.১৪
হিন্দু
মুসলমান
মুসলমান
হিন্দু
১৯৫১
১৯৬১
১৯৭১
১৯৮১
১৯৯১
২০০১
আদমসুমারি কাল

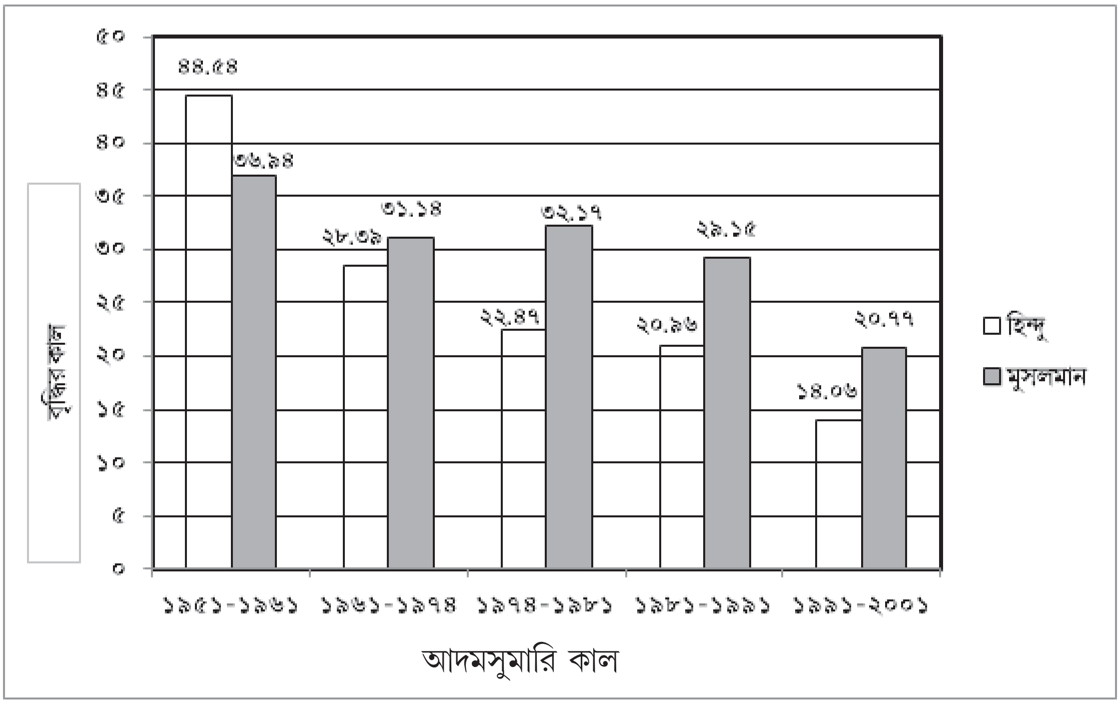
৪৪.৫৪
৩৬.৯৪
৩১.১৪
২৮.৩৯
৩২.১৭
২২.৪৭
২৯.১৫
২০.৯৬
২০.৭৭
১৪.০৬
হিন্দু
মুসলমান
১৯৫১-১৯৬১
১৯৬১-১৯৭৪
১৯৭৪-১৯৮১
১৯৮১-১৯৯১
১৯৯১-২০০১
আদমসুমারি কাল

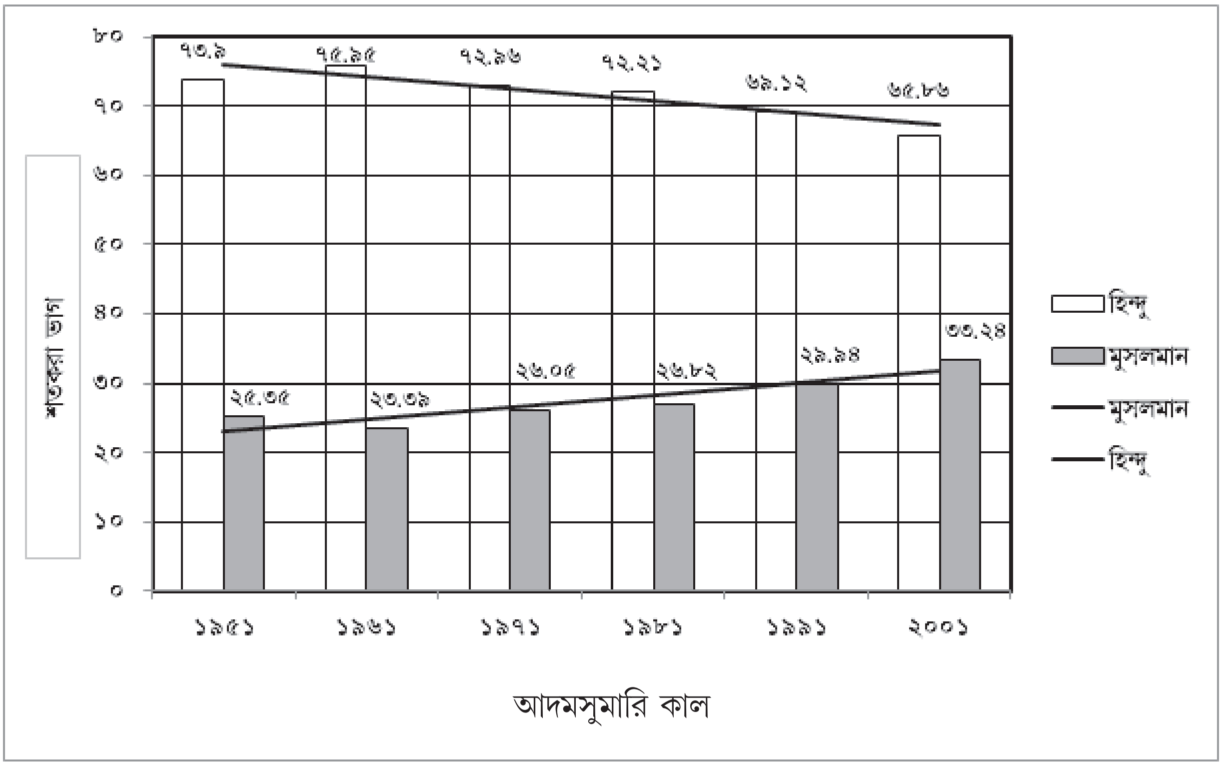
শতকরা ভাগ
৭৩.৯
৭৫.৯৫
৭২.৯৬
৭২.২১
৬৯.১২
৬৫.৮৬
২৫.৩৫
২৩.৩৯
২৬.০৫
২৬.৮২
২৯.৯৪
৩৩.২৪
হিন্দু
মুসলমান
মুসলমান
হিন্দু
১৯৫১
১৯৬১
১৯৭১
১৯৮১
১৯৯১
২০০১
আদমসুমারি কাল

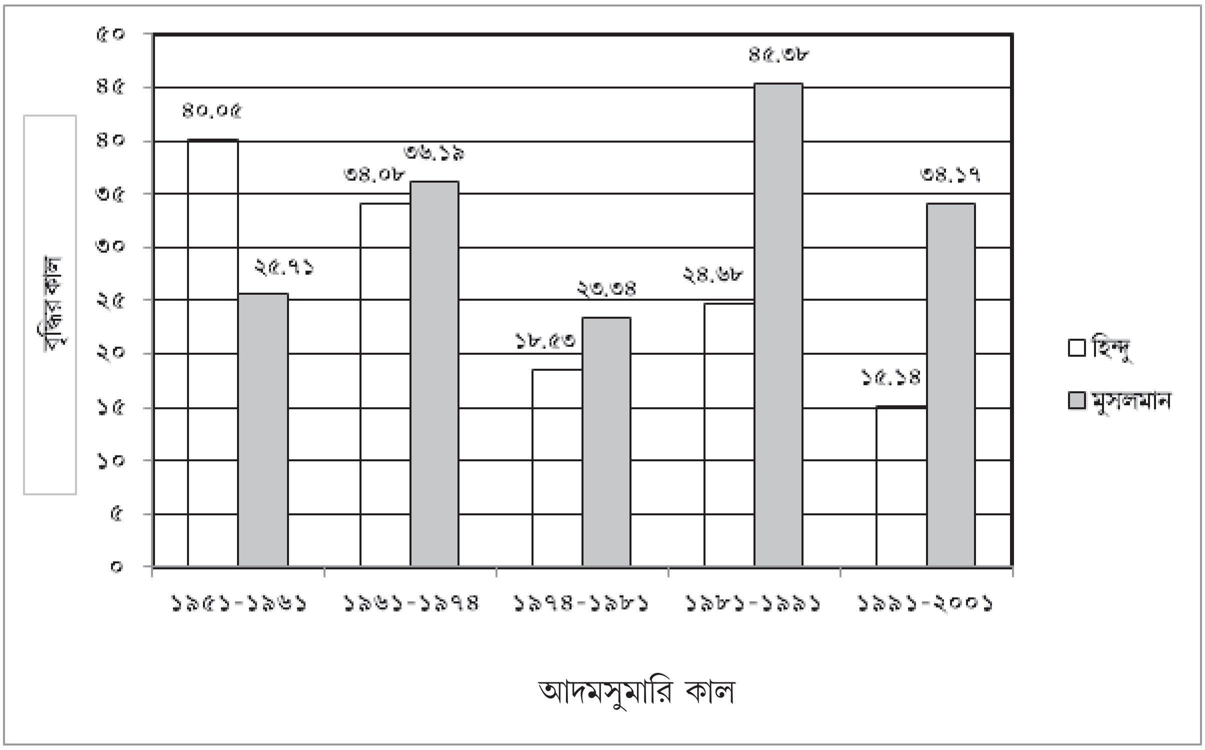

বৃদ্ধির হার
৪০.০৫
২৫.৭১
৩৪.০৮
৩৬.১৯
১৮.৫৩
২৩.৩৪
২৪.৬৮
৪৫.৩৮
১৫.১৪
৩৪.১৭
০
৫
১০
১৫
২০
২৫
৩০
৩৫
৪০
৪৫
৫০
১৯৫১-১৯৬১
১৯৬১-১৯৭৪
১৯৭৪-১৯৮১
১৯৮১-১৯৯১
১৯৯১-২০০১
হিন্দু
মুসলমান
আদমসুমারি কাল

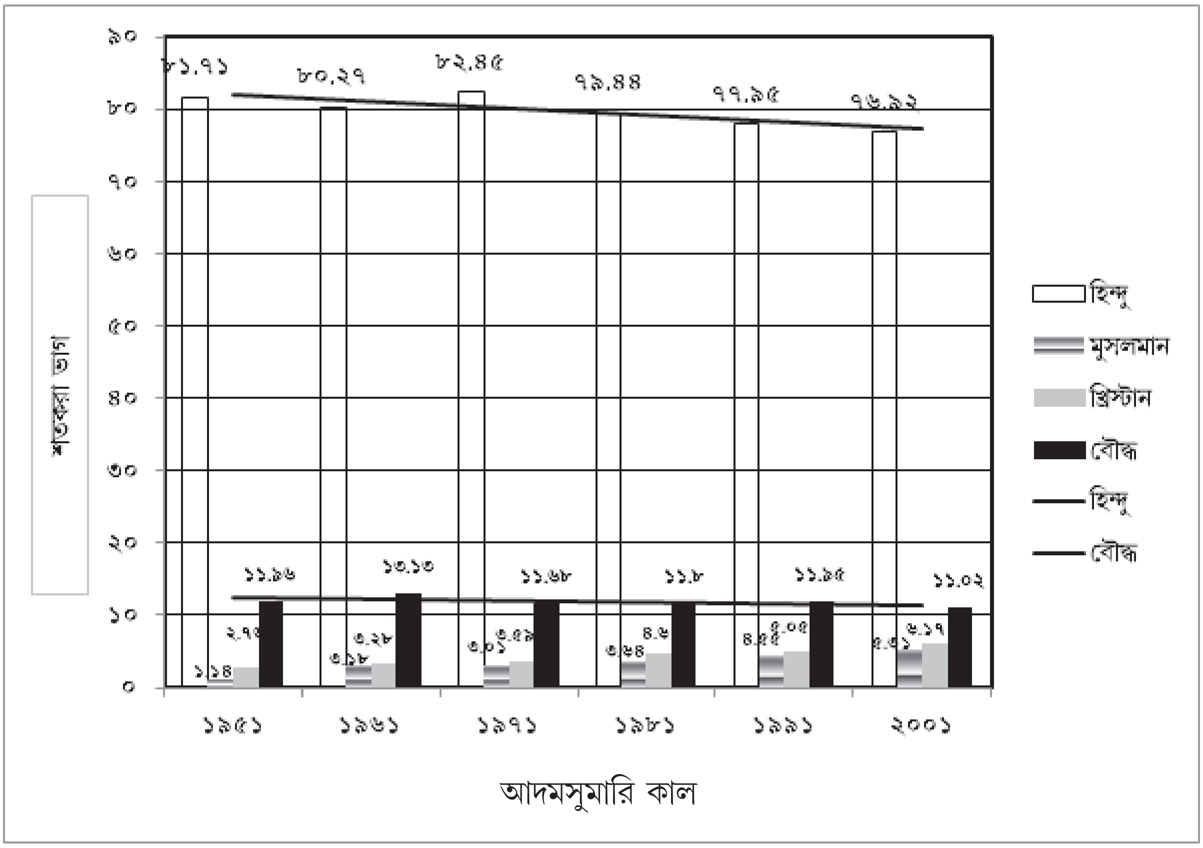

শতকরা ভাগ
৮১.৭১
৮০.২৭
৮২.৪৫
৭৯.৪৪
৭৭.৯৫
৭৬.৯২
১১.৯৬
১৩.১৩
১১.৬৮
১১.৮
১১.৯৫
১১.০২
০
১০
২০
৩০
৪০
৫০
৬০
৭০
৮০
৯০
১৯৫১
১৯৬১
১৯৭১
১৯৮১
১৯৯১
২০০১
হিন্দু
মুসলমান
খ্রিস্টান
বৌদ্ধ
হিন্দু
বৌদ্ধ
আদমসুমারি কাল

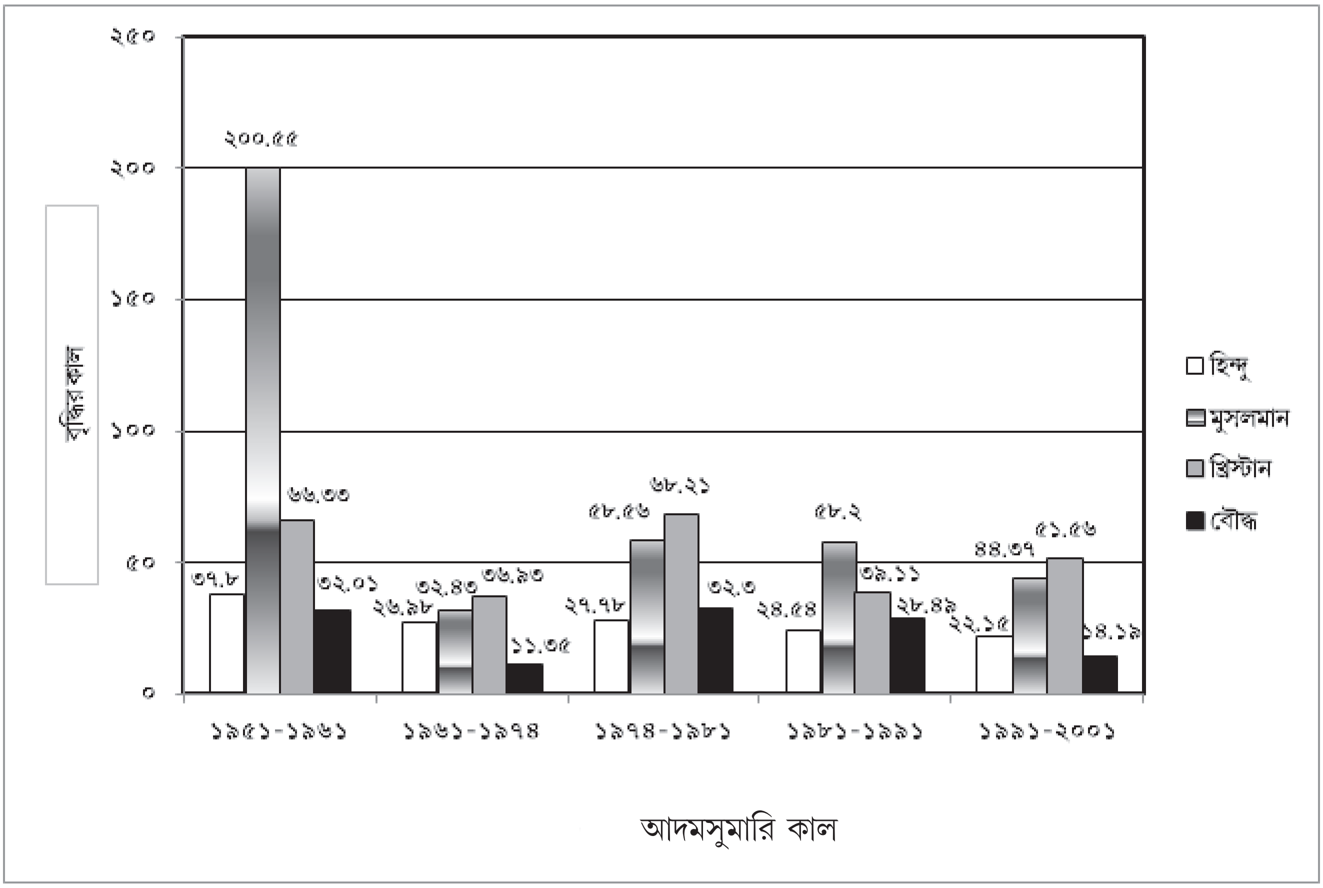
২৫০
২০০
১৫০
১০০
৫০
০
বৃদ্ধির কাল
২০০.৫৫
৬৬.৩৩
৩৭.৮
৩২.০১
২৬.৯৮
৩২.৪৩
৩৬.৯৩
১১.৩৫
২৭.৭৮
৫৮.৫৬
৬৮.২১
৩২.৩
২৪.৫৪
৫৮.২
৩৯.১১
২৮.৪৯
২২.১৫
৪৪.৩৭
৫১.৫৬
১৪.১৯
১৯৫১-১৯৬১
১৯৬১-১৯৭৪
১৯৭৪-১৯৮১
১৯৮১-১৯৯১
১৯৯১-২০০১
হিন্দু
মুসলমান
খ্রিস্টান
বৌদ্ধ
আদমসুমারি কাল

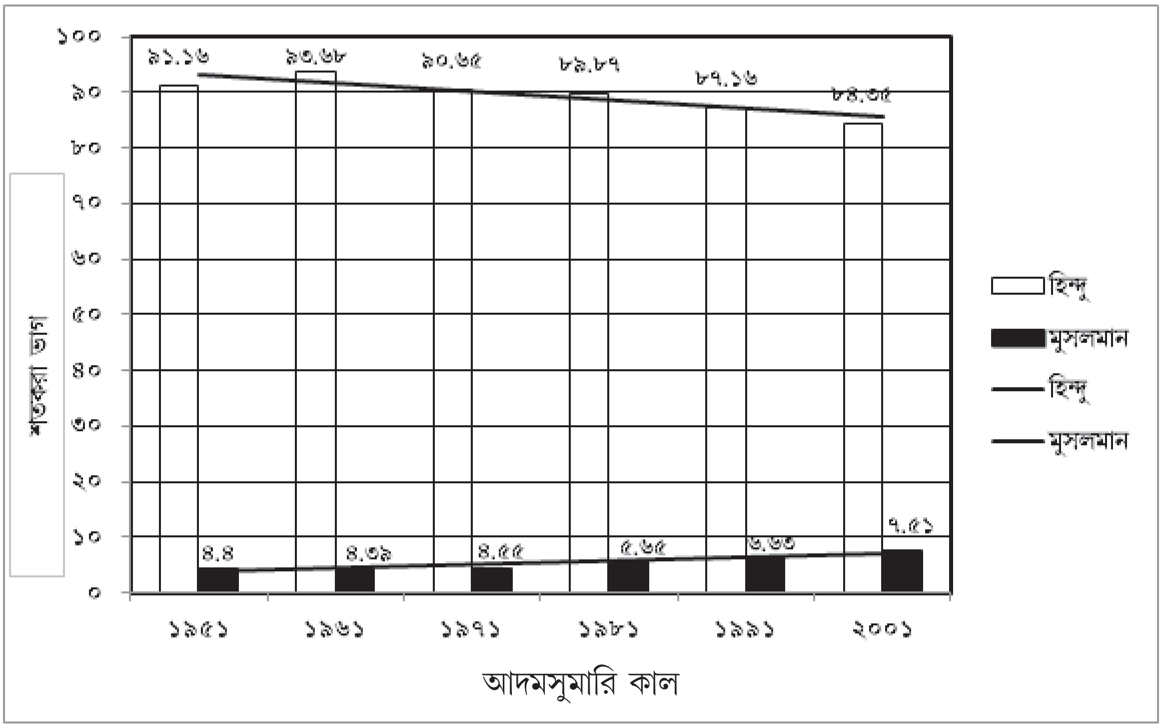
১০০
৯০
৮০
৭০
৬০
৫০
৪০
৩০
২০
১০
০
শতকরা ভাগ
৯১.১৬
৯৩.৬৮
৯০.৬৫
৮৯.৮৭
৮৭.১৬
৮৪.৩৫
৪.৪
৪.৩৯
৪.৫৫
৫.৬৫
৬.৬৩
৭.৫১
১৯৫১
১৯৬১
১৯৭১
১৯৮১
১৯৯১
২০০১
হিন্দু
মুসলমান
হিন্দু
মুসলমান
আদমসুমারি কাল

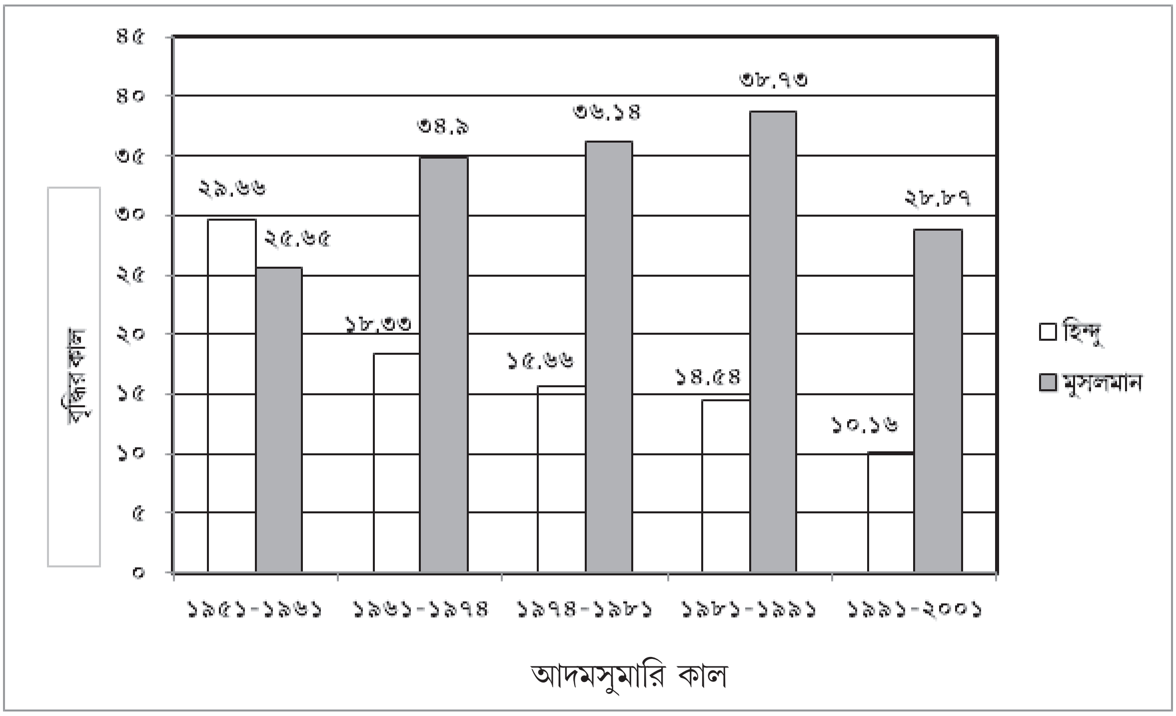

বৃদ্ধির হার
৪৫
৪০
৩৫
৩০
২৫
২০
১৫
১০
৫
০
২৯.৬৬
২৫.৬৫
১৮.৩৩
৩৪.৯
১৫.৬৬
৩৬.১৪
১৪.৫৪
৩৮.৭৩
১০.১৬
২৮.৮৭
১৯৫১-১৯৬১
১৯৬১-১৯৭৪
১৯৭৪-১৯৮১
১৯৮১-১৯৯১
১৯৯১-২০০১
আদমসুমারি কাল
হিন্দু
মুসলমান

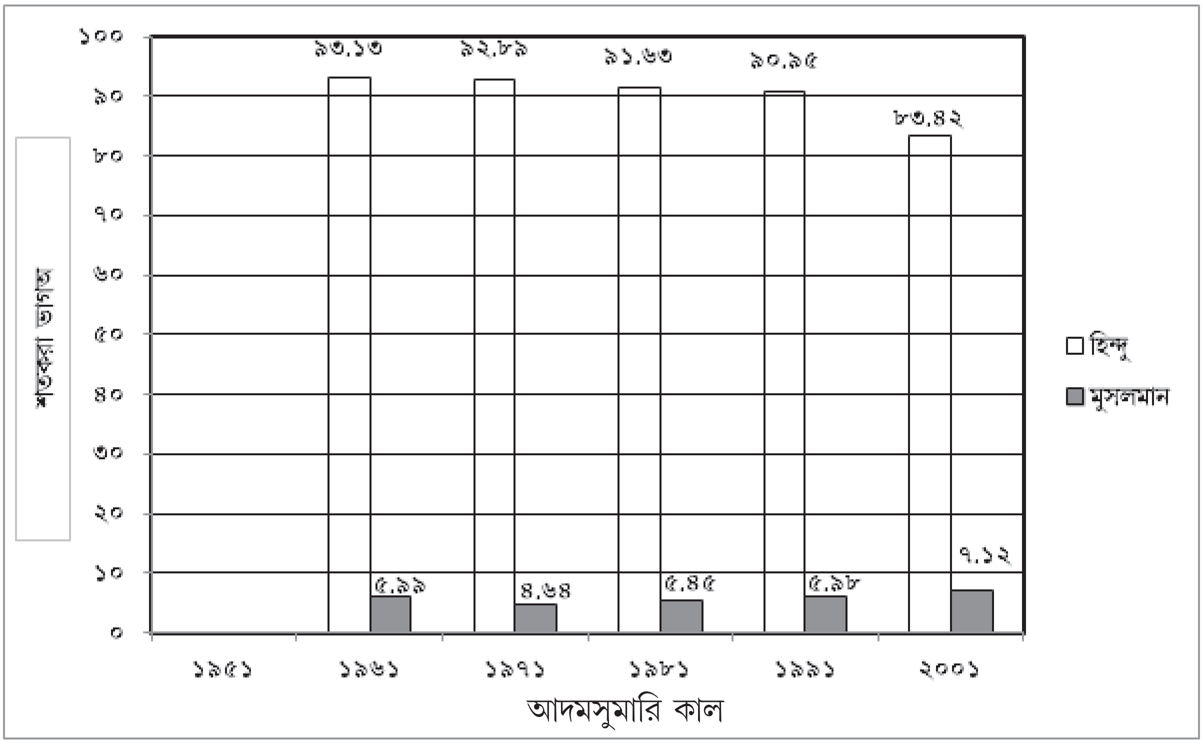

শতকরা ভাগ
১০০
৯০
৮০
৭০
৬০
৫০
৪০
৩০
২০
১০
০
৯৩.১৩
৫.৯৯
৯২.৮৯
৪.৬৪
৯১.৬৩
৫.৪৫
৯০.৯৫
৫.৯৮
৮৩.৪২
৭.১২
১৯৫১
১৯৬১
১৯৭১
১৯৮১
১৯৯১
২০০১
আদমসুমারি কাল
হিন্দু
মুসলমান

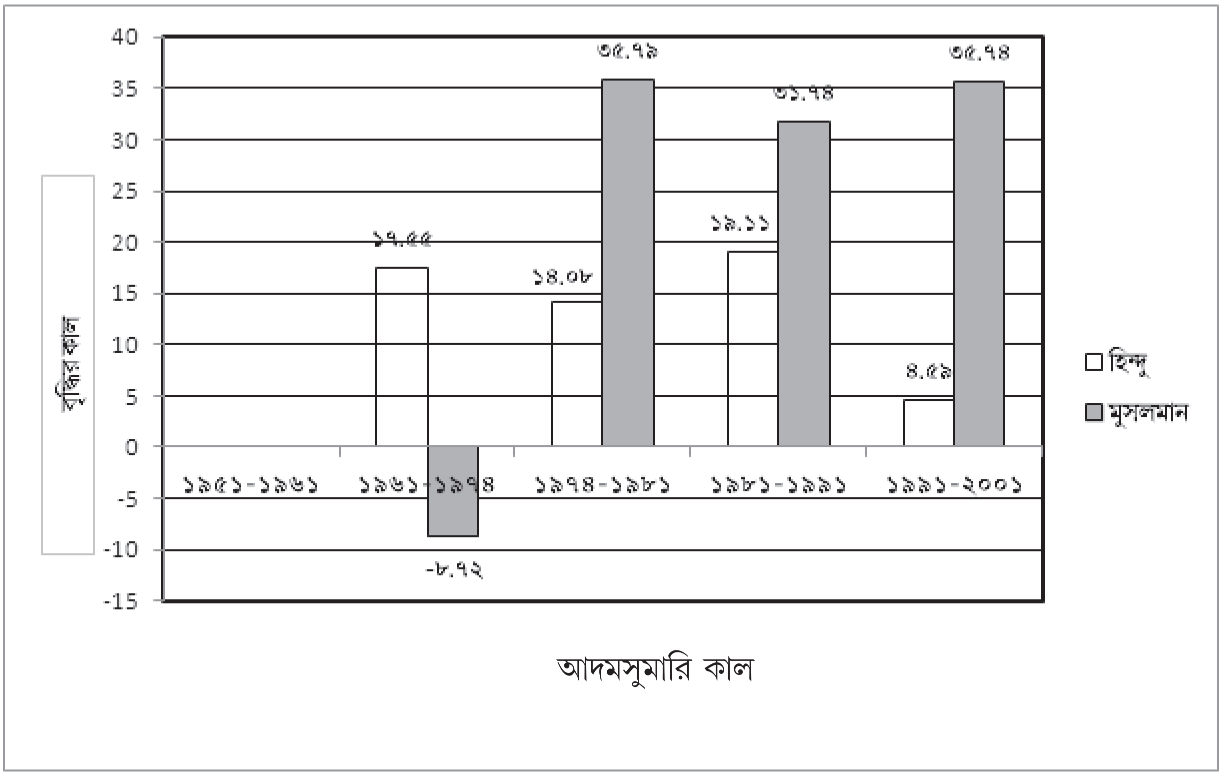
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
বৃদ্ধির হার
৩৫.৭৯
৩১.৭৪
৩৫.৭৪
১৭.৫৫
১৪.০৮
১৯.১১
৪.৫৯
-৮.৭২
১৯৫১-১৯৬১
১৯৬১-১৯৭৪
১৯৭৪-১৯৮১
১৯৮১-১৯৯১
১৯৯১-২০০১
হিন্দু
মুসলমান
আদমসুমারি কাল

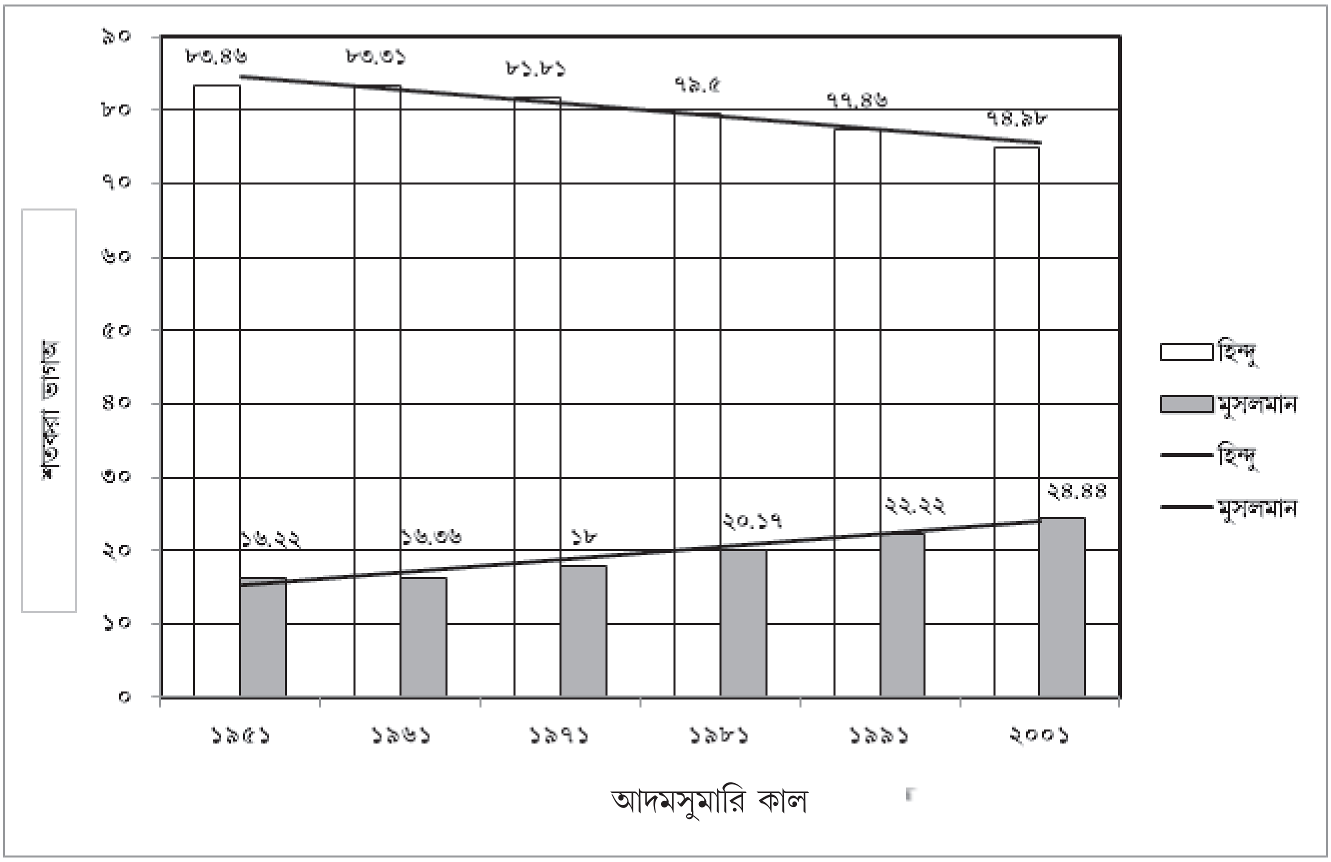
৯০
৮০
৭০
৬০
৫০
৪০
৩০
২০
১০
০
শতকরা ভাগ
৮৩.৪৬
৮৩.৩১
৮১.৮১
৭৯.৫
৭৭.৪৬
৭৪.৯৮
১৬.২২
১৬.৩৬
১৮
২০.১৭
২২.২২
২৪.৪৪
১৯৫১
১৯৬১
১৯৭১
১৯৮১
১৯৯১
২০০১
হিন্দু
মুসলমান
হিন্দু
মুসলমান
আদমসুমারি কাল

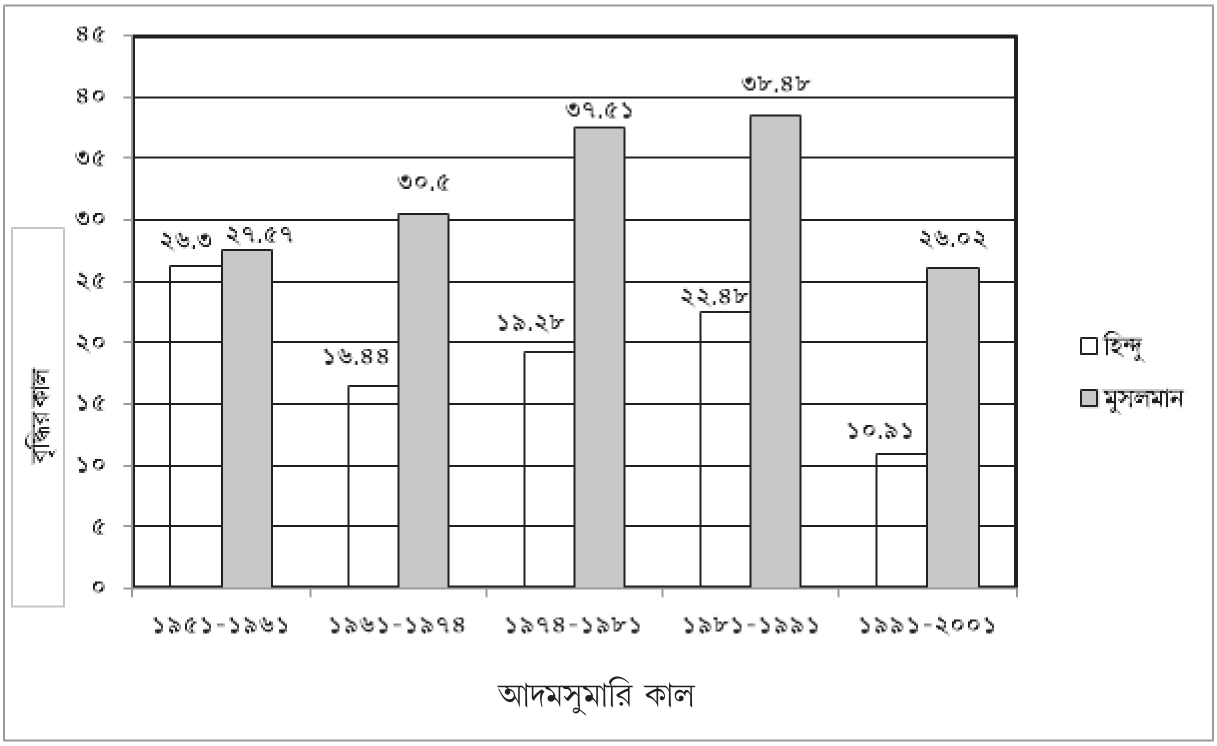
৪৫
৪০
৩৫
৩০
২৫
২০
১৫
১০
৫
০
২৬.৩
২৭.৫৭
৩০.৫
১৬.৪৪
১৯.২৮
৩৭.৫১
২২.৪৮
৩৮.৪৮
১০.৯১
২৬.০২
১৯৫১-১৯৬১
১৯৬১-১৯৭৪
১৯৭৪-১৯৮১
১৯৮১-১৯৯১
১৯৯১-২০০১
হিন্দু
মুসলমান
আদমসুমারি কাল

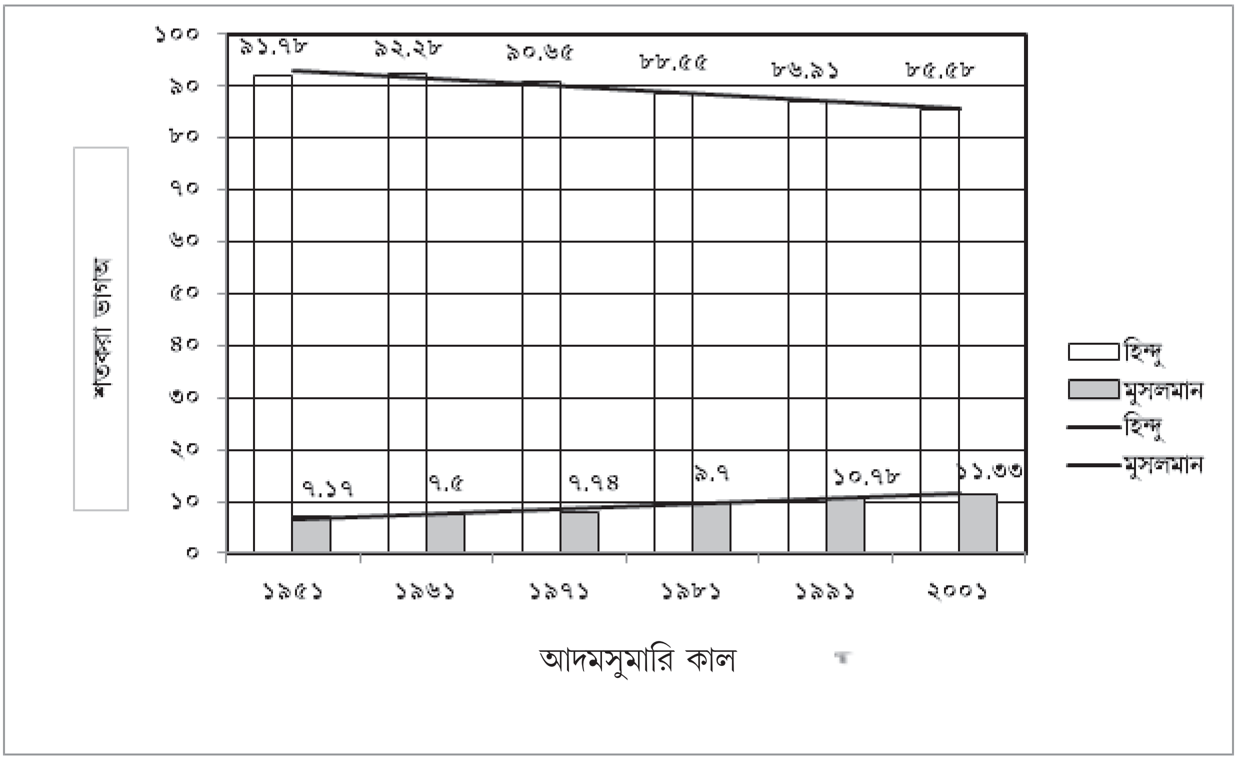
১০০
৯০
৮০
৭০
৬০
৫০
৪০
৩০
২০
১০
০
৯১.৭৪
৯২.২৪
৯০.৬৫
৮৮.৫৫
৮৬.৯১
৮৫.৫৪
৭.১৭
৭.৫
৭.৭৪
৯.৭
১০.৭৪
১১.৩৩
১৯৫১
১৯৬১
১৯৭১
১৯৮১
১৯৯১
২০০১
হিন্দু
মুসলমান
হিন্দু
মুসলমান
আদমসুমারি কাল

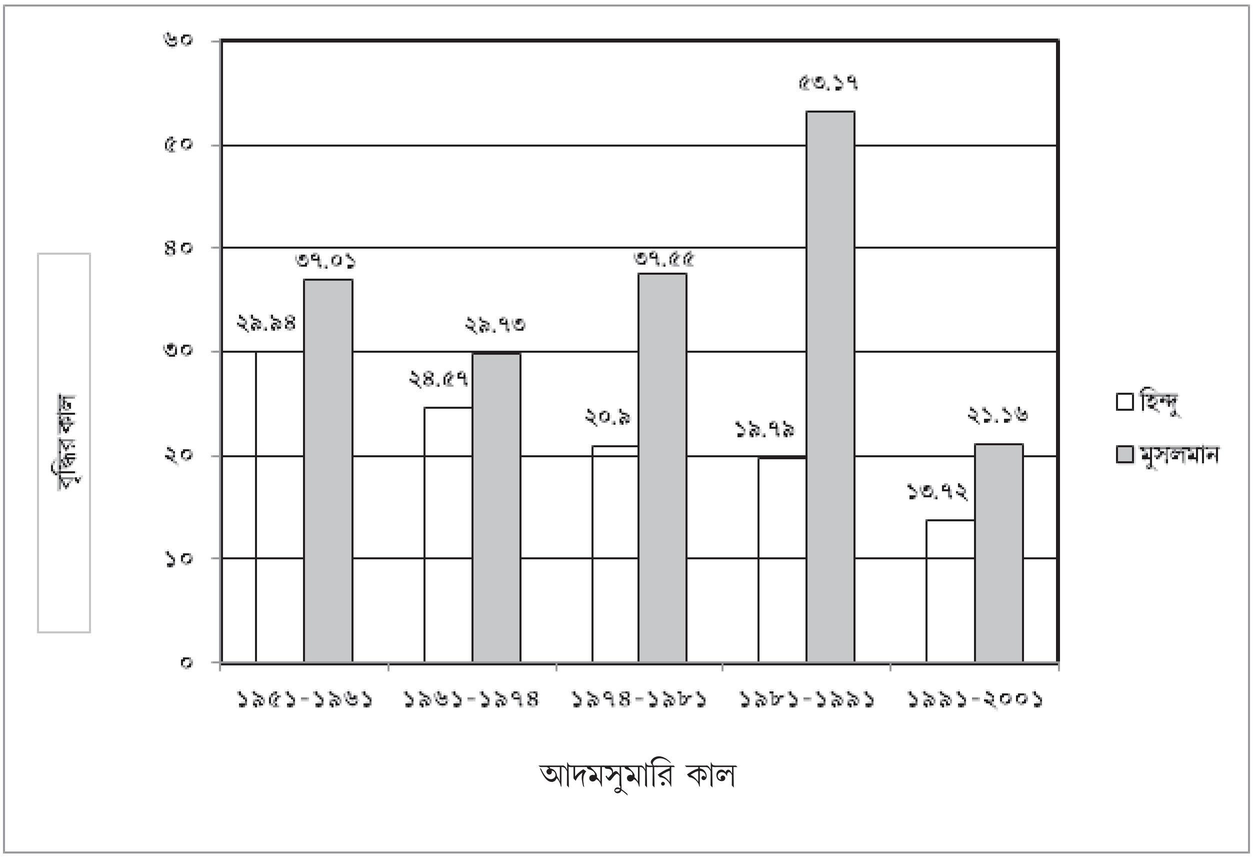
৬০
৫০
৪০
৩০
২০
১০
০
৩৭.০১
২৯.৯৪
৩৭.৫৫
২৯.৭৩
২৪.৫৭
৫৩.১৭
২০.৯
১৯.৭৯
২১.১৬
১৩.৭২
হিন্দু
মুসলমান
১৯৫১-১৯৬১
১৯৬১-১৯৭৪
১৯৭৪-১৯৮১
১৯৮১-১৯৯১
১৯৯১-২০০১
আদমসুমারি কাল

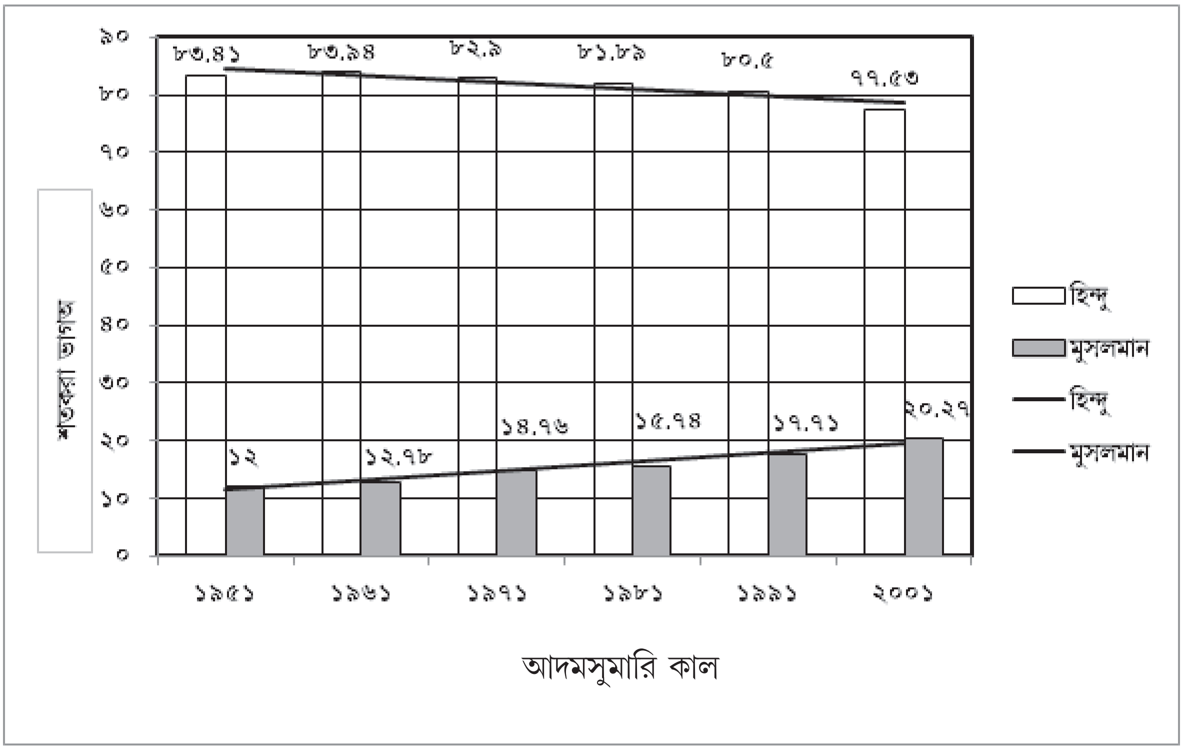
৯০
৮০
৭০
৬০
৫০
৪০
৩০
২০
১০
০
শতকরা অংশ
৮৩.৪১
৮৩.৯৪
৮২.৯
৮১.৮৯
৮০.৫
৭৭.৫৩
১২
১২.৭৮
১৪.৭৬
১৫.৭৪
১৭.৭১
২০.২৭
হিন্দু
মুসলমান
হিন্দু
মুসলমান
১৯৫১
১৯৬১
১৯৭১
১৯৮১
১৯৯১
২০০১
আদমসুমারি কাল

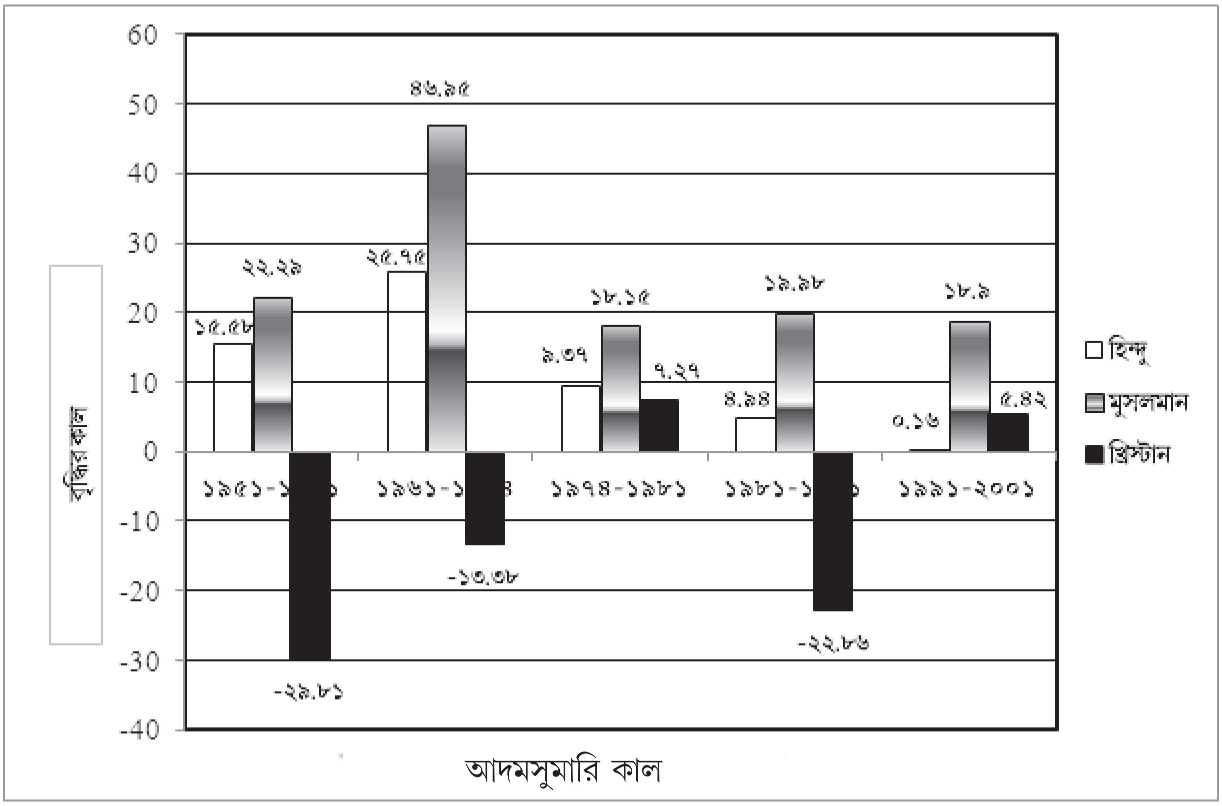
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
৪৬.৯৫
২২.২৯
২৫.৭৫
১৮.১৫
১৯.৯৮
১৮.৯
১৫.৫৮
৯.৩৭
৭.২৭
৪.৯৪
০.১৬
৫.৪২
১৯৭৪-১৯৮১
১৯৯১-২০০১
-১৩.৩৮
-২৯.৮১
-২২.৮৬
হিন্দু
মুসলমান
খ্রিস্টান
আদমসুমারি কাল

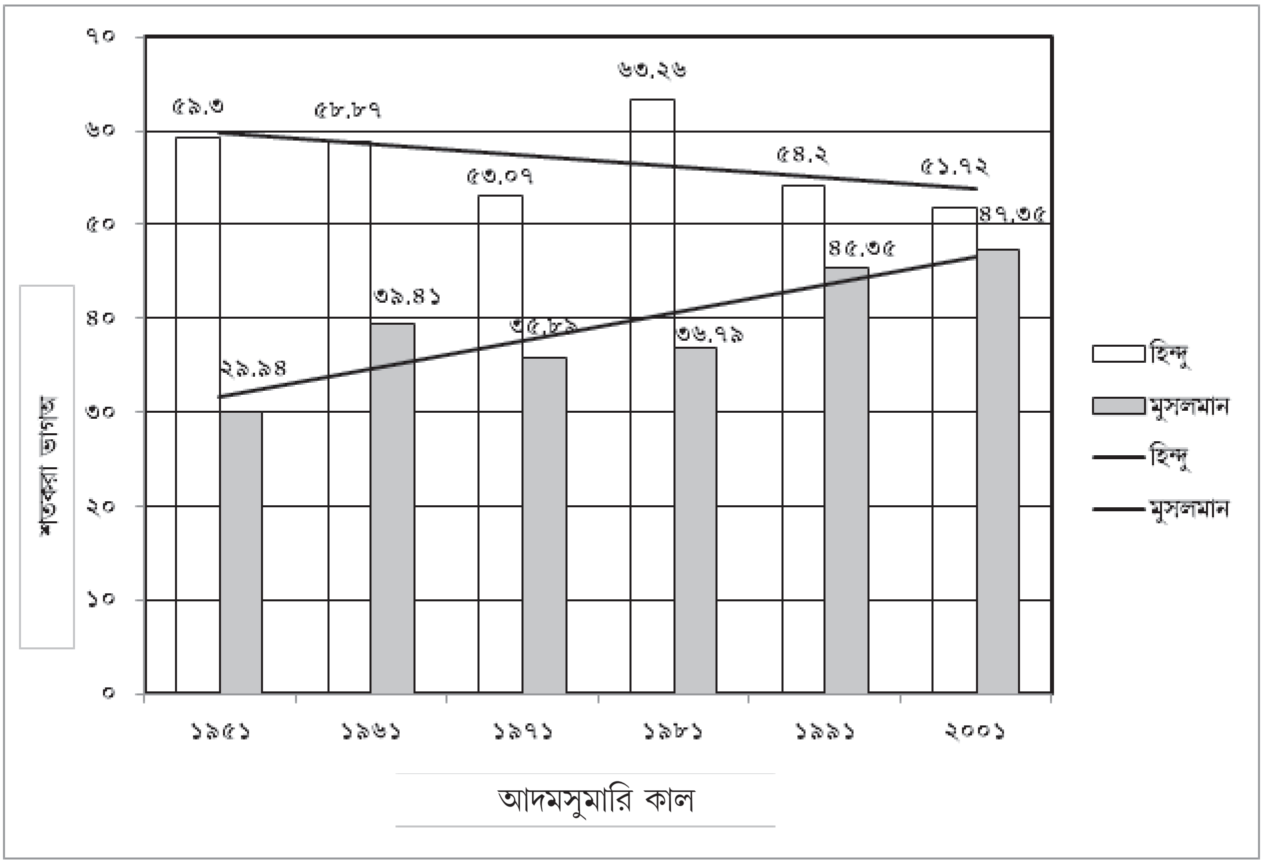
৭০
৬০
৫০
৪০
৩০
২০
১০
০
৬৩.২৬
৫৯.৩
৫৮.৮৭
৫৩.০৭
৫৪.২
৫১.৭২
৪৭.৩৫
৪৫.৩৫
৩৯.৪১
৩৬.৭৯
২৯.৯৪
১৯৫১
১৯৬১
১৯৭১
১৯৮১
১৯৯১
২০০১
হিন্দু
মুসলমান
হিন্দু
মুসলমান
আদমসুমারি কাল

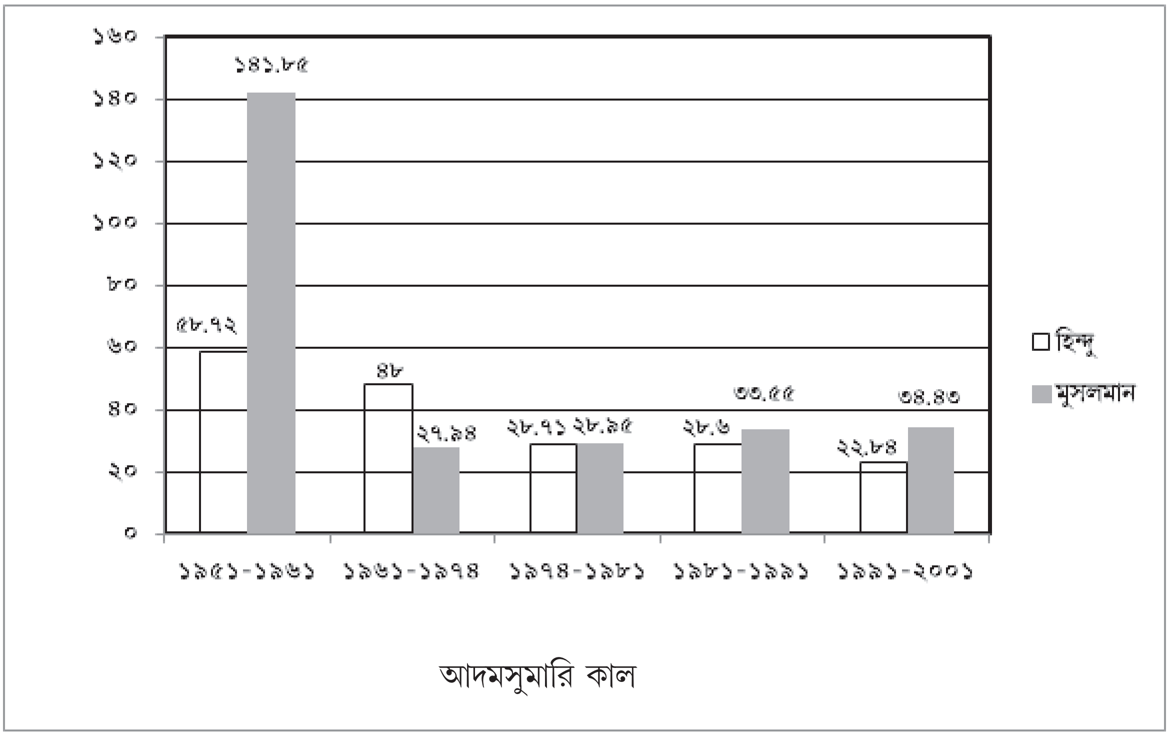
১৬০
১৪০
১২০
১০০
৮০
৬০
৪০
২০
০
১৪১.৮৫
৫৮.৭২
৪৪
২৭.৯৪
২৮.৭১
২৮.৯৫
২৮.৬
৩৩.৫৫
২২.৮৪
৩৪.৪৩
১৯৫১-১৯৬১
১৯৬১-১৯৭৪
১৯৭৪-১৯৮১
১৯৮১-১৯৯১
১৯৯১-২০০১
হিন্দু
মুসলমান
আদমসুমারি কাল

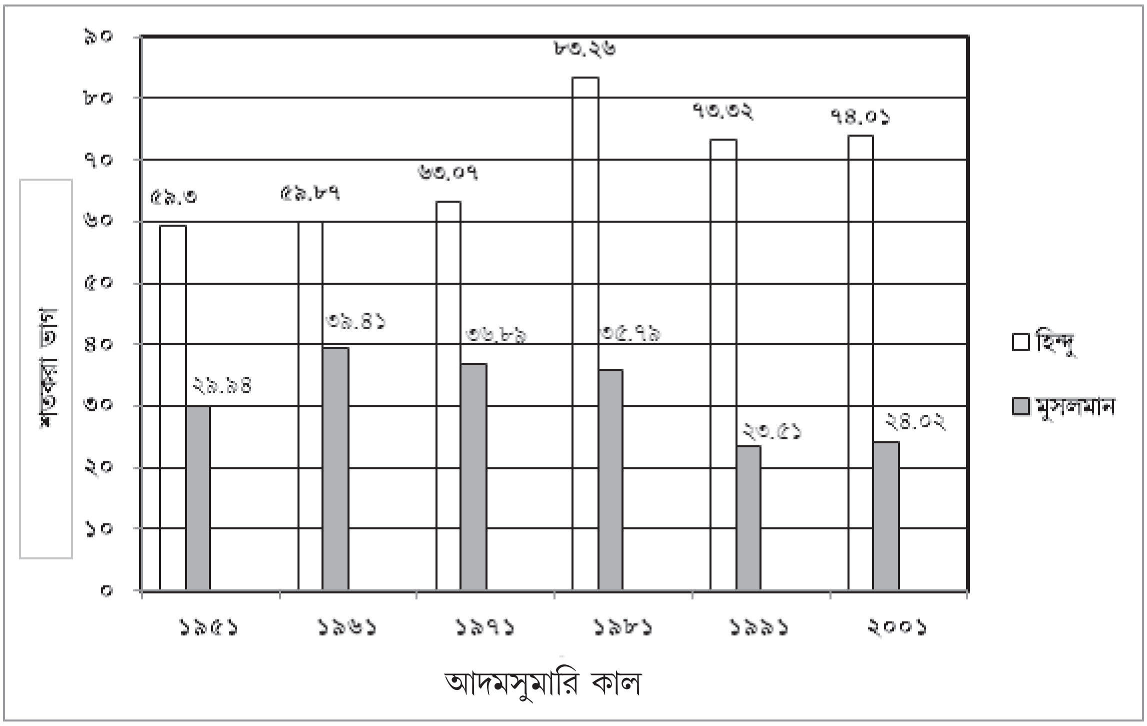
৯০
৮০
৭০
৬০
৫০
৪০
৩০
২০
১০
০
শতকরা ভাগ
৫৯.৩
২৯.৯৪
৫৯.৮৭
৩৯.৪১
৬৩.০৭
৩৬.৮৯
৮৩.২৬
৩৫.৭৯
৭৩.৩২
২৩.৫১
৭৪.০১
২৪.০২
১৯৫১
১৯৬১
১৯৭১
১৯৮১
১৯৯১
২০০১
হিন্দু
মুসলমান
আদমসুমারি কাল

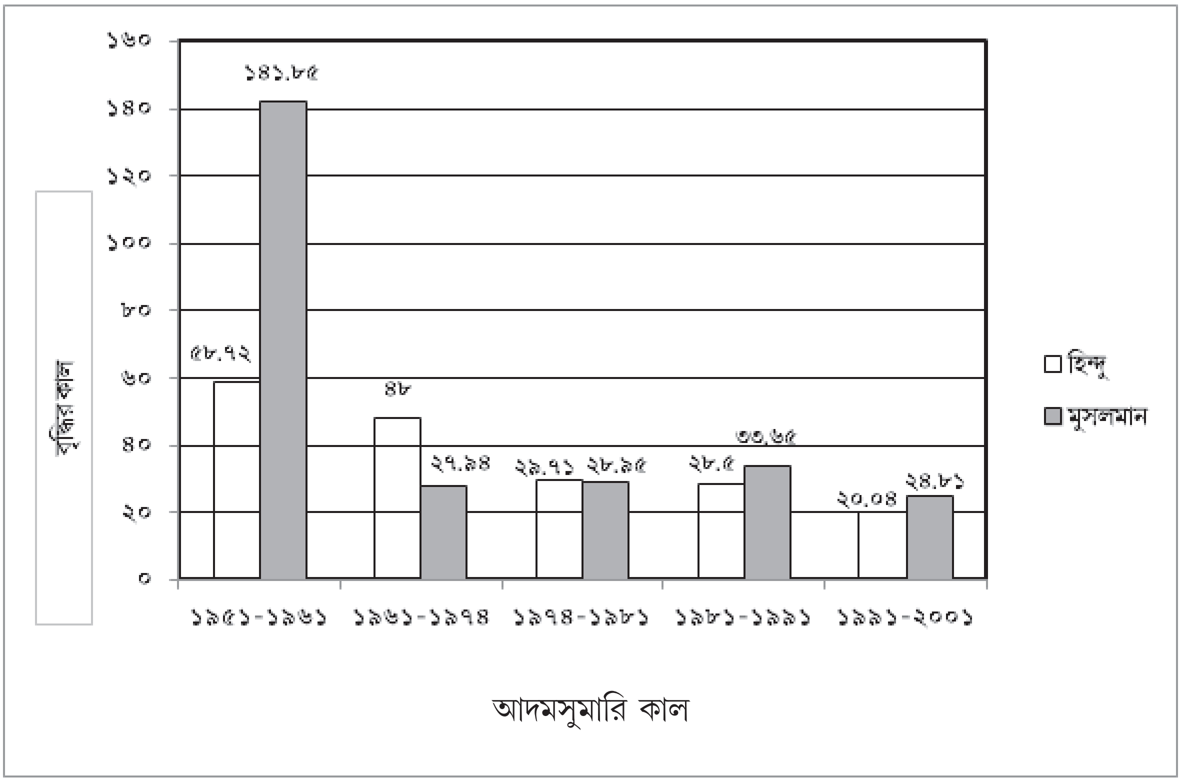
১৬০
১৪০
১২০
১০০
৮০
৬০
৪০
২০
০
১৪১.৮৫
৫৮.৭২
৪৪
২৭.৯৪
২৯.৭১
২৮.৯৫
২৮.৫
৩৩.৬৫
২০.০৪
২৪.৮১
১৯৫১-১৯৬১
১৯৬১-১৯৭৪
১৯৭৪-১৯৮১
১৯৮১-১৯৯১
১৯৯১-২০০১
হিন্দু
মুসলমান
আদমসুমারি কাল

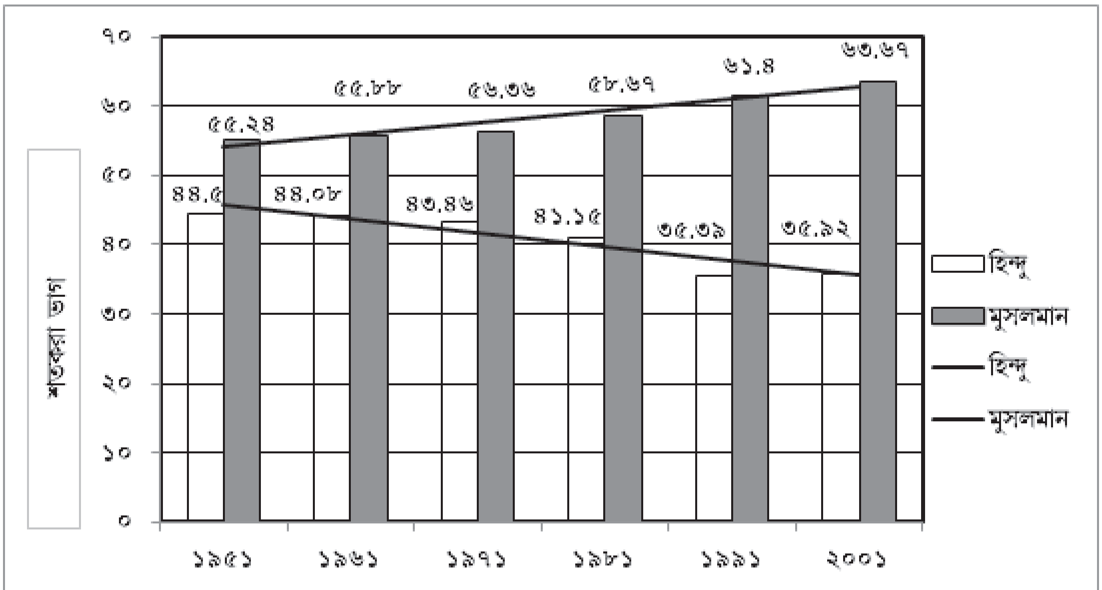
৭০
৬০
৫০
৪০
৩০
২০
১০
০
শতকরা ভাগ
৫৫.২৮
৫৫.৮৮
৫৬.৩৬
৫৮.৬৭
৬১.৪
৬৩.৬৭
৪৪.৫
৪৪.০৮
৪৩.৪৬
৪১.১৫
৩৫.৩৯
৩৫.৯২
১৯৫১
১৯৬১
১৯৭১
১৯৮১
১৯৯১
২০০১
হিন্দু
মুসলমান
হিন্দু
মুসলমান
আদমসুমারি কাল

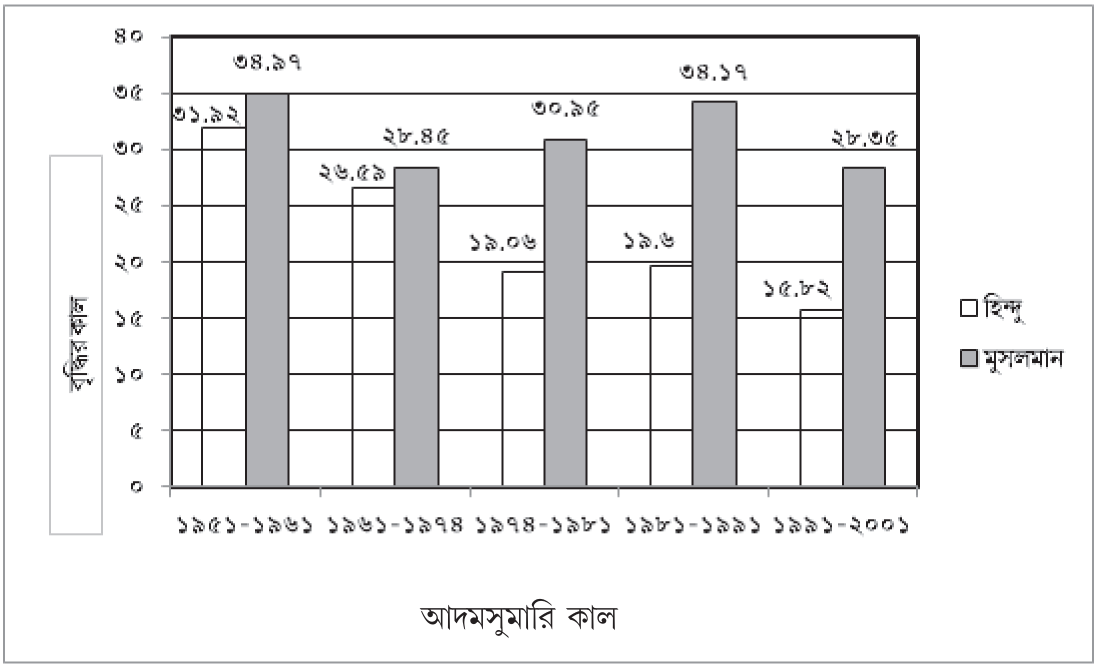
৪০
৩৫
৩০
২৫
২০
১৫
১০
৫
০
৩৪.৯৭
৩১.৯২
২৮.৪৫
২৬.৫৯
৩০.৯৫
১৯.০৬
৩৪.১৭
১৯.৬
২৮.৩৫
১৫.৮২
বৃদ্ধির কাল
১৯৫১-১৯৬১
১৯৬১-১৯৭৪
১৯৭৪-১৯৮১
১৯৮১-১৯৯১
১৯৯১-২০০১
হিন্দু
মুসলমান
আদমসুমারি কাল

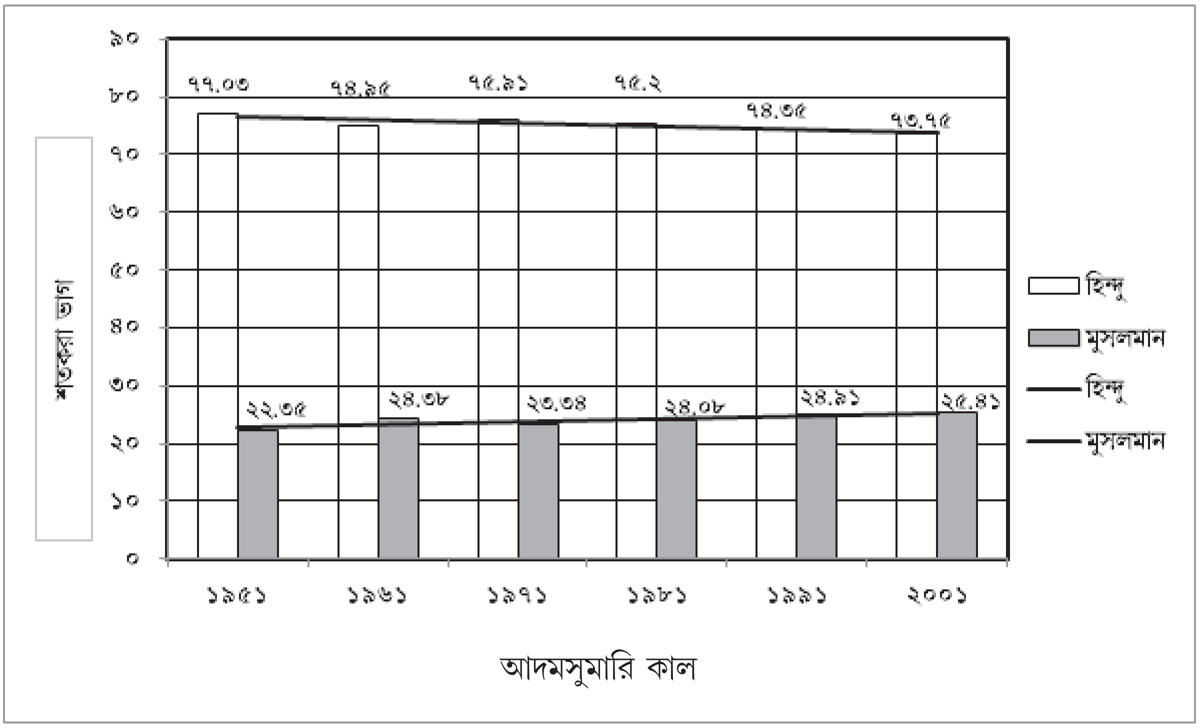
৯০
৮০
৭০
৬০
৫০
৪০
৩০
২০
১০
০
৭৭.০৩
৭৪.৯৫
৭৫.৯১
৭৫.২
৭৪.৩৫
৭৩.৭৫
২২.৩৫
২৪.৩৮
২৩.৩৪
২৪.০৮
২৪.৯১
২৫.৪১
শতকরা ভাগ
১৯৫১
১৯৬১
১৯৭১
১৯৮১
১৯৯১
২০০১
হিন্দু
মুসলমান
হিন্দু
মুসলমান
আদমসুমারি কাল

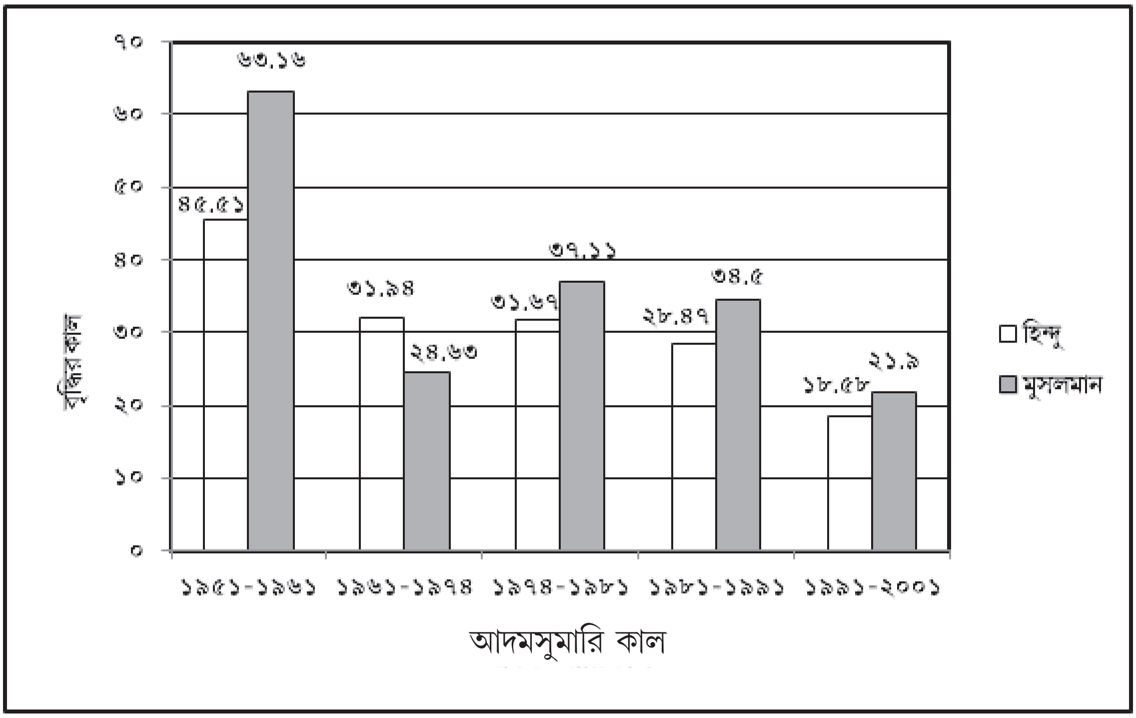
৭০
৬০
৫০
৪০
৩০
২০
১০
০
বৃদ্ধির কাল
৬৩.১৬
৪৫.৫১
৩১.৯৪
২৪.৬৩
৩১.৬৭
৩৭.১১
২৮.৪৭
৩৪.৫
১৮.৫৮
২১.৯
১৯৫১-১৯৬১
১৯৬১-১৯৭৪
১৯৭৪-১৯৮১
১৯৮১-১৯৯১
১৯৯১-২০০১
আদমসুমারি কাল
হিন্দু
মুসলমান

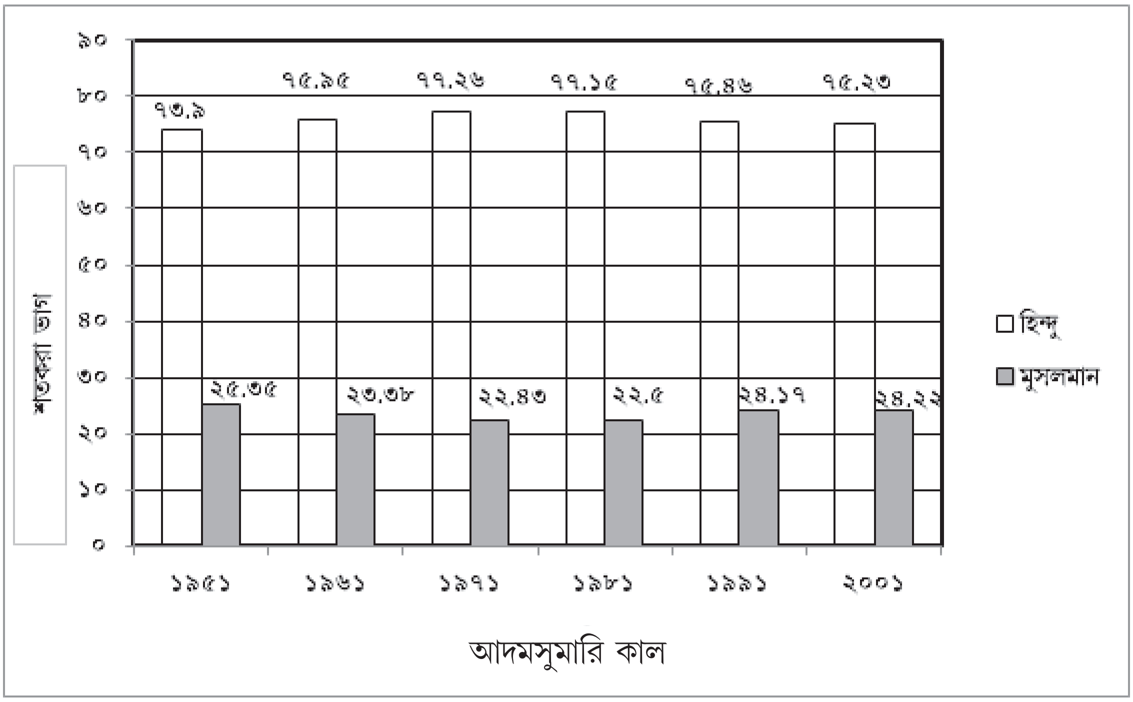
৯০
৮০
৭০
৬০
৫০
৪০
৩০
২০
১০
০
শতকরা ভাগ
৭৩.৯
৭৫.৯৫
৭৭.২৬
৭৭.১৫
৭৫.৪৬
৭৫.২৩
২৫.৩৫
২৩.৩৪
২২.৪৩
২২.৫
২৪.১৭
২৪.২২
১৯৫১
১৯৬১
১৯৭১
১৯৮১
১৯৯১
২০০১
আদমসুমারি কাল
হিন্দু
মুসলমান

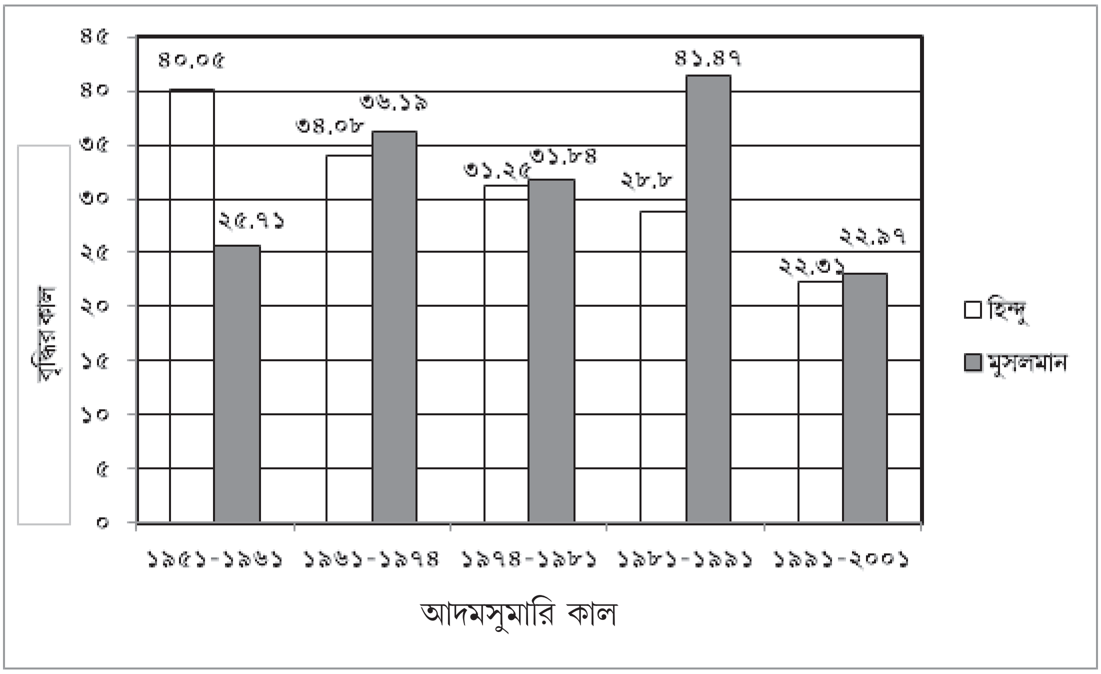
৪৫
৪০
৩৫
৩০
২৫
২০
১৫
১০
৫
০
বৃদ্ধির কাল
৪০.০৫
২৫.৭১
৩৪.০৮
৩৬.১৯
৩১.২৫
৩১.৮৪
২৮.৮
৪১.৪৭
২২.৩১
২২.৯৭
হিন্দু
মুসলমান
১৯৫১-১৯৬১
১৯৬১-১৯৭৪
১৯৭৪-১৯৮১
১৯৮১-১৯৯১
১৯৯১-২০০১
আদমসুমারি কাল

সংখ্যালঘুর এই দেশত্যাগ, বিশেষ করে ধাপে ধাপে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পূর্ববঙ্গ ছেড়ে আসার ফলে সেখানে গভীর সংকট তৈরি হয়। ভারতবর্ষে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে হিন্দুদের একটি বিশেষ শ্রেণি যোগসূত্র তৈরি করে। রাজ্য শাসন করতে ইংরেজরাও তাদের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। এই রাজ আনুগত্যের ফলে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষমতার শীর্ষে এরা বিচরণ করতে শুরু করে। অপর পক্ষে মুসলিম সমাজ পাশ্চাত্য সংস্কৃতি প্রত্যাখ্যান করে আরবি-ফারসি শিক্ষার দিকে ঝোঁক এবং ইসলামিক অনুশাসনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। এর ফলে ইংরেজ ও ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে তাদের দূরত্ব বাড়তে থাকে। ইংরেজ শাসনের শেষ দিকে মুসলিম লিগ সাধারণ মুসলিম সমাজকে আত্মজাগরণের স্বপ্ন দেখায়। এর জন্যে মুসলমান সমাজকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে হয়। সাধারণ মুসলিম প্রবল হিন্দু বিদ্বেষী হয়ে ওঠার ফলে হিন্দুদের দেশত্যাগ ত্বরান্বিত হয়। দেশের শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের অনুপস্থিতিতে পূর্ববঙ্গে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংকট তৈরি হয়। দেশের নানা প্রান্ত জুড়ে আদর্শবাদী ও দক্ষ শিক্ষক সম্প্রদায় শিক্ষার যে উচ্চমান তৈরি করেছিল তাদের বিপুল অনুপস্থিতি মানব সম্পদ তৈরির প্রয়াসকে ব্যাপকভাবে ক্ষুণ্ন করে। সেই সঙ্গে পূর্ববঙ্গের ছোট বড় বিভিন্ন শহর, গ্রাম-গঞ্জে যে নাটমন্দির, সঙ্গীতসভা, পালা-পার্বণ, সম্মিলিত উৎসব, যাত্রা-নাটকের দল ছিল সেগুলি ক্রমে বন্ধ হতে শুরু করে। শিক্ষা-সংস্কৃতির অবনমনের ফলে সামাজিক সংকট প্রবল আকার ধারণ করে।

বিপুল সংখ্যক আদর্শবাদী শিক্ষকদের দেশত্যাগের ফলে শিক্ষাঙ্গনগুলি প্রায় শূন্য হয়ে যায়। তা ছাড়া তাদের ছেলেমেয়েরাও স্কুল ছেড়ে চলে যায়, যারা মেধার দিক থেকে বিদ্যালয়গুলিতে প্রথম সারিতে অবস্থান করত। এই শূন্যতাকে পূর্ণ করবার মত অবস্থা মুসলিম সমাজের ছিল না বললেই চলে। তাদের মধ্যে আরবি-উর্দু পড়ানোর জন্য তালেব এলেমধারী কিছু শিক্ষক ছিল, কিন্তু তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এত নিম্নমানের ছিল যে অন্যান্য বিষয় পড়ানো সম্ভব ছিল না।[৫২] অবশ্য এই শূন্যতা পূরণ করতে মুসলিম সমাজের একাংশ এবং পূর্ববঙ্গে থেকে যাওয়া নিম্নবর্গের হিন্দুরা এগিয়ে আসে। কিন্তু এক্ষেত্রেও ধর্মীয় আদর্শবাদের সংকট থেকেই যায়। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের শিক্ষাঙ্গণে আধিপত্যহীন করতে এক শ্রেণির উগ্র মুসলিম সোচ্চার হয়ে ওঠে। এতদিন হিন্দু জমিদার, নায়েব, দেওয়ান, বড় ব্যবসায়ী নিজেদের অঞ্চলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতেন। স্কুলের নামকরণও হত তার নিকটজনের কারও নামে। বিদ্যালয় চালনার ক্ষেত্রে তিনি কিংবা তার বংশধর কেউ একজন আর্থিক দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। কারণ সরকারি বরাদ্দকৃত অর্থে ভালোভাবে স্কুল চালানো সম্ভব ছিল না।

তারা দেশত্যাগ করার পরে অনেক বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। এই সময়ে মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে আর্থিকভাবে সচ্ছল এবং সমাজ দরদি মুসলমানরা নিজেদের উদ্যোগে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। প্রত্যাশিতভাবেই এইসব স্কুলে মুসলিমদের প্রাধান্য দেওয়া হয়। ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করলেই তাদেরকে শিক্ষকতার পদে বসিয়ে দেওয়া হত। এরফলে শিক্ষার গুণগত মান কমতে শুরু করে। যদিও মুসলিম সম্প্রদায় এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে।

সংখ্যালঘুর দেশত্যাগের ফলে শিক্ষা সংকটের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতি তথা লোকসংস্কৃতির ধারা শুকিয়ে যেতে শুরু করে। লোকায়ত স্তরে বাংলায় হিন্দু-মুসলমান আলাদা কোনও সংস্কৃতির অধিকারী ছিল না— উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা সম্মিলিতভাবে এই ধারাকে বহন করে চলছিল। কিন্তু মোল্লাতন্ত্রের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক বিভাজন প্রয়োজন ছিল। বিশেষ করে পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হবার পরে এই বিভাজন প্রবল হয়ে ওঠে। ধুতি-লুঙ্গি, টিকি-দাড়ি, গরুপুজো-গরু খাওয়ার দ্বন্দ্ব তো দীর্ঘদিন ধরে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল; এরই সঙ্গে কলার পাতার দুই পিঠে দুই জাতির খাওয়ার মত তুচ্ছ ব্যাপারকেও বিরাট করে দেখা হয়েছিল। মুসলমানের পানি হিন্দুর জল, মুসলমানের আণ্ডা হিন্দুর ডিম, মুসলমানের গোসল হিন্দুর স্নানের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান আবিষ্কৃত হয় সে সময়ে। গরু যেমন হিন্দুর কাছে নিষিদ্ধ খাদ্য, শূকর, কাছিম তেমনি মুসলমানদের কাছে হারাম। হিন্দুরা পশুবলি দেয়, মুসলমানরা জবাই দেয়। হিন্দুর জলপাত্র ঘটি বা গাড়ু মুসলমানের বদনা। নিজেদের পৃথক করতে মুসলিম সমাজ জলপাত্র পর্যন্ত আলাদা করে নিল। বিভাজনের ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে নজরুলের ব্যঙ্গ কবিতায়— ‘বদনা গাড়ুতে পুনঃ ঠোকাঠুকি...’ দুই সম্প্রদায় নিজেদেরকে অন্যের থেকে আলাদা করে নেবার উগ্র প্রতিক্রিয়া শুরু করবার ফলে বাঙালির ঐক্যে যেমন ফাটল ধরল, তেমনি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বড় আঘাত এল।

বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে হিন্দুয়ানি মুক্ত করতে ব্যাপক প্রচেষ্টা চলে পূর্ববঙ্গে। নজরুলের ‘চল্ চল্ চল্’ গানটিতে আছে—

‘নবনবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহা শ্মশান’—

‘মহাশ্মশান’-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হল ‘গোরস্তান’। কারণ মহাশ্মশান হিন্দু শব্দবন্ধ। কারবালার জারিগানে পূর্ববঙ্গে দীর্ঘ দিন ধরে প্রচলিত ছিল—

‘দক্ষিণে বন্দনা করি দক্ষিণাল সার

সেইখানে সদাগরি করতায় চন্দো সদাগর।’

পূর্ববঙ্গীয় আকাদেমি পুস্তকে সংগৃহীত জারি গানে ‘চন্দোসদাগর’ বাদ দিয়ে ‘আরবি সদাগর’ করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় তরফে সচেতনতার সঙ্গে সাহিত্য সংস্কৃতিকে এভাবে ইসলামিক চেতনার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়।

বয়াতিরা উভয় সম্প্রদায়ের দেব-দেবী, আল্লা, পীর-পয়গম্বরের মহিমা কীর্তন করত। এই ধারা প্রাচীন পরম্পরা। মুসলমান গীতিকারেরা সমস্ত দেব-দেবীকে প্রণাম জানিয়ে গীত আরম্ভ করত। তারা উপসংহারে গাইত ‘সীতা শান্তি (সতী) মা কে মানি রঘুনাথ গোঁসাই।’ মুসলমান গায়ক পশ্চিমে মক্কার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে গাইতেন—

‘বন্দি ঠাকুর জগন্নাথ
ভেদ নাই বিচার নাই বাজারে বিকয় ভাত।
চণ্ডালে রাধে ভাত ব্রাহ্মণেতে খায়,
এমন সুধন্য দেশে জাত নাহি যায়।
ভাত লইয়া তারা মুণ্ডে মোছে হাত,
সে কারণে রাইখাছে নাম ঠাকুর জগন্নাথ।’

পল্লী গীতিকায় এমন দৃষ্টান্ত অগণিত[৫৩]। কিন্তু পঞ্চাশের দশক থেকে সেই অসাম্প্রদায়িক লোকগান, লোককথা হারিয়ে যেতে লাগল।

সাম্প্রদায়িক শক্তি সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় হিন্দু রবীন্দ্রনাথ লালন ফকিরের গানের খাতা চুরি করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, যে গানের খাতা তিনি পড়বার জন্য চেয়ে নিয়েছিলেন। তা আর ফেরৎ দেননি। কাজি নজরুল সম্পর্কে বিশেষ এক শ্রেণির মানুষের বদ্ধ ধারণা তাঁর মাথা খারাপের কারণ রবীন্দ্রনাথ। তিনি তাঁর আত্মীয় প্রমিলা (নজরুল পত্নী) কে দিয়ে এই হাল করেছেন। তা না হলে নজরুল থাকতে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে নোবেল পুরস্কার পাওয়া সম্ভব ছিল না। এ থেকে বোঝা যায় সমাজ মনের গড়ন।[৫৪]

চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে পূর্ববঙ্গে পোশাকের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষণ করা যায়। স্বাধীনতার পূর্বে বাংলার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বিরাট সংখ্যক মানুষ ধুতি পরত। পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থনে সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যকে স্পষ্ট করে তোলার জন্যে মুসলিম সম্প্রদায় সম্পূর্ণভাবে

ধুতি ত্যাগ করল এবং একতরফাভাবে লুঙ্গি ও আলখাল্লা পরতে শুরু করল। পাশাপাশি হিন্দু রক্ষণশীলতা লুঙ্গিকে প্রতিহত করতে চাইল প্রাণপণে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় থেকে কাপড়ের দাম এত বেড়ে গিয়েছিল যে সাধারণ মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্তের পক্ষে সারাক্ষণ পরে থাকার পক্ষে দশ হাত ধুতি কেনা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। লুঙ্গি আকারে ছোট, তাই ধুতির তুলনায় দামে অনেক সস্তা। কিন্তু হিন্দু ভদ্রলোকেরা কিছুতেই লুঙ্গি পরতে রাজি নয়। কারণ লুঙ্গিতে কাছা দেবার ব্যবস্থা ছিল না। অভাবের কারণে শেষ পর্যন্ত হিন্দুরাও লুঙ্গি পরতে বাধ্য হয়। কিন্তু মুসলমানের লুঙ্গির সঙ্গে নিজেদের লুঙ্গির পার্থক্য বজায় রাখতে এভাবে চেষ্টা করল হিন্দুরা—

i) বাজার থেকে লুঙ্গির কাপড় কিনে এনে সেলাই না করে সেটিকে কোমরে পেঁচিয়ে রাখা; তারা মনে করতে লাগল এতে মুসলমানের লুঙ্গির সঙ্গে কিছুটা হলেও স্বাতন্ত্র্য বজায় রইল;

ii) স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রাখতে হিন্দুরা পরত এক রঙের লুঙ্গি, চেক লুঙ্গি পরিহার করত মুসলমানি ছাপ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে।

কিন্তু ছেচল্লিশে নোয়াখালির দাঙ্গার পর ধুতি সংস্কৃতি প্রায় মুছেই গেল। পূর্ববাংলার গ্রামীণ হিন্দুরা প্রাণ ভয়ে চেক লুঙ্গি পরে বাইরে বের হতে লাগল।[৫৫]

একই বাংলাভাষী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কিছু কিছু শব্দ ব্যবহারের স্বাতন্ত্র্য বরাবরই ছিল কিন্তু তার জন্য ভাষার পৃথকীকরণ হয়নি। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় থেকে ‘মুসলমানী বাংলা’ বলে একটা ভাষারীতি চালানোর জোরদার প্রয়াস চলে। ‘পানি’, ‘গোছল’, ‘নাস্তা’, ‘আণ্ডা’ এসব শব্দ বাঙালি মুসলমানরা বহুকাল ধরেই ব্যবহার করে আসছে, কিন্তু দেশভাগ পরবর্তী সময়ে শব্দগুলির সচেতন প্রয়োগ চাপল মুসলিম পরিচয় চিহ্ন হিসেবে। কাকাতুয়া পাখিকে মুসলমানেরা ‘চাচাতুয়া’ বলতে লাগল। শব্দের ব্যবহার এবং ভাষার গতিধারাকে এভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বদলে দেবার প্রবণতা সাংস্কৃতিক সুস্থতাকে ব্যাহত করে।

নামের আগে সকল বাঙালিই এক সময়ে ‘শ্রী’ ব্যবহার করত— এতে হিন্দু মুসলমানের কোনও ভেদ ছিল না। মুসলমানরা যে ‘শ্রী’ লিখত তার ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়ে গেছে ষোড়শ শতাব্দীর ইশা খাঁর বিখ্যাত কামানে। তাতে স্পষ্ট লেখা আছে ‘শ্রী ইছা খাঁ’ নামটি। এখনও মুসলমান বাড়িতে জমি কেনা বেচার পুরোনো দলিল খুললেই দেখা যাবে; ‘কস্য পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে লিখিতং শ্রী শেখ আমজাদ আলি, পিতা শ্রী শেখ রমজান আলি, জাতি মুসলমান, পেশা-গৃহস্থী।’[৫৬] ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু জাতি পরিচয়কে আলাদা করতে মুসলিম সম্প্রদায় 'শ্রী' বর্জন করে 'জনাব' কথাটি ব্যবহার করতে শুরু করল। দ্বিজাতি তত্ত্বের উন্মেষের দিনগুলিতে মুসলমান যখন পরিধান থেকে ধুতি ত্যাগ করল, পদবি থেকে ছাড়ল 'শ্রী', 'মহাশ্মশান' শব্দ পরিবর্তিত হয়ে 'গোরস্তান' কিংবা 'কাকাতুয়া' রূপ নিল 'চাচাতুয়ায়', তখন থেকেই সংস্কৃতির মহা সংকট কাল শুরু হল।

তথ্যসূত্র

১. বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, নবপত্র, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৬১৪-৬১৬; উল্লেখ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনের সামরিক ব্যয় ৩১০০০ কোটি ডলার, জাতীয় ঋণ ৪,০০০ কোটি থেকে ১০,০০০ কোটি ছাড়ায়, বিদেশী ঋণ ছয়গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৩০০ কোটি হয়; ২০ লক্ষ ঘর-বাড়ি ধ্বংস হয়।

২. যতীন সরকার, *পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন*, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১৭৮

৩. যতীন সরকার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৮২

৪. যতীন সরকার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৬৯

৫. আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯ আগস্ট, ১৯৪৭; উদ্ধৃত : লাডলিমোহন রায়চৌধুরী, *ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশবিভাগ*, দে'জ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১১২

৬. Kanti B. Pakrashi, *The uprooted : A sociological study of Refugees of West Bengal*, ISI, Indian edition, Kolkata, 1971, p. 18

৭. Census Report : 1951, Reference: The Uprooted, p. 17-18

৮. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, *ইতিহাসের দিকে ফিরে ছেচল্লিশের দাঙ্গা*, প্রথম র‍্যাডিক্যাল প্রকাশ, ২০১০, পৃ. ৬১

৯. তপন রায়চৌধুরী, *বাঙালনামা*, আনন্দ, তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৫৮.

১০. অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৯ আগস্ট ১৯৪৬

১১. সুদেষ্ণা চক্রবর্তী, 'উদ্বাস্তু স্রোত ও পশ্চিমবাংলার জনজীবন', হর্ষ দত্ত ও স্বপন বসু (সম্পা.), *বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১৭২

১২. অনিল সিংহ, 'পশ্চিমবঙ্গের শরণার্থী সমস্যা', *ঈশান*, দেশভাগ সংখ্যা, ১৯৯৮, পৃ. ৩৭

১৩. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *উদ্বাস্তু*, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ. ১৫

১৪. মিহির সেনগুপ্ত, *বিষাদবৃক্ষ*, সুবর্ণরেখা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৮৮, এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য : জমিদারি প্রথা বিলোপের পর লেখকের জ্যাঠামশায় বলেছিলেন— 'We are lost. The zamindari system has been confiscated by the Government. We have now to decide, what to do next and have to servive.

১৫. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৬২

১৬. শঙ্কর ঘোষ, *হস্তান্তর*, প্রথম খণ্ড, আনন্দ, তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৮৫

১৭. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, *দেশভাগ স্মৃতি আর সত্তা*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৮

১৮. অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৮ আগস্ট, ১৯৪৮, উল্লেখ্য : যদুনাথ সরকার ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হলে হিন্দুদের দেশছাড়ার কারণ বিশ্লেষণ করেন।

১৯. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯ অক্টোবর, ১৯৪৮

২০. অশ্রুকুমার সিকদার, *ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য*, দে'জ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৫০

২১. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৫.

২২. দক্ষিণারঞ্জন বসু (সম্পা.), *ছেড়ে আসা গ্রাম*, জিজ্ঞাসা, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ৪২

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য : শ্রী গৌরাঙ্গ দাসে'র সাক্ষাৎকার (সাক্ষাৎকার গ্রহণ- ১২.১২.২০১১)
গ্রাম-কংশুর, পো: উলপুর
থানা+জেলা : গোপালগঞ্জ, বাংলাদেশ

২৩. আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৬ অক্টোবর, ১৯৪৬

২৪. প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৫৪ ব. পৃ. ৪৯

আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৮

২৫. Praffulla K. Chakrabarti, *The Marginal Men*, Naya Udyog, Naya Udyog Edition, Kolkata, 1999, p. 1

২৬. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৪-১৫

২৭. শঙ্কর ঘোষ, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২২০

২৮. অশ্রুকুমার সিকদার, *ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য*, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৭০

২৯. Prafulla k. Chakrabarty, *Ibid*, p. 1

৩০. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, *দেশভাগ দেশত্যাগ*, অনুষ্টুপ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৭৩

৩১. অশ্রুকুমার সিকদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১১১

৩২. সমীর সেনগুপ্ত, *পূর্ববঙ্গের সমাজমন*, গণ, দ্বিতীয় সংস্করণ, হৃদয়পুর, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৩২

৩৩. আব্দুল মোহামেইন, *দুইদেশের স্মৃতি*, পৃ. ৭৬-৭৭, উদ্ধৃত; সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৭৬

৩৪. শঙ্কর ঘোষ, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২২৫

৩৫. Praffulla K. Chakrabarti, *Ibid*, p. 2-3

৩৬. *Recurrent Exodus of Minorities from East Pakistan and Disturbances in India— A report to the Indian commission of Justice by the committee of Enquary*, New Delhi p. 48

৩৭. অমলেন্দু দে, *প্রসঙ্গ অনুপ্রবেশ*, বর্ণপরিচয়, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪, কলকাতা, পৃ. ৩

৩৮. Nim C. Bhowmik, *Legal Lynching & Exodus of Minorities from Bangladesh in South Asia*, From, Quarterly, Vol. 4, No-4, 1991, p. 45

৩৯. প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, *প্রান্তিক মানব*, প্রতিক্ষণ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ১২

৪০. ত্রিদিব চক্রবর্তী, নিরুপমা মণ্ডল, পৌলমী ঘোষাল (সম্পা.), *ধ্বংস ও নির্মাণ : বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের স্বকথিত বিবরণ*, সেরিবান, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১১

৪১. সর্বেশ্বর মণ্ডল, *বাংলার কৃষি ও কৃষক সমাজ*, নবজীবন, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৮৪

৪২. তপনকুমার বাইন, *নিম্নবর্গের সমাজ জীবন : দেশ কাল*, সোমপ্রকাশ, বহিরগাছি, নদিয়া, ২০০১, পৃ. ৫২-৫৩

৪৩. অশ্রুকুমার সিকদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১২২

৪৪. Jaya Chatterji, *Bengal Divided: Hindu Communalism Partition, 1932-1947*, Cambridge University Press, 1st Indian edition, New Delhi, 1996, p. 154

৪৫. সাক্ষাৎকার : অধ্যাপক সুকদেব বালা (সাতপাড় কবি নজরুল মহাবিদ্যাল)
গ্রাম+পোঃ হাটবাড়িয়া, থানা+জেলা: গোপালগঞ্জ, বাংলাদেশ
সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ১৪.১২.২০১১

৪৬. অশ্রুকুমার সিকদার, 'বাংলা কথা সাহিত্যে বঙ্গবিভাজন ও নিম্নবর্গীয়রা', উদয়চাঁদ দাশ ও অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), *দেশবিভাগ ও বাংলা উপন্যাস*, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম সংস্করণ, বর্ধমান, ২০০৫, পৃ. ১২৩

৪৭. মনীন্দ্র সমাদ্দার, *দেশভাগের যন্ত্রণা*, উদ্বাস্তু সংগ্রাম পরিষদ, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৪৪

৪৮. অমলেন্দু দে, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৩৩

৪৯. অমলেন্দু দে, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৩৩

৫০. অশ্রুকুমার সিকদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১১

৫১. অশ্রুকুমার সিকদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১১

৫২. মফিদুল হক, 'দেশভাগ : আমাদের বিষবৃক্ষ', সেমন্তী ঘোষ (সম্পা.), *দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা*, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ, ২০০৮, পৃ. ৪৫

৫৩. মিহির সেনগুপ্ত, *বিষাদবৃক্ষ*, সুবর্ণরেখা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৪১০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৮৯-৯০

৫৪. বিপ্লব বালা, 'যে গাছ রুয়েছি তার এই ফল হবে : যারা থেকে গেলাম।' সেমন্তী ঘোষ (সম্পা.) পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৩১

৫৫. যতীন সরকার, '*পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু দর্শন*', জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ৭৩

৫৬. যতীন সরকার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৯০

১.১ উদ্বাস্তু আগমন : ক্যাম্প-কলোনি জীবন

পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ২২০৩.৪৯ কি.মি. সীমান্ত বর্তমান। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুরা দীর্ঘ সময় ধরে সীমানা অতিক্রম করেছে (যার শুরু ৪৬-য়ের দাঙ্গা, চলছে এখনও)। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানসিক সমস্ত দিক থেকে রিক্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিটে ত্যাগ সবকিছুকে ওলটপালট করে দিয়েছে। বেদনার এই ছেদ এক ভৌগোলিক সত্তার পরিবর্তে অন্য ভৌগোলিক সত্তা এক মানুষের পরিবর্তে অন্য মানুষকে জীবনের সাবেকি বোধের পরিবর্তে অন্যবোধের প্রকাশ ঘটিয়েছে।

ভাগাভাগির স্বরূপ বুঝতে পেরে অগণিত মানুষ পায়ে হেঁটে, নৌকায় করে, লঞ্চ-স্টিমারে, ট্রেনে এমনকি বিমান পথেও দেশান্তরী হয়েছে। দেশভাগের পূর্ববর্তী সময় থেকে পূর্ববঙ্গের যে অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের যে অঞ্চলের মানুষের যোগাযোগ বেশি ছিল, তারা দেশত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গের সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসতি গড়তে চেয়েছে। বিষয়টি বুঝতে গিয়ে পূর্ববঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থিতি অল্প পরিসরে আলোচনা করা প্রয়োজন। পূর্ব পাকিস্তানের ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম জেলার নিকটবর্তী ভারতভূমির অংশ ত্রিপুরা রাজ্য। সুতরাং সেইদিকেই এই অঞ্চলের বাস্তুত্যাগী হিন্দুদের স্বাভাবিক গতি। শ্রীহট্টের হিন্দুদের স্বাভাবিক আকর্ষণ উত্তর আসামের প্রতি। রংপুর জেলার নিকটবর্তী অঞ্চল কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলা, তাই এই জেলায় তাদের বসবাসের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। পূর্ব-দিনাজপুর জেলার উদ্বাস্তুদের গতি পশ্চিম দিনাজপুরের দিকে। রাজশাহী জেলার অধিবাসীদের বেশিরভাগ এসেছে মালদহে। পূর্ব পাকিস্তানের বাকি যে অংশ তার থেকে দুটি মূল উদ্বাস্তু স্রোত পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল—

i) প্রথম স্রোতটি ট্রেন যোগে দর্শনা এসে সীমান্ত অতিক্রম করে;

ii) দ্বিতীয় ধারাটি বনগাঁ সীমান্ত অতিক্রম করে।

যারা দর্শনা সীমান্ত অতিক্রম করে তারা মূলত পূর্বপাকিস্তানের মধ্যভাগের বাসিন্দা। পক্ষান্তরে যারা বনগাঁ সীমান্ত পেরিয়ে এসেছে তারা পূর্ববঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে বাস করতো।[১]

উদ্বাস্তুদের প্রথম ঠিকানা— শিয়ালদহ স্টেশন : সীমান্তের নানা শিবির থেকে প্রতিটি পরিবারের সদস্যদের নাম, সদস্য সংখ্যা, মেয়ে-পুরুষের সংখ্যা, শিশুর সংখ্যা ইত্যাদি নথিভুক্ত করে তাদের ট্রেনে করে শিয়ালদহ স্টেশনে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক কাঠামো এবং চাহিদা অনুযায়ী পরিবারগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়—

i) যারা তুলনায় সঙ্গতি সম্পন্ন এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য সরকারের উপর নির্ভরশীল নয়; এদের পরিচয়পত্র দেওয়া হতো ভবিষ্যতে উদ্বাস্তু পরিবার কিনা সে প্রশ্ন উঠলে যাতে প্রমাণপত্র হিসেবে তা ব্যবহার করতে পারে;

ii) দ্বিতীয় শ্রেণির উদ্বাস্তুরা সরকারের উপর আংশিক নির্ভরশীল। তারা আশ্রয়শিবিরে আশ্রয় চাইতো না, তবে প্রাথমিকভাবে কিছু আর্থিক সাহায্য আশা করতো;

iii) তৃতীয় শ্রেণির উদ্বাস্তুদের আত্মনির্ভর হবার ক্ষমতা ছিল না। তারা আশ্রয় চাইতো এবং ভবিষ্যতে পুনর্বাসনের জন্য সরকারের উপর নির্ভর করতো।

বিভিন্ন শ্রেণির উদ্বাস্তুদের পৃথকভাবে চিহ্নিত করতে আলাদা আলাদা রঙের পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছিল।[২]

শিয়ালদহ স্টেশনে এসেই কলেরা ও অন্যান্য রোগের প্রতিষেধক টিকা নেবার জন্য লাইনে দাঁড়াতে হতো, তারপর ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরে লাইন দিতে হতো। এই পর্ব শেষ হলে শিয়ালদহ সাউথ স্টেশনে উদ্বাস্তু শিবিরে যাবার জন্য দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষায় থাকতে হয়েছে। প্ল্যাটফর্মে থাকাকালীন তারা সরকারের কাছ থেকে বিনা পয়সায় চিড়ে-গুড় পেতো। সরকার উদ্বাস্তুদের জন্য কেবলমাত্র এইটুকুই দায়িত্ব নিয়েছিল। কারও অসুখ করলে তাকে দেখাশুনা করার মতো ব্যবস্থা ছিল না।[৩] সেই সময়ে উদ্বাস্তুদের পোটলা-পুটলি নোংরা বিছানাপত্র প্ল্যাটফর্মের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকত। ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডায়েরিয়া, বদহজম, আমাশা তাদের নিত্যসঙ্গী হয়ে ওঠে। মধ্যবিত্ত হিন্দুদের একটি অংশ কলকাতা ও শহরতলির আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। অল্পদিনের মধ্যেই তাদের সঙ্গে উদ্বাস্তুদের দূরত্ব তৈরি হয়। ফলে অনেকেই আবার শিয়ালদহ স্টেশনে এসে আশ্রয় নেয়। সাপ্তাহিক মাথাপিছু নগদ দু'টাকা ও শুকনো চিড়েগুড়ের বরাদ্দের (ডোল) জন্য কাড়াকাড়ি, কল থেকে জল আনবার জন্য মারামারি, ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিদ্রাহীনতা তাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। পাঁচ থেকে ছ'হাজার মানুষের পানীয় জল সরবরাহের জন্য মাত্র তিনটি কল, মহিলাদের পায়খানা মাত্র দু'টি, পুরুষদের জন্য বরাদ্দ বারোটি। শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে তখন সহায়-সম্বলহীন মানুষের ঢল।[৪]

এরাই শালগ্রাম শিলার শুচিতা বাঁচাতে, মেয়ে বউয়ের সতীত্ব রক্ষা করতে ভারতের মাটিতে ছুটে এলো। অথচ শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছোতে না পৌঁছোতেই মা-মেয়ে-বউদের অনেকেই সতীত্ব হারিয়েছে; শালগ্রাম শিলা হয়েছে ভিক্ষার মূলধন। এই স্টেশনে গর্ভবতী তার সন্তানের জন্ম দিয়েছে হাজার হাজার লোকের সামনে, অসহায় বাবা দেখেছে স্টেশনের পাশে নির্জন অন্ধকার কোণে ধর্ষিতা

হচ্ছে কন্যা, যুবতী চলে যাচ্ছে অন্য যুবকের ছায়া হয়ে। অবশেষে সরকারি সিদ্ধান্তে ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের ট্রাক এসে তাদের সরকারি আশ্রয় শিবিরে নিয়ে যায়। কিন্তু ততক্ষণে নতুন উদ্বাস্তুর ভিড়ে প্ল্যাটফর্ম চত্বর ভরে যায়। এভাবে নিত্য দিন শিয়ালদহ প্ল্যাটফর্মে চলতে থাকে উদ্বাস্তু আগমন। বাধ্য হয়ে সরকার শেষ পর্যন্ত শরণার্থীদের পুনর্বাসনের কথা ভাবতে শুরু করে—

পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শরণার্থীদের মূলত তিন শ্রেণিতে ভাগ করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়—

ক)অক্টোবর, ১৯৪৬ থেকে মার্চ ১৯৫৮ পর্যন্ত আগতদের পুরাতন শরণার্থী বলে অভিহিত করা হয় (old migrants) ওয়ার্কিং গ্রুপের রিপোর্ট অনুযায়ী এই শ্রেণির উদ্বাস্তুর সংখ্যা ৪১.১৭ লক্ষ;

খ) ১৯৫৮ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সরকারি হিসেবে ৬১,০০০ শরণার্থী এসেছে। তারা মধ্যবর্তী শরণার্থী। তারা সাহায্য বা পুনর্বাসন লাভের অধিকারী নয়। পূর্ব পাকিস্তান থেকে নতুনভাবে উদ্বাস্তু আগমনকে অনুৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল;

গ) ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি থেকে ৭১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত যারা এসেছে তাদের নবাগত শরণার্থী বলা হয়েছে। প্রায় ১১.১৪ লক্ষ মানুষ এই সময়ের মধ্যে এসেছে। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থির করা হয়, এই সময়ের মধ্যে আগতদের পশ্চিমবঙ্গে কোনও রকম সাহায্য বা পুনর্বাসন দেওয়া হবে না; ইচ্ছুক শরণার্থীদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পাঠানো হবে এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য ও পুনর্বাসনের দায়িত্ব নেওয়া হবে।[৫]

ক্যাম্প জীবন : শিয়ালদহ স্টেশন থেকে উদ্বাস্তুদের নিয়ে যাওয়া হতো সরকারের অস্থায়ী আশ্রয় শিবিরে (ট্রানজিট ক্যাম্পে)। যতদিন তাদের স্থায়ী আশ্রয় শিবিরে স্থানান্তর না করা হতো ততদিন তারা সেখানে বাস করতো। শিয়ালদহ স্টেশনে উদ্বাস্তুদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় তাদের ট্রানজিট ক্যাম্পে এনে রাখা হয়। স্থায়ী শিবির করতে বা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে সরকারের সময়ের প্রয়োজন ছিল। তাই ট্রানজিট ক্যাম্পগুলিতে দীর্ঘ সময় ধরে উদ্বাস্তুদের থাকতে হয়েছিল। স্থায়ী আশ্রয় শিবিরে এসে তারা পুরোপুরি সরকারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। দিনের পর দিন মাসের পর মাস বিনা পরিশ্রমে সাহায্য পেতে অভ্যস্ত শিবিরবাসী অলস-অকর্মন্য ভিক্ষুকের মতো বেঁচে রইল। নানাবিধ কুটির শিল্প, কৃষিকাজ ইত্যাদি যাদের আয়ত্তে ছিল তারাও নিশ্চিন্তে ক্যাশ ডোলের আশায় সব কাজ

ছেড়ে অলস জীবন-যাপন করতে লাগল। কেউ উপার্জন করতে সক্ষম প্রমাণিত হলে তাকে সরকারি রেশন বা ডোল দেওয়া যাবে না; সরকারের এই অদ্ভুত নিয়ম উদ্বাস্তুদের অথর্ব শ্রেণিতে পরিণত করলো।

ক্যাম্পগুলির অবস্থা তখন খুবই শোচনীয়—না ছিল আব্রু, না ছিল কোনও গোপনীয়তা। এরই মধ্যে নবজাতক জন্মাচ্ছে; বিবাহ, মৃত্যু সবই ঘটছে। একটি মাত্র চটের দেয়ালের ওপাশে ছেলে-ছেলের বউ এ পাশে বাবা-মা-বোনেরা। স্নান ঘরে কিংবা শৌচাগারে আবডাল নেই— এরই মধ্যে পাশাপাশি বড় হয়ে উঠছে ছেলে-মেয়েরা। কাজকর্মহীন জীবনের ভয়াবহ অবকাশ কাটে কুৎসিত পরচর্চা, নারী চর্চা আর যৌন আলোচনায়। কারণে-অকারণে জেগে ওঠে তাদের নস্টালজিয়া। এই নস্টালজিয়া প্রতিটি উদ্বাস্তুর একটি বিশিষ্ট ও অনিবার্য লক্ষণ। সত্য আর কল্পনা মেশানো কথা শুনিয়ে বর্তমান পরিস্থিতির ভয়াবহতা ও অনিশ্চয়তাকে সাময়িকভাবে ভুলে থাকতে চায় তারা।

পরিস্থিতির চাপে তরুণ উদ্বাস্তুরা জড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন রকম অপরাধমূলক কাজে; রাজনৈতিক নেতারা তাদের নানাভাবে ব্যবহার করতে শুরু করে। কিশোরী ও যুবতী মেয়েরা কখনও বাইরে, কখনও ঘরে কামুক পুরুষের রিরংসার শিকারে পরিণত হয়; আবার কখনও তারা পাচার হয়ে গিয়েছে নিষিদ্ধ জগতে। কেউ কেউ সামান্য সস্তা সুখের আশায় শরীরকে পণ্য করেছে।[৬] শিশুরা ন্যূনতম শিক্ষার সুযোগ পায়নি, কারণ বেঁচে থাকতে গিয়ে পেটের দাবিকে সবার আগে পূরণ করতে হয়েছিল। সরকারি সাহায্যের একটি বিরাট অংশ কর্মকর্তাদের পকেটে গিয়েছে। যেটুকু উদ্বাস্তুদের কাছে এসে পৌঁছেছে, তাকে কেন্দ্র করে নিজেরাই নানা ধরনের দুর্নীতির পথ অবলম্বন করেছে। যেমন—

i) ভুয়ো নামে রেশনকার্ড করে ডোল তোলা;

ii) একই পরিবারের সদস্যদের স্বেচ্ছায় পৃথক করে দিয়ে বেশি পরিমাণে অর্থ ও রেশন আদায় করা;

iii) বিবাহিত কন্যাকে স্বামী পরিত্যাক্তা বলে অতিরিক্ত সাহায্য দাবি করা;

iv) প্রাপ্ত ডোল বাইরে বিক্রি করে দেওয়া;

v) সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও বাইরে কাজ করা।

সরকার রিফিউজি ক্যাম্পগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছিল[৭]—

i) সাধারণ আশ্রয় শিবির বা ক্যাম্প;

ii) ট্রানজিট ক্যাম্প;

iii) পি.এল.ক্যাম্প;

iv) ওয়ার্কসাইট ক্যাম্প।

আশ্রয় শিবিরগুলি রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল ৫,৫৭,৫৪৪ জন। এরপর খুব বেশি মানুষ আশ্রয় শিবিরে স্থান পায়নি। ১৯৫৮ সালের পরে উদ্বাস্তুদের ক্যাম্পে প্রবেশের সুযোগই দেওয়া হয়নি।[৮]

১৯৪৮ সালের ১৫ জুন প্রকাশিত সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বোঝা যায় পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সরকার ভালো চোখে দেখছে না। তখন পুনর্বাসন দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন মোহনলাল সাকসেনা। তার ঘোষণা, পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হলেই উদ্বাস্তুদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে তাদের দেশে। যতদিন সেটা না হচ্ছে ততদিন তাদের জন্য এখানে ব্যবস্থা হবে সাময়িক বাসস্থানের। পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা এবং বিহারকে উদ্বাস্তুদের ত্রাণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। বেশ কিছু টাকাও বরাদ্দ করা হয় এই খাতে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া হয় দুই লক্ষ টাকা। এর ফলে উদ্বাস্তুদের থাকার জন্য তড়িঘড়ি করে শুরু হয় ক্যাম্প তৈরির কাজ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানিদের সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে সরকার ভারতের পূর্বপ্রান্তে অনেক জমি হুকুম দখল করে। যুদ্ধ সংক্রান্ত মালপত্র মজুত রাখার জন্য নানা জায়গায় তৈরি হয় বিশাল বিশাল গোডাউন। এর পরিভাষিক নাম 'নিসেন হাট'।[৯] নিসেনহাট একধরনের ঘর, সুড়ঙ্গের মতো দেখতে। বাঁকানো করোগেট টিন দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল এর ছাউনি, মেঝে সিমেন্টের। এক একটা ঘর ২৫ ফুটের উপরে চওড়া, ১০০ ফুটের উপরে লম্বা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে গোডাউনগুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। দেশভাগের পর পূর্ববাংলা থেকে আসা উদ্বাস্তুদের আশ্রয় শিবির হিসেবে নিসেন হাটগুলিকে কাজে লাগানো হয়।[১০] সরকারি সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার বড়ো বড়ো ক্যাম্প তৈরি হয়। নদীয়া জেলার কুপার্স ক্যাম্প, ধুবুলিয়া ক্যাম্প, বর্ধমানের পাল্লা, মহেশডাঙা ক্যাম্প এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। পুনর্বাসন কেন্দ্রে না পাঠানো পর্যন্ত শরণার্থীদের যে ক্যাম্পে রাখা হতো, এগুলির নাম ট্রানজিট ক্যাম্প।

অক্ষম পঙ্গু ব্যক্তিদের জন্য স্থায়ী আশ্রয় শিবির খোলা হয়। এগুলিকে পার্মানেন্ট লায়াবিলিটি সংক্ষেপে পি.এল ক্যাম্প বলা হয়। এখানে আশ্রয়প্রার্থীদের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেছিল। তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে কাজের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। মেদিনীপুরের দুধকুণ্ডী, হুগলীর বাঁশবেড়িয়া, নদীয়ার চাঁদমারী, কুপার্সের একাংশ, চামতা, ধুবুলিয়া, উত্তর ২৪ পরগণার অশোকনগর, হাবড়া, টিটাগড় প্রভৃতি এলাকায় এইজাতীয় ক্যাম্পের অস্তিত্ব রয়েছে।[১১]

উইমেন্স ক্যাম্প বা মহিলা শিবিরে অনাথ বিধবা ও অভিভাবকহীন মেয়েদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। মহিলাদের পুত্র সন্তানেরা আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত উইমেন্স ক্যাম্পে থাকতে পারতো। তারপর ক্যাম্প ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে হতো। তবে পরবর্তী সময়ে আঠারো বছরের বড়ো ছেলেরাও পরিবারের সঙ্গে এই ক্যাম্পে থেকে গিয়েছে। হুগলীর ভদ্রকালী, বাঁশবেড়িয়া, রানাঘাটের মহিলা শিবির, রূপশ্রীপল্লী, টিটাগড়ের মহিলা শিবিরের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রূপশ্রী ব্যতীত অন্যসব মহিলা শিবিরের অধিবাসীরা অনেক বয়স্ক ছেলে মেয়ে নিয়ে পুনর্বাসন নিয়েছিল।

ওয়ার্কসাইট ক্যাম্পগুলির চরিত্র ভিন্ন প্রকৃতির। ১৯৫১ সালে প্রথম এই ক্যাম্প গঠিত হয়। পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত জমি উন্নয়নের জন্য বড়োবড়ো ক্যাম্প থেকে উদ্বাস্তুদের এনে বিভিন্ন এলাকায় তাঁবু খাটিয়ে তারমধ্যে রাখা হতো। কাজের বিনিময়ে তারা পারিশ্রমিক পেতো। যারা শ্রম দিয়ে জমির উন্নয়ন ঘটাল, জমির উন্নয়নের পর সেখানে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে, এটাই ছিল সরকারের লক্ষ্য। সারা রাজ্যে এইজাতীয় ৩২টি ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। কিন্তু বহুক্ষেত্রেই দেখা যায় কাজ শেষ হবার পর উদ্বাস্তুরা সেখানে ঠাঁই পায়নি। এক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় চারপাশের নানা কায়েমী স্বার্থ।[১২]

কলকাতার উদ্বাস্তুদের জন্য সরকার দু'রকমের ব্যবস্থা করেছিল—

i) একদল উদ্বাস্তু যারা বসবাসের সমস্যায় ভুগছিল, তারা বাসস্থানের জন্য সরকারের উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। সরকারের কাছে তারা আর্থিক সাহায্য চায়নি। এরা মূলত সচ্ছল পরিবারের, ভাড়া দেবার ক্ষমতা রাখে। এদের জন্য সরকার অনেকগুলি বাড়ি হুকুম দখল করেছিল; তারপর ছোটো ছোটো ফ্ল্যাটে ভাগ করে ভাড়া দিয়েছিল;

ii) বাকিরা ছিল অপেক্ষাকৃত কম সচ্ছল। সরকার তাদের জন্য বাড়ি সংগ্রহ করেছিল এবং বিনা ভাড়ায় তাদের বিতরণ করেছিল।[১৩]

জবরদখল কলোনী : উদ্বাস্তুদের মধ্যে কিছু মানুষ ছিল যারা ক্যাম্পে সরকারি অনুগ্রহ নিতে চায়নি। তাদের মনে স্বনির্ভর হওয়ার অদম্য ইচ্ছা ছিল। এই শ্রেণির উদ্বাস্তুরা কলকাতা কিংবা কলকাতার কাছাকাছি বাস করতে চাইল। এখানে থাকলে অন্নের সংস্থান নিজেরাই করতে পারবে এই আত্মবিশ্বাস ছিল। তাই সংঘবদ্ধ হয়ে কিছু মানুষ অন্যের জমি দখল করে কলোনি স্থাপন করে। প্রধানত চাকুরিজীবী এবং উপার্জনে নিযুক্ত ব্যক্তিরাই এর নেতৃত্ব দিয়েছিল; কাজের জায়গার কাছাকাছি বসতি স্থাপন ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। এই ক্ষেত্রে কলকাতা বা তার আশেপাশের অঞ্চলই উপযুক্ত স্থান।

স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই পূর্ববঙ্গের বহুলোক কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলে কাজ করতো। তারা মূলত মেস, বোর্ডিং কিংবা অল্প পয়সায় ভাড়া বাড়িতে থাকতো। স্বাধীনতা ও দেশভাগের পর বিশেষ করে পঞ্চাশের দাঙ্গার পর এদের পরিবারের লোকজন, আত্মীয় স্বজন সবকিছু ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে শিয়ালদহ স্টেশনে আশ্রয় নেয়। তখন বাড়ি ভাড়া পাওয়া যেমন কষ্টসাধ্য ছিল, তেমনি ভাড়ার হারও ছিল অনেক বেশি। ফলে এদেরই একটা অংশ ফাঁকা জমি দখল করে বাসস্থানের সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী হয়। এদের নেতৃত্বে জবরদখল হলেও বহু শ্রমজীবী মানুষ জবরদখলে অংশ নিয়েছিল।

জবরদখল কলোনি মূলত গড়ে উঠেছিল—

i) জমিদারের বাগানবাড়ি, ফাঁকা জমিতে;

ii) সরকারের খাস জমিতে;

iii) রেললাইন সংলগ্ন রেলের ফাঁকা জমিতে।[১৪]

ফাঁকা জমি চিহ্নিত করে প্রথমেই তারা প্রতিটি পরিবারের জন্য সীমানা নির্ধারণ করতো এবং রাতারাতি হোগলা, মুলিবাঁশ, টিন, টালি দিয়ে ঘর-বাড়ি বানাতো। দখলের সংবাদ জমিদার তথা জমির মালিকের কানে পৌঁছলে লেঠেল বাহিনি এসে বাড়ি-ঘর ভেঙে দিয়ে যেত কিংবা আগুন লাগিয়ে দিত। ভাঙা ঘর-বাড়ি পরের দিনেই আবার তৈরি করে নিত। এই নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ লেগেই থাকতো। আক্রমণ হতে পারে এই আশঙ্কায় কলোনিতে পাহারার ব্যবস্থা করা হতো। গুণ্ডারা কলোনি আক্রমণ করতে এলে শঙ্খ-ঘন্টা-কাঁসর বাজিয়ে কলোনিবাসীকে সতর্ক করে দেওয়া হতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে লেঠেলরা পরাজিত হয়ে ফিরে যেত। উচ্ছেদ না করতে পেরে জমির মালিক আদালতের শরণাপন্ন হতো। এরফলে পুলিশ এসে উদ্বাস্তুদের উপর অত্যাচার করতো। সরকারি খাস জমি ও রেলের ফাঁকা জমি দখল করতে উদ্বাস্তুদের নানা ধরনের পুলিশি ও প্রশাসনিক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই সময়ে এক একটি কলোনি সমগ্র একটি পরিবারের মতো যৌথভাবে কাজ করতো। বেঁচে থাকার জন্য এই লড়াই পরবর্তী সময়ে তাদেরকে রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ করে তুলেছে।

১৯৪৯ সালের অক্টোবরে সোদপুর রেল স্টেশনের কাছে উদ্বাস্তুরা একটি পতিত জমি বেছে নিয়ে রাতারাতি হোগলা ও বাঁশ দিয়ে কয়েকটি কুড়েঘর তৈরি করল, নাম দেওয়া হলো ‘দেশবন্ধুনগর’। এটিই উদ্বাস্তুদের প্রথম জবরদখল কলোনি।[১৫] নিখিলবঙ্গ বাস্তুহারা কর্মপরিষদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় এই কলোনি। তবে এই কলোনি প্রতিষ্ঠার আগেই ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে টালিগঞ্জের ‘গান্ধী কলোনি’ প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং প্রথম জবরদখল কলোনী হিসেবে দেশবন্ধুনগর কলোনিকে বলা যায়

না। তবে ইউ.সি.আর.সি এর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রথম জবরদখল কলোনি হিসেবে ‘দেশবন্ধুনগর’কে অভিহিত করলে কোনও বিতর্ক থাকে না। ‘গান্ধীকলোনি’র পরেই সোদপুরের ‘দেশবন্ধুনগর’ ও টালিগঞ্জের ‘নেহেরু কলোনি’ দ্বিতীয় ও তৃতীয় কলোনির মর্যাদার অধিকারী।[১৬] ক্রমে কলকাতার শহরতলি এবং ২৪ পরগণা, হাওড়া হুগলিসহ বিভিন্ন জেলায় জমি দখল করে দ্রুত কলোনি গড়ে উঠতে থাকে।

প্রথমদিকে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার এই কলোনিগুলিকে স্বীকৃতি দিতে রাজি হয়নি; বরং বিরোধিতা করেছে। কলোনিগুলি থেকে উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদের জন্য পুলিশ ও প্রশাসনকে কাজে লাগিয়েও শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। অবশেষে সরকার ১৯৫১ সালে একটি আইন প্রণয়নে সচেষ্ট হয়। ‘অননুমোদিত জমি দখলীকৃত ব্যক্তিগণের উচ্ছেদ আইন-৫১’ নামে বিলটি উত্থাপিত হয়। বিলের ভূমিকায় লেখা হয়— পূর্ববঙ্গ থেকে বহু সংখ্যক শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে এসে সরকারি ও বেসরকারি জমি বেআইনিভাবে দখল করেছে। এইসকল দখলকারীগণের উচ্ছেদ কল্পে দেওয়ানী আদালতের মাধ্যমে প্রচলিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা সংশ্লিষ্ট পক্ষের কাছে ব্যয়বহুল ও সময় সাপেক্ষ। সেজন্য এই অনভিপ্রেত পরিস্থিতির অবসানের জন্য এই বিলের প্রচলন জরুরী। কিন্তু ইউ.সি.আর.সির নেতৃত্বে এই উচ্ছেদ বিলের প্রত্যাহার এবং কলোনিগুলির সরকারি স্বীকৃতির দাবিতে বিশাল আন্দোলন পরিচালিত হয়। আন্দোলনের চাপে বিলটি সংশোধিত হয়। বিকল্প পুনর্বাসন ছাড়া কাউকে উচ্ছেদ করা যাবে না। এই সংশোধনটি উদ্বাস্তুদের খানিকটা রক্ষাকবচের কাজ করে। তবে উদ্বাস্তুদের সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ শক্তির ফলে কলোনিগুলি থেকে একটি মানুষকেও উচ্ছেদ করা যায়নি।

প্রথম দিকে যারা উদ্বাস্তু হয়ে এল, তারা পরিত্যক্ত মিলিটারি ক্যাম্পে আশ্রয় পেলো। সেখানে স্থান সংকুলান না হওয়ায় কলকাতার উপর পরিত্যক্ত সামরিক ব্যারাকগুলিতে আশ্রয় নেয়; সেগুলি পূর্ণ হলে কলকাতা ও শহরতলির ফাঁকা বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে। এরপর বাসস্থান সমস্যার সমাধানের জন্য উদ্বাস্তুরা শহরতলির শিল্পাঞ্চলে বহু বছরের পতিত ও অনাবাদি জমিতে নিজেদের চেষ্টায় আশ্রয়স্থল গড়ে তোলে।[১৭] জবরদখল কলোনিগুলিকে সৃষ্টির কাল অনুযায়ী দুইভাগে ভাগ করা যায়—

i) ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত গঠিত কলোনি;

ii) ১৯৫১ সাল ও তার পরবর্তী সময়ের কলোনি;[১৮]

এই দুই শ্রেণির জবরদখল উদ্বাস্তু উপনিবেশের শ্রেণিগত চরিত্র ভিন্ন। দেশভাগের অব্যবহিত পরেই

যারা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে, তারা ছিল সচ্ছল পরিবারের। কলকাতা শহর কিংবা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে তাদের পূর্ব যোগসূত্র থাকায় তারা নিজেদের চেষ্টায় বসতি স্থাপন করেছে। ফলে তাদের শিয়ালদহ স্টেশন, ক্যাম্প কিংবা কলোনিতে থাকার প্রয়োজন হয়নি। অপেক্ষাকৃত নিম্ন আয়ের মানুষ, যারা পূর্ববঙ্গে মোটামুটি সচ্ছল ছিল এদের মধ্যে একটি শ্রেণি বাসস্থান সমস্যা দূর করতে জবরদখল উদ্বাস্তু উপনিবেশ গড়তে উদ্যোগী হয়। কারণ—

i) শিয়ালদহ স্টেশনে ও ক্যাম্পে উদ্বাস্তুদের যেভাবে জীবনধারণ করতে হচ্ছিল, সে জীবনে তারা অভ্যস্ত ছিল না;

ii) উদ্বাস্তুদের মধ্যে এই শ্রেণির মানুষ ছিল উদ্যমী এবং কর্মঠ। তাই তারা সরকারের উপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজেরা উপনিবেশ গড়তে উদ্যোগী হয়;

iii) নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষ, যারা পূর্ব থেকেই কলকাতার মেসে কিংবা হোস্টেলে থাকত; পূর্ববঙ্গ থেকে পরিবারের সকলে চলে আসায় সেখানেও থাকা সম্ভব ছিল না;

iv) পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের আগমনের ফলে বাড়িভাড়া ব্যাপক হারে বেড়ে গিয়েছিল সামান্য রোজগারের মানুষের পক্ষে এই ভাড়া দিয়ে বসবাস সম্ভব ছিল না।[১৯]

সুতরাং এই পর্যায়ে গঠিত কলোনিগুলি ছিল অপেক্ষাকৃত সুসংগঠিত। এখানকার বাসিন্দারা যেহেতু কম-বেশি রোজগেরে, তাই তাদের জীবনযাত্রা ও রুচি-পছন্দ ছিল সাধারণ ক্যাম্প-কলোনির বাসিন্দাদের থেকে ভিন্ন ধরনের।[২০]

১৯৫০ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে স্থাপিত জবরদখল উদ্বাস্তু উপনিবেশগুলির বিবরণ[২১]

জেলা	থানা	উপনিবেশ সংখ্যা	পরিবার সংখ্যা	জনসংখ্যা	জবর দখল জমির পরিমাণ (একর)
২৪ পরগণা	যাদবপুর (বর্তমান টালিগঞ্জ সহ)	৫৮	১২,৮৭৯	৪৬৩৯৫	১০৭৩.২৬
”	বেহালা	৪	৪১২	২০৬০	৩৪.৪০
”	দমদম	৪০	৬৮৭০	৩৪০৩৫	৪৫৩.৮০
”	বেলঘরিয়া	৩	২৫৪৩	১২৭১৫	২২৮.৫০
”	বাটানগর	৭	১১৭১	৫৮৫৫	৯৭.৮৫
”	নোয়াপাড়া	৪	৩৬২	১৮১০	৩০১০

জেলা	থানা	উপনিবেশ সংখ্যা	পরিবার সংখ্যা	জনসংখ্যা	জবর দখল জমির পরিমাণ (একর)
”	খড়দহ	১৫	২৭০৭	১৩৫৩৫	২২৫.৬০
”	নৈহাটি	৩	৭১৮	৩৫৯০	৫৯.৪০
”	বীজপুর	৪	৩৩৩	১৫৬৫	২৭.৯০
”	টিটাগড়	১	১৫৫	৭৭৫	১২.৯০
”	জগদ্দল	৪	৩৮৮	১৯৪০	৩২.৩০
”	হাবড়া	২	৪১২	২০৬০	৩৪.২০
হুগলী	শ্রীরামপুর	৩	৮০৯	৪০৪৫	৬৭.৪৩
হাওড়া	বালী	১	১৬০	৮০০	১৩.৩০
৩টি জেলা	১৪টি থানা	১৪৯টি	২৯৮৫৬	১৪৯২৮০	২৩৯০.৬৪

১৯৪৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে মাত্র তিনটি জেলায় চোদ্দটি থানা এলাকায় ১৪৯টি জবরদখল কলোনির খবর পাওয়া যায়। এরমধ্যে ১৪৫টির অবস্থান ২৪ পরগণাতে (তখনকার দিনে ২৪ পরগণা অবিভক্ত ছিল)।

কলোনিগুলির অবস্থানগত দিকটি লক্ষ করলে দেখা যাবে যাদবপুর অঞ্চল ভিন্ন অন্য সব কলোনিগুলি শিয়ালদহ থেকে নৈহাটি পর্যন্ত রেললাইনের দুপাশে অবস্থিত। এই এলাকাটিতে নানা ধরনের শিল্প-কলকারখানা ছড়িয়ে ছিল। অন্যদিকে যাদবপুর অঞ্চলে বড়ো কোনও শিল্প-কারখানা না থাকলেও স্থানটি কলকাতার নিকটবর্তী; তাই কলকাতা শহরে কাজ করার সুযোগ ছিল এখানকার বাসিন্দাদের। একদিকে কারখানায় কাজের সুযোগ, অন্যদিকে শহরে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্তি— এই দ্বিবিধ কারণে জবরদখল উদ্বাস্তু উপনিবেশগুলি গড়ে ওঠে। অল্পদিনের মধ্যেই এদের অধিকাংশ ঘরবাড়ি হোগলাপাতার কুটির কিংবা টালির চালার ঘর থেকে টিনের বাড়ি কিংবা পাকা বাড়িতে পরিণত হয়।

১৯৫০ সালের পরবর্তীকালে স্থাপিত জবরদখল কলোনি : ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে স্থাপিত ১৬৬টি জবরদখল কলোনির নাম পাওয়া যায়। পঞ্চাশ উত্তর জবরদখল কলোনির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো— এই সময়ের জবরদখলকারীরা অপেক্ষাকৃত দরিদ্রশ্রেণির। ১৯৫০ থেকে ৬০ সালের মধ্যে ১৪৯টি কলোনি স্থাপিত হয়। এরপর খুব বেশি জবরদখল কলোনি স্থাপিত হয়নি। কারণ তখনও

অনেকে পুনর্বাসনের আশায় ঘুরছে। এই সময়ে পুনর্বাসন দপ্তরে জমে থাকা ৫৮,০০০ দরখাস্তই তার প্রমাণ[২২]। কিন্তু পুনর্বাসন দপ্তর উদ্বাস্তুদের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়। ফলে ব্যাপক সংখ্যক কলোনি ৬০ দশকের পরে স্থাপিত হতে থাকে। ১৯৬৭ ও ১৯৭৯ সালে এর ব্যাপকতা আরও বৃদ্ধি পায়। এমনকি এমার্জেন্সীর দিনেও কলোনি প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত কলোনিগুলি সমকালীন নেতা, মন্ত্রী, সমাজসেবী, স্বাধীনতা সংগ্রামী অথবা কলোনি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির নামে নামকরণ করা হয়েছে। যেমন শাস্ত্রীনগর, প্রফুল্লনগর, জ্যোতিনগর, ইন্দিরা কলোনি ইত্যাদি। জমি দখলের হিড়িক তখন থেকেই শুরু হয়েছে, যখন উদ্বাস্তুরা বুঝেছে পুনর্বাসনের সব দায়িত্ব সরকার ছেড়ে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যাকে যখন থেকে 'Residuary Problem' হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং সমস্ত ধরণের সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হয়, এরপর থেকেই প্রতিদিন নতুন নতুন কলোনি স্থাপিত হয়েছে।

এই পর্যায়ের কলোনিগুলির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো—

i) কলোনির বাসিন্দারা অপেক্ষাকৃত পরে আগত উদ্বাস্তু;

ii) সরকারি ক্যাম্প-কলোনিতে স্থান না পেয়ে তারাই এই ধরনের কলোনি স্থাপনে উদ্যোগী হয়;

iii) কলোনির বাসিন্দাদের অধিকাংশ নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী;

iv) এই সময়ে স্থাপিত কলোনির ৭০% বেশি বাসিন্দা নিম্নবর্গের মানুষ; বিশেষ করে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের;[২৩]

v) পঞ্চাশ পরবর্তী জবরদখল কলোনিগুলি প্রধানত সরকারি জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; ব্যক্তি মালিকের জমির দিকে উদ্বাস্তুরা নজর দেয়নি। নজর না দেবার কারণ হতে পারে বৃহৎ আকারের ভূমিখণ্ডের অভাব।[২৪]

পঞ্চাশ সালে কিংবা তার পরবর্তী সময়ে গড়ে ওঠা এই মধ্য ও নিম্ন আয়ের কলোনি-বাসিন্দারা পূর্ববঙ্গে প্রধানত কৃষির সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু এখানে আসার পর তাদের আর কৃষিজীবী হিসেবে দেখা যায় না। তারা তাদের পূর্বপুরুষের পেশার পরিবর্তন ঘটায়। ৬০ দশকের পরে অনেকগুলি কৃষিজীবী জবরদখল কলোনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে চাষের জমিতে কৃষিজীবী হিসেবে উদ্বাস্তুরা জীবিকার ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য মুর্শিদাবাদ ছাড়া গঙ্গার এপারে জবরদখল কৃষি কলোনির সংখ্যা অধিক নয়। বরং বাঁকুড়া-বীরভূমের মতো কলকাতা থেকে অনেক দূরের জেলাগুলিতে কৃষি কলোনির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।[২৫]

পঞ্চাশ পরবর্তী কৃষিজীবী জবরদখল কলোনির বিবরণ[২৬]

জেলার নাম	কলোনির সংখ্যা	দখলী জমির পরিমাণ (বিঘা)	পরিবার সংখ্যা
মুর্শিদাবাদ	১৯	৬৬৭৫	২২৫৫
বর্ধমান	১	২৪০	২০৫
বীরভূম	২৪	৬৩৯০	১৩৪৭
কোচবিহার	৪	১৪৮৬	১০৮৯
জলপাইগুড়ি	৪	২৩৭	১০৫
বাঁকুড়া	৩৮	১৫৪৮০	২৫৪৫
নদীয়া	৫	১৫৪৫	৭৬৭
২৪ পরগণা	৪	২৫২০	১৩১৬
মোট ৮টি জেলা	৯৯	৩৭০৪৫	৯৬৬৬

পঞ্চাশ পরবর্তী ৭৬৬টি জবরদখল কলোনির মধ্যে ৯৯টি কৃষিজীবী কলোনি দখল করা জমির পরিমাণ ৩৭ হাজার বিঘা; পরিবারের সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। বাস্তু জমির সঙ্গে সঙ্গে তারা কিছু চাষের জমিও পেয়েছে। অন্যদিকে সরকারি ব্যবস্থায় তৈরি ১৪৫টি কলোনিতে প্রায় ২৩,০০০ কৃষি পরিবারকে কৃষিজমি দেওয়া হয়েছিল। সেদিক থেকে জবরদখলের সাফল্য উল্লেখযোগ্য; কারণ প্রায় ১০,০০০ পরিবার শুধু দখল করা জমির উপর নির্ভর করে নিজেদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। এরজন্য সরকারের কোনও ঋণ দিতে হয়নি; ক্যাম্প খরচও লাগেনি।

সরকারি চেষ্টায় ও সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত কলোনিগুলির সঙ্গে জবরদখল কলোনিগুলির তুলনামূলক চিত্র[২৭]

কলোনির চিত্র	কলোনির সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	জমির পরিমাণ	অর্থব্যয়
সরকারি কলোনি	৫২৮	৯৫,০০০	৮৫,০০০ একর	৫৭-৬৬ কোটি
জবরদখল কলোনি	৯১৫	১ লক্ষ প্রায়	২০,৩৮২ একর	সরকারের কোনও অর্থ ব্যয় হয়নি

কৃষি কলোনিগুলিতে পরিবার পিছু জমি সমবন্টন হয়নি। একই কলোনিতে কোন পরিবারের প্রাপ্তজমি সাড়ে চোদ্দ বিঘা, আবার কারও ভাগে পড়েছে ০.৮৫ বিঘা। কেন এই অসমবন্টন সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে বন্টনের বিষয়ে যতদূর জানা যায় তা হলো—

i) জবরদখল করা সমস্ত কৃষি জমির চরিত্র একইরকম ছিল না; অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের জমি যারা পেয়েছে তারা পরিমাণে কম পেয়েছে;

ii) পরিবারের সদস্য সংখ্যা জমিবন্টনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকতে পারে;

iii) যাদের সক্রিয় উদ্যোগে কলোনি গড়ে উঠেছিল তারা অধিক জমি নিজেদের দখলে রেখেছিল;

iv) কলোনি গড়ে ওঠার শেষ দিকে যারা এসেছিল তারা কম জমি পায়;

v) কৃষির সঙ্গে যুক্ত নয় এমন কিছু পরিবারকে কৃষি কলোনিতে স্থান দেওয়া হয়েছিল। তারা চাষের জমি পায়নি, পেয়েছিল বাড়ি তৈরির জায়গা, ফলে এই অসম বন্টন।

কৃষি কলোনিতে জমি তৈরি ছিল না; জমিগুলি ছিল অনাবাদী, ঝোপ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। নিজেদের চেষ্টায় তারা দীর্ঘ সময় ধরে এই জমিগুলিকে চাষযোগ্য এবং বাসযোগ্য করে তোলে।

সরকারী পুনর্বাসন : উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের বিষয়ে সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। পুনর্বাসনের আওতাভুক্ত উদ্বাস্তুদের কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়—

i) নিম্নবিত্ত শ্রেণি, যারা পূর্ব-পাকিস্তানে জোত-জমা দেখতো, ছোটোখাটো ব্যবসা করতো, দোকান চালাতো; এদের বেশিরভাগ পরিবারই কলকাতা সংলগ্ন আশ্রয় শিবিরে স্থান পেয়েছিল;

ii) কৃষিজীবী সম্প্রদায়, যাদের কারও নিজস্ব চাষের জমি ছিল না, এরা ভাগচাষ করতো চাষের কাজে মজুর খাটতো;

iii) তাঁতি সম্প্রদায়, তাঁত বোনাই ছিল এদের পেশা। এরা প্রশিক্ষিত কারিগর সম্প্রদায়ের মানুষ;

iv) মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মানুষ, মাছধরাই ছিল তাদের একমাত্র পেশা;

v) বারুজীবী সম্প্রদায়ের মানুষ, পানচাষ করে জীবনযাপন করাই ছিল তাদের বংশানুক্রমিক পেশা[২৮]

প্রথম দুই সম্প্রদায়ের তুলনায় তাঁতি, মৎস্যজীবী ও বারুজীবী সম্প্রদায়ের উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল অনেক কম।

কৃষিজীবী পরিবারগুলি বর্ধমান, ২৪ পরগণা, নদীয়ার বিভিন্ন শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। কারণ উক্ত জেলাগুলিতে বিস্তীর্ণ উর্বর জমি ছিল। জমিগুলি ছিল চাষাবাদের উপযুক্ত। কৃষক পরিবার সরকারি সাহায্যে নদী সংলগ্ন চাষের জমি কিনে চাষাবাদ শুরু করে। পূর্ববঙ্গ বিচ্ছিন্ন হবার ফলে ভারতবর্ষের চটকল ও তার অনুসারী শিল্পগুলি চরম সংকটে পড়ে। পূর্ববঙ্গের চাষিরা পাটচাষে দক্ষ ছিল। এই দক্ষ চাষিরা সেই সংকটের হাত থেকে রক্ষা করে। বাংলার অধিকাংশ চটকলগুলি ছিল হুগলি নদীর তীরে, যা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পড়ে। অথচ পাটের জমি পড়েছিল পূর্ববঙ্গে। ফলে কাঁচামাল সংগ্রহ করতে সমস্যা হয়। সেজন্য জাতীয় অর্থনীতিতে এর প্রভাব পড়ে। এই সময়ে উদ্বাস্তুরা কালনা ও কাটোয়া অঞ্চলে উন্নতমানের পাট চাষ শুরু করে। বিভিন্ন সংবাদপত্র পাটচাষের সংবাদ ছেপে স্বস্তি প্রকাশ করেছিল যে, বর্ধমান, নদীয়া, ২৪ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলে পাটচাষের ফলে ভারতীয় কৃষি ও শিল্পকে নতুন করে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।[২৯]

আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তু পরিবারের মধ্যে যারা পুনর্বাসন যোগ্য তাদের পুনর্বাসনে পাঠিয়ে দেবার জন্য একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়। মেয়াদের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল ১৯৫১। স্থায়ী উদ্বাস্তু শিবির ছাড়া অন্যসব উদ্বাস্তু শিবির খালি করে দেবার নির্দেশ দেয় সরকার। সাধারণ আশ্রয় শিবিরে যে পরিবারগুলি পুনর্বাসন যোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি তাদের স্থায়ী আশ্রয় শিবিরে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। বাকিদের পূর্বনির্ধারিত ব্যবস্থায় পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল। ১৯৫১ সালের মার্চের শেষের দিকে একশ্রেণির উদ্বাস্তু পুনর্বাসন নিতে অস্বীকার করে— তারা বারুজীবী সম্প্রদায়।

পুনর্বাসনের জন্য আশ্রয়শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হতো— কৃষিজীবী ও অকৃষিজীবী। কৃষিজীবীদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন হতো; কারণ—

i) কৃষিজীবী পরিবারের জন্য শুধু গৃহনির্মাণের জমি হলেই চলে না, অতিরিক্ত চাষের জমি দরকার হতো;

ii) জমিতে প্রথম ফসল উৎপন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের চাষের উপর নির্ভর করে জীবনধারণ করা সম্ভব ছিল না;[৩০]

তাই কৃষিজীবী পরিবারের জন্য বাস্তুজমির অতিরিক্ত চাষের জমি দেবার ব্যবস্থা থাকতো। নিজের চেষ্টায় তারা জমি সংগ্রহ করতে পারলে ঋণ দেবার ব্যবস্থা করা হয়। আশ্রয় শিবির ত্যাগ করার পরবর্তী ৬ মাসের খোরাকি দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল সরকার।

যারা অকৃষিজীবী, তারা ব্যবসায়ের জন্য ঋণ এবং ৬ মাসের খোরাকি পেতো। গ্রামাঞ্চলে ঋণের পরিমাণ কম হলেও শহরাঞ্চলে ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হতো। এরসঙ্গে গৃহনির্মাণের জন্য নির্ধারিত হারে ঋণ মিলত। বারুজীবী সম্প্রদায় পুরোপুরি কৃষিজীবীদের মধ্যে পড়ে না, আবার ব্যবসায়ী শ্রেণির মধ্যেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করা যেতো না। তারা পান উৎপাদন করে বাজারজাত করতো তাই তারা বাস্তুজমি সংলগ্ন পানচাষের জমি দাবি করেছিল। সরকার সেই দাবি পূরণ করে হুগলি ও নদিয়া জেলায় জমি দেয়।

১৯৪৯ সালের শেষ দিকে উদ্বাস্তুদের আগমন অনেকটা কমে যায়। এই পরিস্থিতিতে সরকারের মনে হয়েছিল, যেখানে আশ্রয় শিবির আছে সেখানেই তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। কারণ—

i) পুনর্বাসনের জন্য নতুন করে জমি সংগ্রহ করতে হবে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে জমিগুলি হুকুম দখল করা হয়েছিল সেগুলি ব্যবহার করা গেলেই পুনর্বাসন সমস্যার সমাধান হতে পারে;

ii) এই ব্যবস্থার ফলে স্থানীয় লোকদের স্বার্থহানির সম্ভাবনা কম;

iii) জমিগুলি সরকারের দখলে রয়েছে, সুতরাং জমি দখল করতে গিয়ে কোনওরকম বাধার সম্মুখীন হতে হবে না;[৩১]

iv) অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসন পাওয়ায় একটি মস্ত সুবিধা হলো উদ্বাস্তুরা যেখানে আশ্রয় নিয়েছিল সেখানে তাদের একটি পরিচিতি তৈরি হয়, ফলে কাজের বাড়তি সুবিধা পায়;

১৯৫০ সালে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা শুরু হয়, ফলে উদ্বাস্তু আগমনের হার বাড়তে থাকে। সেজন্য সরকারকে পুনর্বাসন বিষয়ে নতুন করে ভাবতে হয়, শুরু হয় জমির সন্ধান। পরবর্তী সময়ে আন্দামান ও দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা সেই ভাবনারই ফসল।

তথ্যসূত্র

১. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *উদ্বাস্তু*, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা ১৯৭০, পৃ. ৬৮

২. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৭৯

৩. অমৃতবাজার পত্রিকা, ৮ অক্টোবর, ১৯৪৮

৪. Praffulla K Chakrabnarty, *The Marginal Men*, Naya Udyog, Naya Udyog edition, Kolkata, 1999, p. 11.

৫. অনিল সিংহ, 'পশ্চিমবঙ্গের শরণার্থী সমস্যা', উত্তম দত্ত (সম্পা.) *ঈশান দেশভাগের ৫০ বছর*, ১৯৯৮, পৃ. ৩৫।

৬. উত্তম দত্ত, 'দেশ বিভাগ : স্বপ্নপূরণ ও স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস', সঞ্জয় সাহা (সম্পা.), *তিতির*, ২০০৮, পৃ. ৫২

৭. উত্তম দত্ত, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৫১-৫২

৮. অনিল সিংহ, *পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু উপনিবেশ*, বুক ক্লাব, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ২০

৯. অনিল সিংহ, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৯

১০. বিশ শতকের গোড়ার দিকে ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়র পিটার এন. নিসেন এই ধরনের ঘর নির্মাণ করেন। তার নামেই এইরকম ঘরের নামকরণ করা হয় নিসেনহাট

১১. মহীতোষ বিশ্বাস, *পরতাল*, একবিংশ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা ২০১১, পৃ. ২০

১২. অনিল সিংহ, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২১

১৩. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১২

১৪. সমর পাল, *আমার জীবন আমার ভাবনা*, সোহম, প্রথম প্রকাশ, বারাসাত, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৪৪

১৫. প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, *প্রান্তিক মানব*, প্রতিক্ষণ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা ১৯৯৭, পৃ. ৩১

১৬. ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, *কলোনির স্মৃতি : উদ্বাস্তু প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা*, ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৬৫

১৭. সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের রিপোর্ট, ২য় রাজ্য সম্মেলন, এপ্রিল, ১৯৫১, পৃ. ১৪

১৮. অনিল সিংহ, *পশ্চিমবাংলার জবরদখল উদ্বাস্তু উপনিবেশ*, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৪০

১৯. অভিজিৎ সেন, 'বাস্তুহারা', মোহন ঘোষ (সম্পা.), *কথাকলি*, শারদ সংখ্যা, ১৪১৬ ব., পৃ. ৭০

২০. মন্মথ হালদার, 'সেইসব দিনগুলি', প্রদীপ দাশ (সম্পা.) *পথ*- বইমেলা সংখ্যা, ২০০৫, পৃ. ১১৮

২১. অনিল সিংহ, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৪

২২. সমর পাল, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৪৮

২৩. উৎপল বিশ্বাস, *নিম্নবর্গের দেশত্যাগ*, পুঁথি, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৩২

২৪. গোপাল দেবনাথ, *আশরাফাবাদ কলোনি: জীবনের নানা কথা*, প্রথম প্রকাশ, ২০০৮, পৃ. ৮৪

২৫. সমর পাল, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৪৬

২৬. অনিল সিংহ, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৩

২৭. অনিল সিংহ, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৫

২৮. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৪৬-৪৭

২৯. কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর, *উজানতলীর উপকথা*, চতুর্থ দুনিয়া, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৮৩

৩০. মন্মথ হালদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১২০

৩১. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৫০-৫১

১.২ ১৯৪৬-১৯৭০ আগমনপর্বে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে উদ্বাস্তু জীবনের প্রভাব

ছেচল্লিশ উত্তর সময় থেকে পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে পর্যায়ক্রমে। প্রাথমিকভাবে তাদের প্রয়োজন ছিল খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের। জীবনযাপনের এই ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে তারা নানা সময়ে লড়াই আন্দোলনে লিপ্ত হয়েছে; অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতেই তারা সংঘবদ্ধ প্রতিবাদে নেমেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের নানা স্থানে দাঙ্গা ও অত্যাচারের ফলে হিন্দুদের ঢল নেমেছে। ইতিপূর্বে আমাদের গবেষণাপত্রে তাদের আগমনকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করে দেশত্যাগের কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। তারা এদেশে আসার ফলে সমাজ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি প্রভাবিত হয়েছে। এই প্রভাবকে চিহ্নিত করতে সময়ের নিরিখে (১৯৪৬-১৯৭০) বিষয়টিকে আমরা তিনটি কালপর্বে ভাগ করতে পারি—

i) ১৯৪৬-১৯৪৯ পর্ব;

ii) ১৯৫০-১৯৫৯ ,, ;

iii) ১৯৬০-১৯৭০ ,, ;

১৯৫১ থেকে ৭১ পর্যন্ত জনগণনার ভিত্তিতে আমরা বাস্তুহারা মানুষের জনবিন্যাসের খানিকটা আন্দাজ করতে পারি—

পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যায় উদ্বাস্তু সংখ্যার শতকরা ভিত্তিক হার[১]

বছর	মোট জনসংখ্যা	পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তু	মোট জনসংখ্যার তুলনায় উদ্বাস্তু শতাংশ
১৯৫১	২৬২৯৯৯৮০	২১০৪২০৪১	৮
১৯৬১	৩৪৯২৬২৭৯	৩০৬৮৭৫০	৮.৭৮
১৯৭১	৪৪৩১২০১১	৪২৯৩০০০	৯.৮৬

সারণি অনুযায়ী উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ধাপে ধাপে বেড়েছে। কলকাতা সহ মোট আটটি জেলাতে উদ্বাস্তুর সংখ্যা অন্য জেলার তুলনায় অনেক বেশি। এর মধ্যে সীমান্ত লাগোয়া জেলার সংখ্যা ছয়। বিভিন্ন ধাপে আসা উদ্বাস্তুদের দেশত্যাগের কারণ যেমন ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি পশ্চিমবঙ্গে আসার পরেও তাদের জীবনযাপনের প্রকৃতি ছিল ভিন্ন ভিন্ন স্তরের। দেশভাগের অব্যবহিত আগে কিংবা পরে যাদের আগমন, তাদের সঙ্গে ষাটের দশকে আগতদের সামাজিক চিন্তাধারা, রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং সক্রিয়তার ব্যাপক পার্থক্য লক্ষিত হয়।

প্রথম পর্যায়ে আসা উদ্বাস্তুদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল শহর ঘেঁষা বসবাসের ঝোঁক। এরফলে বিভিন্ন জেলায় বহু নতুন টাউন গড়ে উঠল। কলকাতা মহানগরেরও চরিত্র বদল হলো। উত্তরে দমদম থেকে দক্ষিণে যাদবপুর, টালিগঞ্জ, বেহালা, সোনারপুর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ আধা গ্রামীণ অঞ্চল রাতারাতি শহরতলিতে পরিণত হলো। ১৯৬১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় উদ্বাস্তুদের সংখ্যা[২]—

	মোট জনসংখ্যা	**গ্রামীণ**	**শহুরে**
পশ্চিমবঙ্গ	৩০৬৮৭৫০	১৫০৭২২০	১৫৬১৫৩০
২৪ পরগণা	৭৮৬৬৬১	২৯৭১৪৬	৪৮৯৬৯৭
কলকাতা	৫২২৮২০৫	—	৫২২৮২০৫
নদিয়া	৫০২৬৪৬	৩৮১০০৯	১২১৬৩৮
কোচবিহার	২৫২৭৫৩	২২৭৬২৮	২৫১২৫
জলপাইগুড়ি	২১৮৩৪১	১৭১৬১৭	৪৬৭২৪
পশ্চিম দিনাজপুর	১৭২২৩৭	১২৫১৫৫	৪৭০৮২
বর্ধমান	১৪৪৭০৮	৮১৮৪২	৬২৮৬৩
হুগলি	১৩০৯৫১	৩৮৬৬৩	৯২২৮৮

(১৯৫১ থেকে ৭১ পর্যন্ত) নিচের সারণিতে দেখানো হয়েছে নাগরিক উদ্বাস্তু কোন ধাপে কেমন বেড়েছে[৩]

বছর	**পশ্চিমবঙ্গের মোট শহরের জনসংখ্যা**	**উদ্বাস্তু জনসংখ্যা**	**পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার তুলনায় শহরের উদ্বাস্তু জনসংখ্যার শতকরা হার**
১৯৫১	৬২৮১৬৪২	১০৫২১২১	১৬.৭৪
১৯৬১	৮৫৪০৮৪২	১৫৬১৫৩০	১৮.২৮
১৯৭১	১০৯৬৭০৩৩	২৭২৪৯৩৬	২৪.৮৪

১৯৪৬—৪৯ পর্ব : উদ্বাস্তু বসবাসের ফলে ব্যাপকতর নগরস্ফীতিতে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি দারুণ প্রভাবিত হয়েছে। প্রথম পর্বে আগত উদ্বাস্তুরা কেন্দ্র ও রাজ্যের কংগ্রেস সরকারের প্রতি সমর্থন

জানিয়েছে প্রায় একতরফাভাবে।[৪] কারণ—

i) কেন্দ্র রাজ্যে কংগ্রেস সরকার অধিষ্ঠিত ছিল। সুতরাং উদ্বাস্তুরা তাদের সঙ্গে সু-সম্পর্ক বজায় রাখতে চেয়েছিল;

ii) কংগ্রেস নেতারা দেশবিভাগের আগেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল— পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের যথাযোগ্য মর্যাদা ও পুনর্বাসন দেওয়া হবে। এই পরিস্থিতিতে সর্বস্বান্ত উদ্বাস্তুদের মনে এই ভয় দেখা দিয়েছিল কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্যের অভাব দেখা দিলে কংগ্রেস মুখ ফিরিয়ে নেবে। তাই অধিকাংশ মধ্যবিত্ত হিন্দু এদেশে এসে কট্টর কংগ্রেস সমর্থক হয়ে ওঠে;[৫]

iii) ত্রাণ ও পুনর্বাসনের সঙ্গে যুক্ত অধিকাংশই ছিল কংগ্রেস কর্মী। তাই তাদের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় ছিল না;

iv) পূর্ববঙ্গ থেকে দেশত্যাগী উদ্বাস্তুদের নেতৃত্বে যারা ছিল তারা মূলত স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিল। দেশভাগের পরে তারাই পশ্চিমবঙ্গে এসে উদ্বাস্তুদের নেতৃত্ব দেয় এবং কংগ্রেসের সঙ্গে পূর্ব যোগসূত্র বজায় রাখে।[৬]

মধ্যবিত্ত হিন্দুশ্রেণি এদেশে উদ্বাস্তু হয়ে চলে আসে স্বাধীনতার কেবলই আগে পরে। এই সময় থেকে তাদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির যোগসূত্র ছিল না, শুধু তাই নয়, তারা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিল। পূর্ব-পাকিস্তানে থাকাকালীন তারা ছিল সুভাষপন্থী। তাদের আনুগত্য ছিল প্রধানত সুভাষপন্থী বিপ্লবী সংগঠনের প্রতি। সাধারণভাবে তারা কংগ্রেস বিরোধী ছিল। কিন্তু উদ্বাস্তু হয়ে আসার পরে তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটল।[৭]

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ নিরাপত্তা বিল পেশ করেন। সি.পি.আই এবং অন্যান্য বামপন্থী দল এই বিলের বিরোধিতা করে একে কালা বিল আখ্যা দেয়। এই সময়ে উদ্বাস্তুরা ফরোয়ার্ড ব্লক নেত্রী লীলা রায়ের বাড়ি আক্রমণ করে। কমিউনিস্ট পার্টি উদ্বাস্তুদের সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল মনে করত। উদ্বাস্তুদের প্রতি কমিউনিস্টদের একদিকে যেমন ছিল অবজ্ঞা, অন্যদিকে তাদের শঙ্কাও ছিল— উদ্বাস্তুরা যদি কংগ্রেস বা অন্য কোনও সাম্প্রদায়িক দক্ষিণপন্থী দলের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে তারাই শ্রমিক ধর্মঘট ভাঙার প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।

প্রথমদিকে উদ্বাস্তুদের মধ্যেকার বিরাট সংখ্যক শ্রমিক কারখানার কাজে যোগ দেয়। এই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে উদ্বাস্তুদের অবজ্ঞা করা সম্ভব ছিল না। পক্ষান্তরে উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট

নীতি গ্রহণ করাও সহজ ছিল না। উদ্বাস্তুরা মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয়ে এদেশে এসেছে। ফলে তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রভাব থাকা স্বাভাবিক, সেজন্য তাদের পার্টির মধ্যে আনা চলবে না। আবার অবহেলার ফলে বিশাল এই জনসমষ্টি দক্ষিণপন্থীদের শিবিরে চলে গেলে পার্টি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে পার্টি তিনটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে—

i) উদ্বাস্তুদের বাম ও দক্ষিণ শিবিরের মাঝামাঝি জায়গায় রেখে দিতে পারলে ভালো;

ii) উদ্বাস্তুদের মন থেকে সাম্প্রদায়িকতা দূর করতে হবে;

iii) পার্টির ভিতরে উদ্বাস্তুদের স্থান না দিয়ে উদ্বাস্তুদের কমিউনিস্ট বিমুখতা দূর করতে হবে।[৮] ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি যোশীলাইন ত্যাগ করে রণদিভে লাইন গ্রহণ করে এবং উদ্বাস্তুদের মধ্যে গণসংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বিজয় মজুমদারের নেতৃত্বে গঠিত হয় উদ্বাস্তু সেল। পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু আন্দোলন সরকার বিরোধী বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।[৯]

বিজয় মজুমদারই কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সদস্য যাকে উদ্বাস্তুদের মধ্যে কাজ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তার নেতৃত্বে উদ্বাস্তু কলোনিগুলিতে কাজ শুরু হয়। আত্মপরিচয় গোপন রেখে উদ্বাস্তুদের মধ্যে কমিউনিস্টদের কাজ করতে হতো। উদ্বাস্তুদের মৌলিক ও দৈনন্দিন চাহিদার কথা মাথায় রেখে শুরু হয় লড়াই-আন্দোলন। উদ্বাস্তুদের কমিউনিস্ট বিরোধিতা ক্রমে সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণায় রূপান্তরিত হয়।

উদ্বাস্তুরা ক্যাম্প-কলোনিতে বসবাস শুরু করার পর নিজেদের প্রয়োজনে কলোনি প্রতিরোধ কমিটি তৈরি করে। সরকারি ডোল বা সাহায্যের অনিয়মের বিরুদ্ধে নানা ক্যাম্পে আন্দোলন শুরু হয়। জবরদখল কলোনিগুলিতে জমিদারের গুণ্ডাবাহিনী কিংবা পুলিশি অত্যাচারের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্যে কলোনির মধ্যে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে উদ্বাস্তুরা জবরদখল কলোনির সরকারি স্বীকৃতি আদায় করার জন্য সরকারের প্রতি চাপ তৈরি করে। ১৯৪৮-এর সেপ্টেম্বরে কংগ্রেস নেতা অমৃতলাল চ্যাটার্জির নেতৃত্বে নৈহাটিতে সারাবাংলা উদ্বাস্তু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে নিখিলবঙ্গ বাস্তুহারা কর্মপরিষদ গঠিত হয়। উদ্বাস্তুদের দাবি আদায়সহ সার্বিক কল্যাণমূলক কাজ করাই এই পরিষদের উদ্দেশ্য। এই সংগঠনের অধিকাংশ সদস্য ছিল কংগ্রেস নেতৃত্ব। পাশাপাশি হিন্দু মহাসভা ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কর্মীরা যুক্ত হয়েছিলেন। নেতাদের রাজনৈতিক পরিচয় থাকলেও তারা চাইত না বাস্তুহারা কর্মপরিষদ কখনও রাজনৈতিক দলের হাতিয়ার হয়ে উঠুক।[১০]

১৯৪৯-য়ের ১৪ জানুয়ারি উদ্বাস্তুদের প্রতি সরকারের বঞ্চনার প্রতিবাদে শিয়ালদহ স্টেশনে ১৫০০০ উদ্বাস্তু সমবেত হয়। ওই দিনই ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর মিটিং ছিল। সেই সুবাদে জারি করা হয়েছিল ১৪৪ ধারা। উদ্বাস্তুরা নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হয়ে স্লোগান দিতে থাকলে পুলিশ গুলি চালায়। এই ঘটনায় দুজন আহত হয়, ১৫জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তারই প্রতিবাদে বাস্তুহারা কর্মপরিষদ এবং কমিউনিস্টরা ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেয়। আন্দোলনকারীরা ৯টি ট্রাম পুড়িয়ে দেয়। পুলিশের গুলিতে চারজনের মৃত্যু হয়। আহত হয় ১৫জন। এই দু'দিনের পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বিশাল এক উদ্বাস্তু সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কমপক্ষে ৪০,০০০ উদ্বাস্তু এই সমাবেশে অংশগ্রহণ করে। সভাপতি হন শরৎচন্দ্র বোস। এই আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো কমিউনিস্ট ও উদ্বাস্তুদের অনেক কাছাকাছি এনে দেয়।[১১]

উদ্বাস্তু আগমনের প্রথম ধাপে উদ্বাস্তুরা ছিল অনেকটা অসংগঠিত। মূলত উদ্যোগী কিছু মানুষ যারা সরকারি অথবা ব্যক্তিগত সম্পত্তি দখল করে কলোনি গড়ে তুলেছিল; তারা নিজেদের এই দখলীকৃত বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ না হবার জন্য জমিদারের লেঠেল কিংবা পুলিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তোলে। তাদের এই সংঘবদ্ধতা রাজনৈতিক সংগঠনগুলি কাজে লাগাতে চেষ্টা করে। ক্যাম্প -কলোনির কর্মহীন তরুণ প্রজন্মকে রাজনৈতিক নেতারা ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করতে শুরু করে। পঞ্চাশ পূর্ববর্তী পর্বের উদ্বাস্তুরা ক্রমে সংঘবদ্ধ হতে শুরু করে। অনেকগুলি উদ্বাস্তু সংগঠন মিলে তৈরি হয় ইউ.সি.আর.সি. এই সংগঠনই প্রথম উদ্বাস্তুদের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের পথ দেখায়। পরবর্তী সময়ে তারা এই পথেই দাবি আদায়ে সক্ষম হয়।

১৯৫০ থেকে '৫৯ পর্ব : পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫০ ও ৬০-য়ের দশকে সংগঠিত উদ্বাস্তু আন্দোলনের বিকাশ দেখা গিয়েছিল। সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে উদ্বাস্তু আন্দোলন গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু প্রথম থেকে কোনও রাজনৈতিক আদর্শের প্রভাবে উদ্বাস্তু আন্দোলন সম্ভব হয়েছিল, তা নয়। কলোনি কমিটির মাধ্যমে যে সংগঠিত কাঠামোর জন্ম হয়েছিল তা একটি অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া। পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থী আগমন ও পুনর্বাসনের শ্রেণিকরণের দরুণ Civil Society বা নাগরিক সমাজের উন্মেষ হয়েছিল। আর এই নাগরিক সমাজের উদ্ভবই উদ্বাস্তু সচেতনতা ও সংঘবদ্ধ উদ্বাস্তু আন্দোলন গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। উদ্বাস্তু সমস্যার রাজনীতিকরণ এই আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। এরফলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল। তবে ঐক্য গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুদের সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনই যথেষ্ট

ছিল না, কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।[১২]

সরকারের পুনর্বাসন নীতি, শরণার্থীদের আগমনের ও বসবাসের অভিজ্ঞতা ও তাদের অতীত ঐতিহ্য পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। সময়ের সঙ্গে উদ্বাস্তুদের ধ্যান-ধারণা বদলেছে। ক্রমে তারা কংগ্রেসের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, সেই জায়গা দখল করে নিচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি। এই সময় থেকেই ইউ.সি.আর.সির পরিচালক হিসেবে কমিউনিস্টদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ১৯৫০ নাগাদ উদ্বাস্তুদের পায়ের তলার মাটি অনেক শক্ত হয়েছে। একদিকে ইউ.সি.আর.সি.র নেতাদের প্রচারাভিযান ও সক্রিয় সহযোগিতা, অন্যদিকে সরকারের উদ্বাস্তু বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি ছিন্নমূল মানুষদের মধ্যে সংগ্রামের মানসিকতা তৈরি করেছিল। ১৯৫০ সালে পূর্ববঙ্গের নানা অঞ্চলে দাঙ্গা হয়। ফলে বিরাট সংখ্যক মানুষ বাস্তুহারা হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আসে। ততদিনে উদ্বাস্তুদের উপর থেকে সরকারের সহানুভূতি অনেকটা কমে এসেছে। সরকার তাদের কেবলমাত্র সাময়িক আশ্রয় দানের কথা ভাবছে— পুনর্বাসনের দায়িত্ব নিতে অপারগ বলে ঘোষণা করেছে। এই সময়ে নতুন করে ফাঁকা জমি দখল করে উদ্বাস্তুরা বসতি গড়ার কাজে লিপ্ত হয়েছে। ইতিপূর্বে যেসব জবরদখল কলোনি তৈরি হয়েছে তাদের সংঘবদ্ধতা দেখে নতুন উদ্বাস্তু কলোনির বাসিন্দারা উৎসাহ পায়। তারা শুরু থেকেই ইউ.সি.আর.সি.র সঙ্গে যুক্ত হয়। এতদিন পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের উদ্বাস্তুদের প্রতি যে সহানুভূতি ছিল তা অনেকাংশে কমে অবজ্ঞা ও বিতৃষ্ণা জন্মাতে শুরু করেছে। জমি দখলের কারণে বড়ো বড়ো জমিদার ও জমির মালিকেরা ক্রোধে ফেটে পড়ছিল। ইউ.সি.আর.সি প্রথম থেকেই বলে আসছিল উদ্বাস্তুরা অন্যত্র জমি পেলে দখলকৃত জমি ছেড়ে দেবে। এর সঙ্গে সঙ্গে তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবি ছিল জমিদারি প্রথার বিলোপ। জমিদারি প্রথা বিলোপের দাবি শুধু উদ্বাস্তুদের দাবি নয়, পশ্চিমবঙ্গের সব ভূমিহীন মানুষের দাবি। এছাড়া এই দাবি সি.পি.আই ও অন্যান্য বামপন্থী দলের। ক্রমে এই দাবির সঙ্গে এমন আরও অনেক দাবিকে যুক্ত করা হলো যা পশ্চিমবঙ্গের নিম্নবিত্ত কৃষক ও শ্রমিকের দাবি। ক্রমে শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে উদ্বাস্তুদের আন্দোলনের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের দরিদ্র মানুষের আন্দোলন একাকার হয়ে যায়। এই সময়ে উদ্বাস্তুদের দুটি স্লোগান ছিল—

i) সব উদ্বাস্তু এক হও;

ii) পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সঙ্গে ঐক্য গড়ে তোলো।

এরফলে ঘটি-বাঙালের সম্পর্কের তিক্ততা কমে আসবে, উদ্বাস্তুরা তাদের দাবিদাওয়া আদায়ে সক্ষম হবে।

৫০-য়ের দশকের শুরু থেকে উদ্বাস্তুরা নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করে। এর মূল উপাদান—নাগরিকত্ব অর্জন। ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে উদ্বাস্তুদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। উদ্বাস্তুরা যেভাবে সংগঠিত এবং ঘনীভূত তাতে নির্বাচনের ফলাফলে তার প্রভাব ছিল অবশ্যম্ভাবী। এক্ষেত্রে ইউ.সি.আর.সির ভূমিকা অগ্রণী। উদ্বাস্তু নেতারা জানতেন '৫২-র নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচনী যুদ্ধে যোগ দিয়ে কংগ্রেসকে পরাজিত করা যাবে না; কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা নির্বাচনী লড়াইয়ে যোগ দেওয়া আবশ্যিক বলে মনে করেছিল। কারণ তাদের মনে হয়েছিল একমাত্র নির্বাচনী লড়াইয়ের মাধ্যমে উদ্বাস্তুরা কলোনির খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারবে এবং পশ্চিমবঙ্গের অখণ্ড সমাজের অন্তর্গত হতে পারবে। এর ফলে সরকারের পক্ষে আর তাদের উপেক্ষা করা সম্ভব হবে না।[১৩]

এই সময়ে কলোনির প্রায় সকলেই নির্বাচনের কাজে লেগেছিল। তাদের সঙ্গে ছিল ইউ.সি.আর.সি'র নেতারা। উদ্বাস্তু কিশোর কিশোরীরা বামপন্থীদের সমর্থনে কৌটো নেড়ে পয়সা আদায় করতো। কাগজে, দেওয়ালে পোস্টার লেখা, ছবি আঁকা সব বিনি পয়সায় করতো। উদ্বাস্তুদের অবিভাজ্য অখণ্ড ইচ্ছাশক্তি '৫২-র নির্বাচনকে একটি নতুন মাত্রা দিয়েছিল। তখন থেকে পশ্চিমবঙ্গের নিম্নবিত্তদের একটি অংশ উদ্বাস্তুদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছিল। '৫২-র সাধারণ নির্বাচনের সময় থেকে উদ্বাস্তুদের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল যে, তারা এদেশেরই লোক। বামফ্রন্টের প্রার্থীদের জন্য যে উদ্বাস্তুরা কাজ করছিল তাদের সঙ্গে বাম রাজনৈতিক দলের এদেশীয় শিক্ষিত কর্মীদের আলাদা করা যাচ্ছিল না। কলোনির খোলস ছেড়ে তারা উন্মুক্ত জীবনে বেরিয়ে এলো।

উচ্ছেদ আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও ১৯৫২-র নির্বাচনে অংশগ্রহণ, বৈপ্লবিক কর্মসূচি তাদের জীবনের রূপান্তর ঘটায়। '৫১-র মে থেকে ৫২-র ফেব্রুয়ারির মধ্যে কলোনি, ব্যারাক, বস্তির উদ্বাস্তুরা বামপন্থার দিকে লক্ষণীয় মোড় নিয়েছিল। প্রথম পর্যায়ে আসা ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর কংগ্রেসের প্রতি যে সমর্থন ছিল এই সময় থেকে তা উল্টো খাতে বইতে শুরু করে। তার প্রমাণ হিসাবে বলা যায়—যেখানেই উদ্বাস্তুরা যথেষ্ট সংখ্যায় কেন্দ্রীভূত ছিল সেখানেই বামপ্রার্থীরা সাফল্যলাভ করেছিল। নির্বাচনে উদ্বাস্তু স্বেচ্ছাসেবকেরা পার্টি সদস্যদের থেকেও বেশি সক্রিয় ছিল। এই সময়ে তাদের পার্টির সদস্য পদ দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়।[১৪]

৫২-র সাধারণ নির্বাচনের পর বামদলগুলির সঙ্গে সঙ্গে উদ্বাস্তুরাও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। ১৯৫৩-তে ট্রামওয়ে কোম্পানির দ্বিতীয় শ্রেণির ট্রামের এক পয়সা ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ

আন্দোলন শুরু হয়। নতুন শতাব্দীতে এক পয়সার কোন মূল্য নেই, এক পয়সার মুদ্রাও অস্তিত্বহীন। কিন্তু সেদিন এক পয়সার মূল্য ছিল অনেক। সেই মূল্য রক্ষার জন্য সামিল হয়েছিল জনসাধারণ। ট্রাম পুড়ল, শ্রমিক ধর্মঘট হলো, পুলিশ লাঠি চালাল; চালাল গুলি। কোম্পানি ট্রাম চালানো বন্ধ করল। জয় হলো আন্দোলনকারীদের। জনসাধারণের মন থেকে কংগ্রেস আরও একধাপ সরে গেল। বামপন্থীরা সেই জায়গা দখল করল।[১৫] আসলে বামদলগুলি তাদের শক্তির পরীক্ষা দেবার জন্যে আন্দোলনের পথ খুঁজছিল। ট্রামভাড়া বৃদ্ধি না হলেও অন্য কোনও বিষয় নিয়ে এই বিস্ফোরণ ঘটতই। এই আন্দোলনে উদ্বাস্তু সমাজ সক্রিয় সহযোগিতা করেছিল।[১৬]

পঞ্চাশের দশকে খাদ্য ঘাটতি সমস্যা পশ্চিমবঙ্গের সকল শ্রেণির মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে। একদিকে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদনে ব্যর্থ অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় খাদ্যের জোগান দিচ্ছে না; এই সঙ্গে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর চাপ— এই পরিস্থিতিতে ৫২'-র গ্রীষ্মকালে বামপন্থীরা খাদ্য আন্দোলন শুরু করে। ৫২-র পর থেকে তা বার্ষিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। যদিও তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ঘটনাগুলিকে নিছক বিরোধীদের ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা বলে মনে করেন। কিন্তু বিরোধীদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে শেষ পর্যন্ত রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে খাদ্যের দাবি জানাতে বাধ্য হয়। ১৯৫২ থেকে ৫৭ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে উদ্বাস্তুরা এই আন্দোলনে শরিক হয়।

পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে যেসব উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গে আসে তাদের খাদ্যসংকট ছিল অধিকতর। ফলে বাঁচার তাগিদে মরিয়া হয়ে তারা এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। নানা ঘটনার প্রেক্ষিতে ষাটের দশক জুড়ে পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনে লড়াই আন্দোলন লেগেই ছিল। পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল মানুষসহ সাধারণ মানুষের কাছে কংগ্রেসের গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পাচ্ছিল, পক্ষান্তরে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব বাড়ছিল। তার প্রমাণ পাই ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলে।এই নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় বামপন্থীদের আসনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৫৭ থেকে ৮০তে। এই সাফল্যের অন্যতম দাবিদার উদ্বাস্তুরা[১৭]

১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বরের শেষদিকে কেন্দ্রীয় সরকার পর্যাপ্ত পরিমানে খাদ্য সরবরাহ করে। ফলে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস পায়। কিন্তু খাদ্য ঘাটতির সমস্যা থেকেই যায়। তার প্রধান কারণ অধিক হারে জনসংখ্যার প্রসার। ১৯৫১ থেকে ৬১-র মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৩২.২ শতাংশ, কিন্তু সারা ভারতবর্ষে এই বৃদ্ধির হার ছিল ২১.৬ শতাংশ। মূলত পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু

আগমন জনসংখ্যা বৃদ্ধির মূল কারণ; যা খাদ্যসংকট তীব্র করে তুলেছিল।[১৮]

১৯৬০ থেকে ৭০ পর্ব : ষাটের দশকে উদ্বাস্তু আন্দোলন পুরোপুরিভাবে বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে মিশে যায়। পূর্ববঙ্গের হতাশাগ্রস্ত উদ্বাস্তুদের প্রতি কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার কোনও প্রকার সহানুভূতি দেখায়নি বরং তাদের অস্তিত্বকে বারবার অস্বীকার করার চেষ্টা করেছে। এই অবস্থায় তাদের পাশে এসে দাঁড়ায় বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি। এই পর্যায়ে আসা উদ্বাস্তুরা মূলত নিম্নবর্গের মানুষ। তারা অর্থনৈতিক এবং বর্ণগতভাবে রিক্ত। পূর্ববঙ্গে তারা ছিল প্রান্তিক চাষি, ভাগচাষি কিংবা জনমজুর। জমিই তাদের বেঁচে থাকার মূল অবলম্বন। এতো দিন সেই জমি আঁকড়ে তারা পূর্ববঙ্গে ছিল। কিন্তু পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক চাপে জমির মায়া ত্যাগ করে তারা চলে আসতে বাধ্য হয়। ততদিনে সরকারি পুনর্বাসন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং বিভিন্ন পর্যায়ে আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে এই পর্যায়ে আগতরা অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে বেশি সংকটে পড়ে। তাদের সংকটের কারণ নিম্নরূপ[১৯] :

i) এই পর্যায়ে আগতদের পূর্ববঙ্গে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ছিল না। দেশত্যাগের পরে তাদের সংগঠনহীনতা আরও বাড়ে;

ii) জমিই ছিল তাদের জীবন-জীবিকার মূল অবলম্বন; সেই জমি হারিয়ে তারা নিঃস্ব হয়ে যায়;

iii) পশ্চিমবঙ্গে এসে তারা সরকারিভাবে সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়;

iv) পশ্চিমবঙ্গে তখন প্রচণ্ড খাদ্যসংকট চলছিল;

v) নানান ঘটনার প্রেক্ষিতে লড়াই আন্দোলনের ফলে অস্থির রাজনৈতিক বাতাবরণ ছিল পশ্চিমবঙ্গে।

এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তুরা বাম আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়। ইতিমধ্যে শহর ও শহরতলির ফাঁকা জমি দখল হয়ে গিয়েছে। তাই তারা কলকাতা শহর থেকে দূরে জবরদখল কলোনি গড়ল। এই কলোনিগুলি মূলত কৃষি কলোনি। কৃষি কলোনি গড়ে ওঠার কারণগুলি হলো—

i) পূর্ববঙ্গে বংশ পরম্পরায় তারা ছিল কৃষক। কৃষিকাজে তারা ছিল দক্ষ। কৃষি কলোনি গড়ে তুলতে পারলে বেঁচে থাকতে অসুবিধা হবে না— তাদের এই ধারণা হয়েছিল;

ii) শহরের কাছাকাছি জমি ছিল না যেখানে তারা বসতি গড়তে পারে;

iii) গ্রামীণ জীবনযাত্রার মান নিম্ন, তাই যেখানে ফসল ফলাতে পারলে বেঁচে থাকা সহজ হবে;[২০]

পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে মিশে যাবার ফলে বাম আন্দোলন প্রবলভাবে গ্রাম কেন্দ্রিক হয়ে উঠল। ষাটের দশকের শুরু থেকে বামপন্থী সংগঠনগুলি গ্রামীণ সংস্কারের উপর জোর দেয়। তাদের লক্ষ ছিল—

i) কৃষকদের উপর থেকে জমিদারের অত্যাচার বন্ধ করা;

ii) গণতান্ত্রিক উপায়ে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালনা করা;

iii) বেশি জমির মালিকদের ক্ষমতার বিলুপ্তি;

iv) ভূমিহীনদের মধ্যে জমি বিতরণ করা;

v) কৃষি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ;

vi) অপারেশন বর্গার মাধ্যমে চাষিদের নাম নিবন্ধীকরণ;

vii) গ্রামে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন।[২১]

বামপন্থীদের আন্দোলনের ফলে গ্রামীণ ভূমি ব্যবস্থায় যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে তার সঙ্গে জবরদখল কলোনি গড়ে তোলার পদ্ধতিগত মিল লক্ষ করা যায়।[২২]

ষাটের দশকে কমিউনিস্টদের শক্তির মূল উৎস ছিল রাজ্যের বিরাট সংখ্যক উদ্বাস্তু, যারা বাম আন্দোলনে নতুন মাত্রা এনে দেয়। অন্যদিকে কংগ্রেসি নেতৃবৃন্দ এদের অবজ্ঞা করতো। এদেশীয় কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের ধারণা ছিল যে এই বাঙাল উদ্বাস্তুরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবে এবং তাদের সন্তান সন্ততিদের জীবনে সংকট নিয়ে আসবে। তাদের মানসিকতা প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের ধারাতেই প্রবাহিত ছিল। বাস্তব অবস্থার মোকাবিলায় তারা তাদের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসেনি। অথচ বিপুল এই মানবসম্পদকে ব্যবহার করে গঠনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা যেত, যা সরকার অথবা জনসাধারণ কোনও পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

৫৮-র পরে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। সরকারের ধারণা ছিল পুনর্বাসন ব্যবস্থা চালু থাকলে পূর্ববঙ্গের শরণার্থীরা দেশত্যাগে উৎসাহিত হবে।[২৩] কিন্তু পূর্ববঙ্গের অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় এবং সংখ্যালঘুর প্রতি সংখ্যাগুরুর অত্যাচারের মাত্রা বাড়তে থাকায় উপরোক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হবার পরেও উদ্বাস্তু আগমন বাড়তে থকে। উদ্বাস্তুরা এসে বেঁচে থাকার তাগিদে নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করতে শুরু করে। রেশনকার্ড, ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য তারা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু করে, এক্ষেত্রে আদর্শের কোনও বালাই ছিল না।

ষাটের দশকের শুরু থেকে উদ্বাস্তু এবং বামপন্থীদের মধ্যে পরস্পর নির্ভরতা এবং একে অন্যকে ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা যায়। প্রফুল্ল চক্রবর্তীর ব্যাখ্যায় পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকশ্রেণি সংখ্যায় বা চরিত্রে যে কোনও দিক থেকেই কমিউনিস্ট আন্দোলনের পক্ষে আশাব্যঞ্জক সহায়ক ছিল না। ফলে কমিউনিস্টদের এখানে (শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবর্তী অংশ হিসেবে নয়) উদ্বাস্তুদের নেতৃত্বের মাধ্যমে ক্ষমতার লড়াইয়ে টিকে থাকতে হয়। উদ্বাস্তুরা ৬০ দশক থেকে খাদ্য আন্দোলন সহ বাম আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বেঁচে থাকতে গিয়ে তারা নানাভাবে ব্যবহৃত হয়, সেইসঙ্গে তারা ব্যবহারকারীর চরিত্রও বদলে ফেলে।[২৪]

এই দশকের উদ্বাস্তুরা ক্যাম্প কলোনিতে ঠাঁই পায়নি, নিজেদের উদ্যোগে জমি দখল করে বসতি স্থাপনই ছিল ভরসা। এই সময়ে একলপ্তে অনেকখানি জমি পাবারও সমস্যা দেখা দিয়েছিল। পুনর্বাসন ব্যবস্থাও সরকারি সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে শিয়ালদহ থেকে কৃষ্ণনগর, শিয়ালদহ থেকে ডায়মণ্ড হারবার, শিয়ালদহ থেকে বনগাঁ; হাওড়া থেকে ব্যাণ্ডেল পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে রেললাইনের দু'পাশে অসংখ্য উদ্বাস্তু বসবাস শুরু করে। খাদ্যবস্ত্রের অভাবে এরাই একসময়ে অপরাধপ্রবণ হয়ে পড়ে। তথাকথিত ভদ্র মানুষ তাদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক রাখে না। রাজ্যের স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও এদের অপরাধ প্রবণতা বন্ধ হয় না। কারণ এদের সামনে সুস্থ জীবনের পথ খোলা ছিল না। অন্যদিকে ষাটের দশকের শেষদিকে রাজনৈতিক নেতারা যখন ভোটারের খোঁজে ব্যস্ত তখন উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতার জায়গা তৈরি হলো। এই বেপরোয়া কিশোরদের দিয়েই দাঙ্গা হাঙ্গামা পরিচালনা করেছে রাজনৈতিক নেতারা। এই উদ্বাস্তু কিশোর যুবকদের প্রতি প্রত্যেক দলের নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রায় একই।[২৫]

১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলনে শ্রমজীবী শ্রেণি নিরপেক্ষ ছিল। কৃষক সমাজও এই আন্দোলন থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল। জমিদার শ্রেণি সরকারের খাদ্যনীতিতে ক্ষুব্ধ ছিল, কিন্তু তারা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেনি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বামপন্থীরা গ্রামে জোতদারদের ফসল কেড়ে নেবার কাজে ভূমিহীনদের নামিয়ে শ্রেণিসংঘাত সৃষ্টি করতে চায়নি। তবুও এই আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। যে সমস্ত অঞ্চলে আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে তার সবকটিই প্রায় উদ্বাস্তু অধ্যুষিত। উঠতি বয়সের উদ্বাস্তু নেতারাই রেললাইন তুলে ফেলবার কাজে নেমেছিল। বন্ধের দিন এরাই সকালবেলা এসে ভাঙচুর করে যথাস্থানে চলে যেত। আন্দোলনে হতাহতের তালিকা থেকে এই তথ্যের সত্যতা ফুটে ওঠে।[২৬] কেবল আন্দোলন নয় নির্বাচন সংগ্রামেও উদ্বাস্তুরা প্রাণপণ লড়েছিল। অনেক

ক্ষেত্রে তাদের জনবলের সাহায্যে বামদলগুলি কংগ্রেসের ধনবলের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে পেরেছিল।

তথ্যসূত্র

১. শিবাজীপ্রতিম বসু, 'ছিন্নমূল রাজনীতির উৎস সন্ধানে', ঘোষ সেমন্তী (সম্পা.), *দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা*, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৭৯

২. শিবাজীপ্রতিম বসু, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৮০

৩. শিবাজীপ্রতিম বসু, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৮১

৪. চক্রবর্তী সুদেষ্ণা, 'উদ্বাস্তুস্রোত ও পশ্চিমবাংলার জনজীবন', হর্ষ দত্ত ও স্বপন বসু (সম্পা.), *বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১৭৭

৫. প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, *প্রান্তিক মানব*, প্রতিক্ষণ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৭৯, পৃ. ৩৪

৬. মন্মথ হালদার, 'সেইসব দিনগুলি', প্রদীপ দাশ সরকার (সম্পা.), *পথ*, বইমেলা সংখ্যা, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭০

৭. প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৩৫

৮. প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৩৫

৯. তারক সরকার, *বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ দেশত্যাগ*, অরুণা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ২৮

১০. প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৩৮

১১. সমর পাল, *আমার জীবন আমার ভাবনা*, সোহম, প্রথম প্রকাশ, বারাসাত, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৫৪

১২. সুতপা দাশগুপ্ত, 'স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবাংলায় উদ্বাস্তু সমস্যা', *ইতিহাস অনুসন্ধান:*১৯, ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৩৬৭

১৩. সমর দাশঠাকুর, *কলোনি জীবন*, মিলনী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ১১৯

১৪. প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৭৩-৭৪

১৫. অরবিন্দ পোদ্দার, 'পশ্চিমবাংলা : রাজনৈতিক বৃত্তে পঞ্চাশ বছর', স্বপন বসু ও হর্ষ দত্ত (সম্পা.), পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৮১-১৮২

১৬. প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৭৪

১৭. প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৫৩

১৮. প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৬২-১৬৩

১৯. সমর দাশঠাকুর, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৯৮

২০. অভিজিৎ সেন, 'বাস্তুহারা', মোহন ঘোষ (সম্পা.) *কথাকলি*, শারদ সংখ্যা, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭০

২১. সমর পাল, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৮৮

২২. প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৮২

২৩. অনিল সিংহ, 'পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থী সমস্যা', উত্তম দত্ত (সম্পা.), *ঈশান : বাংলাভাগের পঞ্চাশ বছর*, ১৯৯৮, পৃ. ৪০

২৪. শিবাজীপ্রতিম বসু, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৮৫

২৫. প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৭৫

২৬. প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৭৮

১.৩ ১৯৪৬-১৯৭০ কালপর্বে আগত উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক অবস্থান

পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তুরা এসেছে নানা সময়ে। অর্থনৈতিকভাবে তারা নানা শ্রেণি চরিত্রের। প্রথম দিককার উদ্বাস্তুদের সঙ্গে শেষদিকে আসা উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক ব্যবধান বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। স্বাধীনতার কেবলই আগে কিংবা পরে যারা দেশ ছেড়েছিল তারা ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন ছিল। সুতরাং তাদের দেশছাড়া ছিল অনেকটাই পরিকল্পিত। এদের একটি অংশ ছিল নায়েব ও জমিদার শ্রেণির। তারা ছিল জমির মালিক; কিন্তু চাষের সঙ্গে সরাসরি যোগ ছিল না। তাদের দীর্ঘকালের সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক অবস্থা এদেশে আসার পরেও অনেকটা রক্ষিত হয়েছে। আর একশ্রেণির লোক যাদের কলকাতা মহানগরীর সঙ্গে স্বাধীনতার আগের থেকেই যোগসূত্র ছিল। অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা বরাবরই সমৃদ্ধ। ফলে দেশত্যাগের পরেও তাদের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়েনি। কিন্তু সমস্যায় পড়েছে অপেক্ষাকৃত পরে আসা কৃষিনির্ভর পরিবারগুলি। জমিই যাদের একমাত্র অবলম্বন, রাষ্ট্রনৈতিক চাপে সেই জমি-জায়গা ছেড়ে খালি হাতে এদেশে এসে তারাই পড়ল প্রবল অর্থনৈতিক সংকটে। এদের পেশাগত দক্ষতা ছিল না বললেই চলে।

সময়ের নিরিখে উদ্বাস্তুদের শ্রেণি বিশ্লেষণ করতে আমরা তাদের দুইভাগে ভাগ করতে পারি—

i) ১৯৪৬ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৪৯য়ের ডিসেম্বর;

ii) ১৯৫০ থেকে ১৯৭০।

১৯৪৬-য়ের অক্টোবর থেকে ১৯৪৯-য়ের ডিসেম্বর পর্যন্ত আগত উদ্বাস্তুদের শ্রেণিচরিত্র : প্রথমদিকের উদ্বাস্তুদের বেশিরভাগই উচ্চবিত্ত অথবা মধ্যবিত্ত শ্রেণির। গবেষক নীলাঞ্জনা চ্যাটার্জির হিসেব অনুসারে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত বাস্তুত্যাগীদের শতকরা ৬০জনই ছিল অকৃষিজীবী।[১] এদের ৪টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

i) ভাড়া বা খাজনা গ্রাহক শ্রেণি— জমিদার, তালুকদার, বাড়িভাড়ার উপর নির্ভরশীল মানুষ;

ii) পেশাজীবী শ্রেণি— উকিল, ডাক্তার কবিরাজ সহ-চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, ওভারসীয়র, পুরোহিত, পণ্ডিত, গণক, হস্তরেখাবিদ ইত্যাদি যারা অধিকাংশই ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণের মানুষ;

iii) চাকুরজীবী শ্রেণি— বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সরকারি অফিস, শিল্প-কলকারখানার কর্মী, জমিদারি সেরেস্তার কর্মী, জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটির কর্মী;

iv) ব্যবসায়ী শ্রেণি— ক্ষুদ্রশিল্পের মালিক, কুটির শিল্প অথবা কারখানার মালিক;

এরা সকলেই অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ। ফলে বাড়িভাড়া করে কিংবা জমি-বাড়ি কিনে তারা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিয়েছিল। এই শ্রেণির অধিকাংশই শহরাঞ্চলে বিশেষ করে কলকাতা শহরে পুনর্বাসনের চেষ্টা করেছিল। বিশেষত কলকাতায় ব্যবসা, চাকরি অথবা পেশা অবলম্বনে সুবিধা অনেকবেশি। শেষপর্যন্ত কিছু না হোক কলকাতায় অন্তত ভিক্ষে পাওয়া যায়। এরা অনেক বেশি ভাড়া দিয়েও কলকাতায় বাড়িভাড়া নিতে লাগল। কেউ কেউ কলকাতায় আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে এসে উঠল। শিক্ষাগত যোগ্যতা অথবা আর্থিক সামর্থ্যের জোরে তারা পশ্চিমবঙ্গে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল।[২]

এই পর্যায়ে পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছিল মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণি। ১৯৩৮ সালের প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন, ১৯৩৯ সালে প্রবর্তিত ঋণ সালিশি আইন এবং মহাজনী প্রতাপ ও শোষণ খর্ব করার জন্য আইন; পরবর্তী সময়ে জমিদারি প্রথা বিলোপের ফলে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ একটি শ্রেণি আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।[৩] বংশপরম্পরায় যারা বসে খেতে অভ্যস্ত তারা অর্থনৈতিক কারণে দেশছাড়ার পরে আর্থিক সংকটে পড়ে। তাদের দীর্ঘকালের সঞ্চিত অর্থই এক্ষেত্রে বেঁচে থাকার সহায়ক হয়েছে।[৪] তবে এদের মধ্যে যারা বিশেষ কোনও কাজে দক্ষ তাদের দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটেছে। এদের কাঁচামালের জোগাড় করে দিতে পারলে অথবা কিছু মূলধন দিতে পারলে তা দিয়ে তারা চালিয়ে নিতে পারত কিন্তু সাধারণ মধ্যবিত্তরা অসুবিধায় পড়ল। এদের একমাসের খোরাকি ও কিছু মূলধন দিয়ে দেখা যেত কয়েক মাসের মধ্যে তা ফুরিয়ে গেছে। অর্থাৎ তা থেকে মুনাফা অর্জন করে সংসার চালানোর ক্ষমতা হয়নি। মূলধনই সংসার চালানোর কাজে ব্যয়িত হয়েছে। এদের মধ্যে আবার কেউ কেউ দোকান করে সাইকেল রিক্সা চালিয়ে ফোড়েগিরি করে নিজেদের সংসার চালাত। কিন্তু একটা বড় দল তা পারত না। তার মূল কারণ তারা কোনও নির্দিষ্ট জীবিকার উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকাতে কোনওকালে অভ্যস্ত নয়।[৫] পুববাংলায় দেশবিভাগের আগে মধ্যবিত্ত হিন্দুদের অর্থনৈতিক বিন্যাস যা ছিল তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই শ্রেণি চালিয়ে নিতে পারত। কিন্তু দেশবিভাগের পরে বাস্তুত্যাগ করার ফলে অর্থনৈতিক বিন্যাস নষ্ট হয়ে যায়। ফলে আর তা সম্ভব হল না। এই ধরনের সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সম্পত্তির মধ্যে কিছু চাষের জমি থাকত। তা বর্গাদারের মাধ্যমে চাষ করে যে ফসল উৎপন্ন হতো তা দিয়ে একরকম অন্ন সংস্থান হয়ে যেত। বাড়ির সংলগ্ন জমিতে কিছু সবজি, পুকুরের মাছ এবং গাছের ফল সংসারের প্রয়োজন মেটাত। সেই সঙ্গে বাড়ির কোনও ছেলে যদি পড়াশোনায় ভালো হতো তবে সে পড়াশোনা করে মফস্‌সল শহরে কিংবা কলকাতায় চাকরি পেত।

তাদের আয়ের একটি অংশ পরিবারের বাকি সদস্যদের পিছনে ব্যয় হতো। এই পরনির্ভরশীল মানুষগুলি পূর্ববঙ্গ ছেড়ে আসার পর অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে অসুবিধায় পড়ে।[৬]

প্রথম পর্যায়ে যে মানুষগুলি দেশত্যাগ করেছে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে, তারা নানা পেশায় নিযুক্ত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের পেশার বদল হয়েছে। যে লোকটির সাত পুরুষের জীবিকা পুরোহিতগিরি, তাকে হয়তো নাপিতের দোকান দিতে হয়েছে কিংবা রিক্সা চালাতে হয়েছে।[৭]

প্রথম পর্যায়ে আসা উদ্বাস্তুদের পেশাগত শ্রেণি বিভাজন—

i) সরকারি চাকুরিজীবী;

ii) বেসরকারী সংস্থায় চাকুরিজীবী;

iii) কারখানার শ্রমিক;

iv) ছোটো খাটো ব্যবসা;

v) হাতের কাজ;

vi) কৃষিকাজ।

এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক নিযুক্ত ছিল কারখানায় ও হাতের কাজে। যারা নিজেদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিজেরা করে নিয়েছিল— সরকারি সাহায্যের ধার ধারেনি তারাই নতুন করে নিজেদের অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরি করতে শুরু করল। পরবর্তী সময়ে এরাই অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হয়।[৮]

অন্যদিকে সরকারি ক্যাম্পে যাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল তারা ছিল সহায়সম্বলহীন। সরকারের পক্ষ থেকে যতটুকু সাহায্য করা হত তার মাধ্যমে তাদের দিনযাপন। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী ক্যাম্পের বাইরে গিয়ে কোনও কাজ করা বারণ ছিল। কেউ এই নিষেধ অমান্য করলে সরকারি সাহায্য থেকে সে বঞ্চিত হত। তাস, পাশা খেলে, পরনিন্দা পরচর্চায় তাদের বেশিরভাগ সময় কাটত। সে কারণে উদ্বাস্তু সমাজের বিরাট একটি অংশ দীর্ঘ সময় ধরে অকর্মন্য থাকা ও সরকারি সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হবার ফলে তাদের অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।[৯]

এই সমস্যা থেকে রেহাই দিতে পুনর্বাসন বিভাগ নানা পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল. যেহেতু এই পর্যায়ে আগত উদ্বাস্তুরা ছিল মূলত অকৃষিজীবী সেইহেতু তাদের শিল্পাঞ্চলে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। এরফলে অনেকেই নিজের চেষ্টায় কাজ খুঁজে নিতে পেরেছিল। কিন্তু পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ মানুষের কল-কারখানায় কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল না, ফলে কাজে যোগ দিয়েও অনেকে

পরে সেখান থেকে ফিরে আসে। এই সময়ে সরকার উদ্বাস্তু শিশুদের শিক্ষার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিল। সাধারণত পঁচিশ জন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক বরাদ্দ ছিল। এধরনের বিদ্যালয়ের আর্থিক দায়দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার বহন করত। বিদ্যালয়গুলি যেখানে স্থাপিত হত তাদের মধ্য থেকে যোগ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষক পদে নিয়োগ করা হত।[১০] এর ফলে কিছু পরিবার আর্থিকভাবে স্বয়ম্ভর হয়ে ওঠে, কিন্তু এই সংখ্যা অধিক নয়।

এই পর্যায়ে উদ্বাস্তুদের ব্যাপক হারে স্বয়ম্ভর করা সম্ভব হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে। দক্ষ-অদক্ষ প্রচুর লোক নিয়োগ করা হয়েছিল এই সংস্থায়। কেন্দ্রীয় সরকার এক্ষেত্রে প্রচুর ঋণ দিয়েছিল। সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে বাস চালানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সরকার ভেবেছিল এর ফলে উদ্বাস্তুদের যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে, তেমনি শ্রমিক-মালিক বিরোধের সম্ভাবনাও থাকবে না। সুফলও পাওয়া গিয়েছিল এই পদ্ধতিতে।

পূর্ববঙ্গের কৃষিনির্ভর অর্থনীতি ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে পরিবারের রোজগারের উৎস ছিল একটি। পরিবারগুলি ছিল যৌথ। পরিবার একজনের প্রাধান্যে পরিচালিত হত। প্রধানত পুরুষেরাই ছিল সংসারের উপার্জনশীল। সংসারের অন্দরের দায়িত্ব সামলাতো মেয়েরা। দেশবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে যৌথ পরিবারে ভাঙন শুরু হয়। একই পরিবারের সদস্যরা জীবিকার প্রয়োজনে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া পরিবারের সকল পুরুষের আয়ও সমান ছিল না। অসম এই উপার্জন পরিবারের মধ্যে ভেদরেখা তৈরি করে।[১১]

নতুন পরিবেশে এসে সংসারের টানাপোড়েনে শুধুমাত্র পুরুষের উপার্জনে সংসার চলছিল না। ফলে পরিবারের একাধিক সদস্যসহ মেয়েরা কাজে নেমে পড়ল। যারা ইতিপূর্বে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে কাজ করেনি, তারাও বাঁচার তাগিদে নানা পেশায় যোগ দিল, সেইসঙ্গে ভাঙল দীর্ঘদিনের মানসিক অবরোধ। পূর্ববঙ্গের মানুষ যে জগৎ চিনত তার অবসান হল মূলত ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০-য়ের মধ্যে। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত যাত্রা অভিনেত্রী জ্যোৎস্না দত্ত ও বীণা দাশগুপ্তার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বাস্তুচ্যুত হওয়ার ফলে অর্থের প্রয়োজনে তারা এই পেশা অবলম্বন করে।[১২]

এই পর্বে আগত কৃষিজীবী উদ্বাস্তুদের জন্য সরকার নানা ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে :-

i) টাইপ পরিকল্পনা;

ii) ইউনিয়ন বোর্ড পরিকল্পনা;

iii) বারুজীবী পরিকল্পনা;

iv) সবজি চাষ পরিকল্পনা।

গ্রামাঞ্চলের অকৃষিজীবীদের জন্য তিনটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল:

i) টাইপ পরিকল্পনা;

ii) ইউনিয়ন বোর্ড পরিকল্পনা;

iii) পরিবর্ত ইউনিয়ন বোর্ড পরিকল্পনা।[১৩]

টাইপ পরিকল্পনা ছাড়া সব কটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল অনুমানের উপর ভিত্তি করে। এই প্রকল্পগুলির জন্য জমি সংগ্রহের চেষ্টা হয়েছিল ১৯৪৮ সালের ১৬নং আইন প্রয়োগ না করে। টাইপ পরিকল্পনা অনুসারে সরকার অধিগৃহীত জমিতে পুনর্বাসন দেওয়া হল অথবা উদ্বাস্তুরা সরকারের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে জমি কিনে নিল। ইউনিয়ন বোর্ড প্রকল্প অনুসারে সরকার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টদের সহযোগিতায় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়ার চেষ্টা করল। ইউনিয়ন বোর্ডের পরিবর্তিত পরিকল্পনা অনুসারে সেলামি দিয়ে বৃহদায়তন পতিত জমি সংগ্রহ করে অকৃষিজীবীদের বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। বারুজীবী ও সবজি চাষ প্রকল্প অনুযায়ী পান চাষ ও সবজি চাষের দ্বারা কৃষিজীবীদের পুনর্বাসন দেওয়ার চেষ্টা করা হল। এই প্রকল্পগুলিতে অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের উপর জোর দেওয়া হয়নি।[১৪] বরাদ্দ অর্থের সিংহভাগ ব্যয় হয়েছে ত্রাণশিবির গুলি চালাবার জন্য। যেটুকু সাহায্য উদ্বাস্তুরা পেয়েছে, তার সিংহভাগ ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে। এই ঋণও বিশেষ কাজে লাগেনি উদ্বাস্তুদের। ১৯৫০-য়ের জানুয়ারি মাসে প্রস্তুত কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রকের একটি নোটে বলা হয়েছে—

i) পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন বাবদ সাহায্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিস্তিতে প্রদান করা হয়েছে;

ii) প্রদত্ত ঋণের টাকা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উদ্বাস্তুদের জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তাদের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা ছিল না। ফলে ঋণ দানের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়;

iii) নেহরু লিয়াকত চুক্তির ফলে আশা করা গিয়েছিল উদ্বাস্তুরা তাদের পূর্ব পাকিস্তানের ঘরবাড়িতে ফিরে যাবে। কিন্তু সেই আশা পূর্ণ হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানের পরিত্যক্ত বিষয় সম্পত্তির বিনিময়ে উদ্বাস্তুরা কোনও প্রকার সুযোগ-সুবিধা পায়নি।

পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রদত্ত ঋণের বিরাট একটি অংশ ক্ষতিপূরণ খাতে ধরা হয়েছে। অধিকাংশ উদ্বাস্তুকে সরকার ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি।[১৫] সে কারণে ১৯৪৬ সালের শেষ দিকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত যে

মানুষগুলি পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে তাদের মধ্যে যাদের স্বাধীনতার পূর্বের সময় থেকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে চাকরি বা ব্যবসায়িক যোগসূত্র ছিল তারাই কেবল আর্থিক স্বয়ম্ভর হয়ে ওঠে। বাকি উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে সময় লেগেছিল অনেক বেশি। শিক্ষিত পেশাজীবী সম্প্রদায়েরও দীর্ঘ সময় ধরে অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে দিন কেটেছিল। তবে বে-সরকারি জবরদখল উপনিবেশগুলিকে আইনি স্বীকৃতি এবং সরকারি জমিতে গড়ে ওঠা উপনিবেশগুলিতে উদ্বাস্তুদের দখলীকৃত জমিতে স্বত্ব দিয়েছিল সরকার, যা প্রথম পর্যায়ের উদ্বাস্তুদের বেঁচে থাকার পক্ষে সহায়তার ভূমিকা পালন করে।

১৯৫০ থেকে ৭০ পর্ব : ১৯৪৯-য়ের দিকে উদ্বাস্তুদের আসা অনেকটা কমে যায়। এর ফলে সরকার কিছুটা স্বস্তি পায়। কিন্তু পঞ্চাশের দশকের শুরুতে পুর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। পাশাপাশি সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে উদ্বাস্তুদের আগমনের মাত্রা বাড়ে। এবার যারা এল তাদের সিংহভাগ কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী, তন্তুবায় প্রভৃতি বৃত্তির মানুষ। এরা আসায় এখনকার ত্রাণ ও পুনর্বাসনের চেহারা গেল বদলে। এদের জন্য মোটামুটি একটা সুস্থ জীবনের ব্যবস্থা করতে গেলে জমি চাই, শিল্প কল-কারখানা চাই, জলাভূমি—জাল চাই, তাঁত চাই। শুধু ত্রাণে কুলাবে না; চাই পুরোপুরি পুনর্বাসন।[১৬] ১৯৪৯ সালের মধ্যে যে উদ্বাস্তুরা এসেছিল, Indian Statistical Institute এর সমীক্ষা অনুযায়ী এরা ছিল উচ্চ ও মধ্যবর্গের মানুষ। কলকাতাই ছিল তাদের স্বাভাবিক লক্ষ। ফলে ভারতবর্ষের গ্রামভিত্তিক যে কৃষি অর্থনীতি তাতে প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ প্রভাব পড়েনি।[১৭] কিন্তু পঞ্চাশের দশকে আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনের বেশি কৃষি ব্যবস্থা ও দিন মজুরির সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই পর্বের উদ্বাস্তুদের পূর্ববঙ্গে অর্থনৈতিক কাঠামো ও পরিবারের গঠন ছিল—

i) অর্থনৈতিক ভাবে এরা দুর্বল;

ii) এদের মধ্যে কৃষিজীবী ও জন মজুরের সংখ্যা অধিক;

iii) একান্নবর্তী পরিবারে বসবাসকারী;

iv) অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবারের আয়ের উৎস ছিল একটি;

v) গোটা পরিবারের আয় ব্যয় পরিবার-প্রধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত;

vi) অধিকাংশ উদ্বাস্তুদের বাস ছিল গ্রামে।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এসে তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে—[১৮]

i) দাঙ্গা বিধ্বস্ত পূর্ববঙ্গ থেকে তারা নিঃস্ব হয়ে ভারতবর্ষে আসে;

ii) যৌথ পরিবারগুলি ভেঙে যায়;

iii) পরিবারের আয়ের উৎস হয় একাধিক;

iv) জীবিকার প্রয়োজনে নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ে;

v) বিরাট সংখ্যক উদ্বাস্তুর পেশার পরিবর্তন হয়;

vi) নারীরা ব্যাপক হারে কাজে যোগ দেয়।[১৯]

সুতরাং এই পর্যায়ের উদ্বাস্তুদের জন্য ভারতবর্ষের কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে তাদের জীবন ধারণের প্রভাব পড়ে।

১৯৫২ পর্যন্ত সরকার ২,৩০,০০০ পরিবারকে পুনর্বাসন দিয়েছিল। এদের মধ্যে ২৫,০০০ পরিবার পুনর্বাসনের স্থান ত্যাগ করে চলে যায়।

পরিকল্পনার শ্রেণি	**পুনর্বাসন প্রাপ্তের অনুপাতে[২০] বাস্তুত্যাগীর শতকরা হার**
সরকার সংগৃহীত জমিতে কৃষিজীবী	১৯.৫
সরকার সংগৃহীত জমিতে সবজি উৎপাদক	১৭
সরকার সংগৃহীত জমিতে বারুজীবী	৩
নিজের সংগৃহীত জমিতে কৃষিজীবী	৪.৩
ইউনিয়ন বোর্ড পরিকল্পনায় কৃষিজীবী	৫৫.৩

ইউনিয়ন বোর্ড পরিকল্পনায় কৃষিজীবীদের বাস্তুত্যাগের হার ছিল সবচেয়ে বেশি। এই ব্যবস্থায় সুফল পাওয়া যায়নি বলে ১৯৫১ সালে পরিকল্পনাটি বাতিল হয়ে যায়। মোটকথা সরকার যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল তাতে বিরাট সংখ্যক মানুষের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয়নি। তার ফলে তারা পুনর্বাসনের স্থান ত্যাগ করে, অন্যদিকে উদ্বাস্তুরা নিজেদের উদ্যোগে যে কৃষিজমি সংগ্রহ করেছিল ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল তা ত্যাগ করে যাবার হার ছিল খুব কম। সরকারের সংগৃহীত জমিতে কৃষিজীবীদের কলোনি ত্যাগের হার যেখানে শতকরা ১৯.৫, সেখানে কৃষিজীবী পরিবার নিজেদের নির্বাচিত জমিতে যে পুনর্বাসন নিয়েছিল তা ত্যাগের হার ছিল ৪.৩। এর কারণ মূলত দু'টি—

i) পরিবারগুলি পরিশ্রম করে জমি খুঁজে নিয়েছিল পছন্দ মত। ফলে কাজের ক্ষেত্রে তাদের স্বয়ম্ভর হওয়া অনেক সহজ ছিল। কিছু ক্ষেত্রে প্রতিকূলতা থাকলেও তারা তা মানিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিল;

ii) কৃষিজীবীরা কৃষির উপযুক্ত জমিতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছিল সেজন্য তাদের অন্যত্র যাবার কথা ভাবতে হয় নি।[২১]

এই পর্যায়ে কৃষিতে ব্যাপক উন্নতি হয়। সরকার কৃষিঋণ দিয়েছিল চাষের জন্য, সঙ্গে ছ'মাসের খোরাকি। ছ'মাসের মধ্যে ফসল উঠবে একথা ভেবে এই সময়-সীমা নির্ধারণ। উদ্বাস্তুদের হাড়ভাঙা পরিশ্রমে কৃষির উন্নতি ঘটে। বিশেষ করে যে জমি অনাবাদী, সেই জমিতে উদ্বাস্তুরা কলোনি স্থাপন করে। এই পতিত জমি চাষের কাজে লাগায়। এর ফলে সরকারের উপর তাদের খুব বেশি নির্ভর করতে হয়েনি।

পূর্ববঙ্গের নিম্নবিত্তরা বংশ পরম্পরায় চাষের সঙ্গে যুক্ত। তাদের সেই অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে কাজে লেগেছিল। অনাবাদী জমিতে ফসল ফলাতে বেশি বেগ পেতে হয়নি। গোটা পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে আগত উদ্বাস্তুরা যেভাবে আত্ম নির্ভরশীল হয়ে ওঠার চেষ্টা করে তাতে ভারতীয় অর্থনীতির উপর বিশেষ চাপ তৈরি হয়নি; বরং প্রথম পর্যায়ে আসা অকৃষিজীবী উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের সমস্যা ছিল বেশি। একটি জায়গা নির্বাচন করে সেখানে উদ্বাস্তুদের বসতি দেওয়া খুব এটা শক্ত কাজ নয়। তাতে তাদের আবাসিক সমস্যার সমাধান হয়— কিন্তু বাকি থেকে যায় জীবিকার সমস্যা। কৃষির সঙ্গে যুক্ত উদ্বাস্তুরা নিজেদের স্বাবলম্বী করে তুলেছে— সরকারের উপর নির্ভর করেনি।[২২]

১৯৫২ সালে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়। এই সময়ে রাস্তাঘাট, সেচ বিশেষ করে কৃষি ক্ষেত্রে প্রচুর অর্থ বরাদ্দ হয়। ফলে প্রচুর লোকের কাজের ব্যবস্থা হয়। তখন দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার কাজ পূর্ণ উদ্যমে শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে উদ্বাস্তুদের কাজে লাগানো যেত। কিন্তু সুষ্ঠু কর্মসূচির অভাবে তা ব্যাহত হয়। তবে বর্ধমান জেলার কালনা ও কাটোয়া মহকুমার ভাগীরথী নদী সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চলে উদ্বাস্তু কৃষকেরা নিজের চেষ্টায় জমি সংগ্রহ করে। এই জমিতেই তারা বসতি গড়ে। সরকার চায় তাদের অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল করে তুলতে। তাই কৃষি, বাস্তুজমি, বলদ কেনা সহ নানা খাতে ঋণ দেয়। এর ফলে এই অঞ্চলের মানুষ অর্থনীতিতে সাফল্য পায়।

কৃষক পরিবারগুলি ঋণের টাকায় জমি কেনে। এই জমিগুলি ছিল মূলত অনাবাদী। তবে জমি ছিল উর্বর ও পাট চাষের উপযুক্ত। পূর্ব বাংলার চাষীরা ছিল পাটচাষে দক্ষ অথচ পশ্চিমবাংলায় পাটচাষের প্রচলন ছিল না বললেই চলে। এরাই ব্যাপকভাবে পাটচাষের প্রচলন ঘটায়। বলাবাহুল্য এরফলে তারা জাতীয় কৃষি ও শিল্পকে নতুন করে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গঙ্গার দুইতীরে প্রচুর পাটকল গড়ে ওঠে যার কাঁচামাল যোগান দিত পূর্ববঙ্গ। পূর্ববঙ্গের দক্ষ কৃষকেরা প্রচুর পাট ফলাত। কিন্তু দেশবিভাগের ফলে পাটকলগুলির কাঁচামাল জোগাড় সমস্যা হয়ে

দাঁড়ায়। তখন উদ্বাস্তু কৃষকেরা এই সমস্যার সমাধানে সাহায্য করে। ফলে পাটকলগুলি সংকটের হাত থেকে রক্ষা পায়।[২৩]

উদ্বাস্তু চাপ কমাতে সরকার চল্লিশের দশকের শেষদিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পুনর্বাসনের কথা ভাবতে শুরু করে। এ প্রসঙ্গে সরকারের দুটি প্রকল্পের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য—

i) আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে বাঙালি উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রকল্প;

ii) দণ্ডকারণ্য প্রকল্প।

দুটি প্রকল্পই কৃষি অর্থনীতিকে ভিত্তি করে গঠিত। যারা এই প্রকল্পের অধীনে পুনর্বাসন নেয় তাদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন ছিল নিম্নবর্ণের মানুষ, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল। আন্দামানের জলবায়ু এবং জমি পূর্ববাংলার মানুষের পক্ষে উপযোগী। তাই নানা রকম সহায়তা দিয়ে ১৯৪৯ সালে উদ্বাস্তুদের প্রথম দলটি আন্দামানে পাঠানো হয়। এই সময়ে যে পরিবারগুলি পাঠানো হয় তাদের বাছাই প্রক্রিয়ায় গলদ থাকার জন্য এই প্রক্রিয়া ব্যর্থ হয়।[২৪] দ্বিতীয় পর্বে পাঠানো হয় ১৯৫১ তে। এই পর্বে আন্দামানে পাঠাবার জন্য উদ্বাস্তুদের নির্বাচন করা হয়েছিল অনেক ভেবেচিন্তে। আন্দামানের উর্বর অনাবাদী জমি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ভিত্তি করে নিজেদের চেষ্টায় উদ্বাস্তুরা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধি লাভ করে। যদিও আন্দামানে পুনর্বাসন পাওয়া উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল নগণ্য।

১৯৫০সালের পর তিন মিলিয়নের মতো লোক পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। এদের মধ্যে অকৃষিজীবীর সংখ্যা ছিল নগণ্য। তাই তাদের প্রয়োজন ছিল কৃষি জমিতে পুনর্বাসন। কিন্তু তা না দিয়ে ঊষর দণ্ডকারণ্যের পাহাড়ি অরণ্যে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়। মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার মধ্যে প্রায় ৮০,০০০ বর্গমাইল নিয়ে প্রাথমিক নকশাটি তৈরি হয়। জায়গাটির বেশিরভাগটাই অরণ্যে ঢাকা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে গড় উচ্চতা ২,০০০-৫,০০০ ফুট, বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫০-৬০ ইঞ্চি। প্রতি বর্গমাইলে লোকবসতি ১০০ জনের মত। জলধারণের পক্ষে এই অঞ্চলের মাটি খুবই দুর্বল। এখানে জলের প্রচণ্ড অভাব, হাতে গোনা কয়েকটি মাত্র প্রাকৃতিক জলাশয়। তবে দণ্ডকারণ্যে ছিল বনজ ও খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য। কিন্তু তাকে ব্যবহারের মতো পরিকাঠামো ছিল না। রাস্তা নেই, বিদ্যুৎ নেই এমনকি পানীয় জলের চূড়ান্ত অপ্রতুলতার মধ্যে সরকার উদ্বাস্তুদের এখানে পুনর্বাসন দেয়।[২৫] ফলে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো দূরের কথা। বেঁচে থাকাই তাদের কাছে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই উদ্বাস্তুরা এই অঞ্চল ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে শুরু করে। তাদের চলে যাওয়ার পিছনে কারণগুলি নিম্নরূপ—

i) স্থানীয় কিছু নেতৃত্ব উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে আদিবাসীদের মধ্যে অপপ্রচার চালায় ফলে আদিবাসীরা আতঙ্কিত হয় এবং উদ্বাস্তুদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে;

ii) সরকারি কর্মচারীদের একটি বড়ো অংশ উদ্বাস্তুদের প্রতি নানা রকম অন্যায় আচরণ করে;

iii) রুক্ষ পাহাড়ী জমি যা ফসল ফলাতে অক্ষম;

iv) সেচ প্রকল্পগুলি রূপায়ণে সরকারের উদাসীনতা;

v) খরাজনিত কারণে বছরের পর বছর ফসল না হওয়া;

vi) উৎপন্ন ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়া।[২৬]

vii) ভাষাগত সমস্যা;

viii) পূর্ববঙ্গীয় সমাজ সংস্কৃতির সঙ্গে স্থানীয় সমাজ সংস্কৃতির অমিল।

এরমধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ ছিল অর্থনৈতিক। সব মিলিয়ে উদ্বাস্তুদের পুনরায় উদ্বাসন ঘটে। পঞ্চাশের দশকের শেষপর্ব থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত পশ্চিমবাংলার বাইরে পুনর্বাসন প্রাপ্ত উদ্বাস্তুদের একাধিকবার বাস্তুত্যাগ ঘটেছে; এর মূল কারণ অর্থনৈতিক টানাপোড়েন।

একথা নিশ্চিত করে বলা যায় ৪৭ থেকে ৭০ পর্যন্ত আগত উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়ে পশ্চিমবঙ্গেই সুষ্ঠু পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব ছিল। নিবিড় কৃষি ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাছ চাষের পাশাপাশি ছোটো ও মাঝারি শিল্প স্থাপন করে বহু মানুষের কর্মসংস্থান করা যেত। মানুষ তো শুধু মুখ নিয়ে জন্মায় না তার সঙ্গে দুটি হাতও থাকে, তাকে ব্যবহারের উপযোগী করতে পারলেই অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটানো সম্ভব। প্রথম পর্বের উদ্বাস্তুদের কথা বাদ দিলে যে দীর্ঘ সময় ধরে উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গে এসেছে তারা সরাসরি কায়িক শ্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রে তাদের এই শ্রমের বিপণন ঘটানো যেত। রানাঘাট অঞ্চলে বয়ন শিল্প, হুগলির রবীন্দ্রনগরে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, ধুবুলিয়ায় চিনি শিল্প, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়াতে কাগজ তৈরির কারখানা গড়ার সম্ভাবনা ছিল প্রবল। পাশাপাশি সেচ ব্যবস্থার উন্নতি হলে ডিজেল পাম্প মেশিনসহ কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরির জন্য প্রচুর লোকের কর্মসংস্থান হত। এছাড়াও পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায় প্রচুর খনিজ সম্পদ ছিল। উদ্বাস্তুদের শ্রমের সঠিক ব্যবহার করে খনিজশিল্প স্থাপনের প্রচুর সুযোগ ছিল।[২৭] সরকারের সদিচ্ছা ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা থাকলেই এই বিপুল সংখ্যক ছিন্নমূল মানুষের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো যেত, যা পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছিল।

তথ্যসূত্র

১. অশ্রুকুমার সিকদার, *ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য,* দে'জ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৭০
২. বাপী দে, 'কলকাতায় উদ্বাস্তু সমস্যা', *ইতিহাস অনুসন্ধান* : ৪, ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৪৯৬
৩. অশ্রুকুমার সিকদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৯২
৪. মিহির সেনগুপ্ত, *বিষাদবৃক্ষ,* সুবর্ণরেখা, তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, ১৪১২ বঙ্গাব্দ, পৃ.৯০
৫. সমরেন্দ্রনাথ বৈদ্য, *পরবাস,* সকাল, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৬৮
৬. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *উদ্বাস্তু,* সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা ১৯৭০, পৃ. ৭২-৭৩
৭. মহীতোষ বিশ্বাস, *পরতাল,* একবিংশ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ২১৬
৮. সমরেন্দ্রনাথ বৈদ্য, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৪৮
৯. সামীর আহমেদ, *দেশ যখন পরবাস,* সমকাল প্রথম সংস্করণ, বারাসাত, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৪৮
১০. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *উদ্বাস্তু,* পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৩৬
১১. সমরেন্দ্রনাথ বৈদ্য, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৮৪
১২. অশ্রুকুমার সিকদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৬৩-৬৪
১৩. প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, *প্রান্তিক মানব,* প্রতিক্ষণ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৭৯, পৃ. ১০৪
১৪. প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১০৪-১০৫
১৫. রণজিৎ রায়, 'পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু : কেন্দ্র রাজ্য দ্বন্দ্ব রাজনীতি', সেমন্তী ঘোষ (সম্পা.), *দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা,* গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৬৫
১৬. সৌরিন ভট্টাচার্য, 'ইতিহাসের উল্টো দিক', সেমন্তী ঘোষ (সম্পা.), পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৫২
১৭. সুদেষ্ণা চক্রবর্তী, 'উদ্বাস্তু স্রোত ও পশ্চিমবাংলার জনজীবন', হর্ষ দত্ত ও স্বপন বসু (সম্পা.), *বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি,* পুস্তক বিপনি, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১৭৫
১৮. বরুন বালা, 'বাংলার উদ্বাস্তু সমস্যা', শেখর রায় (সম্পা.), উদ্বর্তন ২০১১, পৃ. ৬০
১৯. বরুণ বালা, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৬১

২০. হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৩৩

২১. সর্বেশ্বর মণ্ডল, *বাংলার কৃষি ও কৃষক সমাজ*, নবজীবন, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৮২

২২. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৩৬

২৩. হিরণ্ময় বন্দ্যোধ্যায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৪৭

২৪. হিরণ্ময় বন্দ্যোধ্যায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৫১

২৫. বাবুলকুমার পাল, *বরিশাল থেকে দণ্ডকারণ্য*, গ্রন্থমিত্র, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১১০-১১১

২৬. বাবুলকুমার পাল, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১১৬

২৭. Alternative Proposal for Rehabilation of West Bengal Refugees, Prepared by UCRC, 11.08.1990, p. 31

১.৪ ১৯৪৬-১৯৭০ কালপর্বে আগত উদ্বাস্তুদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর

দেশভাগের পরের সময়ের ইতিহাস শুধু ওপার থেকে এপারে চলে আসার ইতিহাস নয়, লক্ষ লক্ষ বাস্তুচ্যুত মানুষের ভালো থাকা---- মন্দ থাকা, রূপ-রূপান্তর ও জীবন-যাপনের কাহিনি। ক্যাম্প-কলোনিকে কেন্দ্র করে যে সমাজ গড়ে উঠেছিল, এক সময়ে বৃহত্তর সমাজ পরিমণ্ডলে তার অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করলো। ফলে বদলাতে শুরু করল পশ্চিমবঙ্গের জনজীবন। যারা এলো, যাদের কাছে এলো, এ বদল উভয় পক্ষের। বদলে গেল পরিবারের গড়ন, সদর-অন্দরের ব্যবধান, ঘর-গেরস্থালির ধরন-ধারণ, কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ, শহরের রাস্তাঘাট, গ্রামের সমাজ অঙ্গন। উদ্বাস্তুদের আগমনে এই বদল ছিল অনিবার্য। স্থানীয় বাসিন্দারা এই জনস্রোতের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল না। সমস্যাবহুল অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বাড়তি জনসংখ্যার চাপ, কর্মক্ষেত্রে সংকুচিত সুযোগের মুখে নতুন প্রতিযোগিতা পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের মধ্যে উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সেই প্রতিক্রিয়া আজও বর্তমান। তবে উদ্বাস্তু আগমনের প্রাথমিক পর্যায়ে মানবিক সহানুভূতি দেখা গিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গবাসীর মধ্যে।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গের সমাজ সংস্কৃতিকে কতোটা প্রভাবিত করতে পারল, কিংবা বা কতোটা প্রভাবিত হলো সেই বিষয়েই এই পর্বের অনুসন্ধান। উদ্বাস্তুরা অনেকগুলি ধাপে পশ্চিমবঙ্গে এসেছে; সন-তারিখ দিয়ে সমাজজীবনে তাদের প্রভাবকে নির্ধারণ করা দুষ্কর। প্রথমদিকে আসা উদ্বাস্তুদের (১৯৪৬-য়ের অক্টোবর ১৯৪৯-য়ের ডিসেম্বর) সঙ্গে শেষ দিকে আসা (১৯৫০ থেকে ১৯৭০) উদ্বাস্তুদের সামাজিক অবস্থান, রুচি-পছন্দ আচার-আচরণ, অর্থনৈতিক অবস্থান, শিক্ষাগত মান, কাজের জগৎ ছিল অনেকটাই আলাদা। উদ্বাস্তু হয়ে দীর্ঘ জীবন-যাপনের পর এই বৈষম্য কিছুটা ঘুচল, আবার থেকেও গেল অনেকখানি। পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক কাঠামোকে ভিত্তি করে নতুন শ্রেণি তৈরি হলো।[১]

প্রথমদিকে যে মানুষগুলি দেশ ছেড়েছে তাদের সামাজিক কৌলিন্য ছিল। শিক্ষা-দীক্ষা ও নগর সংস্কৃতির ধারক ছিল এই শ্রেণির উদ্বাস্তু। তাদের দেশত্যাগের কারণ ছিল মূলত মনস্তাত্ত্বিক। নিম্নবর্ণের হিন্দু আর বিধর্মী মুসলমান— উভয়েই তাদের চোখে অস্পৃশ্য। পাকিস্তান সৃষ্টির পর উচ্চবর্গীয়দের মনে হলো মুসলিম সমাজের অধীনে তাদের বসবাস করতে হবে— এই আশঙ্কায় তাদের দেশত্যাগ। দেশত্যাগ করে মুসলিম আধিপত্য এড়ানো গেলেও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে সামাজিক দূরত্ব রক্ষিত

হয়নি। স্টিমারে-বাসে-ট্রেনে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পিণ্ড পাকিয়ে থাকতে থাকতে মুছে গেল ছোঁয়াছুঁয়ির, না-ভেবেচিন্তে মেনে চলা অনেক সংস্কার। ক্যাম্প-কলোনিতে ছত্রিশ জাতের একসঙ্গে বসবাস, ওঠাবসা, সংগঠনে সংগ্রামে ভেঙে যেতে লাগল ভেদাভেদ আর সংস্কারের বেড়াজাল। লাইন দিয়ে জল নেওয়া, স্নান করা, পায়খানার জন্য জলের পাত্র হাতে নিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের মধ্যে কে ব্রাহ্মণ, কে শূদ্র তা চেনার উপায় রইল না। কারণে অকারণে নির্ভরশীলতার নতুন সমাজ গড়ে উঠল।[২]

কিছু উদ্যামী ও স্বাধীনচেতা মানুষ ক্যাম্প-কলোনী থেকে বেরিয়ে এসে সরকারি-বেসরকারি জমি দখল করে নতুন এক ধরনের উপনিবেশ গড়ল; যার নাম জবরদখল কলোনি। সেখানে ঠাঁই পেলো উদ্যোগীদের আত্মীয়-স্বজন। চেনা-জানা, পাড়া-পড়শী কিংবা পরিচিত কোনও লোক। পরিসংখ্যান বলে এইপর্বের জবরদখলকারীদের অধিকাংশই উচ্চবর্ণের মানুষ। পূর্ববঙ্গে এরাই ছিল সমাজরক্ষক— রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি। তাদের মধ্যে বর্ণগত বিভাজন ছিল সুস্পষ্ট। দেশছাড়ার পরে সামাজিক বিভাজন দূর হওয়ার যে বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল, কলোনি জীবনে স্থিতিশীলতার পর তা আবার ফিরে আসে।[৩]

অন্যপক্ষে সরকারি ক্যাম্প কলোনিতে যারা বসবাস করেছে তারা ছিল মূলত—

i) বর্ণগতভাবে রিক্ত;

ii) শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পিছিয়ে;

iii) অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল (উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মানুষ)[৪]।

পশ্চিমবঙ্গের যত্র-তত্র গড়ে ওঠা এই ক্যাম্প-কলোনির মানুষ বদলে দিল এপার বাংলার জনবিন্যাসকে। পূর্ববঙ্গের উন্মুক্ত জল হাওয়ার মানুষ ক্যাম্প-কলোনির খুপরির মধ্যে গা ঘেঁষাঘেষি করে থাকতে থাকতে নিজের মধ্যে নিজেই গুটিয়ে গেল। যে সামাজিক বাতাবরণ ও পারস্পরিক সৌজন্য তাদের মধ্যে ছিল তা হারিয়ে গেল পরিস্থিতির চাপে।

দেশভাগের পর পশ্চিমবাংলার সমাজ-বদলের ক্ষেত্রে নারী সমাজের ভাঙাগড়ার কাহিনি আমাদের সামনে উঠে আসে। একদিকে তার শরীর মনের বিকাশ, অন্যদিকে আত্মজাগরণের স্বপ্ন সমাজকে বদলে দিয়েছে দ্রুত। এই বদল যেমন তার পরিবারের অন্দরে, তেমনি সমাজের বৃহত্তর অঙ্গনে। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে ভারত ও পাকিস্তানের যৌথ প্রচেষ্টায় অপহৃতা নারীদের উদ্ধারের উদ্যোগ

নেওয়া হয়। ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ১২,০০০ নারীকে উদ্ধার করা হয়। নিঃসন্দেহে সরকারের এই উদ্যোগ সৎ। কিন্তু সেই-নারীদের অনেকেই ততদিনে স্থিত হয়েছে পারিবারিক জীবনে। এই অবস্থায় তাদের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল বিভীষিকার স্মৃতিকে ভুলে যাওয়া। তাদের আশঙ্কা ছিল সমাজে আর ঠাঁই হবে না।[৫] হয়ওনি। সমস্যা দেখা দেয় অপহৃতা নারীর গর্ভজাত সন্তানদের নিয়ে। পরিবারে মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা হলেও পরিবার বিধর্মীর ঔরসজাত সন্তানদের কিছুতেই ঠাঁই দিতে রাজি হয়নি। এইসব মেয়েদের রাখার জন্য স্থাপন করা হয়েছিল 'হোম'। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও সমাজসেবীদের দ্বারা তৈরি হয়েছিল এই প্রতিষ্ঠানগুলি। ধর্ষিতা মেয়েদের লেখাপড়া এবং হাতের কাজ শিখিয়ে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলাই ছিল প্রতিষ্ঠানগুলির লক্ষ। 'আনন্দ আশ্রম', 'নারীসেবা কেন্দ্র', 'উদয় ভিলা', 'অল-বেঙ্গল উইমেন্স হোম' এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।[৬]

হোমের পাশাপাশি সৃষ্টি হয়েছিল Orphanage Home বা অনাথ আশ্রম। ইংরেজ শাসনের সূচনাপর্ব থেকে সমাজে অবৈধ সন্তানদের আশ্রয় দেবার জন্য মানবিক কারণে Orphanage Home সৃষ্টি হয়েছিল। তবে তার সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। স্বাধীনতা সমকালে পিতৃ-পরিচয়হীন সন্তানের সংখ্যা অসম্ভব রকমের বেড়ে যায়। সেজন্য সরকারি বেসরকারি অনাথ আশ্রম স্থাপনের প্রয়োজন হয়েছিল। প্রত্যেক জেলাতে একটি করে অনাথ আশ্রম স্থাপন করে সরকার। পরবর্তী সময়ে সমাজের দ্বারা উপেক্ষিত ধর্ষণজাত এই সন্তানদের একটি বড়ো অংশ সমাজবিরোধী বা মস্তান নামে পরিচিতি পেয়েছিল।[৭]

পূর্ববঙ্গীয় সমাজ কাঠামোয় যে নারী ছিল অন্দরে, সে সদরে বেরিয়ে এলো স্বাধীনতা ও দেশভাগের পর। সংসারের প্রয়োজনে বাধ্য হয়েই সে কাজে নামল। মুক্তির পথে, আত্মবিশ্বাসের পথে, মেয়ে হিসেবে আত্ম-পরিচয় পাবার জন্য এই পদক্ষেপ। *Reintegrating the Displaced Refracting the Domestic* প্রবন্ধে বোলান গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন—পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মধ্যবিত্ত নারীদের যে রক্ষণশীল পারিবারিক অবস্থান এতদিন ছিল, পরিস্থিতির চাপে তার পরিবর্তন ঘটল। এই পরিবর্তন ছিল মৌলিক। তারা সংসারের লক্ষ্মণরেখার বাইরে পা দিয়ে বৃহত্তর জীবনে অংশ নিতে শুরু করল। ফলে পারিবারিক জীবনে নতুন আদর্শ গড়ে ওঠে।[৮]

দেশভাগ না হলেও দেশের অর্থনৈতিক প্রয়োজনে বাইরের কাজের জগতে মেয়েদের অনুপ্রবেশ ঘটতই। কিন্তু সেই প্রবেশকে ত্বরান্বিত করেছে দেশান্তর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই অর্থনৈতিক

তাগিদে মেয়েরা অন্তঃপুরের বাইরে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছিল। উদ্বাস্তু নারীরা এই প্রবেশকে ত্বরান্বিত করেছিল। ঘরের বাইরে বেরিয়ে মজুরির নানা পেশায় তারা যোগ দিল, ভেঙে গেল বাস্তব আর মানসিক অবরোধ। এই সীমানা অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তার ছাপ পড়ল। তৈরি হলো—

i) মত প্রকাশের অধিকার;

ii) স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার ভাবনা;

iii) প্রতিবাদ করার ভাষা পেলো;

iv) সংসারের মূল চালিকা শক্তি হয়ে উঠল।

সব উদ্বাস্তু মহিলা অফিসে কাজ পায়নি, কিন্তু নিজের বাঁচা আর পরিবারকে বাঁচানোর তাগিদে অগণিত কম বয়সের মেয়ে হাজির হয়েছে সমাজের কানাগলিতে।

ঘরের বাইরে বেরিয়ে কাজে যোগ দেবার সঙ্গে সঙ্গে ট্রামে-ট্রেনে-বাসে ব্যাগ কাঁধে মেয়েদের ঘামেভেজা চেহারাটা ক্রমশ ডালপালা ছড়িয়ে দিল কলকাতা শহরের বুকে। পুরুষদের সঙ্গে গা ঘেষাঁঘেষি করে যাওয়া আসা, কাজের ক্ষেত্রে পাশাপাশি বসা, গল্প-গুজব— এসব ঘটনা নারীকে নতুন জীবনের সন্ধান দেয়। ফলে পুরোনো মূল্যবোধ, ধ্যানধারণা ভেঙে নতুন বোধের জন্ম হয়। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাকে ছুটতে হয়েছে, শিখতে হয়েছে চামচ দিয়ে ভাত খেতে খেতে দ্রুত কুচি দিয়ে শাড়ি পরে নেবার কৌশল; রপ্ত করে নিয়েছে শাড়ি-ব্লাউজের ম্যাচিং স্টাইল।[৯] আগের দিন বিকেলে বাজার-হাট সেরে রাখা, সকালের রান্নার গোছগাছ করে রাখা, ঝটপট রান্না সেরে ছেলেমেয়েদের সামলানোর দায়িত্ব গ্রহণ করল নারী সমাজ।

কলকাতা শহরের পাশাপাশি গ্রামগঞ্জে মেয়েদের কাজের ক্ষেত্র প্রসারিত হলো। শুধু পুরুষের রোজগারে সংসার চলছিল না, তাই নিজেদের উদ্যোগে কাজ খুঁজে নিল মেয়েরা। পরিবারের সদস্যরা ছড়িয়ে পড়ল নানা জায়গায়। যৌথ পরিবার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল, এই অবস্থায় যৌথ পরিবারের ঢিলেঢালা চলনের বদলে নারীরা সচেতন ও হিসেবি হয়ে ওঠে। গোটা একটি সংসারের সবটুকুই তার নিজের— এই বোধ থেকেই সংসারের ব্যয় সংকোচন, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করতে শুরু করে। এর ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে দ্রুত। গ্রামের অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মহিলারা প্রধানত কাজের তিনটি ক্ষেত্রকে বেছে নেয়—

i) কৃষিক্ষেত্রে শ্রমের বিনিয়োগ;

ii) গৃহভৃত্যের কাজ;

iii) বিড়িবাঁধা সহ ছোটখাটো হাতের কাজ।

১৯৬১ সালেও কর্মরত নারী শ্রমিকের শতকরা ৫৮জন কৃষিজীবিকায় সংলগ্ন দেখা গেছে। পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবাংলার অর্থনীতিতে নারীর শ্রম কৃষিকাজ অথবা গৃহভৃত্যের কাজ এই দুয়ের যে কোনও একটি অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[১০]

স্বাধীনতা সমকালে পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের পড়াশোনার বিশেষ চল ছিল না। মেয়েদের বয়স কুড়ি পার হবার আগেই বিয়ে দেওয়া হতো। উদ্বাস্তুরা এদেশে আসার পর তাদের দেখাদেখি এখানকার ঘটি মেয়েরা লেখাপড়ায় আগ্রহী হয়ে ওঠে।[১১] এর ফলে তাদের বিয়ের গড় বয়স বেড়ে যায়। রিফিউজিদের জন্য নতুন নতুন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এমন কি কলেজ স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে যতগুলি বিদ্যালয় ছিল, ১৯৫০ সালের মধ্যে তার সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। মেয়েদের স্কুল কলেজের সংখ্যাও দ্রুত বাড়তে থাকে।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে উদ্বাস্তুজীবনের অন্যতম বড় সংকট ছিল মূল্যবোধের। প্রতিটি মানুষই বিশেষ কয়েকটি বোধের দ্বারা চালিত হয়। পরিবার ও সমাজ থেকে পাওয়া বোধগুলি মানুষকে সুস্থ সৎ ও মানবিক করে তোলে। কিন্তু জীবন যখন বিপন্ন হয়ে পড়ে, তখন শুরু হয় মূল্যবোধের অবক্ষয়। অর্থনৈতিক সংকট এর প্রধান কারণ। মানুষের বেকারত্ব তাকে বিপথে ঠেলে দেয়। উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে এমনটিই ঘটেছে। ক্যাশ ডোল পাবার আশায় পরিবারের সদস্যসংখ্যা বেশি দেখানো হয়েছে, বিবাহিত মেয়েকে স্বামী পরিত্যক্তা বলা হয়েছে। উদ্বাস্তুদের অবক্ষয়ের জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলিকে চিহ্নিত করা যেতে পারে—

i) অর্থনৈতিক সংকট;

ii) বাসস্থানের সমস্যা;

iii) কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা;

iv) ক্যাম্প কলোনির দুর্বিষহ জীবনযাপন;

v) মিশ্র সংস্কৃতির মধ্যে জীবনধারণ;

vi) কিছু মানুষের লোভ আর ভোগের লিপ্সা;

vii) নারীর বহির্মুখী জীবনের আসক্তি ও আব্রুহীনতা;

viii) প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত কাজে উদ্বাস্তুদের ব্যবহার করা।

পূর্ববঙ্গের জীবন ছিল সরল-শান্ত ও কৃষি নির্ভর। কোনও একটি নির্দিষ্ট সময়ে তারা চাষাবাদ করতো, কেউ কেউ টুকিটাকি ব্যবসা করতো; বাকি সময় অলস জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে কাটাতো। বংশ পরম্পরায় একই স্থানে ছিল তাদের বসবাস; সেইসূত্রে লতায় পাতায় ও সকলের সঙ্গে সকলের আত্মীয়তা। তা ছাড়া ব্যক্তিগত পরিচিতি ছিল দীর্ঘ অঞ্চল জুড়ে। এই পরিবেশে স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক অনুশাসন মানুষকে খারাপ কাজ থেকে দূরে রেখেছে। কিন্তু দেশত্যাগের পর এই সামাজিক কাঠামো ভেঙে যায় পুরোপুরি। ফলে একদিকে সামাজিক দায়িত্ব যেমন কমতে লাগল, তেমনি মানুষ আর ভালোমন্দের ধার ধারল না। সময়ের সংকটে বিপন্ন হলো মানুষের মূল্যবোধ।

দেশভাগের বলি হয়ে মানুষ হারিয়েছে অনেক, সেই সঙ্গে সঙ্গে কেউ কেউ পেয়েছেও ঢের। পূর্ববঙ্গে যে মানুষ যুগ যুগ ধরে খেতের মজুর কিংবা প্রান্তিক চাষি; বর্ণগতভাবে যে ছিল রিক্ত, সামাজিক সম্মানের বালাই ছিল না, তাদের একটি অংশের উত্থান ঘটেছে ব্যাপক হারে। পূর্ববঙ্গের সামাজিক বাতাবরণে এই মানুষগুলি নিজেদের অধিকার সম্পর্কেই ওয়াকিবহাল ছিল না। এখানে না এলে হয়তো তাদের উন্নতি ঘটতো না কোনও দিন। যে মানুষ নতমস্তকে উচ্চবর্ণের মানুষের রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক অত্যাচার সহ্য করেছে। সেই মানুষটি প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পেয়েছে, রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন নিম্নবর্গের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের উত্থান উল্লেখযোগ্য।[১২]

বাংলাদেশ ধানের দেশ, গানের দেশ। এদেশের লোকের কণ্ঠে গান, কবিতা, ছড়া অনায়াসাধ্য। বাংলার ভূ-প্রকৃতিই তার সারা দেহে সংগীত রসের আকর সৃষ্টি করে রেখেছে। এখানকার নীল আকাশ বিস্তীর্ণ সবুজ শস্যক্ষেত বহমান নদী, খাল-বিল বাঙালীর জীবনধারায় মননশীলতার ছায়া ফেলেছে।[১৩] এখানকার ভাটিয়ালি, জারি, সারি, কথকতা, মারফতি, রামযাত্রা, কিস্‌সা, রয়ানী, হালুইগান, হেচড়া পুজোর গান, গোফাল্গুনী, নৌকো বাইচের গান, টপ্পা সহ হাজারো লোকরঞ্জক গান কবিতাকে ফেলে এসেছে উদ্বাস্তুরা। সমাজ জীবনের নানা সংকটে বিলুপ্ত হয়েছে তাদের আচার ও সংস্কৃতি। পূর্ববঙ্গের প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ সুরঞ্জন বসু এই বিলুপ্তির পিছনে চারটি কারণের উল্লেখ করেছেন—

i) সামাজিক পরিমণ্ডল;

ii) কর্মময় জীবনের ব্যস্ততা;

iii) একই অঞ্চলের মানুষের বিচ্ছিন্ন বসবাস;

iv) নগর সভ্যতার চাপ।[১৪]

বিশাল এই ভারতবর্ষে এসে উদ্বাস্তুদের বাইরের জগৎপ্রসারিত হয়েছে, কিন্তু মনের জগৎ সংকুচিত হয়েছে অনেক বেশি।

উদ্বাস্তুদের জীবনে নানা নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছে। ফলে বদলেছে সামাজিক নানা অঙ্গন—

i) পূর্ববঙ্গের মানুষের ভাড়াবাড়ির ধারণা ছিল না বললেই চলে, পশ্চিমবঙ্গে এসে তাদের ভাড়াবাড়ির সঙ্গে পরিচয় ঘটে। স্বল্প পরিসরে সংক্ষিপ্ত জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে তারা;

ii) পশ্চিমবঙ্গে এসে তারা কলকাতার কথ্যভাষায় কথা বলার অভ্যাস করে;

iii) উদ্বাস্তু আগমন পর্বে বাংলা শব্দভাণ্ডারে নতুন মাত্রা পায় কিছু শব্দ: উদ্বাস্তু, বাস্তুহারা, শরণার্থী, রিফিউজি— সংক্ষেপে রিফু। কলোনি শব্দটির অন্য অর্থ তৈরি হলো; সামরিক জগতের ভাষা ক্যাম্প অবরূঢ় হলো নাগরিক জীবনের উপরে। ইংরেজি ডোল শব্দটি মিশে গেল লৌকিক বাংলায়। নতুন ব্যঞ্জনা নিয়ে উপস্থিত হলো মহাকাব্যের দণ্ডকারণ্য;[১৫]

iv) কলকাতার ফুটপাতে দোকানদারি, ট্রেনে হকারি, প্ল্যাটফর্ম দখল করে দোকান করা দেশভাগের আগে ছিল না। উদ্বাস্তুরা এসে বেঁচে থাকার তাগিদে এসব কাজ শুরু করে;

v) কৃষি সভ্যতা শিল্প সভ্যতার দিকে অগ্রসর হয় এই সময় থেকে;

vi) পূর্ববঙ্গে তাদের কাজের যে জগৎ তার বদল হয়েছে। পেশা বদলের সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার ধরন, মনের গড়নও বদলেছে।

অনেক সামাজিক ওঠাপড়া ভাঙচুরের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল সেদিনের মানুষকে। যে মানুষ এসে পড়ল কলকাতার কাছে পিঠে বা ভারতের কোনও একপ্রান্তে; তারা যে শুধু তাদের আগের ভূখণ্ড থেকে উৎপাটিত হয়েছিল তা নয়, একটা গোটা জীবনবৃত্ত পিছনে ফেলে রেখে এখানে এসে আবার নতুন করে অনেক কিছুর মুখোমুখি হতে হয়েছে তাদের। উথাল পাথাল দিনগুলি পেরোতে গিয়ে শিকড়বাকড় ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলতে হয়েছে। এতদিনের অভ্যস্ত জীবনে, আজন্ম লালিত সংস্কারের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটল নতুন সংস্কারের, নতুন জীবনবোধের। নানা দিগন্ত, নানারঙ, নানা হাতছানি নানা অন্ধকার এলো উদ্বাস্তুদের জীবনে।

তথ্যসূত্র

১. সামির আহম্মেদ, *দেশ যখন পরবাস*, সমকাল, প্রথম সংস্করণ, বারাসাত, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৬৮

২. অশ্রুকুমার সিকদার, *ভাঙাবাংলা ও বাংলা সাহিত্য*, দে'জ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৬১

৩. অশ্রুকুমার সিকদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৯৯

৪. মন্মথ হালদার, 'সেইসব দিনগুলি', প্রদীপ দাশ সরকার (সম্পা.), *পথ*, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৮

৫. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, *দেশভাগ স্মৃতি আর সত্তা*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৯০

৬. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *উদ্বাস্তু*, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা ১৯৭০, পৃ. ৯৯

৭. আনন্দগোপাল ঘোষ, 'দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা ষাট; উদ্বাস্তু জীবন ও সাহিত্য', *তিতির*, জুন, ২০০৮, পৃ. ১৩

৮. অশ্রুকুমার সিকদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৬৭-৬৮

৯. জাগরী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মেয়েলী জীবন, ভাগাভাগির পরের যুগ', সেমন্তী ঘোষ (সম্পা.), *দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা*, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১১৬

১০. রুশতী সেন, 'বাঙালি মেয়ের হাল বেহাল', হর্ষ দত্ত ও স্বপন বসু (সম্পা.), *বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ২০৩-২০৪

১১. আনন্দগোপাল ঘোষ, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৩

১২. সমর পাল, *আমার জীবন আমার ভাবনা*, প্রথম প্রকাশ, ২০০৯, পৃ. ৬০

১৩. দীনেশচন্দ্র সিংহ, *পূর্ববঙ্গের কবিগান*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১

১৪. সুরঞ্জন বসু, *পূর্ববঙ্গের লোকসমাজ*, বিজন বসু, প্রথম প্রকাশ, বগুলা, নদিয়া, ১৯৯৮, পৃ. ৪৬

১৫. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৩৪

১.৫ সম্পত্তি বিনিময় : নতুন ধারার উদ্বাস্তু

দেশভাগের ফলে অগণিত মানুষ দেশান্তরী হয়। জীবনের নিরাপত্তা, সামাজিক সম্মান, নারীর সম্ভ্রম রক্ষার জন্য শূন্য হাতে দেশত্যাগ করা মানুষের সংখ্যাই অধিক। এদের মধ্যে কেউ ক্যাম্পে, কেউ কলোনিতে আশ্রয় নিয়েছে, কেউবা আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে কিংবা নিজের উদ্যোগে বেঁচে থাকার উপায় খুঁজেছে। এছাড়া আরও একশ্রেণির উদ্বাস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়, যারা সম্পূর্ণ নিজেদের চেষ্টায় পারিবারিক সম্পত্তি বিনিময়ের মাধ্যমে দেশত্যাগ করেছে।[১] সাধারণ উদ্বাস্তুদের মতো তাদের জীবনে বিরাট বিপর্যয় ছিল না। এই বিনিময়কারী উদ্বাস্তুদের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ—

i) সাধারণ উদ্বাস্তুর তুলনায় বিনিময়কারী উদ্বাস্তুরা অনেক সচ্ছল ছিল;

ii) প্রধানত বড়ো জোতের জমির বিনিময় হয়েছিল;[২]

iii) যে অঞ্চলে বিনিময় হয়েছে, বিনিময়ের আগে থেকেই সেই অঞ্চল সম্পর্কে ধারণা ছিল বিনিময়কারীদের;[৩]

iv) পূর্ববঙ্গ থেকে যারা বিনিময় করে পশ্চিমবঙ্গে এসেছে তাদের কেউ না কেউ উক্ত অঞ্চলের পূর্বের বাসিন্দা;

v) প্রথম দিকে নিজেদের উদ্যোগে কিংবা আত্মীয় স্বজনের সহযোগিতায় বিনিময় হলেও পরবর্তী সময়ে একশ্রেণির দালাল এই কাজে সাহায্য করেছিল;[৪]

vi) যারা বিনিময় করে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে তাদের সিংহভাগ ছিল উচ্চবর্ণের[৫]

vii) সাধারণভাবে একটি পরিবারের সঙ্গে একটি পরিবারের স্থাবর সম্পত্তির বিনিময় হয়েছিল; তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে একটি পরিবারের সঙ্গে দু'টি, তিনটি, এমনকি চারটি পরিবারেরও বিনিময় হয়েছিল।[৬]

এই নতুন ধারার উদ্বাস্তুরা নিজেদের উদ্যোগে দেশত্যাগের সহজ উপায় খুঁজে নিয়েছিল, কারণ—

i) দেশত্যাগের পর বিপর্যস্ত সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থায় জমির খরিদ্দার জোগাড় করা বেশ ঝামেলার ও ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। এই ঝামেলা এড়াতে সম্পত্তি বিনিময়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়;[৭]

ii) উভয় দেশের ক্ষেত্রেই সংখ্যাগুরুর দ্বারা জমি-জায়গা বে-দখল হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল;

iii) নগদ অর্থ নিয়ে দেশত্যাগ করার ঝামেলা অনেক বেশি তাই বিনিময়ের প্রতি ঝোঁক দেখা যায়;

iv) যদি জমি বিক্রি করে নগদ অর্থ আনা হয় তাহলে সেই অর্থ দিয়ে নতুন দেশে এসে জমি কেনা ও বসতি স্থাপনের নানা ঝুঁকি থাকে;

v) সবকিছু তৈরি অবস্থায় পেলে বসবাসের পক্ষে সুবিধা অনেক, এই সুবিধা বিনিময়কারীরা গ্রহণ করেছিল;

vi) একসঙ্গে বড়ো জোতের জমির খরিদ্দার পাওয়া মুশকিল হচ্ছিল;

viii) খণ্ড খণ্ড জমি ভিন্নভিন্ন খরিদ্দারের কাছে বিক্রি করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল[৮]

তাই যে যেভাবে পেরেছে সম্পত্তি বিনিময় করে দেশত্যাগ করেছে।

চল্লিশের দশকের শেষ দিকে বিনিময় শুরু হয়েছিল। পঞ্চাশের দশকে এসে বিনিময়কারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে ষাটের দশকের শেষ পর্যন্ত। বিনিময় হয়েছিল প্রধানত উভয় দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে। ২৪ পরগণা, নদীয়া, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর সহ সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বেশিরভাগ স্থানে হিন্দু-মুসলমানের মিশ্র বসবাস ছিল। দেশভাগের পর নিকটবর্তী অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে উভয় সম্প্রদায় সম্পত্তি বিনিময় করে দেশত্যাগ করে।[৯] জমির ভৌগোলিক অবস্থান, সামাজিক গঠন, অর্থনৈতিক অবস্থা উভয়ের আগে থেকেই জানা ছিল বলে বিনিময়ে বিশেষ সুবিধা হয়েছে। সীমান্ত দূরবর্তী অঞ্চলেও কিছু বিনিময় হয়েছিল। উভয়বঙ্গের ক্ষেত্রে এই বিনিময় ছিল মূলত—

i) রাজধানী ঢাকা, কলকাতা ও অন্যান্য শহরকেন্দ্রিক;

ii) অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ অঞ্চলে বিনিময় হয়েছিল অধিক;

iii) উভয়বঙ্গে ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবসায়িক বিনিময় ঘটেছিল;[১০]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন পূর্ববঙ্গের দক্ষিণ নিম্নবঙ্গভূমি যথা— ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলে বিনিময় প্রথা বিশেষ কার্যকর হয়নি, কারণ পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জল-জঙ্গলে বসবাসের অভ্যেস বিশেষ ছিল না।

পছন্দ ও প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে বিনিময়ের হার নির্ধারিত হয়েছে। স্থাবর সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে বিনিময়কারীদের অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। সাধারণত 'বিঘা প্রতি বিঘা' অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের এক বিঘা জমির বিনিময়ে পশ্চিমবঙ্গের এক বিঘা জমি; এই অনুপাতে বিনিময় হয়েছিল। তবে বিনিময়ের এই হার প্রচলিত ছিল উভয়বঙ্গের গ্রামাঞ্চলে। শহরাঞ্চলে এই হার ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। সেখানকার জমির অবস্থান, বাড়ি-ঘরের অবস্থা, দোকান থাকলে তার মূল্য,

ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ইত্যাদি অবস্থার উপর দাঁড়িয়ে বিনিময় ক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল।

পূর্ববঙ্গের প্রায় সর্বত্র পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় শতাংশের মাপে বিঘা ছিল বড়। পশ্চিমবঙ্গে যেখানে ৩৩ শতাংশে বিঘা, পূর্ববঙ্গে তা ছিল কোথাও ৫২, কোথাও ৬৪ কোথাও ৭২ কিংবা ৮০শতাংশে বিঘা। এই সুবাদে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম উদ্বাস্তু, যারা পূর্ববঙ্গে গিয়েছিল তারা অধিক জায়গা জমি পায় বলে কথিত।[১১] তা ছাড়া পূর্ববঙ্গের জমি ছিল পলি বিধৌত; তাই ধান-পাট সহ যাবতীয় ফসল সহজে ফলানো যেত। সে সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের ব্যাপক চাহিদা থাকায় উদ্বাস্তুরা পূর্ববঙ্গে গিয়ে অধিক হারে পাটের চাষ শুরু করে, ফলে তারা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লাভ করে।

যে অঞ্চলের সম্পত্তি বিনিময় হচ্ছে, সেই অঞ্চলের মোড়ল শ্রেণির কাউকে সামনে রেখে বিনিময়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হত পাছে কোনও সমস্যার সৃষ্টি না হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় গণ্যমান্য কোনও ব্যক্তি কিংবা নিকট আত্মীয়র নামে Power of Atorny দিয়ে দেওয়া হত। আবার কোথাও সাক্ষিসাবুদ রেখে সাদা কাগজে অথবা স্ট্যাম্প পেপারের উপর বিনিময়ের বিস্তারিত বিবরণ ও শর্ত লিখে রাখা হত। অনেকটা বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে সম্পন্ন হত এই কাজ। অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বাসভঙ্গও হয়েছে— বিনিময় করা সম্পত্তি দখল নিতে এসে দেখা গিয়েছে ইতিমধ্যে তা হস্তান্তরিত হয়ে গিয়েছে।[১২]

বিনিময় কার্য যেহেতু ব্যক্তিগত উদ্যোগে গৃহীত হয়েছিল, তাই বিনিময়কারীর সংখ্যা ও তাদের বিনিময়কৃত সম্পত্তির সরকারি হিসেব পাওয়া যায় না। এ সম্পর্কে তাদের দেওয়া বিবরণের উপরই পুরোপুরি নির্ভর করতে হয়েছে। টালমাটাল অবস্থায় যে যেমন পেরেছে সেভাবেই সে বিনিময় করেছে। তবে মোটামুটি যে হিসেব পাওয়া যায় তাতে দেখা গিয়েছে শতকরা ৮৫ ভাগের মত বিনিময়কারী ছিল অর্থনৈতিকভাবে সম্পন্ন।[১৩] কোনও বিনিময়কারী উদ্বাস্তুকেই ক্যাম্প কলোনিতে বাস করতে হয়নি, দিনের পর দিন শিয়ালদহ স্টেশনে কাটাতে হয়নি। তারা চাষযোগ্য জমি পেয়েছে, হালের বলদ পেয়েছে, বাগান-পুকুর-গাছ-গাছালি পেয়েছে; তাই সাধারণ উদ্বাস্তুর থেকে তাদের জীবন ছিল অনেক নিরাপদ। নতুন জলহাওয়া, নতুন সামাজিক পরিবেশ, পরিবার-পরিজন ও প্রতিবেশীর কাছ থেকে আলাদা থাকা সর্বোপরি দেশ ছাড়ার হাহাকার ভিন্ন এই শ্রেণীর উদ্বাস্তুদের বিশেষ কোনও সমস্যা ছিল না। এক্ষেত্রে বাস্তবিক অর্থে তাদের উদ্বাস্তু বলা যায় কিনা সে প্রশ্নের অবকাশ থেকে যায়।

গ্রাম বিনিময় : মানুষ বাস্তুচ্যুত হবার পরেও চেষ্টা করেছিল পরিবার-পরিজন, প্রতিবেশিদের নিয়ে

নতুন করে বসতি স্থাপন করতে। কিন্তু নানা কারণে তা হয়ে ওঠেনি, তাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে একে অপরের কাছ থেকে। এই বিচ্ছিন্নতার মূল কারণ—

i) সরকারের উদ্বাস্তু বিষয়ক পরিকল্পনা;

ii) উদ্বাস্তুদের জীবিকা;

iii) পেশাগত দক্ষতা।[১৪]

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভাগ হবার পর নানা সময়ে নানা কারণে মানুষ তার বাসভূমি ছেড়েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে একই অঞ্চলের মানুষ একইসঙ্গে দেশত্যাগ করেছে এবং একই অঞ্চলে এসে নতুন করে উদ্বাস্তু উপনিবেশ গড়েছে। নয়া গোপালগঞ্জ, বিক্রমপুর উদ্বাস্তু উপনিবেশ, পাবনা কলোনি— প্রভৃতি নামকরণ থেকে বোঝা যায় পূর্ববঙ্গে এদের বসবাস কোনও একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে ছিল। এ প্রসঙ্গে গ্রাম বিনিময়ের মাধ্যমে বসতি গড়া একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। একই সঙ্গে কয়েকটি পরিবারের সম্পত্তি বিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে বহু। কিন্তু একটি গ্রামের বিনিময়ে একটি গ্রাম, এই ঘটনা বিরল। তাই উত্তর ২৪ পরগণার গোপালনগর থানার দিঘাড়ি গ্রামের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের পাবনা জেলার কায়েমকোলা গ্রামের সকল বাসিন্দার যে বিনিময় হয়েছিল তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে মাত্র সাত দিনের মধ্যে গ্রামের সব পরিবার কায়েমকোলা থেকে চলে আসে দিঘাড়ি এবং দিঘাড়ি থেকে চলে যায় কায়েমকোলায়। তিনটি দলে ভাগ হয়ে কায়েমকোলা থেকে আসে। পক্ষান্তরে দিঘাড়ি থেকে কায়েমকোলায় যায় চারটি দলে ভাগ হয়ে।[১৫] অবশ্য আগে থেকেই দুই গ্রামের বয়স্ক কিছু লোক এই বিনিময়ে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। গ্রাম বিনিময়ের কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে তাদের কতগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল[১৬]—

i) উভয় পক্ষের সম মূল্যের সম্পত্তি পাওয়া দুষ্কর ছিল;

ii) জমি-বাড়ির মান সমান ছিল না;

iii) প্রত্যেক পরিবারের নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার ছিল;

iv) দিঘাড়ির তুলনায় কায়েমকোলায় পরিবারের সংখ্যা ছিল বেশি;

v) সমগোত্রীয় স্থাবর সম্পত্তির অভাব ছিল।

কারও গোয়ালে হয়ত দোয়া গাই, হালের বলদ, ধানের মাড়াই, গোরুর গাড়ি ছিল, অন্য পক্ষের হয়ত নৌকা, টিনের ঘর, একপাল ছাগল, অথবা হাঁস-মুরগি ছিল। আবার উর্বর-অনুর্বর কিংবা এক ফসলী-দোফসলী জমির প্রশ্ন তো ছিলই। সব মিলিয়ে গ্রাম বিনিময়ের প্রক্রিয়াটি ছিল বেশ জটিল। উভয় গ্রামের ক্ষেত্রে একজন বয়স্ক লোকের নামে সকলেই পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দিয়ে আসে। বিনিময়

প্রক্রিয়া শেষ হলে তিনি নির্ধারিত মালিকের নামে দলিল করে দেন। দিঘাড়ি গ্রামের মানিক সরকারের বিনিময়ের দলিল হয় ১৯৫০ সালের ১ এপ্রিল (১৮ চৈত্র, ১৩৫৬ব.)।[১৭]

প্রশ্ন জাগে গ্রাম বিনিময়ের মত এত বড় একটি ঘটনা (পাবনার কায়েমকোলার সঙ্গে ২৪ পরগণার দিঘাড়ির) ঘটল কী করে? অনুসন্ধানে জানা যায় কায়েমকোলা গ্রামের মোড়ল সুধীর মণ্ডল বিয়ে করেন কুষ্টিয়ার ভেড়া মারাতে। কুষ্টিয়ার সঙ্গে দিঘাড়ির মুসলমানদের ব্যবসায়িক যোগযোগ ছিল। সেখান থেকেই সুধীর মণ্ডল, বিজয়কৃষ্ণ মল্লিক, নগরবাসী সরকারদের সঙ্গে আনসার আলী সরদার, আবেদ আলি খন্দোকার, রহিম বক্স, এলাহী বক্সদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়।[১৮] এক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সম্পন্ন গৃহস্থরা খানিকটা ক্ষতি স্বীকার করে এই কাজ সম্পন্ন করেছে।

তথ্যসূত্র

১. বরুন বালা, 'বাংলার উদ্বাস্তু সমস্যা', *উদ্বর্তন*, সজল বসু (সম্পা.), দ্বিতীয় বর্ষ, মার্চ ২০১১, নতুন কলোনি, নদীয়া, পৃ. ৬৪

২. সমীরণ চক্রবর্তী, 'বাঙালি উদ্বাস্তু : নতুন ধারা', *অনসূয়া*, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পা.), শীত সংখ্যা, ১৪১৪ব., বনগাঁ, পৃ. ২২

৩. সাক্ষাৎকার : গোলক হালদার, গ্রাম: খারো, পোস্ট : কুমড়া কাশীপুর, থানা: হাবড়া, উত্তর ২৪৪ পরগণা, বয়স : আনুমানিক--৭২ বছর পেশা : কৃষিকাজ। পুর্ব-নিবাস- গ্রাম : পুঁটিয়াবান্দা, পোঃ ফুলতলা, থানা : ফুলতলা, জেলা: খুলনা; সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ১৪.০৪.১২

৪. সাক্ষাৎকার : অমল দে, গ্রাম : মানিকনগর, পোষ্ট : মানিকতলা, থানা : অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগণা, বয়স : ৭৭ বছর, পেশা: ব্যবসা করতেন, বর্তমানে বাড়িতেই থাকেন। পূর্ব-নিবাস- গ্রামঃ বিভাগাদি, পোস্ট: বাগুটিয়া, থানা: অভয়নগর, জেলা: যশোর, সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ২৫.১২.২০১১

৫. সাক্ষাৎকার : কালিপদ সরকার, গ্রাম :শিবপুর পোস্ট : বল্লভপুর, থানা : বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা, বয়স : জন্ম ১৪৩৮ ব., ১৯ চৈত্র, পেশা: সম্পন্ন চাষী। পূর্ব নিবাস- গ্রাম : মাগুরা, পোস্ট দিলপাশা, থানা: ফরিদপুর, জেলা: পাবনা; সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ২২.০৫.২০১২

৬. সাক্ষাৎকার : গোলক হালদার, পূর্বে উল্লিখিত।

৭. আব্দুল রহিম, *আমার দেখা পুব বাংলার সেকাল একাল*, বকতিয়ার প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ,

ঢাকা ১৯৮৫, পৃ. ২৮

৮. আব্দুল রহিম, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৪২

৯. সাক্ষাৎকার : কেশবলাল বিশ্বাস, গ্রামঃ রামশঙ্করপুর, পোস্ট : রামশঙ্করপুর, থানা: গোপালনগর, উত্তর ২৪ পরগণা, বয়স : ৭৩ বছর, পেশা: অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। পূর্ব নিবাস- গ্রাম+পোস্ট : দ্বিগঙ্গা, থানা: ফকিরহাট জেলা: খুলনা; সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ২৪.০৫.২০১২

১০. আব্দুল রহিম, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৪৪

১১. আব্দুল রহিম, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৪৬

১২. গৌতম রায়, *সংগঠনের অভিমুখ : পশ্চিমবঙ্গ ত্রাণ ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কর্মচারী সমিতির মুখপত্র*, সম্পা:, কলকাতা, পৃ. ২০

১৩. কালিপদ সরকার, পূর্বে উল্লিখিত

১৪. গৌতম রায়, পূর্বে উল্লিখিত

১৫. সাক্ষাৎকার : নিমাই সরকার, গ্রাম : দিঘাড়ি, থানা: গোপালনগর, উত্তর ২৪ পরগণা, পেশা: অবসর প্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী, বয়স : ৬৬ বছর পূর্ব নিবাস- গ্রাম: কায়েমকোলা, পোস্ট : লাহিড়ি মোহনপুর, থানা : উল্লাপাড়া, জেলা : পাবনা; সাক্ষাৎকার গ্রহন : ২৭ ডিসেম্বর, ২০১২

১৬. সাক্ষাৎকার : মাখনলাল রায়, গ্রাম + পোঃ ভান্ডার খোলা, থানা : গোপালনগর, উত্তর পরগনা, বয়স : ৬৮ বছর, পেশা : অবসর প্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক, পূর্ব নিবাস— গ্রাম : তিলসরা, পোস্ট +থানা : নগরকান্দা, জেলা: যশোর; সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ১৮ অক্টোবর ২০১১

১৭. নিমাই সরকার, পূর্বে উল্লিখিত

১৮. নিমাই সরকার, পূর্বে উল্লিখিত

১.৬ মুসলিম উদ্বাস্তু

বঙ্গবিভাজন দুইবাংলার জনপদে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বিশেষ করে পুববাংলাকে ঘিরে বাঙালি মুসলমানের মনে নতুন আশা জেগেছিল। পাকিস্তানের জন্মকে ঘিরে পূর্ববাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে একমাত্রিক ও শর্তহীন উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল। এই প্রত্যাশার দুটি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে—

i) ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির আনন্দ;

ii) শ্রেণি ও নৃতাত্ত্বিক বৈষম্য বর্জিত একটি একক মুসলিম জাতির স্বপ্নের দেশ ও স্বকীয় ভূমি। সাধারণ মুসলমানের কাছে পাকিস্তান ছিল একটি নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিভূমি, যেখানে থাকবে ন্যায়বিচার ও পারস্পরিক অধিকারের বাতাবরণ। এর ফলে পূর্ববর্তী উচ্চবর্গের হিন্দু জমিদার, নায়েব, মহাজনদের শাসন-শোষণ থেকে আম-মুসলিম সমাজের মুক্তি ঘটবে। একথা মনে রাখা দরকার পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল তৎকালীন দেশব্যাপী চলমান একাধিক কৃষক আন্দোলন তথা তেভাগা, টংক, হাজং আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং ১৯৪৩ সলের দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে।[১] পরবর্তীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, খুন, নারীধর্ষণের কারণে দেশান্তরী হয় লক্ষ লক্ষ মানুষ।

ভারত-উপমহাদেশে ১৯৪০-১৯৫৩ দশকে সংঘটিত বিভিন্ন দাঙ্গার কারণে প্রায় ৭৯ লক্ষ শরণার্থী পাকিস্তানের উভয় অংশে অভিবাসী হয়।[২] উভয় পাকিস্তান থেকে ভারতে আসা এই মানুষের সংখ্যা ছিল আরও বেশি। গবেষণার প্রয়োজনে এই পরিচ্ছেদে আমরা কেবল পূর্ববঙ্গে আশ্রয়প্রার্থীদের বিষয়ে আলোচনা করব।

ভারতে আশ্রয়প্রার্থী মানুষদের রিফিউজি, উদ্বাস্তু, ছিন্নমূল শরণার্থী, বাস্তুহারা ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত করা হয়। পক্ষান্তরে পূর্ববঙ্গে যাওয়া উদ্বাস্তুদের 'মোহাজের' আখ্যা দেয় পাকিস্তান সরকার। 'মোহাজের' এই নামকরণের সঙ্গে বিশেষ একটি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি জড়িয়ে রয়েছে। ৬২২খ্রি. হজরত মোহম্মদ অত্যাচারিত হয়ে মক্কা ছেড়ে মদিনায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই সময়ে যারা তাঁর অনুগামী হয়েছিল, ইসলাম ধর্মীয় মতে তাদের 'মোহাজের' নামে অভিহিত করা হয়। আর যে সকল মদিনাবাসী তাদের আশ্রয় দিয়েছিল তাদের বলা হতো 'আনসার'। ইসলামীয় মতে নবীজীর এই অনুগামী এবং তাদের আশ্রয়দাতা উভয়েই অত্যন্ত পুণ্যবান— আখেরে তাদের বেহেস্তবাস হবে। মোহম্মদের দেশত্যাগের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে পাকিস্তান সরকার দেশভাগ জনিত কারণে উদ্বাস্তু হওয়া মুসলিমদের নাম দেয় 'মোহাজের'। সাধারণ মানুষের কাছে সরকার এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল— হজরতের

অনুগামীদের মতো তারাও আল্লার সাহায্য পাবে। প্রসঙ্গক্রমে মনে রাখা প্রয়োজন সরকারের এই আহ্বানে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়েছিল। পরবর্তী সময়ে ক্রমে এই সহানুভূতি কমতে থাকে।[৩]

পূর্ব-পাকিস্তানে মূলত দুইশ্রেণির উদ্বাস্তু আসে—

i) বাঙালি উদ্বাস্তু;

ii) উর্দু ভাষাভাষী অবাঙালি উদ্বাস্তু।

১৯৫১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এই দুইশ্রেণীর উদ্বাস্তুর মোট সংখ্যা ছিল—৬,৯৯,৯৭৯। এরা সকলেই মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত; যার প্রায় অর্ধেক অর্থাৎ ৩২৮৪৩৩ জন অবাঙালি।[৪] ১৯৬১ সালের আদমশুমারীতে তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬,৭১,৮৪৪।[৫] ১৯৭১ সালে মোহজেরদের সংখ্যা অনেকবৃদ্ধি পায়। একাত্তরে যুদ্ধের কারণে আদমসুমারী না হওয়ায় প্রকৃত হিসেব পাওয়া যায় না। তবে গবেষকেরা এই সংখ্যা ১০ লক্ষ অতিক্রম করেছে বলে মত প্রকাশ করেছে।[৬] প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা দরকার উদ্বাস্তুরা ভারতবর্ষ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আসতে শুরু করে চল্লিশের দশকের শেষদিকে। তাদের একটি অংশের স্বাধীনতা পূর্বকালীন সময় থেকে পূর্ববঙ্গের সঙ্গে যোগসূত্র ছিল নানা কারণে। এই শ্রেণি মোটামুটিভাবে শিক্ষিত ও অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল ছিল। স্বাধীনতা সমকালে এবং তার পরবর্তী সময়ে বিরাট সংখ্যক হিন্দু পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে। এর ফলে সেখানে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বড় ধরনের সংকট তৈরি হয়। এই সংকট মোকাবিলায় পূর্ববঙ্গে আগত বাঙালি উদ্বাস্তুরা (মোহাজের) বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের আধিপত্য ছিল একচেটিয়া। তারা দেশ ছাড়ার পর শিক্ষাক্ষেত্রে দক্ষ শিক্ষককুলের অভাব দেখা দেয়। তাছাড়া বৃহৎ শিল্পক্ষেত্রে বিশেষত পাট ও বস্ত্রশিল্পে কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ ঘটেছিল পূর্ববঙ্গে। ফলে শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানদের উদ্বাস্তু জীবনের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়নি।[৭] এছাড়াও যেসব পরিস্থিতি বাঙালি মোহাজেরদের সমৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক ছিল তা নিম্নরূপ—

i) দেশত্যাগী হিন্দুদের তুলনায় আগত মুসলিমদের সংখ্যা ছিল কম;

ii) হিন্দুরা বিপুল পরিমাণ সম্পদ ফেলে যায়, যা আগত মুসলিমদের প্রাচুর্য দিয়েছে;

iii) চাকরি ও ব্যবসা ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে;

iv) সরকার উদ্বাস্তুদের নানা ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দিয়েছে;

v) পূর্ববঙ্গের স্থানীয় মুসলিমদের উদ্বাস্তুদের প্রতি সহানুভূতি ছিল;

vi) ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত ঐক্য থাকায় উদ্বাস্তু হয়ে আসার পরেও তাদের সমাজের মূল স্রোতে মিশে যেতে অসুবিধা হয়নি।

এর ফলে বাঙালি মুসলমানদের পূর্ববঙ্গে আসার পর তাদের ইতিহাস দীর্ঘায়িত হয়নি। আগতদের একটি বড়ো অংশ সমাজ ও প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে ভারতে ফিরে গিয়েছে। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা ভারতে যা ফেলে এসেছে সেই তুলনায় পেয়েছে অনেক বেশি, তাই অতীত নিয়ে তাদের যেমন আক্ষেপ নেই, রাষ্ট্রের প্রতি তাদের ক্ষোভও কম; যা পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে রয়েছে।[৮] পরবর্তী সময়ে পূর্ববঙ্গের রাজনীতি ও সমাজ সংস্কৃতিতে এই উদ্বাস্তুরাই নেতৃত্ব দিয়েছে। সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে তারা সহজে মিশে গিয়েছে, ফলে তাদের আলাদা করে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না।[৯]

বাঙালি মুসলিম উদ্বাস্তুদের একটি বড়ো অংশ সম্পত্তি বিনিময়ের মাধ্যমে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে পূর্ব পাকিস্তানে যায়। ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই বিনিময়কার্য সম্পন্ন হয়েছিল। আত্মীয়-স্বজন, জানা-চেনা বিশ্বস্ত লোকের মাধ্যমে এই বিনিময় হয়। হিসেব অনুযায়ী এইরকম বিনিময়কারী উদ্বাস্তুর সংখ্যা মোট বাঙালি মুসলিম উদ্বাস্তুর শতকরা ৪২ জনের কাছাকাছি।[১০] বিনিময় হয় মূলত সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এবং পূর্ববঙ্গের প্রধান প্রধান শহরে। বিনিময়ের হার নির্ধারিত হয়েছে পারস্পরিক চাহিদা অনুযায়ী। প্রক্রিয়াটি চলে চল্লিশের দশকের শেষ দিক থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত। পূর্ববঙ্গের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে নানা সময়ে ঘটে যাওয়া দাঙ্গার প্রেক্ষিতে বিনিময়ের হার বেড়েছে। দেশভাগের পর ভারতীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে সংখ্যালঘু মুসলিমরা সরকারের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে কিছুটা হলেও স্বস্তিতে ছিল। ফলে সম্পত্তি বিনিময়ের যোগাযোগ হলেও তারা দোলাচলে ভুগছিল। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাহীন কাঠামোয় সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগের তাগিদ ছিল অনেক বেশি। তাই পূর্ববঙ্গে আসা উদ্বাস্তুরা সম্পত্তি বিনিময় করে অনেক বেশি লাভবান হয়েছিল।[১১] বিনিময়কারী উদ্বাস্তুরা প্রধানত চাষবাস ও ব্যাবসাকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। পশ্চিমবঙ্গে থাকতেও তারা চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত ছিল তাই অন্য কোনও পেশায় যেতে চায় নি। বিশেষ করে, চাকরি বা শিল্প-কারখানায় কাজে যোগ দেয় নি। চাষের জমি, দোকানপাট—বিনিময়ের মাধ্যমে যা পেয়েছিল তাই দিয়েই দিন গুজারান শুরু করে, সরকারি সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়নি।

মধ্যবিত্ত বাঙালি উদ্বাস্তুদের একেবারে উল্টোদিকে খুঁজতে হবে পূর্ববঙ্গের অবাঙালি মোহাজেরদের। তারা এখানে বিহারি নামে পরিচিত। যদিও সকলের পূর্বনিবাস বিহারে ছিল এমনটি

নয়। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, উড়িষ্যা সহ নানা অঞ্চলের এই উর্দুভাষী মুসলমানরা ৪৬ সালের দাঙ্গার পর থেকে দেশত্যাগ করতে শুরু করে। বিহার থেকে আগত উদ্বাস্তু বা মোহাজেরদের সংখ্যা ছিল বেশি, তাই হয়তো সার্বিকভাবে এই নামকরণ করা হয়েছে।[১২]

৪৬ সালের দাঙ্গা পরবর্তী সময়ে তারা প্রথমে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। সরকারের পক্ষ থেকে প্রাথমিকভাবে এদের জন্য ত্রাণ শিবির খোলা হয়। যেখান থেকে তারা বিভিন্ন পর্যায়ে পূর্ববঙ্গের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সরকারি হিসেব অনুযায়ী এই ত্রাণশিবিরে আশ্রয় গ্রহণকারীদের জন্য ব্যয় হয়েছিল সাড়ে তেইশ লক্ষ টাকা।[১৩]

পূর্ব পাকিস্তান সরকারও শরণার্থীদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল নবগঠিত এই রাষ্ট্র শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য দুইভাবে অর্থসংগ্রহ করতে তৎপর হয়—

i) সিনেমা, রেলের টিকিট সহ নানা ক্ষেত্রে এক পয়সা করে শরণার্থী কর বসায়;

ii) কায়েদ-ই-আজম মেমরিয়াল রিলিফ ফাণ্ড গঠন করে।[১৪]

সরকারের এই আহ্বানে দেশের সাধারণ নাগরিক বিপুলভাবে সাড়া দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য শরণার্থী কর এবং কায়েক-ই-আজম মেমরিয়াল রিলিফ ফাণ্ড থেকে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ সরকারের তহবিলে আসে তার সিংহভাগ ব্যয় হয়েছিল অবাঙালি মোহাজেরদের জন্যে। কারণ সরকার ভাষা ও সংস্কৃতিগত কারণে তাদের প্রতি প্রসন্ন ছিল। এই সময়ে শিল্পায়নের জোয়ার আসে পূর্ববঙ্গে। ফলে শরণার্থীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ে। ১৯৫০ সালের দাঙ্গায় কলকাতা থেকে বহু চটকল শ্রমিক পূর্ব পাকিস্তানে যায়। কথিত আছে পূর্ব পাকিস্তানের নতুন শিল্পায়নের দাবি মেটাতে কলকাতায় পাকিস্তান সরকারের মিশন উস্কানি দিচ্ছিল। ১৯৫০ সালেই পূর্ব পাকিস্তান ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল ডেভলপ্‌মেন্ট কর্পোরেশনের ছত্রছায়ায় বড়ো মাপের শিল্পায়ন শুরু হয়। ১৯৫২ থেকে ৭০ পর্যন্ত ৭৪টি চটকল স্থাপিত হয়, তাঁতের কারখানা ৮ থেকে বেড়ে হয় ৪৪, চিনিকল ৫ থেকে বেড়ে হয় ১৫।

বিহারিদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল শ্রমিক শ্রেণি। নতুন নতুন কলকারখানায়, ব্যবসাক্ষেত্রে, হাট-বাজার-দোকানপাটে এরাই ছিল মাঝারি সরদার ও আধিকারিকের ভূমিকায়। এ ছাড়াও বিরাট সংখ্যক নিযুক্ত ছিল রেলওয়েতে। কুলি থেকে স্টেশন মাস্টার— নানা কাজে নিযুক্ত ছিল বিহারি উদ্বাস্তুরা। উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীর একটি বড়ো অংশ পুলিশের কনস্টেবল হিসেবে নিযুক্ত হয়। বাহান্ন পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তানে সরকারের বিরুদ্ধে ক্রমে জনমত গঠিত হতে শুরু করে, পাশাপাশি পাকিস্তান

সরকার উর্দুভাষীদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এদেরই একটি বড়ো সংখ্যা রাজাকারে পরিণত হয় এবং কিছু সংখ্যক আলবদর ও আল্সাম্স-এর ঘাতক দলে নাম লেখায়।[১৫]

মোহাজেরদের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ নাগরিকদের আবেগ বেশিদিন কাজ করেনি। মানুষ যখন দেখেছে মোটের উপর অর্থনৈতিকভাবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তখন থেকেই মোহাজেরদের সঙ্গে সংঘাত শুরু হয়। পূর্ববঙ্গ ছেড়ে যাওয়া হিন্দুদের বিপুল পরিমাণ জমি জায়গা দোকানপাট কেউ না কেউ দখল করেছিল। সেই সম্পত্তির উপর হাত বাড়ায় মোহাজেররা। চাকরির ক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতা তৈরি হয় দ্রুতগতিতে। ফলে অবাঙালি মোহাজেরদের সঙ্গে স্থানীয়দের সংঘাত চরমে ওঠে। স্থানীয় বাঙালি মুসলমানদের সঙ্গে তাদের ধর্মগত মিল ছাড়া প্রায় সর্বত্র অমিল লক্ষ করা যায়। প্রথম থেকেই অবাঙালি মোহাজেররা পাকিস্তান সরকারের আনুকূল্য পায়। উর্দুভাষী এই সম্প্রদায় মুসলিম লিগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সকল পশ্চিম পাকিস্তানি এলিট শ্রেণির সহানুভূতি লাভ করে। ভাষা, সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানিদের অনুসরণ করায় তারা সরকারের প্রতিনিধিতে পরিণত হয়।

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময় থেকে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করত যে বাইশ পরিবার, তার একুশটি ছিল অবাঙালি মুসলিমদের; একটির মাত্র মালিক ছিল বাঙালি মুসলিম এ.কে. খান।[১৬] তাদের শিল্প-কলকারখানায় অবাঙালি মোহাজেরদের প্রাধান্য ছিল, কারণ—

i) বিহারি শরণার্থীরা চাষের কাজে অভ্যস্ত ছিল না, ফলে পূর্ব পাকিস্তানে এসেই তারা ছোট খাট কাজ খুঁজত; পেশার ক্ষেত্রে কোনও বাছবিচার করতো না;
ii) ভাষাগত নৈকট্যের কারণে শিল্পপতিরা এইশ্রেণির লোকদের বেশি নিয়োগ করতো;
iii) মালিকশ্রেণী মনে করতো এদের কাজ দিলে শ্রমিক ধর্মঘট হবার সম্ভাবনা থাকবে না।

এই সুবাদে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তারা আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ষাটের দশকের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন, সর্বোপরি ৭০ সালের নির্বাচন ও মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি স্বার্থ বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এই বিহারি মোহাজেররা। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের একনিষ্ঠ এই সমর্থকদের হাতে প্রাণ দেয় পূর্ব পাকিস্তানের অসংখ্য নিরীহ হিন্দু। ক্ষেত্র বিশেষে মুসলমানদের প্রাণ ও সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে তাদের হাতে। বিহারি মোহাজেরদের অত্যাচারের হাত থেকে হিন্দুদের প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষা করতে বহু সহৃদয় মুসলমান এগিয়ে আসে।[১৭]

পূর্ব পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ১.৩২% লোক ছিল উর্দুভাষাভাষী। বাকি প্রায় সকলেই বাংলা ভাষাভাষী। তা সত্ত্বেও বাঙালির আবেদন নিবেদন উপেক্ষা করে সরকার পূর্ব পাকিস্তানে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়। বাংলাভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য ১৯৪৮ সাল থেকে আন্দোলন শুরু হয়। উর্দুভাষী মোহাজেররা এই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করে। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে পলাশী ব্যারাক, ৪৮ সালের মার্চে ঢাকা ও যশোরে উর্দুভাষীদের সঙ্গে বাঙালিদের সংঘর্ষ হয়।[১৮] ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে মুসলিমলিগ উর্দুভাষীদের এগিয়ে দেয়। উর্দুভাষীদের সংগঠন 'আঞ্জামানে মোহাজেরিন' (মোহাজেরদের সমিতি) ভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং সরকারের বাংলাভাষা বিরোধী সব পদক্ষেপকে সমর্থন করে। এই সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতা রাগবি হাসান বাংলা ভাষাকে প্রাদেশিকতাবাদ, বর্ণবাদ ও উগ্র জাতীয়তাবাদ হিসেবে চিহ্নিত করেন। পাকিস্তান ও ইসলামের স্বার্থে তিনি সর্বস্তরের মানুষকে এই আন্দোলন থেকে বিরত থাকতে আহ্বান জানান। তিনি এক বিবৃতিতে বলেন ৯৫% বাঙালি উর্দুকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে দেখতে চায়।[১৯] বিহারিদের এই বাঙালি বিরোধী মনোভাবের ফলে পূর্ববঙ্গে বাঙালি-অবাঙালিদের সংঘাত প্রকাশ্যে আসে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লিগের চরম ভরাডুবি হয়। ২৩৬টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২১টি আসনে জয়লাভ করে। পাকিস্তান সরকার যুক্তফ্রন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করবার জন্য পরিকল্পিতভাবে ১৯৫৪'র মার্চে চন্দ্রঘোনা পেপারমিল, আদমজী জুটমিলে বাঙালি-বিহারি দাঙ্গা বাধায়। শুধু আদমজীতে এই দাঙ্গায় মৃতের সংখ্যা ছিল ৫৮০জন।[২০] এই দাঙ্গাকে উপজীব্য করে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করে ৫৪দিনের মাথায় পূর্ববঙ্গে কেন্দ্রের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে বিহারিরা সরকার ও মুসলিমলিগের দিকে আরও ঝুঁকে পড়ে। ১৯৬৯ সালে পুনরায় ঢাকার মিরপুরে, মোহম্মদপুরে বাঙালি-বিহারি দাঙ্গা হয়। বিহারিরা তাদের আন্দোলন ১৯৭০ পর্যন্ত অব্যাহত রাখে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামিলীগের নিরঙ্কুশ জয়লাভ পশ্চিম পাকিস্তানিদের মতো পূর্ব পাকিস্তানের উর্দুভাষীরা মেনে নিতে পারেনি। উর্দুভাষী শিল্পপতিরা বাঙালিদের এই জয়ে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। পূর্বপাকিস্তানের উত্তপ্ত রাজনৈতিক আবহাওয়ায় পুনরায় বাঙালি-বিহারি সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে। উর্দুভাষী মোহাজেরদের পাকিস্তানি শাসকচক্রের প্রতি অত্যাধিক মোহ বাঙালি মাত্রকেই বিক্ষুব্ধ করে তোলে। অন্যদিকে সামরিক প্রশাসনের ছত্রছায়ায় অবাঙালিরা ঢাকা সহ বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে বাঙালির মিছিল, সভা কিংবা স্বাধীনতাকামীদের উপর আক্রমণ চালায়। বিশেষ করে ঢাকার মিরপুর সৈয়দপুর কিংবা চট্টগ্রামের কয়েকটি এলাকায় বাঙালিরা আক্রান্ত হয়। এই আক্রমণে সবচেয়ে বেশি

প্রাণহানি ঘটে চট্টগ্রামে। ২-৪ মার্চ ১৯৭০ চট্টগ্রামের পাহাড়তলি, ফিরোজশাহ কলোনি, ওয়ারলেস কলোনি, খুলনা কলোনি এলাকায় বাঙালিরা আক্রান্ত হয়। এতে উভয় পক্ষের মোট ১২০জন নিহত হয়।[২১]

পাকিস্তানি বাহিনী ব্যাপক আক্রমণের সূচনা করলে আবার দাঙ্গা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ১৯৭০-এর মার্চ মাস থেকে পরবর্তী সময়ে ন'মাস পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহযোগী হিসাবে বিহারিরা গণহত্যায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এপ্রিল মাসে রাজাকার, মিলিশিয়া, আলবদর আলশামস নামে ঘাতক বাহিনী গঠিত হলে বিহারিরা তাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। মোহাজের নেতা নাসিম খানের মতে ৭০ পরবর্তী সময়ে বিহারিদের পাঁচ লক্ষ লোক পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করেছে।[২২] রাজাকার বাহিনীর শতকরা ৬০-৮০ ভাগ ছিল বিহারি।[২৩] এরমধ্যে ২০,০০০ বিহারি শুধু সিভিল আর্মস ফোর্সে যোগ দেয়।[২৪]

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর পাকিস্তানি সেনাদের আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে হিংসা যজ্ঞে সাময়িক ছেদ পড়ে। পরবর্তী সময়ে বিহারি এলাকা থেকে ভারতীয় সেনা চলে যাবার পর পাকিস্তানি সেনাদের খুঁজে বের করতে বেঙ্গল রেজিমেন্ট তল্লাসি আর গ্রেপ্তারি শুরু করে। এই সময়ে বাঙালি ও বিহারিদের সংঘর্ষ আরও প্রবল হয়। অনাবশ্যক খুনজখমের দাঁড়ি টানতে সমস্ত বিহারি পুরুষদের ঠাঁই হয় ঢাকায় কেন্দ্রীয় কারাগারে; মোহম্মদপুরে জারি করা হয় কারফিউ।[২৫]

হিংসা ও ডামাডোলের এই সন্ধিক্ষণে আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটি বিহারি ও উর্দুভাষীদের জন্য সারা বাংলাদেশে ৬০ থেকে ৭০টি ক্যাম্প নির্মাণ করে। এই ক্যাম্পগুলির মধ্যে ঢাকায় অবস্থিত দুটি উল্লেখযোগ্য ক্যাম্প হলো— মোহম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্প এবং পার্শ্ববর্তী মিরপুর ক্যাম্প। ক্যাম্প প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে রেডক্রস বিহারিদের নাম নথিভুক্ত করতে শুরু করে। উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। কিন্তু প্রক্রিয়া চালুর আগে বাংলাদেশ বা পাকিস্তান কোনও সরকারের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করা হয় না। ফলে দ্বিবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়—

i) শেখ মুজিব পুনর্বাসনকামী এই তিনলক্ষ মানুষের দায় নিতে আপত্তি করেন;
ii) ভুট্টো জানান পাকিস্তানে জাতি-সত্তার প্রশ্ন নিয়ে ইতিমধ্যে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, ফলে নতুন করে তারা পূর্ব-পাকিস্তানে বসবাসরত মোহাজেরদের নিয়ে ভাবতে চায় না।[২৬]

এই অবস্থায় রাষ্ট্রপতির নির্দেশ নং ১৬'র ফলে যাবতীয় অবাঙালির ব্যবসায়িক পুঁজি এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হয়। বিশেষ করে ঢাকা-তেজগাঁও এবং টঙ্গি এলাকায় এই আইন মোতাবেক কোনও বিহারির পক্ষে সম্পত্তি ফিরে পাওয়া অসম্ভব হয়ে যায়। ফলে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দিক থেকে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে বিহারিদের অবস্থা শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছায়, বিহারিদের জীবনে শুরু হয় নতুন লড়াই।

এই অবস্থায় একশ্রেণির বিহারি উদ্বাস্তু সমাজের মূলস্রোতের সঙ্গে মিশে যাবার চেষ্টা করে। ৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী সময় থেকেই কেউ কেউ ধীরে ধীরে পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে সরে আসতে শুরু করে এবং বাঙালির শিক্ষা-সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। অর্থনৈতিক সচ্ছলতা পাবার পর তারা ক্যাম্প ছেড়ে পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে যারা ক্যাম্প-জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে রইল, তারা সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সরকারি দাক্ষিণ্যে দিন-যাপন করতে লাগল।

বর্তমানে স্থানীয় হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায় অবাঙালি মোহাজেরদের সঙ্গে সামাজিক দূরত্ব রেখে চলে। ১৯৭১ সালের পরবর্তীতে তারা নাগরিকত্ব হারায়। ফলে দেশের সামরিক ও প্রতিরক্ষা সহ সমস্ত সরকারি দপ্তরে কাজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। তাছাড়া এদের হাতে এমন পুঁজি ছিল না যা বিনিয়োগ করে তারা নতুন রাষ্ট্রে সংসার চালাতে পারে।[২৭] এই অবস্থায় বিহারি মোহাজেররা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে, কলে-কারখানায়, গৃহভৃত্য কিংবা জনমজুরের কাজে নিজেদের শ্রমকে বিনিয়োগ করে। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে মোহাজেরদের কাজের জগৎ সীমাবদ্ধ—

i) নাপিতের কাজ : ঢাকা সহ সারা দেশে নামি সেলুনগুলিতে দক্ষ কর্মচারীদের সকলেই প্রায় বিহারি উদ্বাস্তু;
ii) বাবুর্চির কাজ: শাহী রান্না হয় এমন বড় বড় হোটেল, রেস্টুরেন্ট-এ মূলত এরাই কাজ করে;
iii) সুইপারের কাজ : পরিসংখ্যান বলছে ঢাকা শহরের মোট সুইপারের ৮৬.২৪% বিহারি;[২৮]
iv) বস্ত্রশিল্পের কাজ: বিহারিদের একটি বিরাট সংখ্যক পুরুষ-মহিলা কারচুপির কাজ করে।[২৯] বেনারসি বোনার ক্ষেত্রে এরা খুবই দক্ষ। তাছাড়া পোষক তৈরির কারখানায় তাদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ করা যায়;[৩০]

পাশাপাশি চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই-মস্তানির সঙ্গে যোগ রয়েছে অনেকের। নারীপাচার ও মাদক ব্যবসায়ে

দেশের মাফিয়ারা এই সম্প্রদায়কে কাজে লাগায়।

ক্যাম্প-কলোনিতে তারা নিজেদের মধ্যে উর্দুভাষায় কথা বলে। অন্যদের সঙ্গে কথা বলার সময় উর্দু-বাংলা-হিন্দি-ওড়িয়ার মিশ্রণ থাকে। নতুন প্রজন্মের সকলেই বাংলায় বেশ সড়গড়। তবে প্রত্যেকেই পরিবার থেকে উর্দু শিক্ষার তালিম পায়। এদের শিক্ষার হার খুব কম। স্থানীয় বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণির পর ছাত্রছাত্রী বিশেষ থাকে না। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করবার আগেই তারা কাজে লেগে পড়ে।[৩১]

পাকিস্তান পর্বে তারা একরকম ভালোই ছিল, কিন্তু বাংলাদেশ হবার পরে চরমভাবে পিছিয়ে পড়েছে। তারা শাসনতন্ত্রের বাইরে; সমালোচনার অধিকারও তাদের নেই। জনগণের চোখে তারা সহ-নাগরিক। প্রতি পদে তাদের উপেক্ষা আর গ্লানি সহ্য করে বসবাস করতে হয়। তবু তারা এদেশকেই নিজের দেশ মনে করে। উত্তর ঔপনিবেশিক বাংলাদেশের ক্যাম্প-কলোনির মধ্যে আবদ্ধ এই জনগোষ্ঠী বেরিয়ে আসতে চায়, একটা জায়গা পেতে চায় শিষ্ট সমাজে। বাস্তবে অধিকারহীন এই প্রান্তজনের রুটি-রুজির খোঁজে ঘুরে বেড়ানোই ধর্ম। সে অর্থে বিহারি নাম সার্থক।

সূত্রনির্দেশ

১. মেসবাহ কামাল ও ঈশানী চক্রবর্তী, ‘পূর্ববাংলায় দেশবিভাগের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া’ অনিল দাস (সম্পা.) *এখন পর্যাবরণ*, দেশভাগ সংখ্যা, এপ্রিল, ২০০৯, পৃ. ৬৮

২. আবু মোঃ দেলোয়ার, ‘মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের অবাঙালি মোহাজেরদের (বিহারি) ভূমিকা’, *সমাজ নিরীক্ষণ*, ৮৫ সংখ্যা, ২০০২, পৃ. ১২৯

৩. সাক্ষাৎকার : আবু মোঃ দেলোয়ার, অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইতিহাস বিভাগ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ০৬.১১.২০১২ ঢাকা।

৪. Census of Pakistan 1951, Vol. 3, p. 114

৫. Census of Pakistan 1951, Vol. 2, p. 21

৬. Mahamad Taj Uddin, ‘The Stateless people in Bangladesh: A Study’, in Barun De and Ranbir Samadder (ed.) *Devlopment and Politcial Culture, Bangladesh and India*, 1997, p. 216

৭. মিলন আহমেদ, *স্বাধীনতা ও পূর্ব পাকিস্তান*, সম্পর্ক, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৪৪

৮. পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৬৮

৯. লিয়াকত জাহাঙ্গীর খোকন, *পুব বাংলার সমাজ মন*, মনন, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা ২০০৯, পৃ. ২৮০

১০. আবেদ কামাল, মোহাজের, তথ্যপ্রকাশ, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ২৮৪

১১. সাক্ষাৎকার : ফয়েজউদ্দিন মুনজী (বয়স : ৮৮) গ্রাম+পোঃ বেদগ্রাম, থানা+জেলা: গোপালগঞ্জ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ০৪.১১.২০১১, মোহম্মদপুর ঢাকা

১২. সাক্ষাৎকার : ইউনুস বাকী (বয়স : ৮৪ বছর), জেনেভা ক্যাম্প, মোহম্মদপুর, ঢাকা, সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ২৮.১০.২০১২, নিজ বাসভবন

১৩. সাক্ষাৎকার: আবু মোঃ দেলোয়ার পূর্বে উল্লিখিত।

১৪. দৈনিক আজাদ, ১৪ জুন, ১৯৬৮

১৫. রাজর্ষী দাশগুপ্ত, ‘জেনেভা ক্যাম্প, ঢাকা অনিত্য অঞ্চল, পরিযায়ী সভা’, অনিল দাস (সম্পা.), *এখন পর্যাবরণ*, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৭৫

১৬. শাওন আকন্দ (সম্পা.), ‘বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন’, পুঁথিপত্র, ঢাকা, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪

১৭. সাক্ষাৎকার: তাজিবুল ইসলাম মণ্ডল (বয়স ৭৫), গ্রাম-তারাইল, পোঃ ফুকরা তারাই, থানা : খাসিয়ানী, জেলা: গোপাল গঞ্জ, বাংলাদেশ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ: ২৮.১০.২০১২, নিজ বাসভবন।

১৮. আকসাদুল আলম, ‘যশোর’, আবু মোঃ দেলোয়ার (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১০৬

১৯. রতনলাল চক্রবর্তী, *ভাষা আন্দোলনের দলিল*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১০৬

২০. *দৈনিক আজাদ*, ৬ জুন, ১৯৫৪

২১. *দৈনিক আজাদী (চট্টগ্রাম)*, মার্চ ১৯৭০

২২. Sunday India, 12-18 Janoury 1986, p. 18

২৩. Kssing Contemporary Archive, Vol. XVIII, 1971-1972, p. 25114

২৪. মেজর জেনারেল মাইনুল হোসেন চৌধুরী, *এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য : স্বাধীনতার প্রথম দশক*, মওলা ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ২৮

২৫. Suhana Nahar, ‘Bihari in Bangladesh : Present Status Legal Impediments and solutions in Abrar R Chowdhury (ed.) *On the Morgin: Refugees, Mignants and Minorities* 1998, p. 464

২৬. রাজর্ষী দাশগুপ্ত, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৭৬

২৭. আবেদ কামাল, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২০৪৩

২৮. সুহানা পারভীন, *বাংলাদেশের সমাজ সংস্কৃতি*, সোরা হোসেন, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১০৪

২৯. কারচুপি : রেকাম, শিফন ইত্যাদি বস্ত্রে জরি বসানোর কাজ। এই কাজে বিহারি মোহাজেররা দক্ষ

৩০. সুহানা পারভীন, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৯৮

৩১. রাজর্ষী দাশগুপ্ত, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৭৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা উপন্যাসে ক্যাম্প–কলোনি জীবন

মানুষের কাছে বাসস্থান হল মনোরম ও নিশ্চিন্ত আশ্রয়। বংশ পরম্পরায় বসবাসের জন্য মানুষ কোনও একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে তার বাসস্থান নির্মাণ করে। সেখানে সে শুধু আশ্রয়ই পায় না, সৃজন করে সংসার ও সমাজ। বসবাসের মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হয় মানবীয় সম্পর্কাদি পারিবারিক ও সামাজিক দায়-দায়িত্ব, নৈতিকতা, বেঁচে থাকার জন্য সার্বিক মূল্যবোধ। কোনও কারণে মানুষকে যখন তার সেই স্বপ্নের বাসভূমি থেকে উচ্ছিন্ন হতে হয়, তখন সে নতুন আশ্রয় এবং বাসস্থানের জন্য উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ায়। একটি স্থির জীবন-যাপন ত্যাগ করে বসতি স্থাপনের সময় উচ্ছেদ হওয়া মানুষের জীবনে নানা সমস্যা আসে। বিশেষ করে খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-চিকিৎসা—এই মৌলিক চাহিদা পূরণে সে জেরবার হয়ে ওঠে।

সাম্প্রতিক কালে দেশবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গভূমিও বিভাজিত হয়। এই বিভাজনের ফলে কতটুকু অংশ পাকিস্তানের মধ্যে গেল, কতটুকু ভারতের মধ্যে রইল তা নিয়ে দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছিল; অল্প দিনের মধ্যে তা কেটেও গেল। তার পর থেকে পুব বাংলার হিন্দুরা কাতারে কাতারে হুড়মুড় করে এপারে আসতে শুরু করে; পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানের একটি অংশ পূর্ববঙ্গে চলে যায়। সংখ্যার বিচারে হিন্দুর চলে আসা অনেক বেশি। পূর্ববঙ্গের সমৃদ্ধ হিন্দু শ্রেণির দেশত্যাগের ফলে বিপুল পরিমাণে সম্পত্তি সেখানে থেকে যায়; পাশাপাশি এপার থেকে চলে যায় স্বল্প সংখ্যক মুসলমান, তাই সেখানে অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়নি; সমস্যা তৈরি হয়েছিল এপারে আসা হিন্দুদের। সামান্য আত্মীয়তার সুবাদে সপরিবারে অযাচিত ভর করতে হয়েছে; অসম্মান অবজ্ঞা দেখেও না দেখার ভান করতে হয়েছে। এখানে ওখানে এক ফালি জায়গায় গাদাগাদি করে যতজন সম্ভব মাথা গুঁজতে হয়েছে। স্টেশনে, প্ল্যাটফর্মে, রাস্তার ফুটপাতে, খোলা আকাশের নিচে, পোড়ো জমিতে বসত করতে হয়েছে দিনের পর দিন। উদ্বাস্তু শিবিরে নাম লেখাতে হয়েছে, কত হেনস্থা, কত অপমান সইতে হয়েছে তা বর্ণনার অতীত। সেই অপমানের গ্লানি বহন করে চলতে হয়েছে গোটা জীবন। পাশাপাশি ভাঙাচোরা জীবনের মাঝেই তারা নিজেদের নতুন করে নির্মাণ করেছে, লড়তে শিখেছে প্রবল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে।

১৯৪৬ সালে কলকাতা-নোয়াখালি-বিহার সহ সারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে চলে ভয়াবহ

দাঙ্গা, এরপর থেকে পূর্ব-পাকিস্তান বাংলাদেশে রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত— এই দীর্ঘ সময়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে, এবং পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বসতি স্থাপন করে। বাসস্থানের নিরিখে আমরা তাদের চার ভাগে ভাগ করতে পারি—

i) নিজের উদ্যোগে জমি-জায়গা কিনে বসতি স্থাপন;

ii) বাড়িভাড়া করে বসবাস;

iii) ক্যাম্প কলোনিতে বাসস্থান;

iv) সম্পত্তি বিনিময় করে বাসভূমি রচনা।

এদের মধ্যে ক্যাম্প-কলোনিতে বসবাসকারির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভালো উদ্বাস্তু হয়ে আসার পর সাধারণ মানুষের আশ্রয়স্থল ছিল শিয়ালদহ স্টেশন। সেখান থেকেই তাদের নিয়ে যাওয়া হতো অস্থায়ী আশ্রয় শিবিরে। অবশ্য অনেকেই আশ্রয় শিবিরে না গিয়ে নিজের উদ্যোগে বাসস্থান সমস্যার সমাধান করে। ঐতিহাসিক প্রফুল্ল চক্রবর্তী প্রাথমিকভাবে শিয়ালদহ স্টেশনে আশ্রয় নেওয়া উদ্বাস্তুদের তিনশ্রেণিতে ভাগ করেছেন—

i) অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ও উদ্যোগী শরণার্থী; এরা সরকারি সাহায্য চায়নি, নিজেদের যা সম্বল ছিল তাই দিয়েই তারা পুনর্বাসনের চেষ্টা করে;

ii) আর এক প্রকারের শরণার্থী ছিল, যাদের অর্থ ছিলো না, কিন্তু উদ্যম ছিল; তারা আশ্রয়ের সমস্যার সমাধান করেছিল পরিত্যক্ত অথবা শূন্য বাড়ি, ফাঁকা জমি দখল করে এবং গায়ে খেটে অন্ন সংস্থান করে;

iii) তৃতীয় শ্রেণির শরণার্থীরা ছিল অত্যন্ত দরিদ্র; তাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার শিক্ষা অথবা সামর্থ্য ছিল না, তাই তারা সরকারি ক্যাম্পে আশ্রয় গ্রহণ করে;[১]

প্রাথমিক স্তরে যারা দেশত্যাগ করে তাঁরা একাধারে যেমন ছিল অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ, অন্য দিকে তারা বর্ণগত ভাবে উচ্চশ্রেণির। পূর্ববঙ্গে থাকার সময় তারা বিলাসবহুল জীবন যাপন করত। দেশত্যাগের পর তারা তাদের বুদ্ধি ও অর্থ দিয়ে নিজেদের মতো বাসস্থান তৈরি করে। কিন্তু সকলের পক্ষে তা সম্ভব হয় না, ফলে সাধারণ উদ্বাস্তুর প্রাথমিক ধাক্কা সামলাতে হয়েছে ক্যাম্প কিংবা উদ্বাস্তু শিবিরে। জীবনের এই কঠিন অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন আর. এন. সাকসেনা— 'The refugees were frightened, frustrated, dislocated and confused with no ideas the future. They has lost all they had and been out off from their own family members without knowledge of what had become of them.'[২]

সরকারের নানা ধরনের নিয়ম-কানুন, ক্যাম্পের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অন্ন-জলের অভাব, অপুষ্টি এবং প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত অপ্রতুল ব্যবস্থা উদ্বাস্তুদের জীবন বিপর্যস্ত করে তোলে। বিভাগ পরবর্তী সময়ে মানুষের দেশান্তর উভয়বঙ্গের স্থানীয় মানুষকে ব্যথিত ও সহানুভূতিশীল করে তোলে। মানবিক কারণে তারা গৃহহারা মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উদ্বাস্তুদের আগমন বাড়তেই থাকে, ফলে স্থানীয় অধিবাসীরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়। বেঁচে থাকার জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুরা মরিয়া হয়ে লড়াই শুরু করে। এবং সফলও হয়। পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গীয়দের কিছুটা অলস জীবন-যাপনের ফলে ক্রমে তারা পিছিয়ে পড়তে শুরু করে। তাছাড়া রুচি, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস—সব ক্ষেত্রেই উভয়বঙ্গীয়দের এই ভিন্নতার ফলে একে অপরের কাছে থেকে দূরে সরতে থাকে। এক পর্যায়ে এসে শত্রু সম্পর্কের অবস্থা তৈরি হয়।

এইরকম একটি কঠিন পরিস্থিতিতে ১৯৪৮ সালের ১৫ জুন একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি বের হয়, তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় সরকার এই উদ্বাস্তুদের মোটেই ভালো চোখে দেখছে না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মোহনলাল সাকসেনা ঘোষণা করেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে উদ্বাস্তুদের আবার দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। যতদিন সেটা না হচ্ছে ততদিন তাদের সাময়িক বাসস্থানে রাখা হবে। এরফলে উদ্বাস্তুদের থাকার জন্য পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন স্থানে তড়িঘড়ি শুরু হয় ক্যাম্প তৈরির কাজ। এর মধ্যে কতগুলি বেশ বড়ো আকারের। নদিয়া জেলার কুপার্স ক্যাম্প, ধুবুলিয়া ক্যাম্প; বর্ধমানের পাল্লা, মহেশডাঙা প্রভৃতি ক্যাম্প সরকারি উদ্যোগে উদ্বাস্তুদের আশ্রয়স্থল হিসেবে বেশ জোরালো জায়গা করে নেয়।

সরকার পূর্ববঙ্গের গৃহহারা মানুষের জন্য মোট পাঁচ ধরনের আবাসস্থল গড়ে তোলে। এগুলি নিম্নরূপ—

i) ট্রানজিট ক্যাম্প;

ii) পি.এল.ক্যাম্প;

iii) উইমেন্স ক্যাম্প;

iv) ওয়ার্কসাইট ক্যাম্প;

v) স্থায়ীভাবে পুনর্বাসনের জন্য ক্যাম্প বা কলোনি।

এছাড়া উদ্যোমী উদ্বাস্তুরা নিজেদের উদ্যোগে সরকারি বা বেসরকারি জমি দখল করে আরও এক ধরনের বাসস্থান তৈরি করে, যার নাম 'জবর দখল কলোনি'।

শিয়ালদহ স্টেশনে দীর্ঘ অপেক্ষার পর উদ্বাস্তুদের প্রথম ঠিকানা হল অস্থায়ী বা ট্রানজিট ক্যাম্প। এই শিবিরগুলি তৈরির ক্ষেত্রে সরকার প্রধানত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য ব্যবহৃত ব্রিটিশ সেনা ছাউনিকে নির্বাচন করেছিল। তা ছাড়াও সরকারের নির্বাচিত ফাঁকা জমিতে তাঁবু টানিয়ে উদ্বাস্তুদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। যতদিন উদ্বাস্তুদের স্থায়ী বসবাসের বন্দোবস্ত না করা যায়, ততদিন তাদের অস্থায়ী আশ্রয় শিবিরে রাখবার ব্যবস্থা করা হয়। এই শিবিরগুলি মানুষের বসবাসের প্রায় অনুপযোগী ছিল। সরকারের ভাবনা ছিল অল্প দিনের জন্য এই বাসস্থান নির্মাণ, তাই এক্ষেত্রে অধিক অর্থ ব্যয় করবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু পরবর্তী সময়ে অস্থায়ী আশ্রয়স্থল স্থায়ী বাসস্থানে রূপান্তরিত হয়।

দেশভাগ এবং তার পরবর্তী সময়ে নানা কারণে বহু মানুষের মৃত্যু ঘটে, ফলে অগণিত মানুষ অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে। তারা যেমন অস্থায়ী উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নেয়, তেমনি অনেক পঙ্গু ও অক্ষম ব্যক্তি আশ্রয় নেয় এখানে। সরকার এই অভিভাবকহীন, অক্ষম ও পঙ্গু ব্যক্তিদের জন্য Permanent Liablitity সংক্ষেপে P.L. ক্যাম্প তৈরি করে স্থায়ী পুনর্বাসন দেয়। এদের সারা জীবনের ভরণ-পোষণের দায়ভার গ্রহণ করে সরকার। নদিয়ার চাঁদমারী, কুপার্সের একাংশ, চালতা ও ধুবুলিয়া, মেদিনীপুরের দুধুকুণ্ডী, হুগলীর বাঁশবেড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগণার অশোকনগর, টিটাগড় প্রভৃতি অঞ্চলে বসানো হলো এই ধরনের শিবির।

পাশাপাশি যে সব পরিবারে পুরুষ অভিভাবক ছিল না, সেইসব অনাথ বিধবা মা এবং তাদের শিশু সন্তানদের আশ্রয় জুটল উইমেন্স ক্যাম্প বা মহিলা আশ্রয় শিবিরে। এক্ষেত্রে শর্ত ছিল পুত্র সন্তানের বয়স আঠারো পূর্ণ হলে তাকে ক্যাম্পে রাখা চলবে না; তবে কন্যা সন্তান বিয়ের আগে পর্যন্ত মায়ের কাছে থাকতে পারবে। যদিও পরবর্তীকালে উদ্বাস্তুরা এই শর্ত মানেনি, সাবালক ছেলেরাও মায়ের সঙ্গে বসবাস করেছে। রানাঘাটের মহিলা শিবির, রূপসী পল্লী টিটাগড়ের মহিলা শিবির, হুগলীর ভদ্রকালী, বাঁশবেড়িয়ার মহিলা শিবির উইমেন্স ক্যাম্প হিসেবে বেশ গুরুত্ব পায়।

ওয়ার্কসাইট ক্যাম্প একটু অন্য ধরনের। পুনর্বাসনের জন্য সরকার পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গায় প্রচুর জমি অধিগ্রহণ করে, কিন্তু সেগুলির বেশিরভাগই বাসযোগ্য নয়। কোনও জমি জলমগ্ন, কোনওটি ঝোপ-জঙ্গলে ভর্তি কিংবা উচু-নিচু এবড়ো-খেবড়ো। এই জমিগুলির উন্নয়ন ঘটিয়ে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে; সেই লক্ষ্যে বিভিন্ন অস্থায়ী উদ্বাস্তু শিবির থেকে পরিশ্রমী সক্ষম পুরুষদের নির্বাচন করা হয়। মূলত দুটি কারণে সরকার এই উদ্যোগ গ্রহণ করে।

i) অধিগৃহীত জমিতে উদ্বাস্তুদের কাজে লাগালে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে;

ii) জমির উন্নয়ন ঘটিয়ে উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে; এর ফলে উদ্বাস্তুরা নিজেদের তাগিদেই ভালোভাবে কাজ করবে;

সোনারপুর এবং বাগজোলা সহ সারা রাজ্যে এই ধরনের মোট বত্রিশটি ক্যাম্প বসানো হয়। কিন্তু মজার বিষয় হল, যে উদ্বাস্তুদের পরিশ্রমে জমি বাসযোগ্য হল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেখানে তাদের ঠাঁই হয়নি; বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় চারপাশের নানা কায়েমী স্বার্থ।[৩]

সাধারণ উদ্বাস্তুদের স্থায়ীভাবে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য সরকার অনেকগুলি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই পরিকল্পনাগুলিকে প্রাথমিকভাবে দুইভাগে ভাগ করা যায়—

i) কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শহর ও শহর সংলগ্ন অঞ্চলে পুনর্বাসন;

ii) গ্রামীণ অঞ্চলে শ্রমজীবী মানুষদের জন্য পুনর্বাসন;

কলকাতা তথা শহরাঞ্চলে সরকার অনেক বাড়ি হুকুম দখল করে উদ্বাস্তুদের মধ্যে বিতরণ করেছিল। বিতরণ করা এই বাড়িগুলিতে দুই শ্রেণির উদ্বাস্তু বসবাস করে—

প্রথমত, যারা অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল, তারা সরকার প্রদত্ত বাড়িতে বসবাসের জন্য ভাড়া দিত;

দ্বিতীয়ত, যারা অসচ্ছল, তাদের নির্বাচিত করে সরকার বিনা ভাড়ায় থাকার ব্যবস্থা করে; এছাড়াও সরকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত মিলিটারী বারাক দখল করে সরকারি ব্যবস্থাপনায় তা বিতরণ করে।

সরকার গ্রামীণ মানুষকে পুনর্বাসন দেবার জন্য পেশা ভিত্তিক কলোনি তৈরি করে। সরকারের উদ্দেশ্য ছিল ছিন্নমূল মানুষগুলি যাতে পূর্ববঙ্গের জীবন ধারা বজায় রাখতে পারে। সেজন্য তাদেরকে শুধুমাত্র বাসস্থানের জায়গাই দেওয়া হয়নি, তার সঙ্গে অতিরিক্ত জায়গা-জমি দেওয়া হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে এই ধরনের চার শ্রেণীর কলোনি তৈরি করা হয়—

i) কৃষি কলোনি— কৃষকদের জন্য এক লপ্তে অনেকখানি জমি অধিগ্রহণ করে তা বিতরণ করা হয়। এক্ষেত্রে কৃষকদের মধ্যেই তা বিতরণ করা হয়েছিল। বসবাসের জায়গা ছাড়া তাদের অতিরিক্ত জমি দেওয়া হয় যাতে সেখানে ফসল ফলিয়ে দিন-যাপন করতে পারে;

ii) তাঁতি কলোনি— পূর্ববঙ্গের তাঁতি সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য কলকাতার কাছাকাছি পুনর্বাসন দেওয়া হয়; যাতে তারা তাদের উৎপাদিত বস্ত্র সহজে এবং ন্যায্য দামে বিক্রি করতে পারে। এক্ষেত্রে ফুলিয়া, শান্তিপুর অঞ্চলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাঁতিদের এই পুনর্বাসন সার্থক হয়েছিল।[৪]

iii) মৎস্যজীবী কলোনি---- মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মানুষকে পুনর্বাসন দেবার জন্য ভাগীরথীর পূর্ব তীরকে বেছে নেওয়া হয় যাতে তারা ওই নদীকে নির্ভর করে জীবনধারণ করতে পারে;

iv) বারুজীবী কলোনি— বারুজীবী তথা পান চাষীদের জন্য হুগলী ও নদিয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে কলোনি তৈরি করে। তাদের জন্য এমন স্থান বেছে নেওয়া হয়েছিল যেখানে সহজে পান ফলনো যায় এবং বিপণনের ব্যবস্থা করা যায়। এক্ষেত্রে উদ্বাস্তুদের বসতবাড়ির সঙ্গে পরিবার পিছু দশকাঠা করে জমি দেওয়া হয়েছিল।[৫]

যারা সরকারের অনুগ্রহ নিতে চায়নি, এমন একশ্রেণির উদ্যমী মানুষ সরকারের কিংবা কোনও ব্যক্তির জমি দখল করে কলোনি স্থাপন করে। বলপূর্বক জমি দখল করে কলোনি গঠন করা হয় বলে এই ধরনের কলোনির নাম 'জবরদখল কলোনি।' ১৯৫১ সালে বাস্তুহারা কর্মপরিষদের পক্ষ থেকে জবরদখল কলোনিগুলি গড়ে ওঠার কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে— যারা প্রথম দিকে উদ্বাস্তু হয়ে আসে তারা পরিত্যক্ত মিলিটারি ক্যাম্পগুলিতে আশ্রয় পেয়েছিল, এরপরে যারা আসে তাদের ক্যাম্পগুলিতে স্থান সংকুলান হয় না তাই তারা কলকাতার উপর পরিত্যক্ত সামরিক ব্যারাকগুলিতে আশ্রয় নেয়। সেগুলি পূর্ণ হওয়ার পর তারা কলকাতা ও শহরতলির ফাঁকা বাড়িতে প্রবেশ করে। শূন্য বাড়িগুলি পূর্ণ হওয়ার পর আশ্রয় সমস্যা সমাধানের জন্য অনন্যোপায় হয়ে উদ্বাস্তুরা শহরতলী শিল্পাঞ্চল ও পশ্চিমবাংলার মফঃস্বল অঞ্চলে পতিত ও অনাবাদী সরকারি ও বেসরকারি জমিতে সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় এই ধরনের জবরদখল উপনিবেশ গড়ে তোলে।[৬]

স্বাধীনতা উত্তরকালে ক্যাম্প-কলোনি জীবনের বাস্তব চিত্র বাংলা উপন্যাসে কতটা এবং কোনভাবে বিধৃত হয়েছে তা আমরা আমাদের গবেষণাপত্রের এই অংশে অনুসন্ধান করবার চেষ্টা করেছি। মহীতোষ বিশ্বাসের 'পরতাল' উপন্যাসে ক্যাম্প-কলোনির চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে ইতিহাসের অনুষঙ্গে। উপন্যাস শুরু হয়েছে নয়া কল্যাণপুর কলোনিতে গড়ে ওঠা বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা মীরা দিদিমনির শ্রেণিকক্ষের মধ্যে কেঁদে ফেলার কাহিনি দিয়ে।

পূর্ববঙ্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে শশধর মাস্টার ও তার মেয়ে মীরা নানা বিপর্যয় অতিক্রম করে শিয়ালদহ স্টেশন হয়ে নদিয়ার কুপার্স ক্যাম্পে উপস্থিত হয়। কুপার্সের বাস্তব চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে

উপন্যাসে। লেখকের কথায়— 'ওরা বুঝতে পারল এক নরক থেকে হাজির হয়েছে আর এক নরকে।' আর পাঁচটা ক্যাম্পের মত এখানেও বিশাল এলাকা জুড়ে গায়ে গায়ে লাগানো তাবু, তা দিয়ে হয়তো বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচা যায়, কিন্তু চারপাশ বন্ধ তাবুতে দম আটকে মরার উপক্রম। জীবন-যাপনের অপ্রতুল উপকরণ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সম্পর্কে উপন্যাসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে— 'সাড়ে সাতশো লোক প্রতি চল্লিশটি টিউবওয়েল ওয়েল বড়দের জন্য বরাদ্দ মাথাপিছু সাপ্তাহিক ডোল দুই টাকা, ছোটদের এক টাকা। একশো আশি জনের জন্য একটি করে পায়খানা। প্রকৃতির ডাক তো বলে কয়ে আসে না। অসময়ের ডাকে অনেককেই কম্মোটি সারতে হয় আশপাশের জঙ্গলে। কিংবা খোলা জায়গাতে।'[৭]

'পরতাল' উপন্যাসে চারটি ভিন্ন ধরনের কলোনির কথা উল্লিখিত হয়েছে—

i) রানাঘাটের কুপার্স ক্যাম্প;

ii) উইমেন্স ক্যাম্প

iii) নয়া কল্যাণপুর সমবায় কলোনি;

iv) নমোপাড়া (জবরদখল কলোনি)।

শশধর মাস্টার তার মেয়ে মীরাকে নিয়ে কুপার্স ক্যাম্পে আশ্রয় পায়। ক্যাম্পের দরিদ্র জীবনের মধ্যেও শশধর ও মীরার প্রতি অন্য ক্যাম্পবাসীর কিছুটা হলেও সমীহ ছিল; কারণ তারা জানত পূর্ববঙ্গে শশধর নামী স্কুলে শিক্ষকতা করতেন, মীরা আই.এ. পাশ। তাই পাঁচমিশেলি লোকায়ত জীবনের খেয়োখেয়ি আর ঝগড়া-বিবাদের আঁচ একটু কম লাগে ওঁদের গায়ে। কিন্তু সাপের কামড়ে শশধরের মৃত্যুর পর মীরার মাথার উপর কেউ রইল না 'মীরা বুঝল তার নিজের লড়াইটা এবার তাকে লড়তে হবে নিজেকেই।' ক্যাম্প সুপারের তত্ত্বাবধানে শশধর বাবুর পারলৌকিক ক্রিয়া শেষ হবার পর মীরার নতুন ক্যাম্পে চলে যেতে হয়। ক্যাম্প সুপার তাকে জানায়— 'আপনাকে আমরা এই ক্যাম্পে আর রাখতে পারব না। অভিভাবকহীন কোনো মহিলাকে এখানে রাখার নিয়ম নেই।'[৮] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন সরকার পুরুষ অভিভাবকহীন কোনও মহিলাকে সাধারণ ক্যাম্পে বসবাসের অনুমোদন দেয়নি, তাদের জন্য পৃথক ক্যাম্পের ব্যবস্থা করেছিল। মীরাকে তাই সরকারি বিধি মেনে উইমেন্স ক্যাম্প বা মহিলা শিবিরে স্থানান্তরিত হতে হয়।

পরিত্যক্ত মিলিটারি ব্যারাক ও তার মাঠ সাফ-সুতরো করে এখানে বসানো হয়েছে ক্যাম্প। হাজার দেড়েক তাবু দিয়ে ছেয়ে দেওয়া হয়েছে এই শিবিরকে। সবাই তারা মহিলা— কারও পুরুষ

নেই। কেউ বা একা, কারও বা আছে ছেটো ছেলেমেয়ে। পুব বাংলার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কেউ বা হারিয়েছে স্বামীকে, কেউ বা বাবাকে। এদের অনেকেরই রয়েছে পালাক্রমে ধর্ষিতা হওয়ার নির্মম অভিজ্ঞতা। শোকে-দুঃখে-অপমানে এদের কেউ কেউ নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছে, কেউ কেউ হয়ে উঠেছে ক্ষ্যাপাটে, হিংস্র, প্রতিশোধপরায়ণা। এরকম একটি মহিলা শিবিরে মীরাকে পাঠানো হয় শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগপত্র দিয়ে।

এই ক্যাম্পের সুপার সুলেখা সেন আর আছেন গীতা দে— স্টোর কিপার। এর পরবর্তী ধাপে রয়েছেন 'জেনারেল এ্যাসিস্ট্যান্ট', সংক্ষেপে জি.এ। এরাই সংখ্যায় বেশি এছাড়া মীরাকে নিয়ে ছ'জন শিক্ষিকা রয়েছেন; সেই সঙ্গে একজন মাত্র পুরুষ প্রহরী রয়েছেন যিনি লাঠি হাতে সারা শিবির টহল দিয়ে বেড়ান। আর পাঁচটি উদ্বাস্তু কলোনির মত এখানেও নিত্য দিনের জীবনযাত্রায় অসহায় মহিলারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করে, আবার এসব ভুলে গিয়ে ভাব-ভালোবাসায় একাত্ম হয়ে ওঠে। তাঁবুর ছোট্ট একটুখানি জগৎ; শুধু বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু দরকার, ততটুকু নিয়ে এই বেঁচে থাকা; এরই মধ্যে প্রতিনিয়ত এক ভয়, ক্যাম্পের এই তাঁবুর আশ্রয়টুকু যদি চলে যায়। সেজন্যেই মানুষগুলি ক্রমে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ছে। তাঁদের সম্পর্কে লেখকের কথায় পাই— 'আগে যেন টানটান তেজি ভাব ছিল একটা। সেটা যেন হারিয়ে যেতে বসেছে ক্রমেই।'

মহিলা শিবিরের পাশাপাশি দমদম অঞ্চলের বিশেষ এক ধরনের উদ্বাস্তু উপনিবেশ— 'সমবায় কলোনি' গঠন ও সেখানকার মানুষের জীবন-যাপনের কথা উঠে এসেছে উপন্যাসে। পূর্ববঙ্গের খুলনা অঞ্চলের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান শিবনাথ বসুর নেতৃত্বে গঠিত হয় এই সমবায় কলোনি। শিবনাথবাবু তার পূর্ব পরিচিত সমবায় দপ্তরে কলকাতায় কর্মরত মহেন্দ্র চৌধুরীর সহায়তা পান কলোনি গঠনে। খুলনার উদ্বাস্তুদের মধ্যে কিছু মানুষ একত্রিত হয়ে স্থির করে 'অমরপুর নিশিন্দা, দিয়ালিয়া মৌজা নিয়ে গড়ে তোলা হবে পনেরো শ' পরিবারের একটি উদ্বাস্তু উপনগরী। এর একটি নামকরণ দরকার। কী নাম দেওয়া যায়? শিবনাথের চোখের সামনে ভেসে উঠল তাঁর ফেলে আসা খুলনা জেলার প্রিয় গ্রাম কল্যাণপুর। তিনি ফস করে বলে ফেলেন— আমি প্রস্তাব রাখছি, আমাদের এই কলোনির নাম হোক— নয়া কল্যাণপুর কো-অপারেটিভ কলোনি সোসাইটি লিমিটেড'।' মানুষ যে তার মনের মধ্যে অতীতকে পুষে রাখে তার প্রমাণ শিবনাথের কলোনির এই নামকরণ। বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা দেখি উদ্বাস্তু পাড়ার নাম পাবনা কলোনি', 'ঢাকা কলোনি', 'নয়া গোপালগঞ্জ' ইত্যাদি। উদ্বাস্তুদের দোকানের নাম 'খুলনা স্টোর্স', বাগেরহাট বস্ত্রালয়', ফরিদপুর ফার্নিচার প্রভৃতি। উদ্বাস্তুরা

গড়ে তুলেছে ‘নীলফামারী কাঁঠালীপাড়া (ফরিদপুর) সম্মিলনী’ জগন্নাথ হল (হোস্টেল) সম্মিলনী’ চট্টগ্রাম স্মৃতি সংসদ’ ইত্যাদি। এ থেকে প্রমাণ হয় মানুষ তার অতীত স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়।[১০]

শিবনাথ বসুর সভাপতিত্বে কো-অপরারেটিভ কলোনিটির রেজিস্ট্রেশন হয়। শুরু হয় শেয়ার বিক্রির কাজ; প্রাথমিক সদস্য দুশো চুরানব্বই জন। শুরু হয় জমি কেনার কাজ। জমির কিছু অংশ কিনে, কিছু দখল করে গঠিত হয় এই কলোনি। সর্বসম্মতভাবে জমি বন্টনের সিদ্ধান্ত ঠিক হল এভাবে— ‘বসতবাড়ির জন্য বরাদ্দ হবে পাঁচ কাঠা। কৃষক বারুজীবী পরিবারের জন্য বরোজের জমি অতিরিক্ত দশ কাঠা এবং চাষী পরিবারের প্রত্যেকের জন্য বরাদ্দ হল পাঁচ বিঘা করে চাষের জমি।’[১১]

কলোনিতে ঘরছাড়া নিরাশ্রয় মানুষের পাশাপাশি আর এক শ্রেণির উদ্বাস্তুর আগমন ঘটে ‘এঁরা হলেন চাকুরে-বাকুরে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক মানুষ। কলকাতা বা কোনো শহর-অঞ্চলে ভাড়া-বাড়িতে বাস করেন, এদের এখনই কলোনিতে ঘরবাড়ি বেঁধে বাস করার ইচ্ছে নেই। কিন্তু একটা প্লট ঠেকিয়ে রাখতে চাইছেন।... ভবিষ্যতে জমিটা বিক্রি করে দিলে চড়া দাম পাওয়া যাবে।’[১২] বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে পঞ্চাশের দশকে কলকাতার পার্শ্ববর্তী কলোনিগুলিতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অনেকেই জমি দখল করে রাখলেও বসবাস করেনি; কারণ কলোনিগুলি সে অর্থে বসবাস উপযোগী ছিল না। পরবর্তী সময়ে যখন কলোনির অনেকখানি উন্নতি সাধন হল, তখন থেকে তারা সেখানে আস্তানা গাড়ল। তাদের সঙ্গে সঙ্গে আরও এক শ্রেণীর মানুষ এসে এখানে বসতি স্থাপন করল, যারা চড়াদামে কলোনির মূল মালিকদের কাছ থেকে জমি কিনতে সমর্থ হল। ফলে কলোনি যারা গড়ে তুলেছিল তাদের একটি অংশ অন্যত্র চলে গেল।

নয়া কল্যানপুর কলোনি ক্রমে সমৃদ্ধ জনপদে পরিণত হয়। স্কুল, বাজার-ঘাট, হাসপাতাল তৈরি হয়েছে। রাস্তা বেশ চওড়া; পাকা ড্রেন প্রায় কলোনির সর্বত্র। সব মিলিয়ে শিবনাথ বসুর স্বপ্নের এই কলোনিটি জমজমাট এক উপনগরী। কিন্তু নয়া কল্যাণপুর কলোনির জন্য বরাদ্দ সকারি অনুদানের টাকা সব যে সৎভাবে খরচ হয়, তা নয়। ‘ক্ষমতার লোভের সঙ্গে সঙ্গে টাকার লোভও গ্রাস করেছে শিবনাথকে। দেদার চলেছে টাকার নয়ছয় কোথাও কোনও হিসেব-পত্তর দেবার দরকার বোধ করেন না তিনি। দিলেও তাতে হাজার রকম কারচুপি।’[১৩]

কলোনিগুলিতে শিবনাথ বসুর মত নেতাদের প্রভাব প্রতিপত্তি অকল্পনীয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের শেষ আমলের দিকে দুর্নীতির বাড়-বাড়ন্ত দেখা দিয়েছিল। তখন পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী রাজনীতিও বেশ মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। বামপন্থী কর্মীরা কলোনিগুলিতে গিয়ে গিয়ে উদ্বাস্তুদের সংঘবদ্ধ করবার চেষ্টা করে, পাশাপাশি দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার করে তোলে।

উপন্যাসে আরও একটি কলোনির কাহিনি বিবৃত হয়েছে। নয়া কল্যাণপুর সমবায় কলোনির পাড় ধরে বয়ে যাওয়া খালের পাশ দিয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেলেই চোখে পড়ে এই জবরদখল কলোনি— 'নোমোপাড়া'। উপন্যাসে কলোনি চিত্রটি এমন— 'হতদরিদ্র, মুলিবাঁশ টালির বাড়িঘরের সাবেকি কলোনিপাড়ার আদলে একটি পাড়া। বাসিন্দারা সবাই নমশূদ্র। লোকের মুখে মুখে তাই পাড়াটির নাম নোমোপাড়া।... পাড়াটির দৈন্যদশা চোখে পড়ে এক নজরেই। পুরুষ মানুষেরা কেউ রিকশা চালায়। কেউ রাজমিস্ত্রির জোগালে। কেউ সাপুড়ে। কেউ জেলে। কেউ কাঠমিস্ত্রি। পুরুষ মানুষের আয়ে সংসার চলে না, তাই বেশিরভাগ বাড়ির বউ কিংবা মেয়ে ঠিকে ঝি-র কাজ করে...।"[১৪] এখানেই মঘাই মণ্ডল, নিমাই সাপুড়ের মত শ্রমজীবী মানুষের বাস। তারা সকলে মিলে কলোনিতে প্রাইমারি স্কুল তৈরি করে। তপেশ বিশ্বাস নামে বি.এ. ক্লাসের এক ছাত্রকে এনে স্কুলের শিক্ষক পদে বসায়। ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদেরও তারা স্কুলে পাঠায়। পূর্ববঙ্গে থাকতে নিম্নবর্ণের মধ্যে কোনও দিনই সে অর্থে লেখাপড়ার চল ছিল না, তারাই দেশভাগের পরে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দিতে উৎসাহী হয়ে ওঠে।

উপন্যাসে এই কলোনিরই বাপ-মা হারানো রোহন দাস কলোনির স্কুল থেকে জেলার মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে প্রথম বিভাগে পাশ করে কলকাতার নামী কলেজে পড়তে যায়। হঠাৎই মীরা দিদিমনির হৃদরোগে মৃত্যু হয়। তার গচ্ছিত টাকা থেকে রোহনের পড়ার খরচ চলে। নোমো পাড়ার পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় বিশিষ্টজনেরা বলেন— 'এ পাড়ার একটা ছেলে এবার জেলায় ফার্স্ট হয়েছে'। স্কুলে পড়া ছেলে-মেয়েদের নীতিশিক্ষা দিতে বাপ-মায়েরা বলেন— 'পারবি রোহন দাসের মতো হতে?' অখ্যাত এই জনপদটিকে ঘিরে এখানকার মানুষ নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখে।

রমেশচন্দ্র সেনের 'পুব থেকে পশ্চিমে' উপন্যাসে দক্ষিণ কলকাতার 'তিলকনগর' কলোনির ছিন্নমূল মানুষদের জীবন সংগ্রাম, অভিযোজন ও রূপান্তরের কথা বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববঙ্গের শ্রীপুর নামক হিন্দু প্রধান গ্রামে স্বাধীনতার বেশ কিছুকাল পরেও বেশ কয়েক ঘর হিন্দু থেকে গিয়েছিল।

স্থানীয় মুসলমানদের অত্যাচারে তারাও দেশত্যাগ করে তাদের একটি বড় দল শিয়ালদহ স্টেশনে এসে পৌঁছোয়। তারা সরকারি ক্যাম্পে না গিয়ে যাদবপুরের কাছে তিলকনগর নামে একটি কলোনি গড়ে তোলে।

দেশবিভাগের পর বাস্তুহারাদের নিজেদের চেষ্টায় পশ্চিমবাংলায় বিশেষ করে কলকাতার আশেপাশে পড়ো জংলা জমিতে যে উপনিবেশগুলি গড়ে উঠেছিল 'তিলক নগর' তেমনই একটি কলোনি। কলোনি গঠনে নেতৃত্ব দেয় অধ্যাপক নির্মল সেন। তার সঙ্গে যুক্ত হয় ধ্রুব, ব্রজ, শিবকালী, জয়দ্রথ, জলেশ্বরের মত অনেক মানুষ। নির্মল কলোনির সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। এই কলোনিতেই শ্রীপুর গ্রামের সতেরোটি পরিবার বসতি স্থাপন করেছে। পূর্ববঙ্গের মত এখানেও তারা একে অপরের কাছাকাছি থাকতে চায়। পরস্পরের সুখে-দুঃখে অংশীদার হওয়াই তাদের লক্ষ্য। পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু উপনিবেশগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় পূর্ববঙ্গের একই অঞ্চলের মানুষ এক জায়গায় এসে বসবাস করছে। প্রথমে কয়েকজন এসে বাসস্থান নির্বাচন করেছেন, পরে তারাই বাকিদের আসবার এবং বসবাসের সুযোগ-সুবিধা করে দিয়েছে।

জমি দখল করে কলোনি গঠনের সংবাদ পৌঁছায় জমিদারের কানে। জমিদারের লোক গুণ্ডা নিয়ে এসে আক্রমণ করে, লড়াই হয়। জয়দ্রথ এই কলোনির বাসিন্দা, সে পূর্ববঙ্গের লাঠিয়াল। চর দখল, ফসল কাটতে গিয়ে দেশে অনেকবার তাকে লাঠিয়ালি করতে হয়েছে; আজ কলোনি রক্ষণ করতে সে লড়াইয়ে নেমে পড়ে। আশেপাশের কলোনি থেকেও লোকজন ছুটে আসে। সম্মিলিত এই প্রতিরোধের কাছে পরাজিত হয় আক্রমণকারীরা। গায়ের জোরে উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদ সম্ভব না হওয়ায় জমির মালিকেরা আইনের আশ্রয় নেয়, উদ্বাস্তুরা আইনগতভাবে আত্মরক্ষার পথ খোঁজে। পাশাপাশি রাজনৈতিকভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। তিলকনগর কলোনির মত অনেকগুলি কলোনির লোক সম্মিলিতভাবে লেডি উইলিংডন রোডে সভা করে। 'প্রত্যেক দলের সামনে ফেস্টুন, লোকের হাতে হাতে পতাকা।... 'ইকিলাব জিন্দাবাদ' বলে, 'বন্দেমাতরম্' বলে, মিছিল চলতে শুরু করে। সকলের আগে চলেছে সর্দার জয়দ্রথ...। চোঙা মুখে লাগিয়ে জয়দ্রথ বলে, বাস্তুহারা উচ্ছেদ আইন—। পিছনে শত শত কণ্ঠে ধ্বনি ওঠে চলবে না চলবে না।'[১৫] তিলকনগর কলোনির নেতা নির্মল সেন এই সভায় বক্তৃতা করে। শ্রোতারা মুগ্ধ হয়। তিলকনগরের যুবকরা পাঁচজনকে শুনিয়ে বলে 'উনি আমাদের নিমুদা, তিলকনগরের নির্মল সেন, এম.এ.- গোল্ড মেডালিস্ট।'

পুলিশ এবং গুণ্ডাদের আক্রমণের মধ্যেও কলোনি ক্রমে বড় হতে থাকে। কলোনির প্রত্যেকেরই বাসস্থানের এবং বেঁচে থাকার সমস্যা, তাই পারস্পরিক সম্পর্কের দৃঢ়তা তৈরি হয়; সংঘবদ্ধভাবে কাজ করতে শুরু করে—কলোনির যে কোনও একজনের কাজকে তারা নিজের কাজ মনে করে। এই প্রসঙ্গটি উপন্যাসের মধ্যে উঠে এসেছে— 'আজ ধ্রুব ও হরিভূষণের ঘর উঠবে। ধ্রুবর উঠবে দুখানা বড় ঘর, রান্না ঘর একটা। চালার কাঠামো, বেড়া আগেই তৈরি ছিল। সন্ধ্যার পরেই একদল সেগুলো নিয়ে আসতে লাগল। ছোটরা আলো ধরে পথ দেখায়। আর একদল খুঁটি পোঁতে, এ যেন সারা কলোনির কাজ।'[১৬] পাশাপাশি কলোনির বাসিন্দাদের মধ্যে জমির দখল পাওয়া নিয়ে বিবাদও তৈরি হয়। সকলেই চায় ভালো জমি পেতে। ওপার বাংলায় যারা ছিল উচ্চবর্গীয়দের অধীনস্থ, তারা অধিকার ও মান মর্যাদা পেতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। জলেশ্বর নির্মলকে বলে— 'এতদিন আপনারা সরস মাটি, সরস জল ভোগ করেছেন। এবার আমাগো ভোগ করতে দেন কর্তা।'[১৭] এতদিন যারা ছিল অপমানিত, তারা স্বভাবত আধিপত্যের অধিকার দাবি করল। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন উদ্বাস্তু হয়ে আসার পর বাঁচার লড়াইয়ে অর্থনৈতিকভাবে যারা এগিয়ে গেল তারাই সমাজের প্রথম সারিতে অবস্থান করতে লাগল। তিলকনগরের নিম্নবর্ণের উদ্বাস্তুর মুখে বদলে যাওয়া সময়ের কথা শোনা যায়— 'কালের হাওয়া বদলাইছে। এখন আমরা বুঝছি আলো-বাতাসের আপনাগো যেমন দরকার আমাগোও তাই'[১৮]— তাদের প্রতিবাদের ফলেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে লটারি করে জমিবন্টন করতে হয়।

কলকাতার উপকণ্ঠে যে কলোনিগুলি গঠিত হয়েছিল তাদের জীবন সংগ্রামের পাশাপাশি একটি বিশেষ বিষয়ে ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়, তা হল শিক্ষার প্রতি অনুরাগ। 'পুব থেকে পশ্চিমে' উপন্যাসে উদ্বাস্তুদের নানা সংকট থাকা সত্ত্বেও তারা কলোনির মধ্যেই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে বিদ্যালয়টি পরে সরকারি অনুমোদন লাভ করে। এখান থেকেই ধ্রুব কবিরাজের বিধবা বোন উমা পুনরায় পড়াশুনা করে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করে, পরে সুকান্তি নামে একটি ছেলেও ভাল ফল করে। তিলকনগরে সত্যশরণের মায়ের নামে কলেজ তৈরি হয়েছে; নাম রাখা হয়েছে— 'মহেশ্বরী বাণীপীঠ'।

উপন্যাসের শেষে কলকাতার নিকটবর্তী অনেক কলোনির অর্পণপত্র পাবার কথা বলা হয়েছে। 'তিলকনগর' কলোনির লোকজন আশায় বুক বাঁধে— তারাও জমির মালিকানার বিষয়ে সরকারের স্বীকৃতি পাবে। কলোনির সার্বিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে নানা সমস্যা তৈরি হয়— ব্রজ, মন্মথ, উটেজদু মিলে নির্মল সহ কলোনি কমিটির সকলের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা-রটাতে চেষ্টা করে। নতুন করে নির্মল

সেক্রেটারী নির্বাচিত হলে বিরোধীদের দ্বারা আক্রান্ত হন নির্মল এবং তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। ক্রমে নির্মলের সুস্থ হয়ে ওঠা এবং বিধবা উমা এবং নির্মলের মিলনের মধ্য দিয়ে লেখক কলোনি জীবনের কাহিনিতে আশাবাদের কথা ব্যক্ত করেছেন।

অমিয়ভূষণ মজুমদার 'নির্বাস' উপন্যাসে ছিন্নমূল মানুষের জীবনের গভীর টানাপোড়েনকে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসে উদ্বাস্তু নারী বিমলা বা বিমি বা বিমলপ্রভার স্মৃতিচারণায় এবং ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতায় চিত্রিত হয়েছে নানা সংকট, সেই সঙ্গে 'হলুদমোহন' ক্যাম্পের অধিবাসীদের জীবন চিত্র অঙ্কিত হয়েছে নানা আঙ্গিকে। ক্যাম্পের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন— 'এখানে সৈন্যবিভাগের একটা বড়ো রকমের ঘাঁটি ছিলো।... আর এটা যে সৈন্যদলের ঘাঁটি ছিলো তা অন্য কেউ না ব'লে দিলেও বোঝা যায়।... এটা এখনও একটা ঘাঁটি। বাস্তুহারাদের। তাবুগুলোতে তারা থাকে। ছ'হাত বাই চার হাত তাবুতে বড় জোর দুটি যোগ করে এক একটি পরিবার। এমন অনেক পরিবার। আর কিছু দূরে বাঁশের বেড়া আর খড়ের ছাঁদ দিয়ে তৈরি কয়েক খানা ঘর। ক্যাম্পের দপ্তর।"[১৯]

দেশভাগের পর পূর্ব বাংলার অসংখ্য বাস্তুচ্যুত মানুষ সীমানা অতিক্রম করে বনগাঁ হয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে। বিমলা বহু বাঁধা-বিপত্তি অতিক্রম করে কোনও ক্রমে বনগাঁ স্টেশনে উপস্থিত হয়। অনাহারে, অনিদ্রায় এবং পথশ্রমে বিমলা তখন অত্যন্ত অসুস্থ। সেই সময়ে একটি উদ্বাস্তু দলের সদাশয় ব্যক্তি মরণচাঁদ বিমলাকে সার্বিক আরক্ষা দেয়। এমনকি তার দলের লোকের সঙ্গে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে আসে বিমলাকে। তারা শিয়ালদহ স্টেশন থেকে বেশ কিছুটা দূরে সরে এসে একটি জঙ্গলাকীর্ণ পরিবেশে গাছপালা কেটে বসতি স্থাপন করে। কিন্তু জমির মালিকের অত্যাচারে এবং সাপের ভয়ে সেখান থেকে তারা চলে যায়; অবশেষে আশ্রয় নেয় হলুদমোহন ক্যাম্পে। মরণচাঁদের দলটির সঙ্গে বিমলাও আশ্রয় পায় এই ক্যাম্পে।

ক্যাম্পে কিছুদিন থাকার পর সেখানে বন্যা দেখা দেয়। ক্যাম্পের লোকেরা তাঁবুগুলোর নিচে সেই স্বল্প পরিসর সিমেন্টে ঢাকা কাদায় প্যাঁচপেঁচে হয়ে ওঠে, এটাই ক্যাম্পে বর্ষার রূপ। অবিরাম বর্ষায় সমগ্র ক্যাম্প যখন জলমগ্ন, শিশুরা পর্যন্ত কোমর জলে দাঁড়িয়ে ধুঁকছে; ভোর রাতে তখন একদল লোক উঁচু রাজপথে গিয়ে দাঁড়ালো। তারাই পথ দেখালো। লেখকের কথায় 'তাদের দেখাদেখি গোটা ক্যাম্পটাই সড়কের উচ্চতাকে আশ্রয় করলো।' উদ্বাস্তুরা জানতো সড়কটা ধরে সোজাসুজি চলতে থাকলে কোথাও না কোথাও পৌঁছানো যায়। সার বেঁধে চলতে চলতে তারা পৌঁছল শহরের প্রধান

স্কুলের বন্ধ ফটকটার সামনে। তারপর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে বেড়া ফাঁক করে গড়িয়ে স্কুল বাড়িতে গিয়ে উঠল। বন্যার জল নেমে যাবার পর উদ্বাস্তুরা আবার ফিরে যায় হলুদমোহন ক্যাম্পে। পরে সরকারি নির্দেশে তাদের চলে যেতে হয় দণ্ডকারণ্যে।

বিমলা স্কুল বাড়ি থেকে আর ক্যাম্পে ফিরে আসেনি। ওই স্কুলে বিমলার ভগ্নিপতি ভুবন বাবু বিমলার খোঁজ পেয়ে উপস্থিত হন। একটা বাসা ভাড়া করে ভুবনবাবু ও বিমলা সেখানে উঠে যায়।

উপন্যাসে হলুদমোহন ক্যাম্পের অবক্ষয়ের চিত্র ফুটে উঠেছে নানা চরিত্রের মধ্যে। ক্যাম্পে আশ্রিত মানুষগুলির মধ্যে সামাজিক অনুশাসন নেই, মূল্যবোধটুকুও হারিয়ে ফেলেছে তারা। লতা অনায়াসে যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত স্বামীকে ছেড়ে চলে যায়; বৃন্দা তার বিবাহিত স্বামীর পরিবর্তে শ্রীকান্তের সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করে— 'একদিন ভেসে পড়ল শ্রীকান্ত বৃন্দাকে নিয়ে।'[২০] মরণচাঁদের মাসি অবৈধ সন্তানকে পুঁজি করে ভিক্ষা-ব্যবসা করে। 'প্রৌঢ়াটি এক নিমেষে চোখে একটা অত্যন্ত আর্দ্রতা নিয়ে এল, কণ্ঠস্বরকে করুণ করে ফেলল, 'কিছু দাও মা।... ছেলেটিকে টেনে নিয়ে ভিক্ষা করতে এগিয়ে গেল।'[২১] আবার অভাবের কারণে মাসি সেই ছেলেকে মরণচাঁদের কাছে রেখে যায়। 'মাসি কয়, মরণ এই ছেইলে নেও। আমি আর খাতে দিতে পারি না।'[২২]

কলোনিগুলিতে বিপন্ন নারীর অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাদের সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে সুযোগ সন্ধানী পুরুষেরা। 'নির্বাস' উপন্যাসে দেখা যায় সন্ধ্যায় একজন লোক এসে অনুসন্ধান করে যায়, তারপর মাঝ রাতে বিমলার শরীরকে পেতে সে সরাসরি টাকার প্রস্তাব নিয়ে আসে। মরণচাঁদ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে এক মুহূর্তেই মরণচাঁদকে দুমড়ে-মুচড়ে রেখে লোকটা গা ঝাড়া দিয়ে চলে যায়। আবার লতার স্বামী থাকা সত্ত্বেও রায়মশাই এবং তার ছেলে লতার উপর লোলুপ দৃষ্টি দেয়। বাস্তুচ্যুত নারীর এ এক অপরিসীম যন্ত্রণা।

দেশত্যাগের সময়ে উদ্বাস্তুদের মধ্যে সামাজিক ভেদাভেদ কিছুটা হলেও মুছে গিয়েছিল। পারস্পরিক প্রয়োজনে একে অপরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে গিয়েছিল। কিন্তু ক্যাম্পে স্থিতিলাভ করবার পর পুনরায় শ্রেণিগত বিভাজন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আলোচ্য উপন্যাসে এই বিভাজন রেখা সুস্পষ্ট। হলুদমোহন ক্যাম্প মোটামুটি দেখতে গেলে দুটি পাড়া। ক্যাম্পের কর্তার ঘরের কাছাকাছি কতগুলি তাবু মিলে ভদ্রলোকের পাড়া। হতাশাগ্রস্ত নিঃস্ব অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ,

আচার আচরণে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কলোনির বাসিন্দা অজয়ের কথাতে বিভাজন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে বিমলাকে বলে— 'আপনাকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম মরণচাঁদ আর আপনি এক দলের হলেও এক শ্রেণির নয়। আইনে না থাকলেও, ক্যাম্পে যখন দুটো পাড়া তৈরি হয়েছে তখন আপনি এ পাড়াতেই থাকেন।'[২৩]

পূর্ববঙ্গ থেকে আসা এই মানুষগুলির শেষ পর্যন্ত হলুদমোহন ক্যাম্প থেকে দণ্ডকারণ্যে যাবার নির্দেশ আসে। এই অনিশ্চিত গন্তব্য সম্পর্কে তাদের কোনও ধারণা নেই। বিমির কাছে মরণচাঁদের বউ সোদামুনির জিজ্ঞাসায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়—

'মা ঠাকরুণ, আপনে ও কি যাবা?

কোথায়?

দণ্ডকান্ন।

...

গেলি কি খারাপ? গেলি কি ভালো?'[২৪]

১৯৫৮ সালের মাঝামাঝি দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন পরিষদ গঠিত হয়। মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাল অঞ্চল জুড়ে বাঙালি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য নির্বাচিত করা হয়। ভারত সরকার এই অঞ্চলের জন্য দণ্ডকারণ্য ডেভেলপমেন্ট অথরিটি গঠন করে।[২৫] এখানকার অরণ্য ঘেরা পাহাড়ি ঊষর ভূমিতে নির্বাসিত হতে হয় 'নির্বাস' উপন্যাসের ক্যাম্পবাসীদের যাদের জীবনের দীর্ঘ সময় কেটেছে জলা-জঙ্গলময় আর নদীবেষ্টিত পূর্ববঙ্গে।

নারায়ণ সান্যালের 'বকুলতলা পি.এল.ক্যাম্প' উপন্যাসে উদ্বাস্তু ক্যাম্প এবং উদ্বাস্তু জনতার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বর্ণিত হয়েছে। ঋতব্রত বসু ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেই বাংলা-বিহার সীমান্ত রেখার কাছাকাছি এই ক্যাম্পের কন্স্ট্রাকশন এস.ডি.ও পদে যোগদান করেন। জায়গাটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে গড়ে ওঠা একটি সেনানিবাস। পরিত্যক্ত সেনানিবাস উদ্বাস্তু আগমনে মুখর হয়ে ওঠে— হাজার হাজার মিস্ত্রী মজুর কাজ করে যায়; সমবেত হয় পাঞ্জাবী ছুতার, সিন্ধি ঠিকাদার, উড়িয়া প্লাম্বার আর মদ্রদেশীয় কুলি। সেখানে এসেই ট্রাক থেকে নামে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা, তাদের পরণে 'ছিন্ন মলিন বসন! ওদের মনে যুদ্ধ জয়ের দুর্বার প্রেরণা নেই— আছে জীবনযুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি! ফেলে আসা অতীতের বিভীষিকা আর অনিশ্চিত অনাগতের আতঙ্ক। ওরা এসে গেল দলে দলে। হাজার হাজার উদ্বাস্তু পরিবার। নবীনতম রাষ্ট্রের প্রবীণতম আদিম বিদেশী অধিবাসী। সেনানিবাস পরিণত হল আশ্রয় শিবিরে।'[২৬]

দেশভাগ পরবর্তী সময়ে উদ্বাস্তু আগমনের প্রথম ধাপে এর নামকরণ হয়েছিল ট্রানজিট ক্যাম্প অর্থাৎ অস্থায়ী আশ্রয় শিবির। প্রাথমিকভাবে উদ্বাস্তুদের এখানে আশ্রয় দেওয়া হত, তারপর তাদের স্থায়ী পুনর্বাসনে পাঠানো হত। কেউ বা নিজের ইচ্ছেতে অন্যত্র চলে গেল। বাকি যারা পড়ে রইল, সেইসব অক্ষম পঙ্গুদের স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে সরকার। যেহেতু সরকার সারা জীবনের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাই এর নাম হয় Permanent Liability বা সংক্ষেপে পি.এল. ক্যাম্প। উদ্বাস্তুদের জন্য পরিত্যক্ত ব্যারাকের বিভিন্ন স্থানগুলিকে কাজে লাগাতে শুরু করে— 'মিলিটারি হাসপাতালটাই ওদের আরোগ্যালয়। পাওয়ার হাউসটা এখন রেশমের গুদাম। ইলেক্ট্রিক লাইন উঠিয়ে নিয়ে গেছে মিলিটারি কনট্রোল বিল্ডিংটা এখন ক্যাম্পের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিস। এরোপ্লেন নামবার চওড়া ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ডটায় ওদের বাজার বসে।'[২৭]

ক্যাম্পের একদিকটা শেষ হয়েছে চার মাইল দূরের রেল-স্টেশনে; অপরদিকে রয়েছে থানা-সদর ছুঁয়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। ক্যাম্পের পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত চওড়া কংক্রিটের রাস্তা, ওটাই ছিল ক্রীট-ওয়ে— অর্থাৎ প্লেন নামবার ল্যাণ্ডিং স্ট্রীপ্। এটারই পূর্ব প্রান্তে রাস্তাটা গোল হয়ে বিরাট এক চক্কর খেয়েছে। ক্রীট-ওয়ের এই অংশটাই এখন বড়বাজার। নাম গোলবাজার। এছাড়াও হাসপাতাল ও বড় অফিসের কাছে আর একটা বাজার বসে। এর ঠিক পাশেই ছেলেদের মাইনর স্কুল। সেটার নামকরণ স্কুল বাজার। ক্রীট ওয়ে পরস্পরকে আড়াআড়ি ছেদ করার ফলে যে চারটি ভাগ হয়েছে তার নামগুলি যথাক্রমে— 'গলাদ', 'টিফেনপুর', 'বকুলতলা', 'মেমপাড়া।' সবটা মিলিয়ে ক্যাম্পের নামকরণ করা হয়েছে— 'বকুলতলা পি.এল ক্যাম্প'।

মিলিটারি ব্যারাককে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার থেকে ব্যবস্থাপনা চলছে তিন মাস ধরে। এমন সময়ে ওভারসিয়ার হিসেবে ঋতব্রত কাজে যোগদান করে এই ক্যাম্পে। এটা তার চাকরির প্রথম কর্মক্ষেত্র। ঋতব্রত অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ক্যাম্পে নানাধরনের লোকের বাস। এর মধ্যে অনেকেই অসৎ এবং ধান্দাবাজ। ঠিকাদার রামশরণ সিং ওভারসিয়ার সেনগুপ্ত, ডেপুটি ক্যাম্প সুপার ভৈরববাবু এবং হাসপাতালের ডাক্তার সাধুচরণ এঁরা ঋতব্রতকে সামনে রেখে তাদের অসৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চেষ্টা করে।

ক্যাম্পজীবনে ঋতব্রতর সান্নিধ্যে আসে দুই নারী কুসুম ও কমলা। পি.এল ক্যাম্পে আশ্রিতা কুসুমের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলেন ঋতব্রত। কুসুম পূর্ববঙ্গের এক ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে।

বিয়ের পরেই দেশের পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার কারণে সে তার মামাতো দাদা তারাপদর সঙ্গে এপারে চলে আসে। আসবার সময় তারাপদ মারা যায়। কুসুম সেকথা গোপন রাখে এবং বিধবা সেজে বকুলতলা পি.এল. ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়। পরবর্তীতে স্বামী বিশ্বনাথ তাকে খুঁজে বের করে। লোকের কাছে স্বামীকে সে মামাতো দাদা বিশ্বনাথ বলে পরিচয় দেয়। ক্যাম্পের লোকজন উভয়ের সম্পর্ক সন্দেহের চোখে দেখে এবং তারাপদরূপী বিশ্বনাথকে বেদম প্রহার করে মরণাপন্ন করে তোলে। কুসুমকে তারা মাথা ন্যাড়া করে তাড়িয়ে দেয়। কুসুম চলে যাবার সময় ঋতব্রতকে জানায় সে এখানে যাকে তারাপদ বলে পরিচয় দিয়েছিল সে আসলে তার স্বামী বিশ্বনাথ। ঋতব্রতকে লেখা কুসুমের চিঠিতে এক মর্মান্তিক চিত্র ফুটে উঠেছে— 'আশা ছিল শীঘ্রই স্বামীপুত্র লইয়া আবার সংসার পাতিতে পারিব, কিন্তু আজ যে অবস্থায় ওনাকে লইয়া যাইতেছি — ভয় হয়, এ বেশ পরিবর্তনের সুযোগ হয়তো আর ইহজীবনে আসিবে না।'[২৮] এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন দেশভাগ পরবর্তী সময়ে ক্যাম্প কলোনিতে বসবাসের সময় মানুষকে নানাধরনের ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। পরিস্থিতির চাপে পড়েই কুসুমকে বিধবা সাজতে হয়, পরবর্তী সময়ে স্বামীকে মামাতো দাদা বলে চালাতে হয়। কুসুমের এই সমস্যা উদ্বাস্তুদের সর্বজনীন সমস্যার প্রতিরূপ।

ক্যাম্পের আর একজন মহিলা কমলা; পূর্ববঙ্গের এক পোস্টমাস্টারের মেয়ে কমলা। বাবার মৃত্যুর পর মা ও দিদি সরলাকে নিয়ে দেশত্যাগ করে। পথে সরলা মারা যায়। ঘুরতে ঘুরতে বৃদ্ধা মা কে নিয়ে কমলা এই ক্যাম্পে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এক বিরাট হল ঘরে থাকতে তাদের বিশেষ অসুবিধা হয়। বিশেষ করে বড়খোকার মতো মানুষের লোলুপ দৃষ্টির ফলে তাদের যথেষ্ট সমস্যায় পড়তে হয়। মেয়ের আব্রুর জন্য কমলার মা ঋতব্রতর কাছে একটু পার্টিশন করে দেবার জন্য আবেদন জানায়। ঋতব্রত সমস্ত কিছু পর্যবেক্ষণ করে পার্টিশনের ব্যবস্থা করে দেন। তার জন্য তাকে অনেক সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়। পরে কমলার মা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে পিতৃবন্ধু সঞ্জীব চৌধুরীর নির্দেশে মানবিক কারণে কমলাকে নিজের বাসায় আশ্রয় দেন ঋতব্রত। কমলার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। কিন্তু তাকে সামাজিক স্বীকৃতি দিতে মনের সমর্থন মেলে না। শুরু হয় মানসিক দ্বন্দ্ব— 'একটা সাধারণ রিফ্যুজি মেয়ে। সাতঘাটের জল খেয়ে এসে ঠেকেছে ক্যাম্পে। সে নিজে সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে। ক্যাম্প থেকে একটা উদ্বাস্তু ঘরের মেয়ে নিয়ে সে কোন্ লজ্জায় গিয়ে দাঁড়াবে বাড়িতে।'[২৯] শেষপর্যন্ত অবশ্য সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠে ঋতব্রত কমলাকে বিয়ে করে সামাজিক স্বীকৃতি দিয়েছে। সেদিক থেকে উপন্যাসটির সমাপ্তি মিলনান্ত।

এর মধ্যেও উপন্যাসটিতে উদ্বাস্তু জীবনের কয়েকটি বিশেষ দিক নির্দেশ করা হয়েছে—

প্রথমত, দীর্ঘ সময় ধরে অকর্মণ্য থাকতে থাকতে পূর্ববঙ্গের এই সবল পরিশ্রমী মানুষগুলি ক্রমে অলস হয়ে পড়ে এবং ক্যাম্পের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে তাদের জীবন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে; কারণ রোজগার করবার ক্ষমতা আছে তা প্রমাণিত হলে সরকারের স্থায়ী পোষ্য হিসেবে সারা জীবন ডোল গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।

দ্বিতীয়ত, ক্যাম্প তৈরি করতে এসে ঠিকাদার থেকে শুরু করে কর্মীদের অধিকাংশই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে।

তৃতীয়ত, দেশান্তরী নারীকে নানা কৌশলে তাদের শরীরকে পণ্য করতে বাধ্য করা হয়। উপন্যাসে দেখা যায় 'ক্যাম্প থেকে দৈনিক রেল স্টেশনে মেয়ে চালান যায়। তারা ফেরে ভোরের বাসে।'

নারায়ণ সান্যাল বকুলতলা পি.এল ক্যাম্প উপন্যাসে মুসলিম উদ্বাস্তুর কথা উল্লেখ করেছেন। ইয়াসিন, যে ক্যাম্পের ঠিকাদার রামশরণের গাড়ি চালায়; রামশরণ তাকে অন্যায়ভাবে হাজত বাস করায়, পায়ের জুতো খুলে মুখে মারে। অভিমানে ইয়াসিন তাই দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইয়াসিন শ্রীরামপুরে থাকত। দেশভাগের পর সে তার পরিবারকে কুষ্টিয়ায় রেখে আসে। তার মত দরিদ্র মুসলমান রামশরণের মত প্রভাবশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারবে না। ঋতব্রতর প্রশ্নের উত্তরে সে জানায়— 'আজ্ঞে ছিলাম তো বরাবর শ্রীরামপুরে। পার্টিশনের পর পরিবার পাঠিয়ে দিয়েছি কুষ্টিয়ায়। সেখানেই চলে যাব।' আলোচ্য উপন্যাসে উদ্বাস্তু ক্যাম্প ও ক্যাম্পবাসীর জীবনচিত্র বাস্তবসম্মতভাবে ফুটে উঠেছে।

নারায়ণ সান্যালের 'বল্মিক' উপন্যাসে পূর্ববঙ্গের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের দেশত্যাগ এবং কলোনি জীবনের বাস্তবসম্মত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। উপন্যাস শুরু হয়েছে হরিপদ চক্রবর্তীর দেশত্যাগ করে কলকাতার কলোনিতে আসার বিবরণে। তিনকাল গিয়ে এক কাল ঠেকেছে এই প্রবীণের। পূর্ববঙ্গে তিনি পেশায় ছিলেন শিক্ষক। অসংখ্য ছাত্রকে তিনি নিজের হাতেই মানুষ করেছেন। 'সেই হরিপদ মাস্টারকেই স্বীকার করে নিতে হল ইতিহাস-ভূগোল বহির্ভূত এই সিদ্ধান্তকে। হরিপদ চক্রবর্তীকে হঠাৎ একদিন বলা হল যে মতিগঞ্জে তিনি প্রবাসী। মতিগঞ্জ তার দেশ নয়। এখানে তার স্থান নেই।'[৩০] ফলে দুই পুত্র, দুই কন্যা ও স্ত্রীর হাত ধরে হরিপদ চক্রবর্তীকে বেরিয়ে পড়তে হল। তিনি একা নন, তার মত অনেক মানুষই বেরিয়ে পড়েছে যারা তার সহযাত্রী। নানা টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে তিনি

হাজির হলেন উদয়নগর কলোনিতে। কলোনির কুটিরে মাদুর বিছিয়ে তিনি দুর্ভাগ্যের স্মৃতি রোমন্থন করেন। সেই সূত্রে গ্রামীণ গাছ গাছালির স্মৃতি পড়শীদের কথা, দর্শনা থেকে বার্ণপুর হয়ে রেললাইন ধরে হেঁটে আসা, ছিটকে যাওয়া মানুষজন, ট্রানজিট ক্যাম্প, পি.এল.ক্যাম্প, হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশন পুলিশ ভ্যান কোর্ট, হাজত ইত্যাদির কথা।

হরিপদ মাস্টার একে একে সব হারিয়েছেন, সরকারি লোনে বাড়ি শুরু করেছিলেন। প্রায় শেষ ও করে এনেছিলেন, কিন্তু অভাবের জ্বালায় সব কিছু বিক্রি করে দিতে হয়েছে। বড় ছেলে; রিক্সা চালাত। সেও দু'মাস রোগশয্যায়। জীবনের উপান্তে এসে বৃদ্ধ মাস্টার মশায়ের সব আশা-আকাঙ্ক্ষাই ঘুচে গিয়েছে। ছোট ছেলেকে নিয়ে তিনি স্বপ্ন দেখেন— ওই হয়ত একদিন সংসারের হাল ধরবে, ফিরে আসবে লক্ষ্মীশ্রী।

কলোনিগুলিতে অপ্রতুল স্থান, তাই বাসিন্দাদের একই ঘরের মধ্যে পরিবারের সকলকে নিয়ে বাস করতে হয়েছে দিনের পর দিন। হরিপদবাবুর পরিবারও একটি মাত্র ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। কলোনির বাস্তব চিত্রের সঙ্গে উপন্যাসের কাহিনির হুবহু মিল লক্ষিত হয়— ঘরের মাঝামাঝি একটি শাড়ি টাঙিয়ে একপাশে রাত্রি যাপন করেন হরিপদ বাবু ও তার স্ত্রী বিন্দুবাসিনী দেবী, দুই কন্যা নমিতা আর লতিকা; শাড়ির অন্যপাশে বড় ছেলে, তার স্ত্রী কামিনী ও তাদের সন্তান থাকে। 'কনিষ্ঠ সন্তান এগারো বছরের বাবলু কোথায় শোয় তা বোধ হয় সে নিজেই জানে না।'[৩১] এ বিষয়ে অধ্যাপক প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তীর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য— দেশবিভাগের পরে ঘর ছেড়ে যারা মানুষ হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিল, তারা আজ যেন পর্যবসিত হয়েছে পশুতে। ব্যারাকের এক একটি ঘরে কুড়িটি পরিবার, আড়াল আবডালের কোনও বালাই নেই।[৩২]

উদয়নগর কলোনিতে অভাব-অনটনের মধ্যেও হরিপদবাবুর মেয়ে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে স্কুলের চাকরির সঙ্গে সঙ্গে জামা সেলাই করার কাজ নেয়। কলোনি পরিচালনার জন্য কমিটি গঠিত হলে সেখানেও নমিতা নাম লেখায়, ক্রমে কলোনির নেত্রী হয়ে ওঠে। উদ্বাস্তুদের আশ্রয়দান নিয়ে সমিতিতে ভাঙন ধরে। উদ্বাস্তু নেতারা অনেকভাগে ভাগ হয়ে যায়। সর্বস্বান্ত উদ্বাস্তু নেতা নিতাইপদ আদর্শকে আঁকড়ে বাঁচতে চান, যোগেন চায় গঠনমূলক প্রস্তাব। ভূষণ, যোগেন এরা নব্যপন্থী, নমিতা পুরোনো পন্থী। কলোনির মঙ্গলের জন্য সরকারের কাছে ডেপুটেশনের নেতৃত্ব দেয় নমিতা। কিছু উৎসাহী যুবক অফিসে চড়াও হয়, পুলিশ গুলি চালায়। লাঠির আঘাতে নমিতা গুরুতর আহত হয়

ও হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। সমিতির অন্যতম নেতা নিতাইপদ নমিতার আকস্মিক মৃত্যুতে হতাশ হয়ে পড়ে— 'মুখ চোরা লাজুক মেয়েটির মধ্যেই ছিল সুপ্ত বহ্নিশিখা। জাগিয়ে তুলেছিলেন তাকে তিনি। সংগ্রামের শুরুতেই বিদায় নিল সেই দক্ষ সেনাপতি।'[৩৩]

লক্ষণীয় দেশভাগ পরবর্তী সময়ে উদ্বাস্তু মেয়েরা সাংসারিক সীমা ভেঙে বৃহত্তর জীবনের দৈনন্দিন কাজে অংশ নিতে শুরু করে। পারিবারিক গৃহস্থালি জীবনের এক নতুন আদর্শ গড়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়।[৩৪] মূলত অর্থনৈতিক কারণে নারীর এই অন্দর থেকে সদরে বেরিয়ে আসা। কীভাবে বেঁচে থাকা যায়, একটু ভালো থাকা যায় তার প্রচেষ্টা চলে অনবরত। নমিতার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কলোনিবাসীর নতুন করে বাঁচার অঙ্গীকার তৈরি হয়েছে। কন্যার মৃত্যুতে বুকফাটা হাহাকার বাইরে প্রকাশ করবার সময় নেই অন্ধ হরিপদর— দৈনন্দিনতার সমস্যায় তিনি জর্জরিত।

ঔপন্যাসিক নারায়ণ সান্যাল 'বল্মীক' উপন্যাসে দেশভাগের পর নতুন উপনিবেশে মানুষের বিপর্যস্ত জীবনের চিত্র অঙ্কন করেছেন। উপন্যাস সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতামত উল্লেখযোগ্য— 'বল্মীক উপন্যাসে উদ্বাস্তুদের দুইদিনের ক্ষণভঙ্গুর উইঢিপির মত আচ্ছাদনের একটি স্থায়ী, নির্ভরযোগ্য আশ্রয়ে পরিণত করার আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্বে সাধনার কাহিনি বিবৃত হইয়াছে।'[৩৫]

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'উপনগর' উপন্যাসের বড় অংশ জুড়ে রয়েছে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে আসা উদ্বাস্তু মানুষের কলোনি গড়ে তোলা এবং সেই কলোনিতে নতুন করে জীবনধারণের বিবরণ। কলকাতা থেকে মাইল দশেক দূরে গড়ে উঠেছে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের কয়েকটি কলোনি— 'কীর্তিপুর', 'নেতাজিনগর', 'বাপুজীনগর', 'সুভাষনগর' ইত্যাদি। পূর্ববঙ্গের সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি করে অধ্যাপক অমিয়ভূষণ সেনগুপ্ত 'কীর্তিপুর' কলোনিতে জায়গা কিনে বাড়ি করেছেন। সংসারে রয়েছেন তিনি তাঁর স্ত্রী কল্যাণী, মা শতদলবাসিনী, পুত্র কমলাক্ষ ও কন্যা এণাক্ষী এবং বোন করুণা। কীর্তিপুরের এই বাড়িটির গৃহপ্রবেশের বর্ণনার মধ্যে দিয়ে 'উপনগর' উপন্যাসের সূচনা। সেই গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন অমিয়ভূষণের সহকর্মী, আত্মীয় স্বজন এবং পূর্ববঙ্গের একজন লেখক যিনি অমিয়ভূষণের পূর্ব পরিচিত; অগ্রজতুল্য নীলকান্ত রায়।

নীলকান্ত রায় সপরিবারে যে কলোনিতে থাকেন তার নাম 'নেতাজিনগর'। কামার, কুমার, ছুতোর মিস্ত্রি, থেকে শুরু করে ধোপা, নাপিত, সাহা, কৈবর্ত, কায়েত-বামুন সব শ্রেণির সবরকম জীবিকার লোকই এখানে এসে বসতি গড়েছে। আবার জীবিকাহীন বেকার লোকেরও অভাব নেই।

এক-একটি গৃহস্থের ভাগে দুকাঠা আড়াই কাঠার এক একটি প্লট। অপেক্ষাকৃত যারা স্বচ্ছল এবং ক্ষমতাবান তারা একসঙ্গে দুটো প্লট দখল করে টিন দিয়ে টালি দিয়ে ঘর তুলেছে। প্রায় প্রত্যেকের ঘরের সামনে একফালি করে উঠোন। সেই উঠোন কেউ মিছিমিছি ফেলে রাখেনি। বেগুন মুলো লাউ কুমড়ো সিম সজনে বছরের নানা ঋতুর নানা তরকারির চাষ হয় সেখানে। এখানে চারকাঠা জমির উপর উত্তর আর পশ্চিমের ভিটেয় দু'খানি টিনের ঘর নীলকান্ত রায়ের। এই বাড়ি নীলকান্তর মামাশ্বশুর পান্নালাল চক্রবর্তীর। কলেরায় মামাশ্বশুর ও তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর নীলকান্তর স্ত্রী নির্মলাই মামার সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করেন।

উপন্যাসে কলোনিবাসীর নানা অসুবিধার মধ্যে জীবন-যাপনের চিত্র লক্ষিত হয়। বিদ্যুতের আলো পৌঁছায় নি, রাস্তাঘাট কাঁচা এরই মধ্যে আনন্দে বাস করে কলোনির বাসিন্দারা। এই কলোনির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন নীলকান্তর আত্মীয় মণিময়। মণিময় কলোনির সার্বিক উন্নতির জন্য সকলের সঙ্গে নিজেও কাজে লেগে পড়েন। রাস্তা তৈরির জন্য অমিয়ভূষণের বোন তাঁর সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ থেকে দশ হাজার টাকা রোড কমিটিকে দান করেন। বাস্তব ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছে বিভিন্ন উদ্বাস্তু কলোনি গঠনের সময় কিছু মানুষ তাদের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে বিজয়গড় কলোনি গঠনে সন্তোষকুমার দত্ত এবং ধীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (কালা ভাই)-য়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মূলত নিজেদের জীবন নির্বাহের জন্য এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের সুনাগরিক রূপে গড়ে তুলবার চিন্তায় তারা কলোনি গঠনের ক্ষেত্রে এই ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করেন।[৩৬]

'উপনগর' উপন্যাসে বাস্তুহারা মানুষগুলি কলকাতা শহর থেকে দূরে গাছপালা আর আগাছা জঙ্গলে ভরা গ্রামের পরিবেশে কলোনি গড়ে তোলে। কলোনির নেতা মনিময়ের মনে হয়— 'পূর্ববঙ্গের আস্ত একখানি গ্রামকে মাথায় করে এনে কেউ এই কলোনির মধ্যে বসিয়ে দিয়েছে।' গ্রামের সমৃদ্ধি নেই এখানে তাই একে ঠিক গ্রাম বলা যায় না, গ্রামের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশ গ্রাম নয়, উপগ্রাম। এখানকার মানুষগুলিকেও মণিময়ের মনে হয় মানুষের অণুপরমাণু। মানুষগুলি যেন গ্রামীণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চায় না; কলোনিগুলির নামকরণের মধ্য দিয়ে তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। লেখকের কথায়— 'মহানগরের অধিবাসী না হলে কী হবে, ছোট একটু শহরের সুখ-সুবিধাটুকু পর্যন্ত না থাকলে কী হবে, এরা কেউ আর নিজেদের গ্রামবাসী বলতে রাজী নয়, সবাই নাগরিক। কলোনিগুলিকে এরা নগরের নামে ডাকবে, নিজেদের বাসভূমিকে এরা নগরের ধাঁচে গড়বে, এই এদের স্বপ্ন।'[৩৭] এর কারণ হতে পারে নিম্নরূপ—

i) বংশ পরম্পরায় গ্রামে বাস করা মানুষের ঝা-চক-চকে নগর জীবনের প্রতি আকর্ষণ ছিল প্রবল;

ii) ভবিষ্যতে সরকারের কাছ থেকে বেশি সুযোগ সুবিধা পাওয়া যেতে পারে;

iii) নিজেদের নগরের বাসিন্দা প্রতিপন্ন করে আত্মগরিমা অনুভব করা।

উদ্বাস্তুদের মধ্যে বিশেষ একটি শ্রেণি ছিল যারা ক্যাম্প কলোনিতে বাস করেনি, সরকারের দেওয়া কোনও সাহায্যও গ্রহণ করেনি— সম্পূর্ণ নিজেদের চেষ্টায় সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করে জমি-জায়গা কিনে বসবাস করতে শুরু করেন। এই শ্রেণির উদ্বাস্তুর অবস্থান ছিল নিম্নরূপ—

i) তারা পূর্ববঙ্গে থাকাকালীনই অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল ছিল;

ii) সরকারি কলোনিতে অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা তাঁরা মানতে পারেন নি;

iii) কলোনী জীবনের দৈনন্দিন টানাপোড়েন তাদের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব ছিল না;

iv) এইরকম স্থানে বসবাস তাদের পক্ষে অমর্যাদাকর ছিল।

'উপনগর' উপন্যাসে এই প্রকার স্বনির্ভর উদ্বাস্তুদের কথা উল্লিখিত হয়েছে, তাঁরা কীর্তিপুর উদ্বাস্তু উপনিবেশ গড়ে তুলেছেন কাঠা প্রতি পাঁচ-সাতশো টাকা দিয়ে জমি কিনে। এখানকার সবাই মোটামুটি অবস্থাপন্ন, সচ্ছল, শিক্ষিত। 'বীরনগর, নেতাজীনগরের লোকদের মত দরিদ্র আর হাড়হাভাতে নয়।' কীর্তিপুর কলোনির মানুষদের ধারণা জবরদখল কলোনির মধ্যে 'শুধু পকেট কাটা নয়, গলাকাটার দলও কম নেই। আলাপ-পরিচয় করতে গেলে হয় তারা ধার চাইবে; না হয় চাকরি চাইবে কিংবা অন্য কোনও সুবিধা সুযোগের জন্যে ঘোরাফেরা শুরু করবে। তাই এই ধড়িবাজ কোম্পানির ছায়া যত কম মাড়ানো যায় ততই ভাল।'[৩৮]

কীর্তিপুরের এই মানসিকতার কথা জানতে পেরে বীরনগর, নেতাজীনগর এবং আশেপাশের আরও অনেক জবর দখল কলোনির লোকজন এইসব বড়লোকদের কাছে ঘেঁষে না। বিয়ে, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন অথবা অন্য কোনও উৎসব-অনুষ্ঠানে ডাকতে যায় না। রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে কলোনির বাসিন্দা জিতেনের মুখে তাই শোনা যায় অভিমানের সুর— 'কীর্তিপুরের মানুষ আমাদের সঙ্গে যখন কোনও সামাজিক সম্বন্ধ রাখতে চায় না, তখন আমরাই বা আগ বাড়িয়ে তাদের ডাকতে যাব কেন? এতকাল যদি ওদের ছাড়া আমাদের চলতে পারে, এবারকার রবীন্দ্র জয়ন্তীতেও চলবে।'[৩৯] কলোনির মানুষ-জন মণিময়কে কীর্তিপুর সম্পর্কে জানায়— 'ওদের সঙ্গে আমাদের মিশ খায় না মণিময়দা, আমরা অনেকবার এগোবার চেষ্টা করে দেখেছি ওঁরা মিশতে চায় না। ওঁরা পিছিয়ে যায়।'[৪০]

এক্ষেত্রে দেখা যায় পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারা মানুষগুলি সকলেই দুর্ভাগ্যের শিকার। স্বাভাবিক ছিল তাদের পরস্পরের মধ্যে গভীর সৌহার্দ্য। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় তার উল্টোটা। আর্থিক বৈষম্যের কারণে এখানেও গড়ে উঠল গোষ্ঠীগত বিভেদ।

উপনগরের জীবনধারা তুলে ধরতে লেখক নানা চরিত্রের সমন্বয় ঘটিয়েছেন উপন্যাসে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য চরিত্র অধ্যাপক অমিয়ভূষণ সেনগুপ্ত। তিনি কীর্তিপুরে বাড়ি করেন। প্রচণ্ড পরিশ্রম করে পরিবারের সকলকে সুখী রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু সংসারে অশান্তি লেগেই থাকে। কলকাতা থেকে দূরে বাড়ি করায় স্ত্রী সুখী নন। আবার মেয়ে এণাক্ষী প্রতিবেশী প্রভাকর বাবুর ছেলেকে বিয়ে করে সুখী হতে পারে না। সব মিলিয়ে শিক্ষিত বাস্তুচ্যুত মানুষের পরিণতি প্রতিফলিত হয়েছে অমিয়ভূষণের মধ্যে।

পাশাপাশি লেখক নীলকান্তবাবুর করুণ পরিণতির ছবি ফুটে উঠেছে উপন্যাসে। তিনি পূর্ববঙ্গে থাকতে লেখা থেকে যে রোজগার হত তা দিয়ে সংসার চালাতেন, দেশভাগের পর কলোনিতে এসে জীবন-যাপনের পর থেকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। কোনও রোজগার নেই তার। বড় মেয়ে মালা হাসপাতালে চাকরি করে কোনও রকমে সংসার চালায়। নীলকান্তবাবু মাঝে মাঝে তার পুরোনো কাগজপত্র খুলে লেখার চেষ্টা করেন কিন্তু তার কলম থেকে লেখা বের হয় না; স্বেচ্ছা বন্দী হয়ে থাকেন ঘরের মধ্যে। অবশেষে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যান। দেশবিভাগের ফলে পরিবর্তিত পরিবেশে নিজেকে অভিযোজিত না করতে পারার জন্য সৃষ্টিশীল মানুষের করুণ পরিণতিকে নীলকান্ত রায়ের চরিত্রের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

দেশবিভাগের পটভূমিকায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘অর্জুন’ উপন্যাসে ক্যাম্প কলোনির বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। দেশবিভাগের পর পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু হিন্দুরা একান্ত বাধ্য হয়ে চলে আসে পশ্চিমবঙ্গে। অবশ্য একই সঙ্গে সকলে দেশত্যাগ করেনি। আর্থিক দিক থেকে যারা সচ্ছল, যারা কলকাতায় গিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবার ক্ষমতা রাখে কিংবা যাদের আত্মীয়-স্বজন পশ্চিমবাংলায় আছে তারাই প্রথম যাত্রা শুরু করেছিল। ‘এইরকমভাবে একে একে চলে যায় সরকাররা, মিত্তররা রায়রা, দাবার ঘুঁটির মতন এক একজন উঠে যায় গ্রাম থেকে।’[৪১] কিন্তু গরিব হওয়ার কারণে অর্জুনদের গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার অবস্থা ছিল না, তাই মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হয়েছিল। মনের মধ্যে ক্ষীণ আশা ছিল ‘আবার ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান আগের মতোই এক হয়ে যাবে। গ্রাম- পলাতকরা আবার

সবাই ফিরে আসবে।’[৪২]

এইরকমই একটি পরিবার থেকে মা ও দাদার হাত ধরে বেরিয়ে পড়েছিল এগারো বছরের অর্জুন। পড়াশুনায় খুব ভালো হওয়া সত্ত্বেও বাৎসরিক পরীক্ষা অসমাপ্ত রেখেই দেশ ছাড়তে হয় অর্জুনকে। নানা প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে তারা শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছায়। এখানে এসে তাদের কষ্ট চরমে ওঠে। ‘স্টেশনের কাছেই কয়েকটা ক্যাম্প খোলা হয়েছে, সেখানে আর তিল ধারণের জায়গা নেই। প্ল্যাটফর্ম থিক থিক করছে মানুষে। মাঠে ঘাটে, গাছতলায় আশ্রয় নিয়েছে এই সব ছন্নছাড়া মানুষ। খাওয়া-শোওয়া, মল-মূত্র ত্যাগ সব একই জায়গায়। পটাপট করে কলেরায় মরতে লাগল রোজ দু’চারজন।’[৪৩]

এরকম পরিস্থিতিতে অর্জুনরা শুনেছিল তাদের পাঠানো হবে আন্দামানে কিংবা দণ্ডকারণ্যে। নানা রকম প্রতিশ্রুতির পালা চলে কিন্তু কাজ হয় না কিছুই। মানুষগুলোর কোথাও যেতে আপত্তি ছিল না, তারা শুধু চেয়েছিল— ‘কোথাও একটু পিঠ পেতে শোবার জায়গা, মাথার উপর একটু আচ্ছাদন, দুবেলা দুমুঠো ভাত আর লোক চক্ষুর আড়াল।’ অবশেষে এই ছিন্নমূল মানুষগুলি বিরাজ ঠাকুর নামে এক শুভানুধ্যায়ী মানুষের সাহায্যে দমদমের এক ফাঁকা বাগানবাড়িতে আশ্রয় পেয়ে স্থিত হয়, যা পরিণত হয় ‘দেশপ্রাণ কলোনি’ নামে এক উদ্বাস্তু কলোনিতে।

উপন্যাসে কলোনি জীবনের ছবি আঁকতে গিয়ে লেখক দেখিয়েছেন প্রথম দিকে উদ্বাস্তুদের মধ্যে একতা ছিল, কিন্তু ক্রমে সেই ঐক্য নষ্ট হতে শুরু করে। একটি প্লাইউড ফ্যাক্টরির মালিক কেওল সিং কারখানা বাড়াবার জন্য বাগানবাড়ির বেশ কিছুটা অংশ দখল করে নিতে চায়। কলোনির অধিবাসীরা অর্জুনের নেতৃত্বে প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ায়। বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে কারখানার মালিক দিব্য ও সুখেনের মত বেকার যুবকদের হাত করে। তারা অবস্থার শিকার। বিপথগামী অসামাজিক পথে পা দেওয়া এই যুবকরা আগে ছিল অন্য মানুষ। বড়সড় চেহারার দিব্যর যে কোনও শক্ত কাজে ডাক পড়ত, সেও এগিয়ে আসত এ ব্যাপারে। জুনিয়র গ্রুপে অল বেঙ্গল কুস্তি প্রতিযোগিতায় সে দ্বিতীয় হয়েছিল। অন্যদিকে সুখেনের রোগা, পাকানো চেহারা। দাড়ি গোঁফ বিশেষ নেই। বয়স তার বত্রিশ হলেও বাইশ-তেইশের বেশি মনে হয় না। সুখেন ভালো গান করে, সে কাজ করে পাঁউরুটির কারখানায়। প্রায়ই অন্যদের কাছে সে বলে ‘আমি তোদের মতন বেকার না, বেকারিতে কাজ করি।’

কারখানার মালিকের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রচণ্ড আহত হয়ে অর্জুন হাসপাতালে ভর্তি হয়, কিন্তু

কিছুতেই সে পরাজয় স্বীকার করে না। অর্জুনের ব্যক্তিগত জীবন ও সংগ্রামী চেতনার সঙ্গে সঙ্গে কাহিনিতে এসেছে নানা চরিত্র ও ঘটনা। জীবিকার প্রয়োজনে কলোনির মেয়ে পূর্ণিমাকে স্বেচ্ছায় বেছে নিতে হয় অসামাজিক পথ। দেহকে সম্বল করে অফিস যাবার নাম করে বেরিয়ে পড়তে হয়। পাশাপাশি কলোনিতে থেকেও লাবণ্য স্বপ্ন দেখে; পড়াশুনা করে সে বড় হতে চায়; কিন্তু পরিস্থিতি লাবণ্যকে নিজের মত করে বাঁচতে দেয় না। সুখেন তাকে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু লাবণ্য রাজি নয়। দিব্যর হাতে লাবণ্য অত্যাচারিত হয়। যে দিব্যকে শৈশবে আর কৈশোরে কোমল মুখশ্রী আর সুঠাম শরীরের জন্য মনে হত দেবশিশু, পরিস্থিতি আজ তাকে পশুতে পরিণত করেছে। এদের পাশাপাশি অন্ধ নিশিঠাকুরদার মত আশাবাদী মানুষও আছেন, যিনি যৌবন শেষ হবার আগেই আটত্রিশ বছর আগে পৃথিবীকে শেষবারের মত দেখে নিয়েছেন। তাঁকে কোনও দিন দুঃখ কিংবা হাহুতাশ করতে শোনা যায়নি।

'অর্জুন' উপন্যাসে বিভাগোত্তর ভারতে পূর্ববাংলার সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের কলোনি তৈরি এবং বাঁচার সংগ্রামের কথা ব্যক্ত হয়েছে। অভাবের মধ্যেও নিজেদের টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে জয়ী হয়েছিল তারা। কলোনি জীবনের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে উপন্যাসটিতে।

যতীন বালা তাঁর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'শিকড় ছেড়া জীবন'য়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় একাধিক ক্যাম্পের অনুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন। উত্তম পুরুষে লেখা এই উপন্যাস। যশোর জেলার মণিরামপুর থানার পাড়িয়ালী গ্রামে লেখকের পরিবারের দীর্ঘদিনের বাস। গ্রামটি যশোরের বিখ্যাত ছিয়ানব্বই অঞ্চলে অবস্থিত। ঠাকুরদা সিদ্ধিরাম বালা মণিরামপুর থানায় পুলিশ প্রশাসনের স্থায়ী কর্মচারী ছিলেন, দাদা ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। দেশভাগের পর লেখকের বাবা এবং গ্রামের কয়েকজন মিলে পাকিস্তান সীমান্ত লাগোয়া নাভারান থানার বৌলপোতা গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন। ভারতে না এসে সীমান্ত সংলগ্ন পাকিস্তানে পুনরায় বাসস্থান নির্মাণের কারণ বর্তমান গবেষকের কাছে এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে ব্যাখ্যা করেছেন লেখক, (১৬.১.২০১৫, বনগাঁ)

প্রথমত, দেশের এই অস্থির অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হবে না, তাই অস্থায়ীভাবে নির্মিত এই বাসস্থান থেকে পুনরায় গ্রামে ফিরে যাওয়া অনেক সহজ হবে;

দ্বিতীয়ত, একান্ত যদি দেশের পরিস্থিতি ভালো না হয় তাহলে সহজে তারা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যেতে পারবে।

বৌলপোতা গ্রামে আসার পর দু'বছরের মধ্যে বাবার মৃত্যু হয়, এর এক মাসের মধ্যে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে দাঙ্গাবাজরা বৌলপোতা আক্রমণ করে, ফলে 'আমরা গ্রামের মানুষজন সব প্রাণভয়ে মরি পড়ি, ছুটে পালিয়ে গিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করলাম।'[৪৪] স্বভূমি থেকে উচ্ছেদের পর প্রাথমিক আশ্রয় জুটল শিয়ালদহ স্টেশনে। লেখক এভাবে স্টেশনের বর্ণনা দিয়েছেন— 'গোটা স্টেশন চত্বর গিজগিজ করছে শরণার্থী। কেউ মরে পড়ে আছে, কোনও মা সন্তানের জন্ম দিতে ব্যস্ত। ময়লা আবর্জনা ঝেঁটিয়ে যেমন এক জায়গায় স্তূপ করে রাখা হয় সেরূপ উদ্বাস্তুদের ঝেঁটিয়ে এনে স্তূপ করে গাদা করে রাখা হয়েছে।'[৪৫] এখান থেকে আর পাঁচটা পরিবারের সঙ্গে লেখকের পরিবারকে লরিতে করে হুগলি জেলার ত্রিবেণী থানার নসরাইল গ্রামের পাশে কুন্তিনদীর পাড়ে এনে ফেলে। বিস্তৃত ঝাঁমটি বন পরিষ্কার করে শরণার্থীরা মোম লাগানো তাবু টাঙিয়ে ঘর করে নেয়। দুটি শাল কাঠের খুঁটি, একটি আড়া, দশটি গোঁজ বা খোটা এবং একটি হলদু রঙের তাঁবু বরাদ্দ ছিল প্রতিটি পরিবারের জন্যে।

উদ্বাস্তু শিবির এলাকায় কোনও গাছ নেই, কোনও ছায়া নেই, খোলা আকাশের নিচে দুপুরের সূর্যের তাপ মোম লাগানো তাবুর উপর পড়লে সেই তাপে উদ্বাস্তুরা আধ-পোড়া হতে লাগল। মাসান্তে সামান্য ক্যাশ ডোলের উপর নির্ভর করে তাদের বেঁচে থাকা, প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য শৌচালয়, সামান্য নলকূপ; লেখকের দীর্ঘ দু'বছর কাটে এই কুন্তি উদ্বাস্তু শিবিরে।

কুন্তি ট্রানজিট ক্যাম্পের সুপারিনটেনডেন্ট বদলি হয়ে যাবার সময় তাকে ধরে লেখকের পরিবার হুগলি জেলার 'ভাণ্ডারহাটি' ওয়ার্কসাইট ক্যাম্পে বদলি হয়ে যায়। কথা ছিল ভাণ্ডারহাটিতে জমির উন্নয়ন ঘটিয়ে সেখানেই এখন কর্মরত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে, কিন্তু অন্যান্য ওয়ার্ক সাইট ক্যাম্পের মত এখানকার উদ্বাস্তুদেরও উন্নয়ন ঘটানো জমিতে স্থান হয়নি। লেখকের কথায়— 'ভাণ্ডারহাটি ক্যাম্পে খালকাটাও শেষ হল। তারপরই বাতাসে খবর শোনা গেল ভাণ্ডারহাটি উদ্বাস্তু শিবির তুলে দেওয়া হবে। এখানকার লোকগুলোকে বিভিন্ন শিবিরে নিয়ে যাওয়া হবে। কারণ এখানে আর কাজ নেই।... লরি এসে দাঁড়ালেই সেই লরিতে উঠতে হবে এবং অন্য যে কোনও শিবিরে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে।'[৪৬] এই শিবিরের প্রায় সকলেই নিম্নবর্ণের মানুষ। ঔপন্যাসিকের ধারণা নিম্নবর্গের মানুষ বলেই বারবার এক শিবির থেকে তাদের অন্য শিবিরে স্থানান্তর ঘটছে।

ইতিমধ্যে রাতের অন্ধকারে অজ্ঞাত পরিচয় একদল মানুষ ক্যাম্প সুপার কালিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়কে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয়। তার জন্যে সমগ্র ক্যাম্প জুড়ে চলে ব্যাপক অত্যাচার।

তারপর টেনে হিচড়ে উদ্বাস্তুদের লরিতে তুলে রওনা হয় নতুন কোনও ক্যাম্পের উদ্দেশে— ‘সাত সাতটা পরিবার এক একটা লরিতে। ভোরবেলা রওনা হয়েছিলাম, এখন প্রায় দুপুর হতে চলল, লরি থামে না। সারা দিন, সারারাত লরি চলে ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এসে পৌঁছলাম বলাগড় ক্যাম্পে।’[৪৭] ইতিমধ্যে দু-দুটি উদ্বাস্তু শিবিরে কাটিয়ে এই তৃতীয় উদ্বাস্তু শিবির বলাগড়ে এসে লেখকের মনে হয়— ‘জীবনের অন্তহীন অপচয়, অবিশ্রান্ত নিষ্ঠুরতা আর ধারাবাহিক অনিশ্চয়তার আঁধারে তলিয়ে যাওয়াই আমাদের ভবিতব্য। এদেশের মাটিতে কিছুতেই উদ্বাস্তুদের স্থায়ী শিকড় বসাতে দেবে না সরকার।’[৪৮] এখানে এসেও একই পরিস্থিতি তৈরি হয়।

তবে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সয়ে উদ্বাস্তুরা এই পর্যায়ে এসে ক্রমে সংগঠিত হয়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সুষ্ঠু পুনর্বাসন, পর্যাপ্ত ডোল চালু করা এবং সমস্তরকম সহানুভূতির দাবিতে উদ্বাস্তুরা সমাবেশ, সভা, মিটিং, মিছিল শুরু করল। অবশেষে তারা আমরণ অনশনের ডাক দিল। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেন মতুয়া[৪৯] ধীমান গোঁসাই। তিনি তাঁর সমস্ত শিষ্যদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ উদ্বাস্তুদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ডোল বন্ধ করে দিলেন। শিবিরের বুভুক্ষু মানুষ বেঁচে থাকার তাগিদে রোজগারের আশায় গ্রামেগঞ্জে ছুটতে লাগল। লেখকের উক্তিতে পাই— ‘আমি আর আমার মেজদা জয়হরি বালা ভোরের গায়ে ঘন কালো আঁধার লেগে থাকতে নাকেমুখে দুটো গুঁজে বেরিয়ে যেতাম জনমজুরি খাটতে। সারাদিন জমিতে খেত মজুর খেটে চার আনা, আট আনা কখনও এক টাকা রোজগার করতাম।’[৫০] এমনই এক কঠিন পরিস্থিতিতে উদ্বাস্তুরা আমরণ অনশনে বসে। অনশনে বাদল হালদারের মৃত্যু হয়। পরের দিন সকালে অনেকগুলি লরি এসে দাঁড়ায় ক্যাম্পের সামনে। অনশনের আটাশ দিনের মাথায় অনশনকারীদের ধরে নিয়ে গেল, সঙ্গে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরে দিল সাড়ে চারশো উদ্বাস্তুকে। এদের মধ্যে যারা সরকারের কাছে জবানবন্দি দিল ‘তারা দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনে যাবে’ তারাই কেবল মুক্তি পেল। জেলের বাইরে তাদের জন্য দাঁড়িয়ে ছিল লরি, সেই লরিতে তুলে তাদের নিয়ে যাওয়া হল দণ্ডকারণ্যে।

দণ্ডকারণ্যে যাবার প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই উপন্যাস শেষ হয়েছে, এই প্রতিবাদ বিক্ষোভে স্বয়ং লেখকই অংশগ্রহণ করেছেন। একের পর এক উদ্বাস্তু ক্যাম্প বদলাতে হয়েছে তাঁকে; নানারকম অত্যাচার আর অপমান সয়ে জীবনের উপান্তে এসে আজও তিনি ভুলতে পারেন না ক্যাম্প জীবনের বেদনাময় স্মৃতি।

মনোরঞ্জন ব্যাপারীর ‘চণ্ডাল জীবন’ উপন্যাসে পূর্ববঙ্গের বরিশাল অঞ্চলের নিম্নবর্গীয়, অত্যন্ত দরিদ্র গরিব দাসের জীবন সংগ্রামের কথা ব্যক্ত হয়েছে। গরিব দাসের ছেলে জীবন দাসের ছায়াপাত লক্ষিত হয় ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিজীবনের মধ্যে। গরিব দাসের অন্য ভায়েরা দেশান্তরী হবার পরেও সে পূর্ববঙ্গের মাটি কামড়ে পড়ে ছিল নিতান্ত দেশের মায়ায়। কিন্তু হিন্দু আর মুসলমানের বিবাদ ক্রমে বাড়তে থাকায় প্রতিবেশী হিন্দু-মুসলমান কেউই যখন গরিবকে দেশে নিরাপদে থাকার আশ্বাস দিতে পারল না তখন ঘর-বাড়ি, গাছপালা, মানুষ-জন ছেড়ে গরিব দেশান্তরী হল। আর পাঁচজন গরিব উদ্বাস্তুর মত গরিব দাসও নানান প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে শিয়ালদহ স্টেশন ছুঁয়ে উদ্বাস্তু খাতায় নাম লিখিয়ে সরকারি নির্দেশে পোটলা পুঁটলি নিয়ে উঠে পড়ল রেডফোর্ড কোম্পানীর ট্রাকে। ট্রাক ছুটল দ্রুত। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সওয়ারি ফেলে খালি ট্রাক নিয়ে ফিরে যেতে হবে দ্বিতীয় ট্রিপের জন্যে। এক জায়গায় এসে ট্রাকখানা থেমে গেল। ড্রাইভার নিচে নেমে বাঁজখাই গলায় গরীব, সুবল, রাধাকান্তদের দিকে তাকিয়ে হুকুম দিল— ‘সব লোক উত্তরো। আ- গিয়া ক্যাম্প।’ ‘একটা বিশাল প্রান্তর ঘিরে গড়ে তোলা হয়েছে ছিন্নমূল মানুষদের জন্য এই অস্থায়ী আবাসন। লাল লাল তাবু খাটিয়ে ঢেকে ফেলা হয়েছে সারা এলাকা। পাঁচসাত হাজার পরিবার রাখার মত ব্যবস্থা। এই ক্যাম্পের নাম শিরোমণিপুর।’[৫১]

বেলা চারটে নাগাদ ট্রাক থেকে মালপত্র নামিয়ে উদ্বাস্তুরা বসে আমগাছের নিচে। সামনে সরকারি কর্মচারীদের অফিস আবাস। চারিদিকে টিনের ঘেরা, মাথার উপরে টিনের ছাউনিওয়ালা ঘরগুলোর কোনওটা ডাক্তারখানা, কোনওটা গুদাম, কোনওটা মেস। তবে ঘরগুলোর চেহারা দেখে বুঝে নেওয়া যায় এ সবই অস্থায়ী। সাময়িক, আপৎকালীন ব্যবহারের জন্য। একটা ঘরে মোটা খাতা নিয়ে বসে আছেন বেজায় কালো রঙের একটা লোক। গায়ে সাদা জামা, গোল মুখ, বড় চোখ, চোখে চশমা, কানে, নাকে, হাতে বড় বড় লোম। সূর্য ডোবার মুহূর্তে সবার নাম লেখার পর কালোবাবু একখানা রেশনকার্ডের মত কাগজ ধরিয়ে দিয়ে বললেন— ‘এই কাগজ দেখিয়ে গুদাম থেকে চাল ডাল নিয়ে নে।’ কালোবাবু তার নিজস্ব শৈলীতে আরও বলেন— ‘যা আজ থেকে তোরা ভারত সরকারের ঘর জামাই হয়ে গেলি খা-দা মজা কর।’ চাল-ডালের সঙ্গে পাওয়া গেল খানিকটা নুন। এর নাম ডোল। পরিবার পিছু একটা করে তাবু। গরিব,সুবল, রাধাকান্ত, গগন সব পাশাপাশি তাবু ফেলে। একজন অন্য জনকে তাবু টাঙাতে সাহায্য করে— তৈরি হয় মাথা গোঁজার ঠাঁই।

গরিব দেশছাড়ার পর একদিনও ভাতের মুখ দেখেনি— চিবিয়েছে চিঁড়ে আর গুড়। চাল-ডাল

পেয়ে খুশিতে ভরে ওঠে গরিবের মন। চালটা একটু লাল, মোটা একটু ধুলো-কাঁকর মেশানো। গরিবের অনুভবে—যেমন হোক চাল তো! যার আর এক নাম লক্ষ্মীর দানা, লক্ষ্মীর দানার নিন্দে করতে নেই; লক্ষ্মী বিরূপ হয়। বাপকে দেখেছে খেতে বসে গ্লাস থেকে এক কোষ জল নিয়ে থালার চারপাশে গোল করে ছড়িয়ে দিত, তারপর প্রথম গ্রাস ভাত কপালে ঠেকিয়ে মা অন্নপূর্ণার নাম নিত— আজ তো মা অন্ন জুটিয়েছে, কাল যেন জুটিও। খাবার সময় একটা ভাত ও যদি নিচে পড়ে যায়, পরম যত্নে সেই ভাতটা খুঁটে তুলে নিত। সেই বাপের ছেলে গরিব দাস। অন্নের প্রতি তার একই ভক্তি শ্রদ্ধা। তবু কেন সারাজীবন ভাতের জন্য এত হা হুতাশ, কেন অন্নপূর্ণা তার প্রতি সদয় হয় না, জানে না সে।

ঈশ্বরকে নিবেদন করে ডাল দিয়ে মাখা প্রথম ভাতের গ্রাস মুখের কাছে নিয়ে ভক্ করে ছোটা গন্ধে নাকে ধাক্কা খেয়ে বুঝতে পারল তৃপ্তি করে খাওয়া তো দূরের কথা পেট ভরে তোলাও অসাধ্য কাজ। পরপর তিন চার গ্রাস মুখে চালান করে দেবার পর ভাতের থালার উপরই বমি করে ফেলে গরিব। পূর্ববঙ্গে থাকতে এই দরিদ্র শ্রেণির মানুষের যে অন্নকষ্ট ছিল না তা নয়; এরা সকলেই প্রায় কৃষির সঙ্গে যুক্ত ছিল। নিজের হয়তো সামান্য জমি জায়গা ছিল, তা দিয়ে সারা বছর চালাত। যাদের তাও ছিল না তারা প্রতিবেশীর কাছে ধার চাইলে পেত; এমনও দেখা যেত দরিদ্র প্রতিবেশী অনাহারে আছে বলে সম্পন্ন গৃহস্থ তাদের অন্ন জোটাত।[৫২]

'চণ্ডালজীবন' উপন্যাসে শিরোমণিপুরের যে উদ্বাস্তু ক্যাম্পের কথা উল্লিখিত হয়েছে সেখানে সকলেই পূর্ববঙ্গের নিম্নবর্ণের মানুষ— নমঃশূদ্র। সুতরাং জাতপাতের বালাই নেই। নিম্নবর্গীয়দের এই ক্যাম্প এক সময়ে তুলে দিতে চায় সরকার, কারণ সরকারের বক্তব্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু চাপ বেশি হওয়ায় এখানে তাদের আর পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব নয়, তাই তাদের দণ্ডকারণ্যে স্থায়ী পুনর্বাসন দেওয়া হবে। নিম্নবর্গের এই অশিক্ষিত মানুষগুলিকে সহজে রাজ্য ছাড়া করা যাবে তাই তাদের প্রতি এই অন্যায় জুলুম।

কলোনির শত অভাব-অভিযোগের মধ্যেও নিম্নবর্গের এই উদ্বাস্তুদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি অনুরাগ লক্ষ করা যায়। বিগত চোদ্দোপুরুষ যে কাজ করার সাহস পায়নি, দুঃসাহসিক স্পর্ধায় গরিব দাসের ছয় বছরের ছেলে তাই করে বসল। 'ব্রিটিশ আমলের থিরি পাশ বেনু হালদারের সহায়তায় মহা ধুমধাম সহকারে শাঁখ আর উলুধ্বনির মধ্যে 'হাতে খড়ি' হল জীবনের।... 'ক' লিখেছে।'[৫৩] বেনু হালদার এই মহাযজ্ঞের পুরোহিত। সোয়া সের চাল, নিয়ম অনুসারে যা ডোলের চাল হলে চলবে না, কারণ দানের জিনিস দান করায় পুণ্য মেলে না। তাই চাল আনতে হয়েছিল কিনে। সেই চাল আর দক্ষিণা

নিয়ে সে চলে যাবার আগে বেনু হালদার বলে যায়— 'দ্যাখো গরিব, খালি অক্ষরখান দ্যাখো। তারার নাহান জলজল করতে আছে।... মিলাইয়া দেইখ্যা নিয়ো বড় হইয়া জীবন এ্যাকখান মহাপণ্ডিত হইবো।'[৫৪]

কিন্তু পণ্ডিত হওয়া তো দূরের কথা, জীবন দাসের স্কুলে যাওয়াই একদিন বন্ধ হয়ে যায়। কারণ সরকার স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে, স্কুলের শিক্ষককে অন্যত্র বদলি করে দেওয়া হয়েছে। যেখানে ক্যাম্পই রাখতে চাইছে না সরকার, সেখানে আবার স্কুল থাকবে কোথা থেকে। উদ্বাস্তুদের বলা হল দণ্ডকারণ্যে যাবার জন্য নাম নথিভুক্ত করতে। এই সময়ে উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে যাবার জন্যে নানা ধরনের প্রলোভন দেখানো হয়— হালের বলদ, চাষের জমি, দুধের গাই এসব নিয়ে তারা মহাসুখে থাকবে। এই আহ্বানে সাড়া দেয় শিরোমণিপুর কলোনির কিছু লোক। এই ক্যাম্প-জীবনে তাদের হাঁপ ধরে গিয়েছিল। বংশ পরম্পরায় চাষের সঙ্গে যুক্ত এই মানুষগুলির একটি অংশ চলে গেল দণ্ডকারণ্যে। বাকিরা কলোনির মধ্যে সবচেয়ে বিজ্ঞ মানুষ খগেন মণ্ডলের কাছে এসে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত চাইল। তিনি কাউকেই যেতে নিষেধ করলেন না, তবে দণ্ডকারণ্যের ভয়াবহ ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করালেন। ফলে প্রথম ধাপে উদ্বাস্তুরা দণ্ডকারণ্যে যেতে উৎসাহ দেখালেও পরবর্তী সময়ে অধিকাংশই সেখানে যেতে অনীহা প্রকাশ করে। অন্যদিকে সরকারের পক্ষ থেকে মিথ্যা ছবি দেখিয়ে উদ্বাস্তুদের যাবার জন্যে উৎসাহিত করা হয়। প্রথম ধাপে যাওয়া তিনচারটি উদ্বাস্তু পরিবার ফিরে এসে সে দেশের যে বিবরণ দেয়, তা শুনে সবার বুক হিম হয়ে যায়।

দণ্ডকারণ্য না যেতে চাওয়ার অপরাধে ডোল বন্ধ হয়েছে দু'মাস। অনাহারে কাটে গরিব দাসের। ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে এসে প্রহ্লাদ চক্রবর্তী উদ্বাস্তুদের খেপিয়ে তোলে, যতক্ষণ না পর্যন্ত উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে সুষ্ঠু পুনর্বাসন দেওয়া হয় ততদিন যেন তারা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যায়। কিন্তু প্রহ্লাদ চক্রবর্তীর ফাঁপা কথায় কোনও কাজ হয় না, ফলে উদ্বাস্তুরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যায়। সরকারি সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবার পর ক্যাম্পের বাসিন্দারা নানা জায়গায় ছড়িয়ে যায়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ঘুটিয়ারি শরীফ, বেতবেড়িয়া, ঘোলা, দোলতলা অঞ্চলে শিরোমণিপুরের মত ক্যাম্প বসিয়েছিল সরকার; দণ্ডকারণ্যে না যাওয়ার অপরাধে এইসব ক্যাম্পেও সরকারি সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কলকাতা সন্নিকটে বলে গরিব দাসের মত এখানকার বাসিন্দাদের বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হয়নি— কলকাতা শহরে কাজ করে রোজগার করার সুযোগ পায়। এখানেই এক

ক্যাম্পে থাকে গরিব দাসের তিন ভাই। সেখানে আসার জন্য মনস্থির করে সে। এরই মধ্যে জীবন পালিয়ে যায় ক্যাম্প থেকে, অবশ্য সাতদিন পরে জীবন ফিরে এলে গরিব দাস জীবনের পরে জন্মানো আরও দুই সন্তান সহ চলে আসে ভাইয়ের কাছে।

ঘোলা, দোলতলা এই সব ক্যাম্পের উদ্বাস্তুরা হোগলা পাতার মাদুর বুনে বিক্রি করত। গরিব দাস নেমে পড়ল সেই ব্যবসায়। পরিবারের পাঁচজন সদস্য। গরিবের সংসার চলে না, অভাবের কারণে একদিন জীবন কলোনি ত্যাগ করে চলে যায়। গরিব নতুন বসতির সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ে; কলকাতার কাছাকাছি কোনও ক্যাম্প কিংবা কলোনি। সে হাঁটতে হাঁটতে যাদবপুরের রেললাইনের পাশে দেশী মানুষ রাখাল দাসের ঝুপড়িতে এসে হাজির হয়, রাখাল দাসের সঙ্গে পরামর্শ করে যাদবপুর অঞ্চলে কোনও জবরদখল কলোনিতে একটু জায়গা পাওয়া যায় কিনা। রাখাল ও যে সে চেষ্টা করেনি তা নয়, কিন্তু সে নিম্নবর্ণের মানুষ হওয়ার কারণে স্থান পায়নি সেখানে। জবরদখল কলোনিগুলিতে মূলত স্থান করে নিয়েছিল পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত ও উচ্চবর্ণের মানুষ, সেখানে নিম্নবর্ণের স্থান না হওয়ার কারণ নিম্নরূপ—

i) যে ধরনের লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কলোনিগুলির অধিকার অর্জিত হয়েছিল তা মোকাবেলা করবার ক্ষমতা নিম্নবর্ণের উদ্বাস্তুদের মধ্যে ছিল না;

ii) জবরদখল কলোনিগুলি তৈরি করেছিল মূলত শিক্ষিত সম্প্রদায়। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের মধ্যে নিম্নবর্ণের শিক্ষিত ছিল অতি নগণ্য, তাছাড়া এই স্বল্প সংখ্যক শিক্ষিত মানুষ এই বিষয়ে বিশেষ মাথা ঘামান নি;

iii) উচ্চবর্গীয়রা চান নি কলোনিগুলিতে নিম্নবর্গীয়দের স্থান হোক; তাই ছলে-বলে কৌশলে তারা কলোনি থেকে নিম্নবর্গীয়দের উৎখাত করেছে।

iv) কলোনি গঠনের উদ্যোক্তারা তাদের আত্মীয়-পরিজন কিংবা জানা-চেনা লোকদের ডেকে এনে স্থান করে দেয়, এক্ষেত্রে বাদ পড়ে নিম্নবর্গীয়রা। ফলে উচ্চবর্গীয়দের প্রাধান্য লক্ষিত হয় এখানে।

এই ঐতিহাসিক সত্যের প্রেক্ষাপটে জবরদখল কলোনির বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে রাখাল দাসের কথায়— 'কি জাইত তোমার? নমো, পোদ, কৈবর্ত জাউলা হইলে হইবে না। নাম ধাম জানতে পারলে পাছায় লাথি মাইরা তুইল্যা দিবো। জবরদখল করাণ লাগলে উচা জাইত হয়োন লাগবো। খোঁজ নিয়া দেখো গিয়া কলোনিতে কলোনিতে।'[৫৫] রাখাল দাসের কথায় নিরুৎসাহিত হয়ে গরিব আর জবরদখল কলোনিতে যাবে না বলে স্থির করে। যাদবপুরে রেললাইনের পাশে ঝুপড়িতে ঘর তোলে জীবন।

কলকাতায় নানা ধরনের কাজ করেও সে তার অভাব ঘুচাতে পারে না। গরিবের ছেলে জীবন ফিরে আসে বাবার কাছে। বাবা ছেলের সংগ্রাম চলতেই থাকে, ফুরায় না।

সমরেশ বসুর 'সুচাঁদের স্বদেশযাত্রা' উপন্যাসে পূর্ববঙ্গের বিলডিহি গ্রামের সুচাঁদ বহুরূপীর বাস্তুত্যাগের অনুষঙ্গে কলোনি জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সুচাঁদ সং দেখিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত। বহুরূপীর সাজ দেখাতে গিয়েই ওই গ্রামের মেয়ে বুচির সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। কিন্তু বিনোদ দাসের সঙ্গে বুচির বিয়ে হয়ে যায়। ফলে সুঁচাদের আর মন টিকল না গ্রামে। সুচাঁদ তখন নতুন দেশ দেখার আগ্রহে বেরিয়ে পড়ে হিন্দুস্তানের দিকে 'বিলডিহিতে বুচি থাক, সুচাঁদ দেশান্তরী হোক। এত লোকে যায় একটা তো আশাও আছে। নতুন দেশের একটা টানও তো আছে।'[৫৬]

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন সুচাঁদ দেশভাগজনিত কারণে দেশত্যাগ করেনি— বুঁচিকে না পাবার ব্যাথায় সে বিবাগি হয়েছিল; কিন্তু হিন্দুস্থানে এসে দেশবিভাগের যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয় তাকে। এদেশে এসে বহুকষ্টে কলোনিতে আশ্রয় পায়। কিন্তু এখানকার লোকেরা তার বহুরূপী সাজ দেখতে চায় না, ব্যঙ্গ করে; বেঁচে থাকবার মত রোজগার হয় না। তাই বিলডিহিতে ফিরে যাবার জন্য সুচাঁদ উতলা হয়ে ওঠে। সুচাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনমন ঘটলেও উচ্চবর্ণের কিছু মানুষ যারা দেশত্যাগের পর অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। এই ঐতিহাসিক সত্য সুচাঁদের কথার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে— 'বিলডিহির বোস-ঠাকুরতা, দত্তজা, মিত্তির মশাইরা ভিটেমাটি ছেড়ে এলে ক্ষতি নেই। তাদের সেখানে ছিল দোতলা মোকাম, এখানে হয়েছে চারতলা। তারা হলেন বড় বড় বাস্তুহারা, ...এমন কি, বিলডিহির গদাধর পণ্ডিত, ব্রজেশ্বরীর পুরোহিত, যাদের দেশে থাকতে নুন আনতে পান্তা ফুরাত, তাদের এখন মোটরগাড়ি দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে।'[৫৭] আবার কলোনিতে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেবার জন্য কিছু মানুষের অসুদপায়ে অর্থ উপার্জনের কথা উল্লিখিত হয়েছে উপন্যাসে— 'কলোনির মাতব্বর মহাদেব দাস নিল কিছু টাকা। দপ্তরে বাবুরা কিছু টাকা, হু কী মজা দেখ, মহাদেবও পুবের মানুষ। আর সেই দপ্তরের বাবুও পুবের। কাকে কাকের মাংস খায় না। কিন্তু সুচাঁদ দেখেছে, অভাবে অভ্যেসে কুকুরে কুকুরের মাংস খায়।'[৫৮] এমন একটি নীতিহীন ক্ষয়ে যাওয়া সমাজে বাস করতে চায়নি সুচাঁদ। তাই সে আবার পূর্ববঙ্গে ফিরে গিয়েছে। যদিও সেখানকার সবকিছু তত দিনে বদলে গিয়েছে, তার ভালোবাসার মানুষ বুচিরও মৃত্যু হয়েছে; সেখানেও তার মন টেকে না। তার পরই গুপ্তচর সন্দেহে সুচাঁদকে থানায় ধরে নিয়ে যায়— নিজের জন্মভূমিতে সে হয়ে যায় বিদেশী।

প্রফুল্ল রায়ের 'শত ধারায় বয়ে যায়' উপন্যাসে পূর্ববঙ্গের রাজদিয়া অঞ্চলের সবচেয়ে সম্মানীয় ব্যক্তি হেমনাথ মিত্র তথা উপন্যাসের নায়ক বিনয়ের দাদু হেমকত্তার বাড়ির গৃহভৃত্য যুগলের উদ্যোগে গঠিত কলোনির চিত্র ফুটে উঠেছে। কলোনি জীবনকে কেন্দ্র করে এ উপন্যাস লেখা হয়নি, উদ্বাস্তু জীবনের নানা অনুষঙ্গে জবরদখল কলোনির কথা উঠে এসেছে।

হেমকত্তার বাড়ির কামলা যুগল দেশভাগ পরবর্তী সময়ে শ্বশুরবাড়ির লোকদের সঙ্গে স্ত্রী পাখিকে নিয়ে ভারতে চলে আসে। সরকারি ক্যাম্পে না গিয়ে নিজে উদ্যোগী হয়ে সে জমি দখল করে কলোনি স্থাপন করে। আগরপাড়া থেকে পুব দিকে মাইল তিনেক হাঁটলেই মুকুন্দপুরে যুগলের এই কলোনি। আর পাঁচটা জবরদখল কলোনির মত তার এই কলোনির দখলও সহজে আসেনি। যে জমিতে তারা উপনিবেশ গড়েছে তার মালিক ওদের উৎখাত করার জন্য দিন নেই রাত নেই, যখন তখন হানাদার পাঠাচ্ছে। গুণ্ডাদের সড়কির ফলা যুগলের পা এফোঁড় ওফোঁড় করে ফেলেছিল; তাই তাকে কলকাতায় নিয়মিত পায়ের চিকিৎসা করতে আসতে হয়। উপন্যাসে কলোনি জীবনের দু'টি বিশেষ দিক উঠে এসেছে—

১. উপনিবেশ গড়তে সংঘবদ্ধভাবে সংগ্রাম; বিশেষ করে কলোনির নারীদের সমবেত সংগ্রাম;

২. কলোনিবাসীর শিক্ষার উদ্যোগ।

জবরদখল কলোনি গঠনের জন্য পুরুষের পাশাপাশি নারীদের ভূমিকা ছিল যথেষ্ট সক্রিয়। আলোচ্য উপন্যাসে মুকুন্দপুর কলোনি রক্ষার ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত সক্রিয়। যুগলের সঙ্গে বিনয় এবং আশু দত্ত (যাকে বিনয় কলোনিতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করতে চায়) কলোনিতে আসার পর তারা দেখতে পায় নারীর রণরঙ্গিনী রূপ। পূর্ববঙ্গে থাকতে যুগলের বউ পাখিকে দেখেছিল লজ্জানত জড়সড় একটি মেয়ে, তার ভেতর এমন আগুন লুকিয়ে ছিল কে ভাবতে পেরেছে। পাখির নেতৃত্বে কলোনির মেয়েরা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে— 'কারও হাতে ধারাল ছ্যান দা, কারও হাতে সড়কি, কারও হাতে বঁটি, কারও হাতে কুড়োল।... সবচেয়ে বেশি করে যাকে চোখে পড়ছে সে পাখি। তার মাথায় ঘোমটা নেই, আঁচল মাটিতে লুটোচ্ছে। সিঁদুর লেপটে কপালে মাখামাখি। শাড়ি এবং ব্লাউজের অনেকখানি ছিঁড়ে গেছে। দুচোখ থেকে আগুন ঠিকরোচ্ছে।'[৫৯] হানাদারেরা সবমিলিয়ে ছিল সাত আট জন। হয়তো ভেবেছিল, কলোনির মেয়েরা কী আর করতে পারবে? তাদের দেখে আতঙ্কে সিঁটিয়ে যাবে; কিন্তু ঘটনাটি ঘটে উল্টো। সংখ্যায় অধিক হওয়ায় এবং কলোনি রক্ষায় মরিয়া এই নারীদের সঙ্গে পেরে না উঠে তারা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যায়। কলোনির

মেয়েদের এই সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ পরবর্তীকালে সামাজিক অধিকার ও প্রতিষ্ঠা পাবার ক্ষেত্রে বিশেষ কাজ করেছে।

এই উপন্যাসে যুগলের স্বপ্নের এক জনপদ গড়ার প্রয়াস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হেমনাথের বাড়ির এক কামলা, অক্ষর পরিচয়হীন, দেশে থাকতে যে ধান বুনত, সর্ষে-কলাই ফলাত, পাট জাগ দিত, খাল-বিল-নদীতে মাছ ধরে বেড়াত সে 'ভাটির দেশ এবং রাজদিয়া অঞ্চলের মানুষ খুঁজে খুঁজে নিয়ে আসে এবং তার মুকুন্দপুর কলোনিতে স্থান দেয়।' কারণ সে চায়— 'পূর্ব বাংলাকে সীমান্তের এপারে নতুন করে নির্মাণ করবে।' এই স্বজন প্রীতি বা অঞ্চলের... প্রতিটান লক্ষ করা গিয়েছে প্রায় প্রতিটি কলোনিতে। সেজন্য খেয়াল করলে দেখা যায় এক একটি কলোনিতে সকলেই প্রায় একই অঞ্চলের বাসিন্দা কিংবা তারা লতায় পাতায় আত্মীয়।[৬০]

যুগল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে কলোনিতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তার জন্য সে রাজদিয়া হাইস্কুলের প্রাক্তন সহকারী প্রধান শিক্ষক আশু দত্তকে বেছে নিয়েছে, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কারণ ব্যক্ত করেছে বিনয়ের কাছে। পূর্ববঙ্গে থাকলে কোনও চিন্তা ছিল না। খাল-বিল-নদী-নালায় ভরা সেই দেশ তার উপরে মাঠের পর মাঠ উর্বর জমি। নদীর মাছ আর খেতের ফসল— তা দিয়ে তাদের সারা বছর চলে যেত। কিন্তু এখানে সেই খাল-বিল নেই যে জমির মালিকদের সারা বছরের জন্য ঠিক করা রয়েছে কিষাণ তাই কাজ-কাম পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় ভবিষ্যতের চিন্তায় মগ্ন যুগল বলে— 'চাকরি বাকরি ছাড়া আমাগো নাখাল রিফুগো গতি নাই । কিন্তুক চারকিতো মুখের কথা খসাইলে হয় না। হের লেইগা বিদ্যা চাই। প্যাটে কালির অক্ষর সান্ধাইতে (ঢোকাতে) হইব। হে তো অ্যামনে হয় না। ইস্কুল বহাইতে (বসাতে) হইব।'[৬১]

অক্ষর পরিচয়হীন এই যুবক ছিল আলভোলা ধরনের, সীমান্তের এ পারে এসে পরিস্থিতির চাপে সে বুঝেছে লেখাপড়া ছাড়া উদ্বাস্তুদের ছেলেমেয়েদের কোনও গতি নেই। সেজন্যে বিনয়কে নিয়ে যুগল আশু মাস্টারের কাছে যায় এবং তাকে রাজি করিয়ে নিয়ে যায় মুকুন্দপুর কলোনিতে। কলোনির সকলের হয়ে যুগল আশু দত্তকে অনুরোধ করে— 'এই পোলা-মাইয়া গুলানের ভার আপনেরে নিতেই হইব মাস্টার মশায়। লেখাপড়ি না শেখলে ইণ্ডিয়ায় অগো জনম বেবাক আন্ধার।'[৬২] আশু মাস্টারের জন্য কলোনির পক্ষ থেকে তারা সাত কাঠা জমি বরাদ্দ করে সেই সঙ্গে বাস করবার জন্য ঘর তুলে দিতে রাজি হয়। এ ছাড়া স্কুলের জন্য এক বিঘা জমি দেওয়া হয়। আশু দত্ত কলোনির

লোকদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উৎসাহ এবং বিদ্যার প্রতি অনুরাগ দেখে বিস্মিত হন। প্রথমে ইতস্তত করে ও পরে বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করতে সম্মত হন।

উপন্যাসে 'সোনার বাংলা উদ্বাস্তু পল্লি' নামে আরও একটি কলোনির কথা বিবৃত হয়েছে। 'নতুন ভারত'-এর চিফ রিপোর্টার প্রসাদ লাহিড়ির নির্দেশে বিনয় উদ্বাস্তু কলোনির ইতিহাস ও উদ্বাস্তুদের জীবন-যাপনের কথা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করার জন্য এই কলোনিতে যায়। গড়িয়া বাজার পিছনে রেখে আরও মিনিট পনেরো বাসে চেপে ভুবনমোহিনী গার্লস হাইস্কুলের উল্টো দিকে একটা গেঁয়ো মাটির পথ পেরিয়ে কিছু দূর হাঁটতেই দেখা গেল বাঁশের একটা ঘুঁটি পোঁতা সেটার সঙ্গে পেরেক দিয়ে আটকানো এক টুকরো লম্বা টিনের পাত। পাতটায় আঁকা বাঁকা অক্ষরে লেখা 'সোনার বাংলা উদ্বাস্তুপল্লি'।

আর পাঁচটা উদ্বাস্তু কলোনির মতো এই কলোনির লোকগুলোর চেহারা শুষ্ক ও বিবর্ণ, তাদের চোখে-মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ। বিনয় কলোনিতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে কলোনির মানুষগুলির শঙ্কা, উৎকণ্ঠার সঙ্গে কৌতূহল প্রবল হয়ে ওঠে। কলোনির কাজ শুরু হয়েছিল এক বছর আগে, পুরো ভূখণ্ড জুড়ে ছিড় হোগলা বন। বন সাফ করে নিচু জমিতে মাটি ফেলে প্রথম বসতি তৈরি হয়। মাথা গোঁজার মত ঘর তুলে এরা বসত করছে ঠিকই, কিন্তু সেখানেও পদে পদে সংকট। এই জমির মালিক সামন্তরা। উদ্বাস্তু পল্লির বাসিন্দাদের উৎখাত করার জন্য তারা নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কতবার যে সশস্ত্র গুণ্ডা পাঠিয়েছে তার হিসেব নেই। তিন তিনবার রাতের অন্ধকারে হানাদারেরা কলোনির ঘরের চালে, বাঁশের বেড়ায় পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। এখানে নানা অঞ্চলের মানুষ এসে বসতি গড়েছে। তারা সংঘবদ্ধ হয়েছে নিজেদেরকে রক্ষা করবার জন্য। এখানে এসে বিনয় দেখা পায় পূর্ববঙ্গ থেকে আসবার সময়ে বিনয়ের সঙ্গী অধর ভূইমালির। সে-ই কলোনির সমগ্র অঞ্চলটি বিনয়কে ঘুরিয়ে দেখায়. কলোনি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ফেরার সময় সেখানে প্রবেশ করে একজন যুবক এবং একজন তরুণী। তাদের সম্পর্কে বিনয় কৌতূহলী হয়ে পড়ে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অধরের কাছ থেকে জেনে নেয় যুবকটির নাম ত্রিদিব সেন, যুবতীর নাম জয়ন্তী বসু। তারা কমিউনিস্ট পার্টির লোক। তাদের পরামর্শ মত কলোনি চালিত হয়। উদ্বাস্তুরা এপারে এসে পশুর মত জীবন-যাপন করছে অথচ সরকার তাদের সুষ্ঠুভাবে বাঁচার মত কোনও ব্যবস্থাই করছে না। তাই শরণার্থীদের দাবি যাতে সরকার মেনে নেয় তার জন্য ত্রিদিব সেনরা কলোনিবাসীদের দিয়ে মিটিং মিছিলের পরিকল্পনা করে। এই জন্যই কলোনিগুলিতে প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য উদ্বাস্তুরা প্রথমে এসে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়। কারণ কেন্দ্রে ও রাজ্যে তখন কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায়, তাদের সঙ্গে না থাকলে সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে হবে। কলোনিগুলিতে নিজেদের উদ্যোগে উদ্বাস্তুরা কমিটি গঠন করে। এই কমিটির মূল উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের সুরক্ষা এবং সরকারের কাছ থেকে দাবি-দাওয়া আদায় করা। কংগ্রেস সরকার উদ্বাস্তুদের চাহিদা পূরণ না করতে পারার কারণে সরকারের প্রতি তাদের মোহভঙ্গ হয়। কংগ্রেস সরকারের এই ঘাটতির জায়গা পূরণের লক্ষ্যে কমিউনিস্টপার্টি কলোনিগুলিতে তাদের সংগঠন বিস্তার করে। 'শতধারায় বয়ে যায়' উপন্যাসে ত্রিদিব সেন এবং জয়ন্তী বসুর কলোনিতে আগমন কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনের বিস্তার এবং দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সরকারের বিরুদ্ধে উদ্বাস্তুদের সংঘবদ্ধ হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে।

নারায়ণ সান্যালের 'অরণ্যদণ্ডক' উপন্যাসে দীর্ঘ ক্যাম্প জীবনের তথ্যনিষ্ঠ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। উপন্যাসটি অরণ্যকাণ্ড, আদিকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড, উত্তরাকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড— এই কটি অধ্যায়ে বিভক্ত। উনিশশো পঁয়তাল্লিশ থেকে উনিশশো ষাট/একষট্টি পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে। আদিকাণ্ডে তেরশ বাহান্ন সালের আশ্বিন মাসে কাহিনির শুরু। অবিভক্ত বাংলাদেশে কমলপুরের শেষ সামন্তপ্রভু কমলাপতি চৌধুরির গ্রামে আগমন, জমিদার বাড়িতে দুর্গাপুজো সেই পুজো উপলক্ষ্যে ডাকা সভায় গ্রামবাসীরা অপমানিত হয়ে ফিরে বারোয়ারি পুজোর ব্যবস্থা এবং জমিদারের পুজো বয়কট করার মধ্য দিয়ে লেখক দ্রুত সমাজ বদলের একটি ছবি এঁকেছেন।

একদিকে জমিদারী প্রথার বিলোপ ঘটছে অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মানুষের বেপরোয়া জীবন-যাপন, জীবনবোধের বদলে যাওয়া মূল্যায়ণের মধ্যেই সামন্ত প্রভু কমলাপতির সঙ্গে পুত্র শ্রীপতির বিরোধ বাধে। ইতিমধ্যে দেশভাগ হল কমলপুরের মানুষগুলোকে আমরা দেখতে পেলাম নতুন কালে নতুন পরিবেশে— ঠিক পাঁচ বছর পরে, বর্ধমান জেলার লক্ষ্মীপুরে। র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদে দেশ বিভাজনের পর এপারে এসে তারা উঠল রিসেপশান সেন্টারে। সেখান থেকে তারা যান ট্রানসিট ক্যাম্পে। কমলপুরের মানুষগুলিকে অবশেষে চালান করা হল লক্ষ্মীপুরের পি.এল. ক্যাম্পে।

এই ক্যাম্পের যারা বাসিন্দা তারা পি.এল. অর্থাৎ সরকারের স্থায়ী পোষ্য। লেখক ক্যাম্পের বর্ণনা-দিয়েছেন এভাবে— 'আউলিয়া মাঠের অনাবাদী বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে গড়ে উঠেছে সারি সারি

দোচালা ঘর। মুলিবাঁশের দেওয়াল, দরমার ঝাপ, দরজা-জানালা, আর শাল খুঁটির উপর করোগেট টিনের চালা। লক্ষ্মীপুর পি.এল ক্যাম্প।'[৬৩] বর্তমান সিংহ-জমিদার রায় সাহেব আউলিয়া মাঠের অনাবাদী জমিটা সরকারের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। তিনিই আবার ক্যাম্প তৈরির জন্য সোয়া লক্ষ টাকা কন্ট্রাক্ট পেয়েছিলেন। ক্যাম্প তৈরি শেষ হতে না হতেই উদ্বাস্তুরা এসে পড়ে। সকলেই নাকি এসেছে 'পাকিস্তানের কী এক নদীর ধারে কোনও এক কমলপুর গাঁ থেকে। ক্যাম্পে এসে তারা নতুন সংজ্ঞা লাভ করেছে— পি.এল. তথা সরকারে স্থায়ী পোষ্য। বাঁচার তাগিদে তাদের ভিড় করতে হয় ডোল অফিসের কাউন্টারে। 'কার্ডে দাগ দিয়ে ক্যাম্প ক্লার্ক বীরু গুপ্ত হিসাব করে টাকা দেয়। মাথাপিছু চার টাকা নয় আনা করে প্রাপ্য প্রাপ্তবয়স্ক একজনের এক পক্ষকালের জন্য। এ ছাড়া আছে র‍্যাশন। দু'সের চাল, দু'সের আটা আর চৌদ্দ ছটাক ডাল। পনের দিনের রসদ।'[৬৪] বিনা পরিশ্রমে এমন ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা পছন্দ হল না লোকগুলোর, তারা জমি চায়, লাঙল চায়, বীজ ধান চায়— ডোল চায় না। সরকার তাদের এই সদিচ্ছায় সাড়া দিয়ে আউলিয়া মাঠের এবং দামোদরের গর্ভভুক্ত জমিটা বিলি করতে চায়; কিন্তু সে জমি অনুর্বর কাঁকুরে, ফসল হওয়া তো দূরের কথা জমিতে লাঙলও চলবে না। দ্বিজপদ কর্মকার, রতন ঘোষেরা তাই লক্ষ্মীপুরে পুনর্বাসন চায় না।

ইতিমধ্যে লক্ষ্মীপুর পি.এল ক্যাম্প বন্ধ করে দিতে উদ্যোগী হয় সরকার। কলকাতা থেকে পুনর্বাসন বিভাগের বড় কর্তারা এসে ক্যাম্পের লোকদের দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের প্রস্তাব দিলেন। দণ্ডকারণ্যে না গেলে ছ'মাসের ডোল নিয়ে ক্যাম্প ত্যাগ করতে হবে। এরপর সরকার আর তাদের কোনও দায়িত্ব গ্রহণ করবে না। পাশাপাশি দণ্ডকারণ্যে গেলে চাষের জমি, বসত বাড়ি, হালের বলদ দোয়া গাই বীজ ধান, প্রাথমিকভাবে সংসার চালানোর খরচ সবই দেওয়া হবে। সেখানে যাওয়ার জন্যে নানাভাবে প্রলুব্ধ করা হয়। ক্যাম্পের লোকেরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ঠিক করে তারা দণ্ডকারণ্যেই যাবে।

কদিন পরেই তাদের নিয়ে আসা হল হাওড়া স্টেশনে। স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা হয়েছে নিয়ে যাবার জন্যে। প্রথম যাত্রীর দল নবজীবনের আহ্বানে চলল দণ্ডকারণ্যে। কমলপুর গাঁয়ের ভূতপূর্ব বাসিন্দা অর্থাৎ লক্ষ্মীপুর ক্যাম্পের উদ্বাস্তুরাও এল এই দলে। স্পেশাল ট্রেন থামল রায়পুরে। সেখান থেকে মানা শিবির মাইল আষ্টেক। মানা রিসেপশান সেন্টারে থাকল দুচার দশদিন। তারপর রাঙামাটির ধুলো উড়িয়ে শাল, আমলকি, হরিতকি আর মহুয়া বন পেরিয়ে একবার ট্রাক থামল চামরা ফিডিং সেন্টারে। সেখানে তাদের জন্যে খাবার রান্না করে রাখা হয়েছে অনেক আগে থেকে— ভাত ডাল

ট্যাঁড়শের চচ্চড়ি, আলু-বেগুনের ঝোল। খাওয়া দাওয়া সেরে আবার ট্রাকে ওঠা; অবশেষে ট্রাক এসে পৌঁছয় মাকরেল ওয়ার্ক-সাইট ক্যাম্পে। কিন্তু এখানে এসে প্রথমেই তাদের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। তাদের পাকা বাড়ি দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এখানে এসে তারা দেখে 'সারি ছোলদারী তাবু। আমবাগানে ঘন ছায়ায় মাকরেল ওয়ার্ক সাইট ক্যাম্প।' সারা দণ্ডকারণ্য জুড়ে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য ওয়ার্ক ক্যাম্প। ইঞ্জিনিয়ার ঋতব্রতর ভাগে পড়েছিল এরকম দশ-বারোটি ক্যাম্প তৈরির দায়িত্ব। একটি ওয়ার্ক ক্যাম্পে পঞ্চাশটি পরিবার থাকবে। প্রতিটি ক্যাম্পে দুটো করে নলকূপ, একটা ইঁদারা। দশ-বারো বছর নিষ্কর্মা থাকতে থাকতে ওরা কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে তাই ওয়ার্ক ক্যাম্পগুলিতে কাজ করিয়ে তাদের কর্মক্ষম ও কর্মমুখীন করে তোলা হবে। তার পর তাদের জন্য তৈরি ঘর-বাড়িতে স্থানান্তরিত করা হবে।

গ্রামের ছক তৈরি করে দিয়েছেন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। বিশ ফুট চওড়া গ্রাম্য সড়ক। 'তার দুই ধারে দুই সারি প্লট দশ কাঠা করে।' প্রতিটি গ্রামে থাকবে একটি পুকুর, একটি কুয়ো, এটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আর চণ্ডীমণ্ডপ। কয়েকটি গ্রামের কেন্দ্রস্থলে একটি মাধ্যমিক স্কুল এবং একটি চিকিৎসা কেন্দ্র। উদ্বাস্তুরা ওয়ার্ক সাইট ক্যাম্প ছেড়ে আসে তাদের নতুন গাঁয়ে, সেখানে এসে তারা চিহ্নিত করে যায় নিজস্ব প্লট। এক্ষেত্রে ঋতব্রতর কথা অনুযায়ী লটারী করতে হয়। শালের খুঁটির উপর তারা গড়ে তোলে একটা টিনের ছাউনি। তারপর নিজ নিজ রুচি ও ইচ্ছানুযায়ী সেটাকে ভাগ করে দু-তিনটে ঘরে। দেড়ফুট চওড়া কাদার দেওয়াল তুলে লাউ-কুমড়ো শশার গাছ লাগায়; গোবর দিয়ে নিকিয়ে পরিচ্ছন্ন করে তোলে উঠোন। পৃথকভাবে তোলে রান্নাঘর, ঢেঁকিশাল।

কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় জমির নকশার সঙ্গে দাগ নম্বর মেলাতে গিয়ে। বনমালী হুই, যিনি পূর্ববঙ্গে সেটেলমেন্ট বিভাগের ঝানু আমিন ছিলেন তিনি নিজের হাতে চেন ধরে মাপ শুরু করলেন, কিন্তু সুরাহা করতে না পেরে বলে দিলেন— 'প্লানের লগে জমির মিল নাই'। শেষ পর্যন্ত দিবাকর পণ্ডিত সিদ্ধান্ত নিলেন, এবছর সকলে মিলে যৌথ চাষ করা হোক। কিন্তু সেখানেও নানা সমস্যা; তৈরি হয়। সকলের পরিশ্রম করার ক্ষমতা সমান ছিল না তাই নিজেদের মধ্যে বিভাজন দেখা দেয়। অবশেষে নিজেরাই সে সমস্যার সমাধান করে। সকলেই বাস্তুহারা, এই দুর্দিনে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজনেই সকলে সমঝোতা করে। ক্রমে স্থিতিশীল হতে শুরু করে উদ্বাস্তুদের জীবন। তারা এখানকার জল-হাওয়ায় মানিয়ে নিতে শুরু করে। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগের মত উদ্বাস্তুদের ওয়ার্ক সাইট ক্যাম্পে কাজ করিয়ে কর্মসক্ষম করে তোলার পরিবর্তে সরাসরি তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা

করা হয়। তথাপি দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু আগমন বন্ধ হয়ে যায়। উপন্যাসে দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তুদের না আসতে চাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে— 'এক একটি ক্যাম্পে আছে পাঁচ হাজার দুহাজার সলিড ভোট। ওদের ভোটের দাম না কি অল্প নয়। আগামী নির্বাচনের আগে ক্ষমতাশালী কেউ চান না ওরা ক্যাম্প ছেড়ে চলে যায়।'[৬৫] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন উদ্বাস্তুরা ক্রমে কংগ্রেস ছেড়ে কমিউনিস্ট পার্টির দিকে ঝুঁকছে। কমিউনিস্টরা তাদের দলের প্রধান শক্তিস্থল হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছে কলোনিগুলিকে। প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেত্রী মনিকুন্তলা সেনের কথায় এই সত্যতার প্রমাণ মেলে— 'প্রায় প্রত্যেকটি কলোনিতে গিয়েছি মহিলা সমিতি গড়তে। এবার কলোনিগুলো থেকে পেতে লাগলাম নিত্যনতুন সাথী।... এইসব কলোনিতে গড়ে উঠতে লাগল নিত্য নতুন মহিলা সমিতি ও কর্মকেন্দ্র।.... এক একটা কলোনি যেন এক একটা সংগ্রাম দুর্গ।'[৬৬] কমিউনিস্ট নেতাদের ধারণা হয়েছিল কলোনিগুলি যদি উঠে যায় তাহলে পার্টি তার শক্তি হারাবে সে কারণে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে তারা উদ্বাস্তুদের কলোনি ত্যাগ করে দণ্ডকারণ্যে না যাবার জন্য ইন্ধন দেয়— কলোনিতে কলোনিতে বিক্ষোভ চলতে থাকে। সরকারের সঙ্গে উদ্বাস্তুদের সংঘাত তৈরি হয়। কমিউনিস্টরা এই সুযোগ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে বলা যায় ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুদের বিশেষ ভূমিকা ছিল, যার বীজ রোপিত হয়েছিল বিভাগ পরবর্তী সময়ে তাদের কলোনিগুলিতে মজবুত সংগঠন তৈরির মধ্যে।

উপন্যাসে দণ্ডকারণ্যের মারকেল ওয়ার্ক সাইট ক্যাম্পের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। কমলপুরের প্রাক্তন বাসিন্দা, যারা বর্ধমানের লক্ষ্মীপুর উদ্বাস্তু ক্যাম্প হয়ে এখানে এসে অসংখ্য উদ্বাস্তুর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। রসিকলাল শিরোমণি, যিনি কমলপুরের সমাজের মধ্যমণি ছিলেন তিনি দণ্ডকারণ্যের এই ক্যাম্পে। এখানে আরও রয়েছেন কমলপুরের জমিদার কন্যা উমা এবং তার মাস্টারমশায় দিবাকর। স্বামী-স্ত্রীর মতন এক ঘরে বাস করে তারা, কিন্তু উমা ধরা দেয় না দিবাকরের কাছে, কেন ধরা দেয় না দিবাকরের কাছে তা রহস্যময় হয়ে ওঠে। উমা অসুস্থ হয়ে পড়ে ডাক্তার আসে, তার যক্ষ্মারোগ ধরা পড়ে। তাকে কাঁকেতে একটি প্রাচীন মিশনারি হাসপাতালের টি.বি.ইউনিটে ভর্তি করে দেওয়া হয়। সেখান থেকে উমা দিবাকরকে চিঠিতে জানায়— সে এই রোগের কথা আগেই জানত, তাই তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি। উপন্যাসের শেষে উমাকে সুস্থ করে ক্যাম্পে ফিরিয়ে আনার আশায় দিবাকর রওনা হয়েছে কাঁকেতে। পূর্ববঙ্গে থাকলে কঠোর সামাজিক নিয়মের মধ্যে সামান্য গ্রাম্য টুলো পণ্ডিতের সঙ্গে জমিদার কন্যার প্রণয়ের সম্পর্ক হয়ত

পরিণতি পেত না, ক্যাম্প-কলোনিতে সেই ভেদ রেখা ঘুচে গেল।

ক্যাম্পের সামাজিক অবস্থা বোঝাতে লেখক বিভাগ পূর্ববর্তী পূর্ববঙ্গের কথাকে তুলে ধরেছেন— 'কমলপুরেও এমন চণ্ডীমণ্ডপের বৈঠক হত— সেখানে মধ্যমণির মত থাকতেন রায়মশায়, আর তাকে ঘিরে সরোজ সাঁই, ননীমাধব, হৃদয় ঘোষ, রসিকলাল চাটুজ্জের দল। পারালকোটের এই বিজন-বনের একান্তে যে মজলিস বসল সেখানে শুধু ভদ্রলোকরাই সমাগত হয়নি— এসেছে নবীন যুগী, নবা পাল দ্বিজপদ কর্মকার, রত্নাকর আর নীলাম্বর; আছে যুগন্দ, রাখহরি মালাকার প্রভৃতিরাও।'[৬৭] নিম্নবর্ণের মানুষের সঙ্গে উচ্চবর্ণের মানুষের একাসনে বসে মত বিনিময় করবার এই সামাজিক অবস্থা তৈরি হয়েছিল দেশভাগের কারণে।

নবীন যুগীর মেয়ে রাধা দ্বিজপদ কর্মকারের ছেলেকে ভালোবাসে। উভয়ে উভয়কে বিয়ে করতে চায় কিন্তু নবীন যুগীর এতে ঘোরতর আপত্তি। কিন্তু সে আপত্তি যুগের দাবি এবং সমাজের চাপের কাছে হার মানে। এভাবেই ক্রমে বদলে যাওয়া সমাজের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'অরণ্যদণ্ডক' উপন্যাসে।

সুধীররঞ্জন হালদার তাঁর 'অরণ্যের অন্ধকার' উপন্যাসে পূর্ববঙ্গের নিম্নবর্ণের এক দম্পতি নিবারণ-মালতীর দণ্ডকারণ্য যাত্রা এবং সেখানে তাদের জীবনের নানা বিপর্যয়ের চিত্র অঙ্কন করেছেন। মেধা থাকলেও অনটনের কারণে ক্লাস এইটের বেশি পড়তে পারেনি নিবারণ। নিবারণ প্রথম পাঠশালায় ভর্তি হতে এলে মাস্টার ভট্চায্যিমশায় বলেছিলেন— 'এই বয়সে এসেছিস লেখাপড়া শিখতে, বুড়ো ধাড়ি হয়ে! তোরা চাষাভুষোর ছেলে, লেখাপড়া শিখবি কী, তোর বাপ-ঠাকুরদা কি কালির আঁচড় জানে কিছু? তার চেয়ে বরং এই বয়স থেকে চাষবাসের কাজে লাগলে আখেরে লাভ হবে।'[৬৮]— এসব কথা বলেও স্কুল বিমুখ করা যায়নি নিবারণকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই ক্লাশ এইট। সতোরো-আঠারোতেই বাবার মৃত্যু। তারপর সংসারের হাল ধরতে হয়, বোনেদের বিয়ে দিতে কাটে আরও বছর চারেক। অবশেষে মায়ের অনুরোধে বিয়ে হয় মালতীর সঙ্গে, বিয়ের পরে বুড়ি বেঁচে ছিল বছর দেড়েক। তখন দেশভাগ সম্পূর্ণ হয়েছে; নেতারা বুঝে নিয়েছে যে যার অংশ। পূর্ববঙ্গে তখন একটাই কথা— এ দেশ মুসলমানদের; হিন্দুর কোনও স্থান নেই। প্রতিদিন দাঙ্গার খবর আসে। ইতিমধ্যে তাদের প্রথম সন্তান নীতীশের জন্ম হয়। ছেলে সবে হাঁটতে শুরু করেছে এই সময়ে দেশত্যাগ করে নিবারণ। প্রথমে তাদের ঠাঁই হয় পশ্চিমবাংলারই একটি আশ্রয় শিবিরে। অল্প সময়ের মধ্যে যে বিপুল

সংখ্যক উদ্বাস্তু আসে তাদের অধিকাংশই কৃষিজীবী। তাদের জন্য চাই বিপুল পরিমাণে চাষযোগ্য জমি। পশ্চিমবঙ্গের মত ছোট্ট একটি রাজ্যে তাদের স্থায়ী পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব নয় এই যুক্তিতে সরকার দণ্ডকারণ্য প্রকল্প গ্রহণ করে বাঙালি উদ্বাস্তুদের সেখানে পুনর্বাসন দেবার ব্যবস্থা করে। উদ্বাস্তুরা এর প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেখানে যেতে বাধ্য হয় মালতী-নিবারণ। এখানে যখন প্রথম আসে তখন প্রচণ্ড প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়তে হয় তাদের। চারদিকে বন-জঙ্গল, হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের ভয়ে সিঁটিয়ে থাকত মালতী। এ ছাড়াও দণ্ডকারণ্যের জীবন-যাপনের নানা প্রতিকূলতার কথা বর্ণনা করেছেন ঔপন্যাসিক—

i) বালুময় পাথুরে অনুর্বর এখানকার জমি, জলধারণের ক্ষমতা নেই মোটেই;

ii) বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই কম;

iii) পাথুরে জমিতে লাঙল চালানো যায় না।

এরমধ্যেই লড়াই করে তারা বেঁচে থাকে। জমি সাফ করা, আল বাঁধা, ঘর তৈরি করে চলে নিবারণের মত আরও অনেকে। পনের-বিশটা পরিবার মিলিয়ে একটা দল তৈরি হয়েছে। নিবারণ একটি দলের লিডার। ইতিমধ্যে মালতী মা হয়েছে আরও তিন ছেলে মেয়ের। জগদীশের পরে আরও এক ছেলে, তারপর দুই মেয়ে সোমা আর উমা। 'এই সোমাই এখন সারা দেহে বান ডাকিয়ে বারো ছাড়িয়ে তেরোয় পড়েছে।' নিবারণের মেধা থাকা সত্ত্বেও ক্লাস এইটের বেশি এগোতে পারেনি। তাই দৈনন্দিন টানাপোড়েনের মধ্যেও ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠায়। ইতিমধ্যে উদ্বাস্তুদের সঙ্গে স্থানীয় আদিবাসীদের মধ্যে বিরোধ তৈরি হয়, সেই সঙ্গে এক শ্রেণির মানুষ উদ্বাস্তুদের সুন্দরবনে পুনর্বাসন দেবার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে শুরু করে। তারা উদ্বাস্তুদের প্রলোভন দেখায়— 'সুন্দরবনের অব্যবহৃত আগাছা ভর্তি উর্বর মাটি অপেক্ষা করে আছে তাদের জন্য! হাতছানি দিয়ে যেন ডাকছে তাদের এখন তারা গিয়ে আগাছা কেটে দখল নিয়ে সদ্ব্যবহার করলেই হয়।'[৬৯]

এই অরণ্যে যারা বসতি গড়েছে, প্রতিদিনের চেষ্টায় ইতিমধ্যে তারা অনেকটা স্থিতাবস্থায় পৌঁছাতে পেরেছে। নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান মনে তাদের আবার ভাবনা চিন্তা শুরু হয়। এতদিন বাদেও তারা ভুলতে পারেনি সোনার বাংলার কথা। নিবারণ শেষ পর্যন্ত সুন্দরবনের মরিচঝাঁপির হাতছানিতে সাড়া দেয়। প্রায় বিনামূল্যেই সমস্ত কিছু দিয়ে বউ-ছেলে-মেয়ের হাত ধরে পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে সুন্দরবনের মরিচঝাঁপির উদ্দেশ্য রওনা হয়। দেশত্যাগ করে এসে নানা ঘাটের জল খেয়ে ঘুরে ফিরে এসে যখন একটু স্থায়িত্বের স্বাদ পেতে শুরু করেছে তখনই তারা দ্বিতীয়বার পথে বেরিয়ে উদ্বাস্তু

হয়। বাসে ট্রেনে চেপে অবশেষে তারা সাতদিন পরে পৌঁছায় হাসনাবাদে। এখান থেকে মরিচঝাঁপির দূরত্ব বেশি নয় কিন্তু সেই দ্বীপে যাবার মতন কোনও ব্যবস্থা নেই। তাই হাসনাবাদ রেল স্টেশনের কাছাকাছি রেললাইনের ধারে বড় রাস্তার পাশে তারা আশ্রয় নেয়। ক্রমে সে স্থান নরককুণ্ড হয়ে ওঠে। প্রতিদিনই নৌকো করে উদ্বাস্তুরা পৌঁছাচ্ছে মরিচঝাঁপিতে, নিজেদের উদ্যোগে তৈরি করেছে অস্থায়ী ঝুপড়ি। কিন্তু সরকার উদ্বাস্তুদের সুন্দরবনে পুনর্বাসন দিতে রাজি নয়। প্রথমে তাদের সতর্ক করা হয়, তারপর পানীয় জল বন্ধ করে দেওয়া, স্থল থেকে খাবার বন্ধ করে দেওয়া হয়, উদ্বাস্তুদের উপর গুলি চলে, যাত্রীবাহী নৌকা ডুবিয়ে দেওয়া হয়। সরকারের পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হয় দণ্ডকারণ্যে ফিরে যেতে। বাধ্য হয়ে নিবারণ তার পরিবারের সকলকে নিয়ে দণ্ডকারণ্যে চলে যায়।

নিবারণের মেয়ে সোমা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া শিখতে শুরু করে। মাস্টার মশায়ের স্ত্রী রোগগ্রস্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। এই অবসরে নিবারণের মেয়ে সোমার সঙ্গে মাস্টার মশায়ের শারীরিক সম্পর্ক তৈরি হয় এবং সন্তান সম্ভবা হয়ে পড়ে। এই সংকট থেকে মুক্তির জন্য উপায় খুঁজতে থাকে নিবারণের বউ মালতী। অবশেষে স্থির হয় ক্যাম্পের হরেনের মায়ের কাছে যাবে, জড়ি-বুটি দিয়ে সেই গর্ভপাত করিয়ে দেবে। সোমার ভবিষ্যৎ জীবনের অনিশ্চয়তার মধ্যে শেষ হয় উপন্যাস।

দেশবিভাগ পরবর্তীকালে বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুর চাপে পশ্চিমবঙ্গ দিশেহারা হয়ে পড়ে। শিয়ালদহ স্টেশনের খোলা আকাশের নিচে এক বস্ত্রে কাটায় দিনের পর দিন। সরকারি উদ্যোগে যেমন তাদের জীবনধারণের ব্যবস্থা করা হয়, তেমনি কলকাতা মহানগরের চারপাশে এই উদ্বাস্তুদের একটি শ্রেণি দখল করে নিতে থাকে পোড়ো ও জলা জমি। দখলি জমির উপর কলোনি গড়ে শুরু হয় বাঁচার লড়াই। জমির মালিক জমি দখলমুক্ত করতে তৈরি হওয়া ঘরগুলি রাতের অন্ধকারে ভেঙে দিয়ে যায়, তবু হার মানে না উদ্বাস্তুরা। তাদের পাশে এসে দাঁড়ায় আর.সি.আর.সি, ইউ.সি.আর.সি.এর মত সংগঠনগুলি। শুরু হয় ‘অন্ন-বস্ত্র ও বাসস্থানের জন্য লড়াই’— টিকে থাকার এই লড়াইকে কেন্দ্র করে শচীন দাশ তার ‘উদ্বাস্তু নগরীর চাঁদ’ উপন্যাসে বাস্তুহারা মানুষের ইতিবৃত্তকে উপস্থাপন করেছেন। উপন্যাস শুরু হয়েছে দেশভাগের কেবলই পরবর্তী সময়ে, শেষ হয়েছে দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের আগে।

পূর্ববঙ্গের মহিকান্ত গুপ্তরা চার ভাই। তিনি নিজে মস্ত এক জমিদারের নায়েব, তার মেজো ভাই

নিশিকান্ত মাদারিপুর স্কুলের খ্যাতনামা শিক্ষক। এক ভাই শশীকান্ত দেশ স্বাধীনের আগেই বোম্বেতে চাকরি পাওয়ার পর স্ত্রী কুন্তলাকে নিয়ে পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করেছিল, সে আর বাড়ির সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ রাখেনি। অন্য আর এক ভাই সুধাকান্ত চিরদিন সংসারের বাইরের মানুষ। ষোল-সতেরো বছর বয়স থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দেশের কাজে। ব্রিটিশ সিপাই এর হাতে ধরাও পড়েছে অনেকবার, জেল ও খেটেছে। গান্ধীজীর আদর্শে দেশের শৃঙ্খল মুক্তির শপথ নিয়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে। পূর্ববঙ্গের এই সমৃদ্ধ পরিবারটি সেই দিনই এক বস্ত্রে দেশত্যাগ করে, যেদিন প্রতিবেশী মুসলমানরা তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল। আর পাঁচটি উদ্বাস্তু পরিবারের মত মহীকান্তর পরিবারও শিয়ালদহ স্টেশনে এসে আশ্রয় গ্রহণ করল। কিন্তু স্টেশনের এই নোংরা পরিবেশে তাদের পক্ষে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখান থেকে বেরিয়ে যাবার উপায় খুঁজতে থাকে মহীকান্ত এবং তার ভাই নিশিকান্ত। সেই সময়ে কলকাতার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জায়গায় সরকারি-বেসরকারি জমি দখল করে উদ্বাস্তুরা নিজেদের উদ্যোগে কলোনি গড়ে তুলছিল। কলোনিতে জমি পাইয়ে দেবার জন্য একশ্রেণির দালাল রাজ তৈরি হয়। মহীকান্ত এ-রকম এক দালালের পাল্লায় পড়ে। নিশিকান্ত থেকে আলাদা করে মহীকান্তকে কলকাতার দক্ষিণে যাদবপুরের কাছাকাছি একটি কলোনিতে পৌঁছে দিয়ে টাকা নিয়ে দালাল হাওয়া হয়ে যায়। মহীকান্ত বুঝেছিলেন দালাল তার টাকা হাতিয়ে নিতে ভাই নিশিকান্তর কাছ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। কলোনিতে এসে মহীকান্ত বিনামূল্যেই জায়গা পেয়েছিল, কিন্তু প্রায় প্রতি রাতেই জমিদারের গুণ্ডা বাহিনী কলোনি আক্রমণ করে, তাই ছেলে-মেয়ে-স্ত্রীকে ছেড়ে ভাই নিশিকে আনতে যাওয়া সম্ভব হয় না, ক্রমে দুশ্চিন্তা বাড়ে যদি ভাইকে সরকারের লোকজন কোনও ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়, তাহলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তারা। এই অবস্থায় এক প্রকার ঝুকি নিয়েই মহীকান্ত শিয়ালদহের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। কিন্তু কলোনির এক প্রতিবেশী অমূল্য নিশিকান্তকে কলোনিতে আনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। অমূল্য নিশির কাছে অপরিচিত, তাই তাকে চিঠি লিখে দেয়। নিশিকান্ত তার পরিবার নিয়ে ট্রেনে চেপে, বাসে চড়ে, পায়ে হেঁটে পৌঁছায় মহীকান্তর কলোনিতে। সেখানে আলগা মাটি ফেলে তৈরি করা হয়েছে ভিত। ভিতের ওপরে হোগলা দিয়ে ঘেরা বেড়া, মাথার উপরে হোগলার ছাউনি। বেড়ায় কোথাও জানালা নেই, সামনে শুধু একটাই দরজা। কপাট বলতে কিছু নেই। লোগলার চারপাশে বাঁশের চটা দিয়ে বেঁধে তৈরি করা একটা ঝাঁপ সেখানে লাগানো। মহীকান্তর তৈরি এই আস্তানায় এসে উঠতে হয় নিশিকান্তকে। এমন জীবনযাপনে তারা অভ্যস্ত নয়, বিশেষ করে ছেলেমেয়েরা খুবই স্বচ্ছন্দে কাটিয়েছে পূর্ববঙ্গে, তাই তাদের কষ্ট হয় অনেক বেশি। তবু পরিস্থিতিকে মানিয়ে নিয়ে বড়দের মত ছোটরাও অভ্যস্ত হয়ে ওঠে কলোনি জীবনে।

আর পাঁচটা কলোনির মত এ কলোনিও জমিদারের লোকেরা মাঝে মাঝে আক্রমণ করে, কলোনির লোকেরাও সম্মিলিত ভাবে তার প্রতিরোধ গড়ে তোলে। পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে নারীরা শঙ্খ বাজিয়ে সতর্ক করে দেয় কলোনিবাসীকে। মহীকান্তরা যে কলোনিতে থাকে তার নাম 'বিজয়গড়' কলোনি। এই কলোনি তৈরির ইতিহাস প্রসঙ্গে লেখকের বর্ণনায় পাই— সন্তোষ দত্তর একটা পোশাকি নাম ছিল, 'বাঘা'। তার তত্ত্ববধানে, যাদবপুরের পরিত্যক্ত জমিতে গড়ে ওঠে এই কলোনি। কলোনি গঠন প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি নাম উঠে এসেছে, যেমন— জিতেন মজুমদার, পরেশ মুখার্জি, প্রবোধ সাহা, হরিনাথ ঘোষ, ধীরেন চ্যাটার্জী প্রমুখ। এঁরা সকলেই বাস্তব ক্ষেত্রে কলোনি গঠনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

দ্রুত বদলাতে থাকে কলোনির রূপ। আগে ছিল জলা জমি, কোথাও কোথাও বুনো ঘাস, তার ভেতর রাজ্যের যত সাপ আর শেয়াল; অচেনা-অজানা নানা ধরনের বিষাক্ত পোকামাকড়। উদ্বাস্তুরা এসে সেই জঙ্গল কেটে খানাখন্দ বুজিয়ে, সাপ-শেয়াল তাড়িয়ে জমির মালিকদের ভাড়াটে গুণ্ডার অত্যাচার সহ্য করে গড়ে তুলল উপনিবেশ। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এক উপনগর। কলোনির দ্রুত বদলে যাওয়ার কথা ফুটে উঠেছে লেখকের বর্ণনায়— 'প্রথমে ছিল অস্থায়ী হোগলার চালা। চারদিকে চারটে বাঁশের খুঁটির ওপরে হোগলার পাতা দিয়ে ছাওয়া ঘর। চারদিকে হোগলারই বেড়া। নিচে মাটি ফেলে কোনওরকমে উঁচু করে নেওয়া একটু ভিত। কিন্তু দিন গেল, মাস কাটল, জমিদারের গুণ্ডাদের হামলা ঠেকিয়েও অস্থায়ী চালাগুলো একদিন হয়ে উঠল স্থায়ী। লেপে পুছে ঝকঝকে করা হল মেঝেটা গৃহস্থের উঠোনে ফুটল জবা, শিউলি আর কলাবতী।'[৭০] তবুও কোথাও যেন একটা ভয়, একটা অস্বস্তি দানা বেঁধে উঠেছিল কলোনির বাসিন্দাদের মনে, শেষ পর্যন্ত থাকবে তো তাদের এই বাস্তুটুকু। এই অনিশ্চয়তার মধ্যেও কলোনিবাসী দূর্গাপুজোয় ব্রতী হয়, সব কিছু ভুলে অতীতের ধারাবাহিক ঐতিহ্যকে প্রকাশ করতে চায়।

১৯৫১ সালের বিধান রায় সরকারের উচ্ছেদ বিল (Eviction Bill) প্রসঙ্গটি উঠে এসেছে উপন্যাসে। সরকার বে-আইনি ভাবে দখল করা সম্পত্তি উদ্বাস্তুদের কাছ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে জমির মালিকদের দিয়ে দিতে চায়। এই খবর শুনে মহীকান্ত, নিশি, বিপিন-সহ সকলেই বিচলিত হয়ে ওঠে। তাদের আশঙ্কা কলোনি থেকে উচ্ছিন্ন করে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে আন্দামান, দণ্ডকারণ্য, উড়িষ্যা, বিহার কিংবা অন্য কোথাও। পুনর্বাসনের নামে তাদের নির্বাসন দেবে বলে উদ্বাস্তুদের মনে হয়। এই নির্বাসনের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে হলে আটকাতে হবে এই আইন। তাই কলোনির পক্ষ

থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আগামী পরশু তারা সবাই মিলে ধর্ণায় বসবে আইন সভার সামনে। বিজয়গড়, আজাদগড়, গান্ধী কলোনি, শ্রীকলোনি থেকে যেমন লোক আসতে থাকে, তেমনি আদর্শ পল্লী, বিক্রমগড়, চিত্তরঞ্জন, বাপুজিনগর, রামগড়, বিদ্যাসাগর কলোনি থেকেও লোক আসে দলে দলে। সকলেরই তখন অস্তিত্বের সংকট, তাই এই আন্দোলনে মেলে অভূতপূর্ব সাড়া। লেখকের কথায় 'ঘুম নেই এখন এ উপনিবেশের চোখে।' ছিন্নমূল এই মানুষদের সঙ্গে যুক্ত হয় তদানীন্তন সময়ের দুই উদ্বাস্তু দরদী সংগঠন ইউ.সি.আর.সি এবং আর.ই.আর.সি। ঔপন্যাসিকের এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে ঐতিহাসিক প্রফুল্ল চক্রবর্তীর কথায়। 'ইউ.সি.আর.সি ও আর.সি.আর.সি এই দুটিই উদ্বাস্তু সংগঠন, এদের দাবিও অভিন্ন।'[৭১] সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উদ্বাস্তুরা কলোনিতে টিকে থাকার উপায় খোঁজে। উদ্বাস্তুদের আন্দোলনের কারণে উচ্ছেদ বিল এনেও সরকার তা আইনসভায় তুলতে পারে না। সরকার ক্রমে উদ্বাস্তুদের চাপে নমনীয় হতে থাকে।

এই উপন্যাসে আরও একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের কথা উপস্থাপিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী মোহনলাল সাকসেনা কলকাতায় এসে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে ভারত সরকারের যে সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন, তা উপন্যাসে এভাবে উল্লেখ করেছেন লেখক— 'পঞ্চাশের আগে যে সমস্ত উদ্বাস্তু পূর্ববঙ্গ থেকে এদেশে এসেছিলেন অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে, তারা পুরোনো উদ্বাস্তু। কিন্তু নতুন করে দাঙ্গার ফলে পঞ্চাশ থেকে যারা সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকেছে তারা নতুন উদ্বাস্তু।'[৭২] পুরোনো উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে ভারত সরকার চিন্তাভাবনা করলেও নতুনদের পুনর্বাসনের কোনও দায়িত্বই সরকার নিতে চায় না— তাদের জন্য থাকবে শুধু আশ্রয় শিবির ও সাময়িক ত্রাণকার্য। এর সপক্ষে সরকারের যুক্তি ছিল এ-রকম— নতুনভাবে যারা পূর্ববঙ্গ থেকে চলে আসছে, দাঙ্গা পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতি শান্ত হলে আবার তারা দেশে ফিরবে। এই পরিস্থিতিতে তাদের পুনর্বাসনের প্রশ্নই ওঠে না। তাই সরকার তাদের জন্য সীমান্তবর্তী অঞ্চলে আশ্রয় শিবির গড়বে, যাতে তারা তাড়াতাড়ি দেশে ফিরতে পারে। সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার প্রতিবাদের প্রসঙ্গও উঠে এসেছে উপন্যাসে।

উপন্যাসের শেষে লেখক কলোনি জীবনের অস্থিরতার মধ্যেও একটি স্থিতিশীল জীবনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। মহীকান্তর ভাই সুধাকান্ত, যিনি দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করে গান্ধীজীর সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তিনি নানা জায়গায় খুঁজে খুঁজে শেষ পর্যন্ত কলোনিতে এসে দাদাদের খুঁজে পেয়েছেন, অন্যদিকে শশীকান্ত, যিনি দেশবিভাগের পূর্বে চাকরি সূত্রে বম্বে চলে গিয়েছিলেন তিনিও দুর্ঘটনায়

একটি পা হারিয়ে দাদার কলোনিতে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

প্রফুল্ল রায়ের 'নোনা জল মিঠে মাটি' উপন্যাসে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের আন্দামানে পুনর্বাসনের কাহিনি বিবৃত হয়েছে। পোর্টব্লেয়ার থেকে এক'শ মাইল দূরে উত্তর আন্দামান দ্বীপে সরকারের উদ্যোগে গড়ে উঠেছে এই উদ্বাস্তু উপনিবেশ, সরকারি পরিভাষায় যার নাম— 'রিফিউজি সেটেলমেন্ট।' এরিয়াল উপসাগরের তীরে কিড নামক এক ইংরেজ সাহেব উপনিবেশ পত্তনের আশায় ১৭৯২ সালে এসেছিলেন এই দ্বীপে। এর দীর্ঘ ১৬৪ বছর পর ১৯৫৬ সালের এক মধ্য দুপুরে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের নিয়ে জাহাজ এসে ভিড়ল এখানে স্থায়ী বসতি গড়তে।

ঔপন্যাসিক আন্দামানে পুনর্বাসনের কাহিনিকে বর্ণনা করতে গিয়ে উদ্বাস্তুদের অতীত জীবনে ফিরে গিয়েছেন— জীবনের আরও দুটি অধ্যায়ের বর্ণনা দিয়েছেন এখানে—

i) পূর্ববঙ্গের সুখী-সমৃদ্ধ জীবন-যাপন;

ii) পূর্ববঙ্গ থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে আসার পর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ইতর জীবন-যাপন।

সীমান্ত পেরিয়ে এপারে এসে নানা শিবিরে বসবাসের পর অবশেষে আন্দামানের এই দ্বীপে এনে তোলা হয় উদ্বাস্তুদের। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা দরকার পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু-আগমন ক্রমে বাড়তে থাকায় পশ্চিমবঙ্গে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে সরকার আন্দমানের বিভিন্ন দ্বীপে পুনর্বাসন দেবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে সরকার দু'রকম প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছিল—

i) নানা জায়গায় ট্রানজিট ক্যাম্প এবং ডোল বন্ধ করে দেয়; যাতে উদ্বাস্তুরা বাধ্য হয় আন্দামান যেতে;

ii) আন্দামানে গেলে উদ্বাস্তুদের প্রচুর সুযোগসুবিধা দেওয়া হবে; এর ফলে উদ্বাস্তুদের সমৃদ্ধ জীবনযাপনের সম্ভাবনা থাকবে বলে প্রচার করে।

উদ্বাস্তুদের মনে কালাপানি পেরিয়ে আসা এই দ্বীপ সম্পর্কে নানা ধরনের আশঙ্কা ছিল, অবশ্য এই আশঙ্কার বাস্তবতাও ছিল। তবে সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে যারা সরকারের ডাকে সাড়া দিয়েছিল তারা লাভবানই হয়েছিল।[৭৩]

দ্বীপে এসে উদ্বাস্তুদের প্রথমেই ট্রানজিট ক্যাম্পে তোলা হয়। ক্যাম্পের অবস্থান সম্পর্কে উপন্যাসে বলা হয়েছে— 'টিলার মাথা অনেকখানি জুড়ে সমতল। জঙ্গল সাফ করে এখানে

অনেকখানি মাটি বার করা হয়েছে। এখানে ওখানে মাটি ফুঁড়ে সারি সারি কতকগুলি ঝুপড়ি উঠেছে... সেগুলোর মাথায় বেত পাতার চাল, বাঁশের বেড়া, বাঁশের পাটাতন।'[৭৪] ঝুপড়ির কাছাকাছি এসে সি.এ পাশ সাহেব (পুনর্বাসন দপ্তরের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মী) চেচিয়ে বলেন— 'এই হল ট্রানজিট ক্যাম্প, তোদের আস্তানা।' পুরো পাঁচ দিন বঙ্গোপসাগরের অগাধ কালো জল পাড়ি দিয়ে এই দ্বীপে এসে পৌঁছেছে মানুষগুলো। তাদের দেখে মনে হয় যেন 'নিজস্ব কোনও ইচ্ছা নেই। আর থাকলেও সে ইচ্ছা তাদের উপর কোনও ক্রিয়াই করে না'।

টিলার মাথায় মোট চল্লিশটি ঝুপড়ি। পাল সাহেবের ব্যবস্থা অনুযায়ী আপাতত কুড়িটি ঝুপড়িতে থাকবে নারী ও শিশুরা যার অবস্থান পিছনের দিকে, সামনের দিকে বাকি কুড়িটিতে থাকবে পুরুষেরা। এখানে ঠাঁই পেয়েছে নিত্য ঢালী, তার মেয়ে কাপাসী; যে ধর্ষিতা হয়েছে দেশবিভাগ পরবর্তী দাঙ্গার সময়ে। বুড়ি বাসিনী, রসিক শীল, হারান ও তার ঠাকুমা উজনী বুড়ি, অসুস্থ হরিপদ ও তার যুবতী স্ত্রী তিলি, যোগেন করাতি, উদ্ধব বৈরাগী, চন্দ্র জয়ধর, হরিপদ বারুই সহ নানা বয়সের নানা চরিত্রের মানুষ। পূর্ববঙ্গে এরা ছিল নানা পেশার মানুষ। আজ সব হারিয়ে তাদের একটিই পরিচয়— উদ্বাস্তু। এই উদ্বাস্তুদের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে পুনর্বাসন কর্মী পাল সাহেব, লিঙ্কম্যান নিতাই, সেল ব্যবসায়ী (শঙ্খ, কড়ি ব্যবসায়ী) পানিকর এবং তার দুই কর্মচারী লা তে, জাতে বর্মী, ধানুক, জাতে ওঁরাও।

প্রাথমিকভাবে এরা সকলেই ডোল নির্ভর। ডোল পাওয়ার কারণেই মানুষগুলি বেশি পরিশ্রম করতে চায় না, কিন্তু পাল সাহেব চায় লোকগুলি ডোল নির্ভর না হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াক। তাই তাদেরকে পাল সাহেব একটু করে কর্মজীবনে অভ্যস্ত করে তোলে। চাষের জন্য প্রত্যেককে জমি, হালের বলদ, বীজধান দেয়। সেখানে তারা ফসল ফলায়, স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ঘর তোলে। এতদিন ট্রানজিট ক্যাম্পে তারা যেভাবে জীবন কাটাত তা বিলুপ্ত হয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে উঠতে শুরু করে। লেখকের কথায় পাই— 'এই দ্বীপে যারা উপনিবেশ গড়তে এসেছে, এতদিন মনে হত তারা এক, অভিন্ন। তাদের আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই।... কিন্তু পায়ের নিচে মাটি আর মাথার উপর ছাউনি পেয়ে তাদের অন্য স্বরূপ বেরিয়ে পড়েছে।'[৭৫]

এই উদ্বাস্তু উপনিবেশের নানা ঘটনা বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসে। হারান ভালোবাসে অর্ধ-উন্মাদ ধর্ষিতা কাপাসীকে; কিন্তু ঠাকুমা উজানী বুড়ি কাপাসীকে ঘরে আনতে রাজি নয়। সংসার জীবনে শরীর মনে অতৃপ্ত তিলি অসুস্থ স্বামী হরিপদকে ত্যাগ করে যোগেন করাতিকে ভালোবাসে। তিলির

গর্ভে যোগেনের সন্তান আসে। অভিমানে হরিপদ চিরদিনের মত নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তিলি যোগেনের পুত্রের জন্ম দেয়; উপনিবেশে এই প্রথম নবজাতক আসে। শেল ব্যবসায়ী পানিকর কাপাসীকে পাচার করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে দ্বীপ থেকে পালিয়ে যায়। নিত্য তার মেয়ে কাপাসীকে নিয়ে ফিরে আসে কলোনিতে। কাপাসী সুস্থ হয়ে ওঠে; এখন আর সে হাসে না, অতীতের স্মৃতিকে মনে করে শুধুই কাঁদে। হারান তাকে সান্ত্বনা দেয়— 'কিছুই লষ্ট হয় নাই কাপসি। জীবনে কিছু লষ্ট হয় না।'[৭৬]

সব মিলিয়ে বলা যায় 'নোনা জল মিঠে মাটি' উপন্যাসে ছিন্নমূল মানুষগুলির হতাশা, বঞ্চনা, জ্বালা-যন্ত্রণার কাহিনি বিবৃত হযেছে; পাশাপাশি পুনর্বাসন কর্মী পাল সাহেবের সহায়তায় আন্দামানের এই পুনর্বাসন স্থানে সব হারানো মানুষগুলি হতাশা-যন্ত্রণাকে অতিক্রম করে নতুন করে বাঁচার স্বপ্নে বিভোর হয়েছে।

দেশভাগ বিষয়ক প্রায় সমস্ত বাংলা উপন্যাসে ক্যাম্প কলোনির উদ্বাস্তুদের কথা উল্লিখিত হয়েছে। কখনও তা এসেছে উদ্বাস্তু জীবনের অনুষঙ্গে, কখনও বা নিছক বর্ণনার তাগিদে। এর মধ্য থেকে যে উপন্যাসগুলিতে ক্যাম্প-কলোনির সঙ্গে উদ্বাস্তুদের জীবন আষ্টে-পিষ্টে জড়িয়ে রয়েছে, আমরা সেগুলিকে গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছি। আমাদের গৃহীত উপন্যাসগুলিতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ পরিস্ফূট হয়ে উঠেছে।

i) শিয়ালদহ স্টেশনে উদ্বাস্তুদের মানবেতর জীবন-যাপন এবং সেখান থেকে সরকারি ক্যাম্পে ডোল নির্ভর জীবন-যাপন;
ii) ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ক্যাম্পের বর্ণনা এবং সেখানকার জীবনযাত্রার প্রকাশ;
iii) উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্য এবং আন্দামানে পুনর্বাসন;
iv) জবরদখল কলোনি গঠন;
v) দখলকৃত কলোনিতে পুলিশ এবং গুণ্ডাবাহিনির সঙ্গে টিকে থাকার লড়াই এবং উদ্বাস্তু জীবনের পুনর্গঠন।

দেশান্তরী হওয়ার পরে এবং ক্যাম্পে স্থানান্তরের পূর্বে উদ্বাস্তুদের আশ্রয়স্থল ছিল শিয়ালদহ স্টেশন। এখানে অবস্থানরত সময়ে উদ্বাস্তুদের জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'নোনা জল মিঠে মাটি', 'শিকড় ছেড়া জীবন' 'পরতাল', 'পুব থেকে পশ্চিমে' প্রভৃতি উপন্যাসে। স্টেশনের নোংরা পরিবেশ, অপ্রতুল ত্রাণ সামগ্রী, কলেরা, ডাইরিয়া, আমাশা সহ নানাধরনের রোগ ব্যাধি, শিশু মৃত্যু, বেঁচে থাকার

তাগিদে পুরুষের নানা ধরনের অসৎবৃত্তি, নারীর শরীর বিক্রি করে জীবনধারণ; সব মিলিয়ে স্টেশনের নারকীয় পরিবেশের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে উপন্যাসগুলিতে।

ক্যাম্প জীবনের চিত্র সুস্পষ্ট রূপে ফুটে উঠেছে 'নির্বাস', 'শিকড় ছেড়া জীবন', 'চণ্ডাল জীবন', 'বকুলতলা পি.এল.ক্যাম্প', 'বল্মিক', 'উপনগর', 'সুচাঁদের স্বদেশযাত্রা' প্রভৃতি উপন্যাসে। উদ্বাস্তু আগমনের পর তাদের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে নানা ধরনের ক্যাম্প যেমন ট্রানজিট ক্যাম্প, উইমেন্স ক্যাম্প, পি.এল.ক্যাম্প, ওয়ার্ক সাইট ক্যাম্প তৈরি হয়েছিল এবং ক্যাম্পেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উদ্বাস্তু আশ্রয় নিয়েছিল। ঔপন্যাসিকেরা কোনও কোনও ক্ষেত্রে কাহিনি বিস্তারে ঐতিহাসিক তথ্যকে উপস্থাপন করেছেন। এক্ষেত্রে 'কুপার্স', 'শিরোমণিপুর', 'ঘুঁটিয়ারি শরীফ', 'দোলতলা', 'অশোকনগর' প্রভৃতি ক্যাম্পের নাম উঠে এসেছে। পাশাপাশি উপন্যাসগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের তদানিন্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়, ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রী মোহনলাল সাকসেনা সহ উদ্বাস্তু আন্দোলনের বহু নেতা-কর্মীর নাম উঠে এসেছে।

ক্যাম্পের ডোল নির্ভর জীবন-যাপন, এবং এই পরনির্ভরতার ফলে উদ্বাস্তুদের কর্মবিমুখ হয়ে পড়ার চিত্র উঠে এসেছে উপন্যাসগুলিতে। কলোনির বিভৎস চিত্র, অপ্রতুল খাদ্যসামগ্রী, ডোল নিয়ে নানা বিবাদ এবং বেঁচে থাকার প্রয়োজনে সরকারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্যাম্পবাসীর রুখে দাঁড়ানোর চিত্র রয়েছে প্রায় সমস্ত উপন্যাসে।

সরকারের উপর নির্ভরশীল না হয়ে যে সকল উদ্বাস্তু নিজেদের ভাগ্য নিজেরা গড়ে নিতে জমি দখল করে কলোনি তৈরি করেছিল তাদের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে 'পুব থেকে পশ্চিমে', 'অর্জুন', 'শত ধারায় বয়ে যায়', 'উদ্বাস্তুনগরীর চাঁদ', 'পরতাল' প্রভৃতি উপন্যাসে। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি উপন্যাসে জমিদারদের লাঠিয়ালদের সঙ্গে কলোনিবাসীর প্রতিনিয়তের লড়াই, পুলিশের অত্যাচার, কলোনির স্বীকৃতি পেতে উদ্বাস্তুদের আন্দোলনের কথা বিবৃত হয়েছে। পাশাপাশি সমস্ত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে কলকাতা সন্নিহিত অঞ্চলে উদ্বাস্তুদের স্থিত হওয়ার ইঙ্গিত মেলে উপন্যাসগুলিতে। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা দরকার বাস্তব ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের সমাজ সংস্কৃতিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির যে ব্যাপক প্রভাব লক্ষিত হয় তাদের অধিকাংশই উঠে এসেছিল ক্যাম্প কলোনি থেকে।

উদ্বাস্তুদের বাসস্থান ও জীবন-জীবিকার সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত সরকার উড়িষ্যা, ছত্রিশগড়, মধ্যপ্রদেশ এর বিরাট অঞ্চল জুড়ে সুবৃহৎ দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা গঠন করে। এখানকার

প্রতিকূল জলবায়ু, অনুর্বর পাহাড়ি জমি, স্থানীয় আদিবাসীদের অত্যাচার উদ্বাস্তুদের জীবন দুর্বিসহ করে তোলে। উদ্বাস্তু জীবনের এই চিত্র বর্ণিত হয়েছে ‘অরণ্যের অন্ধকারে’, ‘অরণ্য দণ্ডক’ প্রভৃতি উপন্যাসে। উপন্যাসে বারে বারে উল্লিখিত হয়েছে পরিকল্পনার নানা ত্রুটি এবং উদ্বাস্তুদের বিবিধ সংকটের কথা। অনেকেই এখানে বসবাসের পর পুনরায় পশ্চিমবঙ্গে ফিরে গিয়েছে।

মোটের উপরে ক্যাম্প-কলোনি সংক্রান্ত আলোচ্য উপন্যাসগুলিতে উদ্বাস্তু জীবনের যে বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, সেখানে একদিকে যেমন ক্যাম্প-কলোনির ভয়াবহ পরিবেশে ছিন্নমূল মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রতিকূলতার কথা উঠে এসেছে, অন্যদিকে তেমনি সমস্ত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে বৃহত্তর সমাজ পরিমণ্ডলে নিজেদের সংযুক্ত করবার ইঙ্গিত রয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, *প্রান্তিক মানব*, প্রতিক্ষণ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ২০

২. R.N. Saxena, *A Study in Changing attitudes*, Asia Publishing Hosue 1st edtion, Mumbai, 1961, p. 4

৩. মহীতোষ বিশ্বাস, *পরতাল*, একবিংশ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ২২

৪. হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *উদ্বাস্তু*, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ. ৭৬

৫. হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৪৯

৬. অনিল সিংহ, *পশ্চিমবাংলার উদ্বাস্তু উপনিবেশ*, ন্যাশনাল বুক, কলকাতা, ১৯৭৯, পৃ. ১৫

৭. মহীতোষ বিশ্বাস, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২২

৮. মহীতোষ বিশ্বাস, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৩০

৯. মহীতোষ বিশ্বাস, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৮৮

৯ক মহীতোষ বিশ্বাস, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৩১

১০. আনন্দগোপাল ঘোষ, ‘দেশ বিভাগ ও স্বাধীনতা ষাট: প্রসঙ্গ উদ্বাস্তু জীবন ও সাহিত্য’, *তিতির*, জুন, ২০০৮, পৃ. ২০

১১. মহীতোষ বিশ্বাস, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৩১

১২. মহীতোষ বিশ্বাস, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৪৪

১৩. মহীতোষ বিশ্বাস, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৬১

১৪. মহীতোষ বিশ্বাস, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১১৩

১৫. রমেশচন্দ্র সেন, *পুব থেকে পশ্চিমে*, ভারতী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১১১

১৬. রমেশচন্দ্র সেন, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১১৭

১৭. রমেশচন্দ্র সেন, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১০৪

১৮. রমেশচন্দ্র সেন, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১০৪

১৯. অমিয়ভূষণ মজুমদার, *নির্বাস*, দে'জ, ১ম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ২

২০. অমিয়ভূষণ মজুমদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৬০

২১. অমিয়ভূষণ মজুমদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৩৯

২২. অমিয়ভূষণ মজুমদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৭৪

২৩. অমিয়ভূষণ মজুমদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৫৭

২৪. অমিয়ভূষণ মজুমদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৪৯

২৫. রনজিৎ রায়, 'পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু: কেন্দ্র রাজ্য দ্বন্দ্ব-রাজনীতি', সেমন্তী ঘোষ (সম্পা.) *দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা*, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৫৫-৫৬

২৬. নারায়ণ সান্যাল, *বকুলতলা পি.এল.ক্যাম্প*, নাথ ব্রাদার্স, ১ম নাথ সংস্করণ, ৩য় মুদ্রণ, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৯

২৭. নারায়ণ সান্যাল, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৯

২৮. নারায়ণ সান্যাল, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৯৭

২৯. নারায়ণ সান্যাল, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৩২

৩০. নারায়ণ সান্যাল, *বল্মিক*, নাথ, ১ম নাথ প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ১

৩১. নারায়ণ সান্যাল, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৬

৩২. অশ্রুকুমার সিকদার, *ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য*, দে'জ, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫, কলকাতা, পৃ. ১৩৬

৩৩. নারায়ণ সান্যাল, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৮১

৩৪. মফিজউদ্দিন, 'অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'নির্বাস': উদ্বাস্তু জীবনের আলেখ্য', মননকুমার মণ্ডল (সম্পা.) *দেশভাগের সাহিত্য: স্মৃতি ও সত্তার উত্তরাধিকার*, নেতাজী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১৪১

৩৫. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্য উপন্যাসের ধারা*, মর্ডান বুক, নবম পুনঃর্মুদ্রণ সংস্করণ,

কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৭১১

৩৬. দেবব্রত দত্ত, *বিজয়গড় একটি উদ্বাস্তু উপনিবেশ* প্রগ্রেসিভ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ২২

৩৭. নরেন্দ্রনাথ মিত্র, *উপনগর*, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাস সমগ্র, আনন্দ, ১ম সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ২৭১

৩৮. নরেন্দ্রনাথ মিত্র, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৭৬

৩৯. নরেন্দ্রনাথ মিত্র, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৭৬-২৭৭

৪০. নরেন্দ্রনাথ মিত্র, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৭৫

৪১. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *অর্জুন*, আনন্দ, ১ম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৭১, পৃ. ২১

৪২. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২২

৪৩. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৮

৪৪. যতীন বালা, 'যশোরের স্মৃতি ও উদ্বাস্তু ক্যাম্পের জীবন', মননকুমার মণ্ডল (সম্পা.) *পার্টিশন সাহিত্য*, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ২৫৭

৪৫. যতীন বালা, *শিকড় ছেড়া জীবন*, চতুর্থ দুনিয়া, ১ম সংস্করণ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১৬৮

৪৬. যতীন বালা, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২০৯

৪৭. যতীন বালা, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২২৮

৪৮. যতীন বালা, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১২৮

৪৯. মতুয়া : হরিচাঁদ ঠাকুর (১৮১২ জন্ম) প্রবর্তিত ধর্মমতের অনুসারী, পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর-বরিশাল অঞ্চলের নিম্নবর্গীদের মধ্যে এই ধর্মমত গ্রহণের প্রবণতা দেখা যায়।

৫০. যতীন বালা, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৫৩

৫১. মনোরঞ্জন ব্যাপারী, *চণ্ডাল জীবন*, প্রিয় শিল্প, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৬৯

৫২. লিয়াকত জাহাঙ্গীর খোকন, *পুব বাংলার সমাজ মন*, মনন, ১ম সংস্করণ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৭৪

৫৩. মনোরঞ্জন ব্যাপারী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৮৫

৫৪. মনোরঞ্জন ব্যাপারী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৮৫

৫৫. মনোরঞ্জন ব্যাপারী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৪৮

৫৬. সমরেশ বসু, *সুচাঁদের স্বদেশ যাত্রা*, আনন্দ, ১ম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৫৩

৫৭. সমবেশ বসু, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৭৬

৫৮. সমরেশ বসু, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৫৭

৫৯. প্রফুল্ল রায়, *শতধারায় বয়ে যায়*, করুণা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৮১

৬০. অনিল সিংহ, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ৫

৬১. প্রফুল্ল রায়, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ৭২

৬২. প্রফুল্ল রায়, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ৮৬

৬৩. নারায়ণ সান্যাল, *অরণ্য দণ্ডক*, দে'জ, ৪র্থ সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ১৬৪

৬৪. নারায়ণ সান্যাল, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৬৪

৬৫. নারায়ণ সান্যাল, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৪৭

৬৬. মনিকুন্তলা সেন, *সেদিনের কথা*, নবপত্র, ২য় প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ১৮৪

৬৭. নারায়ণ সান্যাল, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৯৯

৬৮. সুধীররঞ্জন হালদার, *অরণ্যের অন্ধকারে*, অদল বদল, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৯

৬৯. সুধীররঞ্জন হালদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৫১

৭০. শচীন দাশ, *উদ্বাস্তুনগরীর চাঁদ*, দে'জ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১৩৫

৭১. প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ৫৮

৭২. শচীন দাশ, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৬৭

৭৩. অঞ্জন নন্দী, 'কালাপানির দেশ', স্বপন বিশ্বাস (সম্পা.), *নোনা জল*, ১০ম বর্ষ শীত সংখ্যা, আন্দামান, ২০১২, পৃ. ৯৮

৭৪. প্রফুল্ল রায়, *নোনা জল মিঠে মাটি*, দে'জ, ৩য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ২৮

৭৫. প্রফুল্ল রায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১১৮

৭৬. প্রফুল্ল রায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৭৭

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবনের রূপান্তর

বাসস্থান বদলের সঙ্গে মানুষের জীবন ধারা বদলে যাবার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। জন্ম থেকে মানুষ তার চারপাশের জগতের সঙ্গে মিলে যায়। সেখানকার জল-হাওয়া, গাছপালা, নদ-নদী, পাহাড়-জঙ্গল সর্বোপরি মানুষের সঙ্গে গড়ে ওঠে নাড়ির সম্পর্ক। জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি অনুসারে মানুষের জীবন যাপনের প্রক্রিয়া গড়ে ওঠে। রুচি-পছন্দ, খাদ্যাভ্যাস, ভাষা— এসব কিছুরই প্রথম পাঠ গ্রহণ করে চারপাশের জগৎ থেকে। মানুষকে যখন বাধ্য হয়ে সেই পরিচিত জগৎ তথা বাসস্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে হয়, ফেলে আসা জীবনের অনেক কিছুকে ত্যাগ করে নতুন পরিবেশে নতুনভাবে নিজেকে গড়ে তোলে। এর ফলে পুরোনো ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, চাল-চলন, আদব-কায়দা, রীতি-নীতিকে বদলাতে হয়। বাস্তুত্যাগী মানুষের কাছে এই বদল অনিবার্য এবং বিকল্পহীন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সারা পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হয়। কৃষির উপর ভিত্তি করে এই অর্থনৈতিক দুরবস্থা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হচ্ছিল না; তাই শিল্পের প্রভূত উন্নতির ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। শিল্পক্ষেত্রে শ্রমের যোগান দিতে ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে গ্রাম ছেড়ে শহরে যেতে হয়। ফলে বদলে যেতে থাকে গ্রামীণ চিত্র; সেই সঙ্গে নানা পরিবর্তন লক্ষিত হয় ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজ জীবনে। পরিবর্তনের এই ধারাগুলি এভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়—

১. এতদিনের কৃষিভিত্তিক যৌথ পরিবার ভাঙতে শুরু করে,

২. অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পর নতুন করে বাঁচার প্রয়াসে মানুষ মরিয়া হয়ে ওঠে;

৩. কৃষি সভ্যতা ক্রমে শিল্প সভ্যতার দিকে পা বাড়ায়;

৪. বেঁচে থাকার প্রয়োজনে বহু ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবনমন ঘটে;

৫. কর্মক্ষেত্রে নানা শ্রেণির মানুষের সমন্বয় ঘটে, ফলে মিশ্র সংস্কৃতির বাতাবরণ গড়ে ওঠে।

বিশ্বজুড়ে এই সংকটকালীন অবস্থায় ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে এবং বঙ্গ বিভাজিত হয়। এই বিভাজনে অগণন মানুষের দেশান্তর অনিবার্য হয়ে ওঠে। পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতে আসে হিন্দুরা, বিপরীত দিকে ভারত থেকে পূর্ববঙ্গে যায় মুসলমানরা। এমনিতেই দেশান্তরী মানুষের মানসিক সংকট থাকে প্রবল, তার সঙ্গে উভয়বঙ্গের আঞ্চলিক ভিন্নতা তাদেরকে মহা সংকটের মধ্যে এনে ফেলে।

পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে খাল-বিল-নদী-নালা বিস্তৃত। বছরের বেশিরভাগ সময়ে সেখানকার মাঠ-ঘাট থাকে জলে ডুবে, নৌকোই তাদের যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম। কৃষিকাজ এবং মাছ ধরাই তাদের প্রধান অবলম্বন। তাদের ফসল ফলানোর পদ্ধতিও ভিন্নতর। উদ্বাস্তু হয়ে এসে যারা নিজেদের উদ্যোগে কৃষিকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকতে চাইল তারা যে অবস্থার মধ্যে পড়ে তা নিম্নরূপ—

১. কৃষিকাজ ছিল তাদের জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন, পূর্ববঙ্গে প্রত্যেকেরই যেখানে কিছু না কিছু জায়গা জমি ছিল তারা সম্পূর্ণ ভূমিহীন হয়ে পড়ল;

২. এখানে পূর্ববঙ্গ থেকে চাষের পদ্ধতি আলাদা, তাই ভূমিহীন কৃষকরা অন্যের জমিতে শ্রমের বিনিয়োগ করতে গিয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হয়;

৩. পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ জমিই ছিল এক ফসলী, উর্বর ভূমিতে একবার ফসল ফলিয়ে সারা বছর মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের অভাব ঘটত না, এখানে এসে সেই আয়েশী জীবন-যাপনের বিপত্তি ঘটে।

অন্যদিকে যে বিরাট সংখ্যক মানুষ ক্যাশ-ডোলের উপর নির্ভর করে ক্যাম্প-কলোনিতে বসবাস শুরু করল, তাদের জীবনধারা নতুন খাতে বইল। অধ্যাপক প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তীর কথায়— নিরাপদ এবং সুন্দর বাসস্থানের আশায় এই হতভাগ্য মানুষগুলি যে বিপদ সংকুল যাত্রা শুরু করে ছিল তা এসে সরকারি ক্যাম্পের অন্ধকার কানাগলিতে এসে ঠেকল। ক্যাম্পের অন্ধকারে নিজেদের মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুর জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হতে লাগল।[১] ফলে সমাজ বদলে গেল। পূর্ববঙ্গে বংশ পরম্পরায় যে পেশাকে তারা ধারণ করে ছিল তা ত্যাগ করে বাঁচার উপযোগী যে কোনও পেশায় অবাধে প্রবেশ করল। এতদিনের পারিবারিক এবং বংশগৌরব বিসর্জন দিয়ে আত্মপরিচয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইল; এবং তা অবশ্যই অর্থনৈতিক মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে।

দেশান্তরের পর পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের রূপান্তরের ক্ষেত্রগুলিকে এভাবে বর্ণনা করা যায়—

১. রোজগারের জন্য সবাইকেই প্রায় বাইরে বেরিয়ে পড়তে হল, ফলে বৃহৎ পরিবারগুলি ছোট হতে শুরু করল;

২. পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষার পরিবর্তে কলকাতার ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে উঠল, পাশাপাশি হিন্দি ভাষার অবাধ প্রবেশ ঘটল বাঙালিদের মধ্যে,

৩. প্রতিদিন বাইরে কাজে বেরোনোর কারণে কর্মক্ষেত্রের উপযোগী পোশাক গায়ে চড়াতে হল— ধুতি-লুঙ্গি-শাড়ির বদলে প্যান্ট-শার্ট, সালোয়ার এল ঘরে;

৪. খাদ্যের অভ্যেস বদলাতে হল। স্বল্প সময়ে যেসব খাদ্য রান্না করা যায় সেই সব খাদ্যে অভ্যস্ত হল। পাশাপাশি শুকনো খাবার বিশেষত পাউরুটি, বিস্কুট, কেক এগুলি দোকান থেকে কিনে নিয়ে ব্যাগে পুরে তাড়াতাড়ি ছুটতে হল কর্মক্ষেত্রে। সেইসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের খাদ্যের প্রচলন ঘটল বাঙালিদের মধ্যে;

৫. পূর্ববঙ্গের লোকসংস্কৃতি ভুলতে লাগল এবং ক্রমে তারা নগর সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। পাশাপাশি কর্মস্থলে নানা অঞ্চলের লোকের সঙ্গে মেলা মেশার ফলে মিশ্র সংস্কৃতি তৈরি হল;

৬. বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়ার কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়তে লাগল, অধিকারের প্রশ্নে তারা লড়ে আদায় করতে শুরু করল;

৭. বাঁচার তাগিদে সংঘবদ্ধভাবে কাজের প্রয়াস গ্রহণ করল।

গবেষণার এই অংশে আমরা অনুসন্ধান করবার চেষ্টা করব দেশভাগ বিষয়ক বাংলা উপন্যাসে বাস্তুহীন মানুষগুলি দ্রুত কীভাবে বদলে যেতে শুরু করল। নিজেদের বদলে নেবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজকে তারা কীভাবে কতটুকু বদলাতে পারল তাও আমাদের আলোচনায় উঠে এসেছে।

রমেশচন্দ্র সেনের ‘পুব থেকে পশ্চিমে’ উপন্যাসের নায়ক নির্মলের নেতৃত্বে ‘তিলকনগর’ কলোনি গঠিত হয়। এখানে কলোনির বাসিন্দাদের বদলে যাবার কাহিনি নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়েছে। কলোনি গঠনের প্রথমদিকে নির্মলের সঙ্গে আলাপ হয় বরিশাল জেলার পিরোজপুর অঞ্চলের বাসিন্দা জয়দ্রথর। সে সেখানে ছিল লাঠিয়াল, এখানে এসে বাঁচার তাগিদে হয়েছে ঘরামি। নির্মলের কথার উত্তরে সে তার পরিচয় দিয়েছে এভাবে— ‘দ্যাশে ছিলাম সর্দার। চর দখল করার সময় আমার ডাক পড়ত। জয়দ্রথ সরদাররে ডরাইত সগলডি। সেই বাঘ আজ মেকুর হইয়া গেছি। সর্দার হইছে ঘরামি। তা হইলেও ফ্যালনা যাই না। এখানেও লড়াই... এক রাত্তিরের মধ্যে একখানা গেরুটি ঘর তোলতে পারি।’[২] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য পূর্ববঙ্গের নানা অঞ্চলে অবৈধভাবে জমি দখল করা, সদ্য জেগে ওঠা নদীর চর দখল করা, জোর করে ফসল কেটে আনা, ব্যক্তিগত বিবাদ, এক পাড়ার সঙ্গে অন্য পাড়া, কিংবা পার্শ্ববর্তী দুই গ্রামের সামাজিক বিবাদে লাঠিয়ালদের ডাক পড়ত। লাঠিয়ালরা মোটা টাকার বিনিময়ে এই কাজ করত। শোনা যায় কাজিয়ায় পরাজিত হলে সর্দার চুক্তির সমস্ত অর্থ ফেরৎ দিতেন।[৩] যশোরের নারদ সর্দারের নাম এখনও বয়স্ক উদ্বাস্তুদের স্মৃতিচারণায় উঠে আসে।

কলোনিতে নতুন নতুন ঘর উঠছে, তাই হরিভূষণও ঘরামির পেশা বেছে নেয়। পাশাপাশি

জটিল যে ছিল নৌকোর মাঝি, নিজের নৌকো ছিল। দেশ-বিদেশে সেই নৌকো নিয়ে ঘুরে বেড়াত। এখানে নদী নেই তাই তার ভীষণ আক্ষেপ। নৌকোর মাঝি জটিল এখন রিক্সা চালিয়ে সংসার চালায়। এই রিক্সা ভাড়া করা, তার ইচ্ছে একদিন যেমন সে নৌকোর মালিক ছিল, এখানে সে রিক্সার মালিক হয়। কিন্তু সহায়সম্বল হীন এই মানুষটির সে স্বপ্ন পূরণ হয় না, কারণ সংসারের খরচ চালিয়ে তার একটি পয়সাও থাকে না।

কলোনির তরুণ বয়সের বিপুল স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে। দেশ-গাঁয়ে থাকলে পড়াশোনা ছাড়া তাকে হয়ত অন্য কিছু করতে হত না; কিন্তু বাঁচার তাগিদে সে ঠোঙা বানিয়ে বিক্রি করে, নানা ধরনের জিনিস ফেরি করে। কাজের অবসরে অফিসে অফিসে ঘোরে চাকরির আশায়। নিজেকে যোগ্য করে তুলতে টাইপ রাইটিং শেখে। 'এখন তার টাইপের স্পিড মিনিটে চল্লিশ'। কাজের সন্ধানে এক সওদাগরি অফিসে গিয়ে এক পরিচিত ভদ্রলোকের দেখা মেলে। তিনি তার ছেলের তৈরি কালির বড়ি বিক্রি করে উপার্জন করার পরামর্শ দেন— দশ গ্রোস্ বিক্রি করলে লাভ পাঁচসিকে। কিন্তু বিপুল তিন দিনেও দু গ্রোসের বেশি বিক্রি করতে পারে না। তাই সে সব বাদ দিয়ে চাকরির আশায় একপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লেখায়।

অভিরাম পূর্ববঙ্গে চাষবাস করত। সামান্য তার লেখাপড়া। সে তিলকনগর 'কলোনীর অফিস ঘরের বারান্দায় এক পাঠশালা খুলেছে। সকালে বিকালে ছেলেমেয়েদের পড়ায়।'[৪] নেপাল দেশে থাকতে ছুরি কাঁচি তৈরি করে বিক্রি করত। কিন্তু কলকাতার বাজারে কাঠের ফলা দেওয়া ছুরি কাঁচি চলে না; তাই তাকে অন্য কোনও পেশার কথা ভাবতে হয়। কলোনির অন্য এক বাসিন্দা শিবকালীর পেশা ছিল কবিরাজি। সে সব ছেড়ে সে এখন ডিমের ব্যবসা করে। তার স্ত্রী রক্ষাকালী জীবনবীমার দালালি করে। কিন্তু তাতেও তার সংসার চলে না, তাই ঘটকালির কাজে নামতে হয়। দেশত্যাগের পর মানুষের এই পেশাগত পরিবর্তন পশ্চিমবঙ্গের সমাজ বদলের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। উদ্বাস্তু যুবকেরা শ্রমিকে পরিণত হল। পূর্ববঙ্গে যাদের সচ্ছল অবস্থা ছিল, এখানে তা নেই, ফলে তাদের গোত্রান্তর ঘটল। বিক্রমপুরের বিধু আচার্যের যুবক ছেলে জগদীশ শিয়ালদহ স্টেশনের চৌহদ্দির ভেতরে বিড়ির দোকান খুলে বসেছে। নিত্যানন্দ পানের দোকান দিয়েছে। নগেন চীনাবাদাম ফেরি করে বেড়ায়। অমূল্য মেটিয়াবুরুজে মাটি খোঁড়ার কাজ পেয়েছে। এদের বয়স পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে। দেশে এদের এমন হীন অবস্থা ছিল না। এখানে বাধ্য হয়ে বংশানুক্রমিক পেশা বিসর্জন দিয়েছে।[৫]

পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুরা বসবাস শুরু করবার পর শিক্ষার প্রতি তাদের ব্যাপক ঝোঁক লক্ষ করা যায়। এর কারণ বাইরের জগৎকে তারা বুঝতে শিখল এবং ক্রমে তারা আত্মসচেতন হয়ে উঠল। পুরোনো ধ্যান-ধারণা বদলে সন্তানের শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হল। উপন্যাসে হরিভূষণ ও তার স্ত্রী সর্বসুন্দরীর কথাবার্তায় শিক্ষার প্রতি অনুরাগ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে— 'হরিভূষণ বড় ছেলে অহিভূষণকে স্কুলে দিয়েছে। তার স্ত্রী সর্বসুন্দরী বলেছিল, ছাওয়াল কি দারগা হবে যে ইস্কুলে দিলা।

হরিভূষণ বলল, মিস্ত্রীর ছেলে দাগা হয়ত হবে না। কিন্তু সকলেরই লেখাপড়া করা দরকার, মিস্ত্রীর ও।'[৬]

বাস্তুহারা হবার পর উচ্চবর্ণ, নিম্নবর্ণ উভয়শ্রেণির মানুষই সমান সংকটের সম্মুখীন হয় তাই উভয়ের মধ্যে বাঁচার তাগিদ ছিল। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষাগত ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার কারণে সর্বক্ষেত্রে অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে, বিশ শতকের গোড়া থেকে তা নিম্নবর্গীয়রা অনুভব করতে শুরু করে। তাদের ধর্মীয় নেতা গুরুচাঁদ ঠাকুর এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[৭] কিন্তু পূর্ববঙ্গে পদে পদে সেই উদ্যোগ ব্যাহত হয়। দেশভাগের পর তারা পশ্চিমবঙ্গে এসে সর্বজনীন শিক্ষার সুযোগ পায় এবং তা গ্রহণ করে। আলোচ্য উপন্যাসে দেখা যায় কলোনি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে উদ্বাস্তুরা সম্মিলিতভাবে স্কুল প্রতিষ্ঠা করছে। কলোনির সব শ্রেণির ছেলে-মেয়েরা সেখানে পড়াশোনা করে। বিদ্যালয়ের নাম দেওয়া হয় বিদ্যাসাগর বাণীপীঠ। এখান থেকেই ধ্রুব কবিরাজের বোন উমা মাধ্যমিকে প্রথম বিভাগে পাশ করে; চিন্তা হরণের কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে সুকান্তি বোর্ডের মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। স্কুলের ভালো ফলের জন্য স্থানীয় ব্যবসায়ী সত্যশরণ ঘোষ এগিয়ে আসে। স্কুলের জন্য পাকাবাড়ির প্ল্যান তৈরি করে নির্মল। লোহা-লক্কড়-সিমেন্ট কন্ট্রোলের দরে পাবার জন্য সরকারের কাছে দরবার শুরু করে। সত্যশরণের ইচ্ছে ছিল তার মায়ের নামে বিদ্যালয়ের নামকরণ করা হোক। কিন্তু তা করা যায়নি কারণ ইতিপূর্বেই বিদ্যাসাগরের নামে নামকরণ করা হয়ে গিয়েছে। শেষপর্যন্ত বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের নামকরণ করা হয় সত্যশরণের মায়ের নামে। শিক্ষার অগ্রগতি উদ্বাস্তুদের জীবনধারা আমূল বদলে দিয়েছিল।

কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কলোনি তৈরির পর থেকে উদ্বাস্তুদের মধ্যে ভাষাগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বাসিন্দারা সকলেই বাংলা ভাষা-ভাষীর মানুষ হলেও অঞ্চলভেদে তাদের ভাষার টান ছিল আলাদা আলাদা কিন্তু কলকাতার কাছাকাছি বাস করার ফলে তাদের ভাষাগত অভিযোজন ঘটে। লেখকের কথায়— 'কলোনিতে ঘর বাঁধার কিছুদিন পর থেকেই একদল উদ্বাস্তু পশ্চিমবাংলার

ভাষায় কথা বলতে শুরু করেছে।'[৮] কিন্তু যারা বয়স্ক, তারা পূর্ববঙ্গের ভাষায় অভ্যস্ত। তাই এ ভাষা তাদের কাছে বেমানান লাগে। হরিভূষণের স্ত্রী সর্বসুন্দরীর মুখে কলকাতার ভাষা সম্পর্কে বিদ্রূপের সুর শোনা যায়— 'কলকাতায় আইছি, এখন কত নতুন কথাই না শোনব।'

উপন্যাস শেষ হয়েছে নির্মল ও উমার মিলনের মধ্য দিয়ে। উমা বিধবা, বিয়ের অল্প দিনের মধ্যেই তার স্বামী মারা যায়। তারপর থেকে শুরু হয় তার আসক্তিহীন জীবনযাপন। পাথরের ঠাকুর গোপালই হয়ে ওঠে তার জীবনসঙ্গী। দেশত্যাগ করে আসার সময়ে গোপালকে সে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। তাঁর সেবা-যত্নের মধ্য দিয়েই উমার জীবন কাটছিল। কিন্তু কলোনির নেতা নির্মলের প্রেরণায় সে আবার লেখাপড়া শুরু করে। কলোনির বিদ্যালয় থেকে সে প্রথম বিভাগে মাধ্যমিক পাশ করে। সে আই.এস.সিতে ভর্তি হয় ভবিষ্যতে ডাক্তার হবার আশায়। অবশেষে সে ডাক্তারিতে ভর্তিও হয়। এখন উমা গোপালকে আর সেভাবে ভক্তি করে না, নিত্যপুজো দূরের কথা নিত্যদিন তাঁর কথা মনেও পড়ে না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে উমার মনের বিকাশ ঘটেছে দ্রুত। বৈধব্য জীবনের নিরাসক্ত অবস্থা কাটিয়ে সে রক্ত মাংসের সজীব এক নারী হয়ে উঠেছে। পূর্ববঙ্গে ডাক্তার হবার কথা হয়ত সে স্বপ্নেও ভাবত না, আবার বিধবা হয়ে ভালোবেসে বিয়ে করাও ছিল অকল্পনীয় বিষয়।

পূর্ববঙ্গে যে মানুষগুলি শান্ত ও নির্বিবাদ জীবন-যাপন করত এখানে এসে কলোনির জমি দখল করতে গিয়ে লড়াকু হয়ে ওঠে তারা। জমির মালিক আইনের আশ্রয় নিলে তারা কোর্টে হাজিরা দেয় সম্মিলিতভাবে, আবার নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে নারী-পুরুষ সম্মিলিতভাবে কলকাতার রাজপথে নামে এবং শেষপর্যন্ত অধিকার আদায়ে সফল হয়। উদ্বাস্তুদের এই সাফল্য তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনকে বিশেষভাবে সূচিত করে।

প্রফুল্ল রায়ের 'শতধারায় বয়ে যায়' উপন্যাস শুরু হয়েছে নায়ক বিনুর পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে কলকাতায় এসে বসবাসের কাহিনি দিয়ে। বিনুর দাদু (মায়ের মামা) হেমকান্ত মিত্রের বাড়িতে আশ্রিতা ঝিনুক ঢাকায় গিয়ে ধর্ষিতা হবার পর তাকে নিয়ে বিনু কলকাতায় দিদির শ্বশুরবাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে। 'কেয়াপাতার নৌকো' উপন্যাসের সেই কিশোর বিনু এই পর্ব থেকে বিনয়। রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার' গল্পে বালিকা রতন পোস্টমাস্টারকে এক রাতের সেবা-যত্নে যেমন জননী হয়ে উঠেছিল, বিনয় ও তেমনি 'দেশভাগের পর নানা ঘা খেয়ে খেয়ে অজস্র অভিজ্ঞতায় এখন সে এক পরিপূর্ণ যুবক।'[৯]

বিনয় সচ্ছল পরিবারের সন্তান। রাজদিয়া থেকে কলকাতায় এসে দিদিদের কাছে উঠেছে। দিদিরাও তার প্রতি সহানুভূতিশীল। পাঁচজন সাধারণ উদ্বাস্তুর মত তাকে ক্যাম্প কলোনিতে বাস করতে হয়নি। খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের জন্য সে অর্থে লড়াই করতে না হলেও জীবিকার সন্ধানে ঘুরতে হয়েছে— 'নতুন ভারত' নামে একটি খবরের কাগজে রিপোর্টারের কাজ নিতে হয়েছে। বিনয়ের বাবা কলকাতা থেকে গিয়ে রাজদিয়ায় যে পরিমাণ সম্পত্তি কিনেছিলেন এবং তার দাদুর যে বিষয়-বৈভব ছিল তাতে বিনয়ের চাকরির প্রয়োজন পড়ত না। দেশভাগ বহু মানুষের জীবনকে এভাবে অন্য খাতে বইয়ে দিয়েছে।

উপন্যাসে নিত্য দাস নামে রাজদিয়া অঞ্চলের একজন দালালের সক্রিয় উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বিনয়ের জামাইবাবু হিরণদের রাজদিয়ার ষাটকানি দুই ফসলী সরস চাষের জমি, বাগিচা, পুকুর, বসত বাড়ির পরিবর্তে টালিগঞ্জের খান মঞ্জিলের বিনিময়ে জন্য মৌখিক কথাবার্তা শেষ করেছে। সেই সময়ে নিত্য দাস এই বিনিময়ের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে। তার কথায় হিরণদের আরও বেশি সম্পত্তি পাওয়ার কথা ছিল। এই বিনিময়ের কথা নিত্য দাসের জানার কথাই নয়, অথচ সে এসে হিরণের কাছে সব বলে যায়। এতে হিরণ বিস্মিত হয়। হিরণের প্রশ্নের উত্তরে নিত্য দাস জানায় 'কারা ইণ্ডিয়ার সম্পত্তি বদলাবদলি কইরা পাকিস্তানে যাইতে চায়, কারা পাকিস্তান থিকা একই উদ্দিশ্য লইয়া ইণ্ডিয়ায় আইতে চায়— এই খবর না জানলে কারবার চালামু ক্যামনে'।[১০] তার ইচ্ছা, হিরণ শওকত আলির সঙ্গে 'খান মঞ্জিল' বদলের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিক, সে নিজে খুঁজে আরও লাভজনক জমি জায়গার সন্ধান দেবে। নিত্য দাস শওকত আলিকে দেওয়া মৌখিক প্রতিশ্রুতিভঙ্গের প্রস্তাব দেয়। হিরণের বাবা দ্বারিক দত্ত প্রতিশ্রুতিভঙ্গে কিছুতেই রাজি নয়। নিত্য দাস তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে কথা দিয়ে কথা না রাখার মধ্যে কোনও অন্যায় নেই— 'আপনারা অহনও সেই সইত্য যুগে পইড়া আছেন। দিনকাল আর আগের লাখান নাই। যা করলে লাভ বেশি হেইয়া করণ উচিৎ। যদিন সুযুগ পাওন যায় হেইটা পুরা উশুল কইরা নেওন বুদ্ধিমানের কাম। কারে শুকনা মুখের কথা দিছিলেন হেয়া ধইরা থাকলে চলে?'[১১] নিত্যদাসের কথার মধ্য দিয়ে বোঝা যায় মানুষের সততা ও মূল্যবোধ কতটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল দেশভাগ পরবর্তী সময়ে।

পূর্ববঙ্গের সামাজিক জীবনের একটি মজবুত বাঁধন ছিল। তাদের পারস্পরিক চেনা-জানা ছিল দীর্ঘকালের। তাই হঠাৎ করে একের সঙ্গে অন্যে কথার খেলাপ করতে পারত না কিংবা ছলনার আশ্রয় নিতে পারত না। পশ্চিমবঙ্গে আসার পর এই সামাজিক বাঁধন চুরমার হয়ে যায়। ঠকবাজি জোচ্চুরি,

প্রবঞ্চনা একশ্রেণির মানুষ পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। যে যেমন পেরেছে নিজের মত করে গুছিয়ে নিয়েছে; অন্যের কী হল সে দিকে তাকায় নি। এর ফলে সামাজিক দায়বদ্ধতা তলানিতে এসে দাঁড়িয়েছিল। দেশভাগ পরবর্তী সময়ে সমাজের সেই ক্ষতকে আর সারিয়ে তোলা যায়নি।[১২]

রিপোর্টারের কাজ করতে গিয়ে উদ্বাস্তুদের নানাধরনের রূপান্তরের ছবি চোখে পড়েছে বিনয়ের। টালিগঞ্জের ফুটপাতে হাঁটাতে হাঁটতে বিনয় লক্ষ করে এগারো বারো বছরের একটি মেয়ে চট বিছিয়ে রকমারি জিনিস বিক্রি করছে। খাতা, পেনসিল, কালি, রাবার, বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয়, লক্ষ্মীর পাঁচলি, সরল হোমিওপ্যাথি শিক্ষা, ধারাপাত, কাঠের স্কেল, ধূপকাঠির প্যাকেট, পঞ্জিকা, ম্যাজিক শিক্ষার বই, রান্নার বই সবই রাস্তার উপরে সাজিয়ে বসে আছে। খরিদ্দার সামলানোর ফাঁকে ফাঁকে ব্রাউন পেপারে মলাট দেওয়া একটা বই পড়ছে। বিনয় কৌতূহলী হয়ে ওঠে। সে জিনিস কেনার অজুহাতে মেয়েটির পরিচয় জেনে নেয়। মেয়েটি স্থানীয় দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়ের ক্লাস সিক্সের ছাত্রী। নাম আরতি পাল। মাস আষ্টেক হল তারা পূর্ববঙ্গ থেকে এসে কালীঘাটের কাছে নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য লেনের একটি বস্তিতে এসে উঠেছে। তিন ভাইবোন বাবা-মা নিয়ে তাদের সংসার। বাবা রাধানাথ পাল চেতলায় একটি মাদুরের আড়তে কাজ জুটিয়েছে। সকাল সাতটা থেকে সাড়ে আটটা এবং সন্ধ্যে পাঁচটা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত তার ডিউটি। যে পয়সা আড়ত থেকে পাওয়া যায় তাতে ঘরভাড়া দিয়ে পাঁচ পাঁচটি মানুষের পেট চলে না; তাই ফুটপাতে দোকান খুলে বসতে হয়েছে।

ন'টা নাগাদ রাধানাথ চেতলা থেকে চলে আসে, তখন আরতির ছুটি। সে উর্ধ্বশ্বাসে বাড়ি ফিরে য়ায়— 'ঝপাঝপ দু'চার মগ জল মাথায় ঢেলে নাকে মুখে দুটো গুঁজে স্কুলে ছোটে। কথা প্রসঙ্গে বিনয়কে সে জানায়— 'বাবা কইছে যত কষ্টই হউক আমাগো তিন ভাই-বইনেরে পড়াইব। আমি সবাইর বড় আমার পরে দুই ভাই। ঠিক করছি কিছুতেই পড়াশুনা ছাড়ুমনা।'[১৩]— তার চোখে-মুখে আত্মবিশ্বাসের ছাপ, ফুটপাতে দোকানদারি করার ফাঁকে ফাঁকে পড়াশুনা করে আরতি ক্লাসে প্রথম হয়ে সিক্স থেকে সেভেনে ওঠে। তার স্বপ্ন সে একদিন বি.এ পাশ করবে, সেই সঙ্গে ভাইদের পড়াবে এবং সংসারের হাল ধরবে। উপন্যাসে আরতির কাহিনি থেকে দুটি বিষয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়—

১. স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে উদ্বাস্তুদের মধ্যে আংশিক সময়ের ও ঠিকা কাজের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়;

২. ঘরের চৌহদ্দির বাইরে বেরিয়ে এসে পরিবারের সকলের রোজগারের প্রতি ঝোঁক; বিশেষভাবে লক্ষণীয়, কাজের প্রতি নারীর ঝোঁক। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আরতির মত কিশোরীদের

পরিচয় পাওয়া যায়; যারা পঞ্চাশের দশকে মজুরির নানা পেশায় যোগ দিয়ে ভেঙে ফেলেছিল মানসিক অবরোধ, তারা পূর্ববঙ্গে যে দুনিয়াকে চিনত তার অবসান হল ১৯৪৭ থেকে পঞ্চশের মধ্যে। দায়িত্বের বোঝা কাঁধে নিয়ে তারাই সংসারকে সচল রাখে।[১৪]

আলোচ্য উপন্যাসে জীবনের রূপান্তরের ক্ষেত্রে যুগলের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। নিম্নবর্গের এই দরিদ্র ছেলেটি বিনুর দাদু হেমনাথ মিত্রের বাড়িতে গৃহভৃত্যের কাজ করত; সে আজ আগরপাড়ার কাছে সদ্য প্রতিষ্ঠিত কলোনির একজন নেতা। সে সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখে। নিজে লেখাপড়া জানে না, কিন্তু সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য লেখাপড়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। তাই কলোনিতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষে পূর্ববঙ্গের রাজদিয়া হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক আশু দত্তকে খুঁজে বের করে। যুগল বিনয়কে বলে— তার জীবন উঞ্ছবৃত্তি করে কেটে গেল, কিন্তু ছেলে-মেয়েদের জীবন এভাবে চলতে পারে না; তাদের জন্য শিক্ষা চাই। কলোনির শিশুদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব দেওয়া হয় আশুদত্তকে। যুগলের ভাবনার প্রসারতা দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে বিনয়। 'অক্ষর পরিচয়হীন এই যুবকটি এক সময়ে ছিল খুবই আলাভোলা ধরনের। খাল বিল নদী মাছ পাখি ধানের খেত পাটের খেত— এ সবের বাইরে অন্য কোনও দিকে নজর ছিল না। সীমান্তের এপারে এসে সে বুঝেছে, লেখাপড়া ছাড়া উদ্বাস্তু ছেলে মেয়েদের গতি নেই।'[১৫] শিক্ষাই হল আসল শক্তি, সেটা ছাড়া যে টিকে থাকা যাবে না— এই অনুভব কলোনিবাসীদের মধ্যে বিশেষভাবে কাজ করেছিল।

স্কুল তৈরির লক্ষে যুগল আশুদত্ত এবং বিনয়কে নিয়ে কলোনিতে এলে সেখানে দেখা যায় যুগলের স্ত্রী পাখির রণরঙ্গিনী মূর্তি। পাখির এইরূপ দেখে অবাক হয় বিনয়। লাজুক, কোমল স্নিগ্ধ এক নারী 'আশ্চর্য এক ভোজবাজিতে কদিনের মধ্যে আগাগোড়া বদলে গেছে।' এতকালের চেনা লজ্জাবনতা মেয়েটির মধ্যে যে এমন আগুন লুকিয়ে ছিল তা ভাবা যায়নি।

উপন্যাসের নায়ক বিনয়ের রূপান্তরও চোখে পড়ার মত। রাজদিয়ার বিনু এখানে বিনয় হয়ে উঠেছে। শুধু নামের ক্ষেত্রে তার এই রূপান্তর নয়— কাজের ক্ষেত্রে দক্ষতার ক্ষেত্রে, ভাবনাচিন্তার পরিপক্কতায় তার রূপান্তর উল্লেখযোগ্য। বিনয় দিদিদের আশ্রয়ে না থেকে 'শান্তিনিবাস' নামক মেসে গিয়ে ওঠে, জীবনের দায়বোধের কারণে ঝুমাকে খুঁজে ফেরে কলকাতার অলিতে গলিতে। অবশেষে আন্দামান পাড়ি জমায় তাকে ফিরে পাবার আশায়।

আলোচ্য উপন্যাসে হেমনাথের বাড়ির কামলা কলোনির নেতা হয়েছে। তার স্ত্রী পাখি পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের তাগিদে কলোনি রক্ষার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে, নিত্য ঢালী সততা, মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে দালালি পেশা বেছে নিয়েছে। আবার বিনয়ের দাদু হেমনাথ, যিনি কোনও দিনও তার পূর্ববঙ্গের জন্মভিটে ছেড়ে, সেখানকার মানুষদের ছেড়ে আসবেন না বলে ঠিক করেছিলেন তারও মানসিকতার পরিবর্তন হয় পরিস্থিতির চাপে। দেশভাগ এই মানুষগুলিকে আমূল বদলে দিল।

দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, ক্যাম্প-কলোনি জীবন, লোকায়ত জীবন-চিত্র— এসবের বিবিধ মিশেলে গড়ে উঠেছে 'পরতাল' উপন্যাস। জীবনের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করবার মধ্য দিয়ে উদ্বাস্তুদের জীবন-ছবি বদলে গেছে। জীবনের ধরন ধারণ, পেশা, আদবকায়দা বদলে গিয়েছে এক লহমায়। পূর্ববঙ্গে তাদের ছিল কৃষি নির্ভর জীবন-যাপন। পশ্চিমবঙ্গে এসে তারা ভূমিহীন হয়ে পড়ল। তাই কলকাতা শহরের আশেপাশে কিংবা শহরতলির রেললাইনের পাশে চালাঘর তুলে বসবাস শুরু করল, যাতে শহরে গিয়ে শ্রম বিক্রি করে আবার ঘরে ফিরতে পারে।[১৬]

'পরতাল' উপন্যাসে পূর্ববঙ্গের অমর গাতির মঘাই মণ্ডল নয়া কল্যাণপুর কলোনির পাশে নমোপাড়ার বাসিন্দা। সোদপুরের মহামায়া ক্লথমিলে সে চাকরি নেয়। চাষি মঘাই রাতারাতি বনে গেল মিলের শ্রমিক। লেখকের কথায়, '(মঘাই) যে হাত দিয়ে খেত জমিতে একদিন লাঙল চালাতো, কাস্তে দিয়ে গোছায় গোছায় কেটে আনত পাকা ধানের গোছা, সেই হাত দিয়ে এখন মিলের কাপড় বানাবে মঘাই। গ্রামের খেত-বিলের চাষি হল শহরের কারখানার শ্রমিক। বেঁচে থাকার একটা পথতো বাছতেই হবে।'[১৭]

কল্যাণপুরের বাসিন্দা সুরেশ দাস রেললাইনের কাছে জঙ্গল সাফ করে থাকতে শুরু করেছে। গঙ্গার তীরে একটা পাটকলে সে একটা চাকরি জুটিয়েছে। তা দিয়ে তার সংসার চলে। আবার বনবিহারির কথা উল্লিখিত হয়েছে উপন্যাসে, যিনি দেশে থাকতে খুলনা কোর্টে ওকালতির কাজ করতেন। এদেশে আসার পরে তিনি সেই আইনি পেশায় যুক্ত থাকতে চেয়েছিলেন। তাই ব্যারাকপুর কোর্টে ঘোরাঘুরিও করেছেন কিছুদিন। কিন্তু সুবিধা করতে পারেন নি। তাই পেটের দায়ে বাড়ির পাশে একটা খাটাল তৈরি করেছেন। তাতে গোটা দশেক মোষ পুষেছেন, তা দিয়েই সংসার চলে। যারা নমো পাড়ার বাসিন্দা তারা সকলেই পূর্ববঙ্গে চাষবাসের সঙ্গে যুক্তি ছিল, কিন্তু এখানে এসে ভূমিহীন হয়ে যে যার মত কাজ খুঁজে নেয়। নিমাই সাপের খেলা দেখিয়ে বেড়ায় লোকের বাড়িতে। স্টেশনে,

বাজারে। ফটিক নমো পাড়ার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া খালে ভ্যাসাল জাল ফেলে মাছ ধরে। সেই মাছ বিক্রি করে নাজির হাটের বাজারে। 'তপেশ বিশ্বাস বিনি-মাইনের স্কুলে পড়ায়। সেই সঙ্গে প্রাইভেট টিউশনি করে আর সি.পি.এম পার্টির ফাই ফরমাশ খাটে'। লেখক নিম্নবর্গীয়দের এই জনপদের পেশাগত বিবরণ দিয়েছেন এভাবে— 'নমোপাড়ায় কেউ রিক্সা চালায়, কেউ জনমজুরির কাজ করে, কেউ রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে খাটে কেউ বা করে অন্যরকম কিছু কাজ। বউরা কেউ কেউ লোকের বাড়িতে যায় ঠিকে ঝির কাজ করতে।'[১৮] আসলে ভাঙাচোরা জীবনকে নতুন করে গঠন করতে সবাই উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। সব্বার মনের ইচ্ছে কী করে, দু-পয়সা বেশি রোজগার করা যায়।

পূর্ববঙ্গের ভিটেমাটি ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বদ্ধমূল সংস্কার ভাঙার নিদর্শন পাই 'পরতাল' উপন্যাসে। বিতাড়িত হয়ে পথে বের হবার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই অনুভব করতে শুরু করল সকলের দুর্দশা একই রকমের। ফলে বহুদিনের জড়তা ভেঙে এল সামাজিক চলমানতা। জাতপাতের বেড়াজাল ভেঙে 'নোয়াখাইল্যা নমঃশূদ্র আর ব্রাহ্মণ একাকার হয়ে গেল।'[১৯] অবশ্য জাতপাতের এই বদ্ধমূল সংস্কার চল্লিশের দশকের প্রথম দিক থেকে ক্রমে ঘুচতে শুরু করে। দীর্ঘকাল ধরে উচ্চবর্গীয়দের চোখে মুসলমান এবং নিম্নবর্গীয় হিন্দুর মধ্যে বিশেষ ফাকি ছিল না। কিন্তু মুসলিম লিগ যখন থেকে সাধারণ মুসলমানদের মনে ধর্ম ও সম্প্রদায়গত ঐক্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হল, তখন থেকেই নিম্নবর্ণ- উচ্চবর্ণ উভয় শ্রেণির হিন্দু অন্য সব পরিচয় হারিয়ে সংখ্যালঘুতে পরিণত হল। ফলে বর্ণগত বিভাজন মুছে গিয়ে উভয়ের মধ্যে ঐক্যের বাতাবরণ সৃষ্টি হল। বিপরীতভাবে নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং সাধারণ মুসলমানের মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক ছিল তা ভেঙে গিয়ে কাজিয়া-ফ্যাসাদ শুরু হল। চল্লিশের দশকের শেষদিকে ফরিদপুরের হাটবাড়িয়া, বাগেরহাটের চিতলমারী, মোল্লাহাটের কাজিয়া এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— 'Since the turn of century, ideologues of Hindu political unity had advocated programmes for the uplift of untouchables and the breaking down of castebarriers.' [২০]

বিভাগ পরবর্তী সময়ে স্টেশনে ফুটপাতে, ক্যাম্প কলোনিতে পরস্পরের কাছে থাকতে থাকতে বিভাজন রেখা মুছে যাবার কথা উল্লিখিত হয়েছে উপন্যাসে। নমোপাড়ার একমাত্র উচ্চবর্গীয় বাসিন্দা বাণীকণ্ঠ দীর্ঘ দশ বছর যে ধুবুলিয়া ক্যাম্পে কাটিয়ে এখানে এসে বসতি গড়েছে তারই বর্ণনা দিয়েছে— 'একটার পর আর একটা গায়ে গায়ে লাগানো সব তাঁবু। দেশে থাকতে দেখেছি কোনোটা ব্রাহ্মণপাড়া, কোনোটা কায়স্থ পাড়া, কোনোটা নমো পাড়া। সব ভাগ ভাগ করা। আর এখানে সব মিলে মিশে একাকার।'[২১] তার বাঁ-পাশে ছিল একঘর নমঃশূদ্র, ডান পাশে ছিল ভুঁইমালি, তার পাশে একটা মুচি

পরিবার। এক টিউবওয়েলে স্নান, লাইন দিয়ে পায়খানায় যাওয়া; এসব করতে করতে বাণীকণ্ঠর মনে হয়েছে 'ক্যাম্পই হচ্ছে সেই মহামানবের সাগর তীর, যেখানে কায়েত, চাঁড়াল, শুদ্দুর বদ্যি মুচি মেথর— সব এখানে এক দেহে লীন হয়ে গেছে।'

বাণীকণ্ঠ বংশ পরম্পরায় পুরোহিতের কাজ করে। কিন্তু এখানে এসে তাকে মুদির দোকান খুলে বসতে হয়। নমোপাড়ায় ঢোকার মুখেই তার দোকান। সে যে ব্রাহ্মণ নিজেই লোকের কাছে তা প্রচার করে। পরিচিতি বাড়তে থাকে। নমো পাড়ায় পুজো হলে তার ডাক পড়ে। সেজন্য বাণীকণ্ঠ নমঃশূদ্রদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেও দ্বিধাবোধ করে না।— 'দেশে থাকতে নমঃশূদ্রদের ঘেন্না করতাম। চাঁড়াল বলে ডাকতাম। নমঃশূদ্ররা যে পুকুরে স্নান করত, সেখানে আমরা পা-ও ধুতাম না। আর এখানে তো ওদের দয়াতেই খেয়ে-পরে বেঁচে আছি।'[২২] পরস্পরের সহাবস্থানে সাম্যের বাতাবরণ তৈরি হয় কলোনিতে।

শিবনাথ বসুর নেতৃত্বে অমর গাতি, প্রতাপ খালি সিদ্ধি কাঠি, কল্যাণপুর অঞ্চলের মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রমে মহেশ পুকুরের পাড়ে যে ছোট্ট কলোনি গড়ে উঠেছিল ক্রমে তার কলেবর বৃদ্ধি পায়। বিরাট এই জলাশয়ের পাশে যে হোগলা বিল ছিল তাকে কেন্দ্র করে কলোনির চাষাভুষো বাসিন্দারা স্বপ্ন দেখেছিল— সেখানে তারা ফলাবে সোনার ফসল। কিন্তু কলোনি পত্তনের গোড়ার দিকের সেই লোকগুলির স্বপ্ন ক্রমে ভাঙতে থাকে। এখানকার রাস্তাঘাটের উন্নতি ঘটে;বাজার, স্কুল-কলেজ তৈরি হয়— সব মিলিয়ে জমজমাট এক শহর। এঁদো কলোনি হল পৌরসভা। আস্তে আস্তে ভদ্রলোকদের বসবাস বাড়তে শুরু করল কলোনিতে। পাশাপাশি নিম্নবিত্তের নিম্নবর্গীয়রা হারিয়ে যেতে লাগল এখান থেকে। কারণ কলোনির সংগঠক শিবনাথ চান না, নিম্নবর্গীয়রা এখানে থাকুক। থাকার অনেক চেষ্টা করেও তারা শিবনাথের কাছে হার মানে। শেষপর্যন্ত নতুন করে বাঁচার সন্ধানে কেউ বনগাঁ, কেউ বসিরহাট, কেউ ক্যানিং অথবা অন্য কোথাও চলে যায়। সেখানে গিয়ে মাটি-জমি-ফসলকে ঘিরে আবার তারা উপনিবেশ গড়ার স্বপ্ন দেখে কিন্তু বারবার তাদের সেই স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। উপন্যাসে একশ্রেণির উদ্বাস্তুর বারবার এই স্থানত্যাগের চিত্র আমরা বাস্তবেও লক্ষ করে থাকি।

উদ্বাস্তুদের জীবনধারা বদলের ক্ষেত্রে এই উপন্যাসের আরও তিনটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

প্রথমত, পূর্ববঙ্গে গ্রামকেন্দ্রিক জনপদে ভাড়াবাড়ির ধারণা ছিল না। উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গে আসার

পর অপেক্ষাকৃত সচ্ছল পরিবারের লোকজন যারা ক্যাম্প কলোনিতে যেতে চাইল না তারা কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বাড়িভাড়া করে থাকতে শুরু করে। উপন্যাসে দেখা যায় নয়া কল্যাণপুর স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষিকা মীরা দিদিমনি ভাড়া থেকেছে স্থানীয় কলোনিতেই। আবার তপেশ বিশ্বাস ভাড়া গিয়েছেন নমো পাড়ায়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে সাধারণের মধ্যে এর প্রচল ঘটে।

দ্বিতীয়ত, পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ মানুষের মধ্যে চায়ের অভ্যেস ছিল না একেবারেই। এখানে এসে সে অভ্যেস রপ্ত করে তারা। মৃদু উত্তেজক এই পানীয়টি অল্প পয়সায় পাওয়া যায়, চায়ের সঙ্গে বিস্কুট অথবা ওই জাতীয় কিছু খেয়ে দীর্ঘক্ষণ কাটানো যায়, আবার অতিথি আপ্যায়ণের ক্ষেত্রেও চা সহজসাধ্য। তাই যে চা অভিজাত পরিবারের মধ্যে প্রচলিত ছিল তা গণ পানীয়তে পরিণত হয়। দেশভাগ পরবর্তী সময়ে। উপন্যাসে দেখা যায় নমোপাড়ার নিমাই; সাপ খেলা দেখানো যার জীবিকা, তার চায়ের নেশার বিবরণ দিয়েছেন লেখক—'প্ল্যাটফর্মের উপরকার চায়ের দোকান, চায়ের দোকানটা দেখেই নেশা জাগল নিমাইয়ের।'[২৩]

তৃতীয়ত, নিম্নবর্গের শিক্ষার প্রতি অনুরাগ, যা এই উপন্যাসে বিশেষ দিক্ নির্দেশ করে। নমোপাড়ার পিতৃমাতৃহীন রোহন জেলার মধ্যে প্রথম হয়েছে। সে এখন সমগ্র অঞ্চলবাসীর উদাহরণ। নমোপাড়ার পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে বাবা-মায়েরা শিশুদের বলে, পারবি রোহন দাসের মত হতে। তাকে অনুসরণ করে নমোপাড়ার অন্য ছেলে মেয়েরা স্কুলে যেতে শুরু করে। দেশত্যাগ না করলে হয়ত রোহনের মত নিম্নবর্গীয়দের শিক্ষার এই অগ্রগতি ঘটত না।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'চতুষ্পাঠী' উপন্যাসে নিষ্ঠাবান এক টোলের পণ্ডিত অনঙ্গমোহন নাতি বিপ্লবের উপবীত ধারণের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে উপন্যাস। নানা নিয়ম কানুন মেনে বিপ্লব তথা বিলুকে উপনয়ন দেওয়া হচ্ছে। তার গেরুয়া বসন, মাথা ন্যাড়া, ঘোমটায় ঢাকা। এই অনুষ্ঠানের পুরোহিত শ্রী কামাখ্যাচরণ চক্রবর্তী। তার নির্দেশে বিলুকে প্রথমে মায়ের নিকট থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করতে হয় তারপর অনঙ্গমোহন তার বান্ধব তারানাথ স্মৃতিতীর্থকে আহ্বান করেন ভিক্ষা দানের জন্য। সময়ের স্রোতে এইসব লৌকিক আচার একদিন হারিয়ে যাবে এই আশঙ্কা ফুটে ওঠে অনঙ্গমোহনের কথায়— 'আস তারানাথ, অধিক দিন আর এই সব বজায় থাকব না।'[২৪]

অনঙ্গমোহন পূর্ববঙ্গের নোয়াখালির বাসিন্দা। ছেচল্লিশ সালে কলকাতার দাঙ্গার খবর পূর্ববঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে নোয়াখালিতে একতরফা ভাবে সেখানে হিন্দু নিধন শুরু হয়। ১৬ অক্টোবর ১৯৪৬, বেঙ্গল প্রেস অ্যাডভাইজারি কমিটির রিপোর্টে দাঙ্গার বিবরণ পাওয়া যায় এরকম হাজার হাজার গুণ্ডা গ্রামবাসীদের ওপর চড়াও হয়েছে, গোহত্যা করে গ্রামবাসীদের জোর করে গো-মাংস খাইয়েছে এবং অনেক মেয়েকে হরণ করছে বা জোর করে বিয়ে করছে, ধর্মান্তরিত করছে।[২৫] এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে অনঙ্গমোহন দেশত্যাগ করে। আলোচ্য উপন্যাসে অনঙ্গমোহনের শ্যালক হরিদাস তথা বোবা ঠাকুর আক্রান্ত হন। দাঙ্গার সময়ে মুসলমানরা তার টিকি কেটে দেয়। সেই কারণে বোবা ঠাকুর বিখ্যাত হয়ে যান। তিনি ওই কর্তিত শিখাটি সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন। পরে গান্ধিজি নোয়াখালি সফরে এলে তাকে শিখার অগ্রভাগ দেখিয়েছিলেন বোবাঠাকুর। এর জন্য তিনি আর্থিক অনুদানও পেয়েছিলেন। দেশ বিভাগের পর সেই শিখা গচ্ছিত কৌটো হরেন মুখার্জিকে দেখানো হয়েছিল। এই ঘটনায় অনঙ্গমোহন শ্যালককে পরিহাস করে বলেছিলেন— 'তোমার শিখাটা না নিয়ে যদি আমারটা নিত তবে স্কুলের চাকরি আমারই হইত।'[২৬] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যে শালগ্রাম শিলার পবিত্রতা রক্ষার জন্য মানুষ দেশত্যাগ করল সেই শিলাখণ্ডই কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভিক্ষার মূলধন হয়ে উঠেছিল।

অনঙ্গমোহন কুলশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। সমাজের সর্বস্তরে তিনি পূজ্য। নিজ গৃহে ছিল তার বাস। দেশ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে আসার পর নিজের স্বকীয়তা বজায় রাখতে তিনি ক্যাম্প-কলোনিতে যাননি— দেড়শো বছরের পুরোনো এক জীর্ণ বাড়ির একাংশে ভাড়া থাকেন একমাত্র নাতি বিলু এবং বিধবা বউমা অঞ্জলিকে নিয়ে। নিত্য দিনের বিবাদ লেগেই থাকে প্রতিবেশী ভাড়াটিয়ার সঙ্গে। এর ফলে অনঙ্গমোহনের

১. জীবনধারণের ক্ষেত্রকে সংক্ষিপ্ত করতে হয়,

২. প্রতিনিয়ত সমঝোতা করে চলতে হয়।

নিজেদের প্রয়োজনেই প্রতিবেশী শিখার মায়ের সঙ্গে ভাব জমাতে হয় অনঙ্গমোহনের বউমা অঞ্জলিকে।

অনঙ্গমোহনের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে যে সংস্কার জড়িয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে, পরিস্থিতির চাপে তা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। ফলে বদলে নিতে হয় নিজেকে। তার মতে 'চপলা তটিনী মধ্যে পতিত নিশ্চল প্রস্তর খণ্ডই শৈবালাক্রান্ত হয়। কারণ সে নিশ্চল।' পরিবর্তনশীল জগতে যোগ্য না হলে যে বাঁচা যাবে না একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না এই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের। উপন্যাসে দেখা যায়

বিলুর মায়ের অফিসের লোকজন আসেন ছেলের পৈতার দিন। এদের মধ্যে একজন মুখার্জী অর্থাৎ ব্রাহ্মণ; বাকি দু'জনের এক জনের পদবী 'যশ' অন্যজনের 'মণ্ডল'— অর্থাৎ এরা উভয়েই অব্রাহ্মণ। উপবীত ধারণের দিন অব্রাহ্মণের মুখদর্শন এবং স্পর্শ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। যজ্ঞের পুরোহিত কামাখ্যা-পণ্ডিত অজ্ঞাত কুলশীল এই অতিথিদের পরিচয় জানতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তারা যাতে বিলুর মুখদর্শন না করতে পারেন তার জন্যে তিনি সাত তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ান এবং বিলুর মাথার ঘোমটা টেনে দেন। অনঙ্গমোহনের কানের কাছে মুখ রেখে প্রশ্ন করেন, 'ব্রাহ্মণ তো।' সকলে যে ব্রাহ্মণ নয় বিলুর মায়ের কথাতে তা স্পষ্ট হয়ে যায়। বিলুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় মা বলেন— 'ইনি রামকুমার মণ্ডল। মণ্ডল কাকু।' শুধু মুখদর্শন নয়, অব্রাহ্মণ যশ বাবুর হাত থেকে উপহার ও গ্রহণ করতে হয়। বিলুর মা অতিথিদের নিয়ে চলে গেল কামাখ্যা পণ্ডিত গঙ্গাজল ছিটিয়ে যজ্ঞস্থান পবিত্র করেন। পাশাপাশি শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন অনঙ্গমোহন, আর ভাবেন— 'এই মুহূর্তে একটা অনাচার হয়ে গেল। উপনয়নের মধ্যে শূদ্রের প্রবেশ।'[২৭] কিন্তু বৌমাকে এখন আর কিছু বলতে পারেন না অনঙ্গমোহন। কারণ বউমা চাকুরিরতা, তার রোজগারেই সংসার চলে।

তারানাথ স্মৃতিতীর্থ এই অনাচারপুরী থেকে দ্রুত সরে পড়তে চান। ভোজন সেরেই এখান থেকে যাবেন তাই ব্রাহ্মণ ভোজনের কত দেরি সে বিষয়ে খোঁজ খবর করেন। পূর্ববঙ্গে এই পরিস্থিতি হলে তারানাথ হয়ত আহারের প্রতীক্ষা করতেন না। আজ তারানাথ নীরবে সব কিছু মেনে নিলেন। দিন যে বদলে গেছে সে কথা বুঝে অনঙ্গমোহন নিজেকে আশ্বস্ত করে— 'অব্রাহ্মণ ঘরে এসেছে, ব্রহ্মচারী শূদ্রমুখ দর্শন করেছে— তাতে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে। এখন কি আর তপোবন আছে না চতুরাশ্রম আছে। এখনতো সব প্রতীক মাত্র। স্মৃতির পণ্ডিতরা এরকম মনু-সর্বস্বই হয়।... দণ্ডী, বিলহন, কালিদাস পড়া থাকলে বুঝতে পারতেন যুগে যুগে আচার বিচার পাল্টায়।'[২৮]

বিলুর বাবা মারা যাবার পর চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে বিলুদের পরিবার। বিলুর বাবার সহকর্মী পরিতোষ যশ সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। কারখানার পক্ষ থেকে যশবাবু বিলুর মাকে চাকরির প্রস্তাব দিলে ঠাকুরদা অনঙ্গমোহন বিস্মিত হন। তিনি বউমার দিকে তাকিয়ে থাকেন আর স্মৃতির পথ ধরে হেঁটে পৌঁছে যান অতীত গৌরবে। বাস্তুভিটে থেকে উৎখাত হওয়া মানুষ তখনও তাদের পরিচয়ের সঙ্গে বয়ে বেড়াত গ্রাম-নাম যেমন চৌমুহনীর রসময় ঠাকুর, দেওপাড়ার বরদা কাব্যতীর্থ, সেনাচাকার বৈকুণ্ঠ স্মৃতিতীর্থ— এদের কেউ আছেন ধুবুলিয়া ক্যাম্পে কেউ লেকের ধারে ঝুপড়ি বানিয়ে, কেউ দমদম বা যাদবপুরের কলোনিতে। অনঙ্গমোহন শুনলেন বোয়ালিয়ার ন্যায়ালঙ্কারের

গৌরবর্ণা পৌত্রী আছে ধুবুলিয়া ক্যাম্পে। ব্যাস এইটুকুই। সদাচরণ ন্যায়ালঙ্কারের পৌত্রী অঞ্জলির সঙ্গে বিয়ে দিলেন পুত্র জগদীশের। ছেলের অকাল মৃত্যুতে সংসার ভেসে যাবার উপক্রম। সংসারে আয় বলতে চতুষ্পাঠীর সরকারি বৃত্তি। চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের কাছ থেকে দক্ষিণা নেওয়া যায় না— এই শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অবৈতনিক। অথচ সরকার যা বৃত্তি দেয় নিজেরও ব্যয় নির্বাহ হয় না। স্কুলে চাকরি হবার সম্ভাবনা নেই অনঙ্গমোহনের। পিতার চতুষ্পাঠীতেই অনঙ্গমোহনের শিক্ষা। পিতা মনে করতেন মেকলে প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষায় অনাবশ্যক পাশ্চাত্য অনুরাগ জন্মে। তাই পিতা নীলকমল বিদ্যালঙ্কারের চতুষ্পাঠীতে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। অথচ আজ সেই ম্লেচ্ছদের শিক্ষার বড় দরকার মনে হয় অনঙ্গমোহনের। আজ তাই সমস্ত গরিমা ত্যাগ করে বউমাকে মাড়োয়ারি কারখানায় চাকরির অনুমতি দিতে হয়। কারণ বাঁচতে তো হবে। পেটের জ্বালা যে বড় জ্বালা।

খাদ্যের অভাব মানুষের জীবনকে কতখানি বদলে দিতে পারে তা আলোচ্য উপন্যাসে প্রাচীন ঋষিদের জীবন-আলোকে উপস্থাপন করেছেন। ঋষি উদ্দালোক তার পুত্র শ্বেতকেতুকে জগতের সার বুঝিয়ে দিয়েছেন এভাবে— 'আমাদের মন অন্নময়, প্রাণ জলময়, বাক্য তেজময়।' শ্বেতকেতু পিতার কথার তাৎপর্য বুঝতে না পারলে পুত্রকে এক পক্ষকাল কেবল জল পান করে থাকার নির্দেশ দিলেন। পঞ্চদশ দিবস পরে শীর্ণ শুষ্ক শ্বেতকেতু বাবার কাছে গেলে তিনি শ্বেতকেতুকে ঋক, যজু, সাম আবৃত্তি করতে বললেন। কিন্তু সে কিছুই বলতে পারল না। এই বিস্মরণের কারণে শ্বেতকেতু লজ্জিত হয়। পুত্রের অবস্থা দেখে উদ্দালোক বলেন— 'বৎস কাতর হইও না। যাও ভোজন কর। ভোজনান্তে সবই স্মরণ হইল।'[২৯] অনঙ্গমোহন আজ অভাবের দায়ে দিশেহারা। বংশ গৌরব, সংস্কৃতের পাণ্ডিত্য বিসর্জন দিতে পুরোনো পঞ্জিকা ছিঁড়ে ফেলেন মুরগিওয়ালার পালক ছেঁড়ার মত করে। ঘর থেকে বের করে আনলেন 'বাক্যচন্দ্রহার' তাও ছিঁড়ে ফেলেন। তা দিয়ে ঠোঙা বানিয়ে বাজারে বিক্রি করার পরিকল্পনা করেন। এরপর পূর্ণচন্দ্র চতুষ্পাঠীতে ঠোঙা তৈরি হতে লাগল নিয়মিত। বাড়ির পাশের চায়ের দোকানদার ন্যাড়া অনঙ্গমোহনের জাত্যভিমান বিসর্জন দেওয়া দেখে অভিভূত হয়। ছেলেটি একদিন বলে— 'পণ্ডিত মশাই আপনাকে দেখে আমার ভুল ভেঙেছে। আগে জানতাম নামাবলী জড়ানো টিকিওয়ালা ব্রাহ্মণ মানেই অং বং করে দক্ষিণা চায়। আপনি আলাদা. আপনি অন্য একটা লড়াই করছেন। আপনাকে দেখে আমার শ্রদ্ধা হয়।'[৩০]

চক্ষুলজ্জার খাতিরে ঠোঙা বানানোর ঘরের দরজা এতদিন বন্ধ করে রাখা হত, এখন তা খোলাই থাকে। অনঙ্গমোহনের তৈরি করা ঠোঙা বিলু দোকানে দোকানে বিক্রি করে। বিক্রির জন্য তার অধিক

সময় ব্যয় হয়। এই পরিস্থিতিতে অনঙ্গমোহন ভাবেন মান-সম্মান বিসর্জন দিয়ে তারও রাস্তায় নেমে যাওয়া উচিৎ। কারণ তিনি অনুভব করেন সামাজিক সম্মান অর্থ নির্ভর। বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে এখন ভুল। 'উত্তমা মানমিচ্ছন্তি ধনমিচ্ছন্তি অধমা'— একটা মিছে কথা মনে হয়। আসলে রাস্তায় বেরিয়ে ফেরি করতে না পারাটা একটা সংস্কার, কুলগত সংস্কার। সব সংস্কার ভেঙে ফেলে তিনি কিছু ঠোঙা ব্যাগে ভরে ফেরি করতে বের হন। প্রায় সকলেই তাঁকে চেনে তাই পণ্ডিতমশায়ের তৈরি ঠোঙা কিনতে চায় না। অবশেষে অনঙ্গমোহন অপরিচিত জায়গায় গিয়ে ঠোঙা বিক্রির কথা ভাবেন। বাজারে গিয়ে চাঁদিপুর ঘাটের রাঙাজবা সিঁদুর বিক্রেতার মত হাত উঁচু করে বলেন— এই যে ভালো ঠোঙা, খুব ভালো ঠোঙা আছে। অনঙ্গমোহনের মত লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুকে মান-সম্মান ত্যাগ করে এভাবেই পথে নামতে হয়েছিল পেটের দায়ে।

বিলু ক্লাস এইটে। মায়ের ইচ্ছে নাইন থেকে সে সায়েন্স নিয়ে পড়বে। অঙ্কে ভালো নম্বর না পেলে সায়েন্স পাওয়া যাবে না। তাই অঙ্কের জন্য প্রাইভেট টিউটর দেওয়া দরকার। টিনের কৌটো তৈরির কারখানায় কাজ করে সংসার চালানো দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। তাই তাকে অন্য কাজের কথা ভাবতে হয়। পাশের ভাড়াটিয়া শিখার মা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল; সে ফিরে এসেছে। কিন্তু পুরোপুরি সুস্থ নয়। তাই শিখার বাবা অজিতবাবু তার বাড়িতে অঞ্জলিকে রান্নার কাজের জন্য প্রস্তাব দেয়। অনঙ্গমোহন এই প্রস্তাবে প্রবল আপত্তি করলেও অঞ্জলি এই প্রস্তাবে সাড়া দেয়। সন্তানের প্রয়োজনে সদাচরণ ন্যায়ালংকারের পৌত্রী মান-সম্মান বিসর্জন দিয়ে রান্নার কাজে নিযুক্ত হয়। দেশভাগ পরবর্তী সময়ে স্বামী-সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের শরীর বিক্রি করতেও দ্বিধা করেনি উদ্বাস্তু নারী।[৩১]

সমাজ যে ক্রমে বদলে যাচ্ছে তার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ মেলে নাতনি স্বপ্নার বৈবাহিক সিদ্ধান্তে। অনঙ্গমোহন খ্যাতনামা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। অথচ তিনি নাতনিকে বিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেন চায়ের দোকানদার ন্যাড়ার সঙ্গে। অসবর্ণের এই বিয়ের কথা শুনে পুত্রবধূ অঞ্জলি ভীষণ অবাক হয়। কিন্তু অনঙ্গমোহন সিদ্ধান্তে অনড়। নিজেই যুক্তির জাল বোনেন— 'ধর্ম কাষ্ঠ পুত্তলিকা নয়। ধর্ম চলচ্ছক্তিযুক্ত।' সে কারণে তিনি আচার সর্বস্ব ধর্মকে ত্যাগ করে জীবধর্মকে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

ঠোঙা তৈরি, বিক্রির সঙ্গে সঙ্গে বিলু গঙ্গার পাড়ে চায়ের দোকান দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

মহালয়ার শুভ দিনে সে দোকান উদ্বোধন করতে চায়। মা তার সম্মান বিসর্জন দিয়ে দোকানে গিয়ে বসবার কথা ভাবে। কারণ বিলুকে সায়েন্স পড়াতে গেলে অর্থের প্রয়োজন। অনঙ্গমোহনও আজ মহালয়ার তপর্ণ করিয়ে অর্থ রোজগারের জন্য গঙ্গার ঘাটে গিয়ে দাঁড়ান। কিন্তু সেখান থেকে তিনি ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। বিলুকে বলেন— 'মন্ত্র পড়াইয়া দক্ষিণা চাওয়া আমার দ্বারা হইল না। তিনি বিলুকে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে চেয়েছেন— 'যা বিলু, ঘরে যা। বাস্তুবিদ্যা পড়। বিদ্যার কোনও বিকল্প নাইরে বিলু, অবিদ্যঃ জীবনং শূন্য। আমিই বরং চায়ের দোকান করি।' তাঁর মত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত যে বর্তমান যুগে অচল তা ভেবে নিজেই নিজেকে ধিক্কার জানান। স্বগতোক্তির সুরে বলেন— 'হে বানভট্ট, তোমার চন্দ্রপীড়ের আনন্দোচ্ছ্বাস দিয়া কিশমিশ শোভিত কেক মোড়াইয়া খরিদ্দার খুশি করুম তোমরা দেখ। হে দেবতা গণ, পুষ্পবৃষ্টি কর। মেঘদূতমের পৃষ্ঠায় প্যাকেট কইরা খরিদ্দারকে দিমু সুজি বিস্কুট।'[৩২] এই আক্ষেপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় জীবনবোধের গভীরতম যন্ত্রণা।

অনঙ্গমোহন তাঁর টোলের প্রিয় ছাত্রী সুমিতাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতেন— সে একদিন টোলের মুখ উজ্জ্বল করবে। স্বপ্নার বিয়ের সময় অনঙ্গমোহন তার প্রিয় দুষ্প্রাপ্য অনেকগুলি বই উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর দেওয়া বইগুলি সুমিতা কলেজ স্ট্রিটে পুরোনো বইয়ের দোকানে বিক্রি করে দেয়। তার সেই বইগুলি দোকানে আবার বিক্রি হতে দেখে ব্যথায় ভরে ওঠে বুক। যে সুমিতা সংস্কৃত ভাষায় এত দক্ষতা অর্জন করল, সে তার শ্বশুর বাড়িতে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল খোলে। কারণ যুগের প্রয়োজনে শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই বদল আমাদের জীবনে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'মহানগর' উপন্যাসে দেশবিভাগের বলি প্রিয়গোপাল বাবুর পারিবারিক জীবনযাত্রা বদলে যাবার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। প্রিয়গোপাল ছিল জমিদারের সেরস্তা, স্বাধীনতার আগেই তার চাকরি চলে যায়; ফলে চরম অর্থনৈতিক সংকট শুরু হয়। আর পাঁচজন ভদ্র প্রতিবেশীর দেখাদেখি বাড়ির অন্য সকলকে কলকাতায় পাঠিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে নিজে থেকে গেলেন পূর্ববঙ্গে। ছেলে কলকাতার ছোট্ট একটি ব্যাঙ্কে চাকরি করে। ছেলে চিঠি লিখল— দুজায়গায় খরচ চালানো অসম্ভব তাই তিনি যেন কলকাতায় চলে আসেন। এক জায়গায় হবার পরেও সুব্রতর পক্ষে সংসার চালানো দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। পূর্ববঙ্গের এই সচ্ছল পরিবারটি প্রতিদিন সংসারের খরচ কমাবার চেষ্টা করছে। জমা-খরচের খাতা খুলে খুঁটে খুঁটে দেখে কোথায় ব্যয়ের অঙ্কটা ছাঁটাই করা চলে। স্বামী সুব্রতর সঙ্গে পরামর্শ করে আরতি কতকগুলি নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে—

১. সপ্তাহে তিন দিন নিরামিষ ভোজনের ব্যবস্থা;

২. জামা-কাপড় নিজেরা কেচে নিয়ে ধোপার খরচ কমানো;

৩. কয়লার ব্যয় হ্রাস করবার জন্যে কয়লার গুড়ো দিয়ে গুল তৈরি করে তা দিয়ে রান্নার আয়োজন।

প্রতিমাসে ভাবে সংসারের ব্যয় ভার হয়ত কিছুটা কমবে কিন্তু তা না হয়ে উল্টোটাই হয়। হয় ছিঁড়ে যায় শ্বশুরের পাঞ্জাবি, কিংবা ফেঁসে যায় শাশুড়ির শাড়ি, না হয় ছেলেটা পড়ে কঠিন অসুখে। সাধ-আহ্লাদ সব বিসর্জন দিয়েও সংসার টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তাই খরচ কমানোর সঙ্গে সঙ্গে আয় বাড়ানোর কথা ভাবতে শুরু করে। অভিজাত পরিবারের সন্তান হয়েও পরিস্থিতির চাপে রক্ষণশীলতা থেকে সরে এসে সুব্রতকে স্ত্রীর চাকরির কথা ভাবতে হয়। সে আরতিকে বলে 'পুরুষ হোক, মেয়ে হোক, আজকাল বসে খাওয়ার কি জো আছে কারও? চেষ্টা-চরিত্র করে তুমিও যদি একটু কিছু জোটাতে পারতে মন্দ হত না। বিশ হোক পঁচিশ হোক, যা আনতে তাতেই অনেক সাহায্য হত আমার।[৩৩]

নারীর কাজের জগতের প্রতি যে পুরুষের ধারণা ক্রমে বদলে যাচ্ছিল তার প্রমাণ মেলে সুব্রতর সহকর্মী পরেশবাবুর কথায়। আরতি চাকরিতে যোগ দেবার পর থেকে সুব্রত অফিসে বাড়িতে তৈরি টিফিন আনে না। এর কারণ হতে পারে দুটি—

১. আরতি কাজে যোগ দেবার পর থেকে সময়ের অভাবে সে টিফিনের ব্যবস্থা করে দিতে পারে না;
২. আর্থিক সচ্ছলতা বাড়ার ফলে বাড়ি থেকে খাবার এনে খাওয়া আত্ম গরিমায় আঘাত লাগে বা ঝামেলার মনে হয়।

বাড়ির টিফিন আনা সম্পর্কে পরেশবাবুকে সুব্রত বলেছে— 'আগে আনতাম। এখন আর ওসব—' পরেশবাবু সুব্রতর সঙ্গে টিফিন ভাগ করে খেতে খেতে সাংসারিক অভাব অনটনের কথা তুলে ধরেন। তারও মনে হয় এই সময়ে দাঁড়িয়ে একজনের রোজগারে সংসার চালানো সম্ভব নয়। আরতির চাকরি প্রসঙ্গে নিজের আক্ষেপ ফুটে উঠেছে— 'আপনি ভাগ্যবান মশাই। আজকালকার দিনে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে এক হাতের রোজগারে কি আর চলে?... যদি আর একখানা হাত থাকে, বাইরে থেকে কিছু কিছু নিয়ে আসে তাহলে বড্ড সাহায্য হয় মশাই।'[৩৪] পঞ্চাশের দশকে নারীকে কাজের প্রতি উৎসাহিত করবার উদাহরণ পাওয়া যায় সর্বত্র। কলকাতার রায়চৌধুরী পরিবারের মেয়ে কবিতা রায়চৌধুরী জানিয়েছিলেন ভালোলাগার কাজ গান শোনা আর সেলাই করা। একথা শুনে তার মা রেগে গিয়ে বলেছিলেন— এটা কি কোনও কাজ হল? পড়াশুনা কর। একটা পাশ করে তার পর টিচার্স ট্রেনিং নিতে হবে, চাকরি করতে হবে। তারপর যদি পড়তে ইচ্ছে হয় আরও পড়বে।[৩৫] নারী সংসার সামলে কাজ করে পয়সা রোজগারের ফলেই সংসারের হাল ফিরল উদ্বাস্তু পরিবারে।

আরতির 'মুখার্জি অ্যাণ্ড মুখার্জি' ফার্মে জয়েন করার পর সুব্রতর সংসারের হাল ফেরে। এরপর থেকে বদলে যেতে শুরু করে সংসারের হাল চাল; বদলে যেতে থাকে পরিবারের সার্বিক অবস্থা—

১. আরতি সংসার সামলে অফিসে যায় সকাল সকাল তাই ভোরে উঠে সংসার যাত্রা সেরে অফিস যাত্রার তোড়জোড় শুরু করে;

২. চাকরিতে যাবার সময় প্রতিদিন আরতির ছোট্ট ছেলে পিন্টু কেঁদে ভাসায়। ট্রামে করে অফিসে যেতে যেতে সেই সুর বুকের মধ্যে বাজে। কিন্তু উপায় থাকে না আরতির;

৩. ক্রমে পিন্টু মায়ের অনুপস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে;

৪. আরতি প্রথম মাসের রোজগার শ্বশুরের হাতে তুলে দিলেও তিনি খুশি হন না। কিন্তু যে শাশুড়ী একদিন আরতির চাকরির ঘোরতর বিরোধী ছিলেন তিনি আজ বউমার চাকরির পক্ষে স্বামীর কাছ সওয়াল করেন;

৫. প্রিয়গোপালবাবুর জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসে ফলে তিনিও বউমার চাকরি করায় আপত্তি করেন না;

৬. সংসারে আরতির গুরুত্ব বাড়ে এবং নিজস্ব মতামতের জায়গা তৈরি হয়;

আরতি আর্থিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়া প্রসঙ্গে স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে— নারীর হাতে বেশ কিছু ক্ষমতাই তুলে দিয়েছেন নরেন্দ্রনাথ। তার নারী ক্ষমতাশালী, স্বনির্ভর। পুরুষের সঙ্গে সমান ক্ষমতার অধিকারী।[৩৬]

সুব্রতর ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যাবার পরে সংসারে অনটন বাড়ে। এক সময়ে আরতিকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে আনবে ভেবে ছিল সুব্রত কিন্তু সেটা আর সম্ভব হয় না। সংসারের কাজের জন্য কুমুদকে সর্বক্ষণের জন্য রেখেছিল, সুব্রতর রোজগার কমে যাওয়ার কারণে তাকে ছাড়িয়ে দিতে হয়, সবার ঠাট-বাট কমে আসে। দুধের পরিমাণ কমে হয় এক পোয়া। চায়ের পরিমাণ কমল। সুব্রতর ছোট দুই ভাই নন্তু আর সন্তু যাদের মাছ ছাড়া খাওয়া হত না, এখন ওদের নিরামিষ ভোজন চলে প্রায়ই, কেউ আর থালায় ভাত ফেলে উঠে যায় না। আবার প্রিয়গোপাল দূর সম্পর্কের আত্মীয়-বন্ধুর ঠিকানা জোগাড় করে খোঁজ-খবর নেওয়ার অছিলায় তাদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হন। যারা খেতে বলে না, বাড়িতে এসে তাদেরই নিন্দে করেন। আর যারা খাওয়ায় তাদের ওপর খুশি হন; তাদের সুখ্যাতি মুখে আর ধরে না। প্রিয়গোপাল যে মানুষটি একদিন জমিদারের নায়েব ছিলেন টাকা পয়সার অভাব ছিল না আজ তাকে মান সম্মান বিসর্জন দিয়ে অযাচিত হয়ে লোকের বাড়িতে বাড়িতে খাবার আশায় ঘুরতে হয়। বদলে যায় অন্তর-বাইরের গঠন।

কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের 'উজানতলীর উপকথা' উপন্যাসের প্রথম পর্বে কাজল ছিল কিশোর, পূর্ববঙ্গের মাঠ-ঘাট, খালি-বিল, নদী-নালায় ছিল যার বিচরণ ভূমি দ্বিতীয় পর্বে সে যুবক। সাতচল্লিশের দেশভাগের পর ঘর ছেড়ে পথে ভাসাবার যে পালা শুরু হয়েছিল, উনপঞ্চাশে এসে তা খানিকটা স্তিমিত হয়। কিন্তু পঞ্চাশের নির্মম গণহত্যার পর শুরু হয় ছিন্নমূল মানুষের নতুন প্রবাহ। এই প্রবাহে কাজলকে ও গা ভাসাতে হয়, নানা অপমান আর গ্লানি নিয়ে পথের ক্লান্তি সয়ে সে সীমান্ত পার হয়। তারপর নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গের এক উপনিবেশ পদ্মবিলের পাশে নতুন পল্লিতে আশ্রয় পায় কাজল। পূর্ববঙ্গে কাজল যেমন বিলবাঘিয়ার পার্শ্ববর্তী নিম্নবর্গীয় জনপদে বাস করত এখানে এসেও পদ্মবিলের পাশে শুরু হয়েছে কাজলদের বসবাস। জমিদারের পোড়ো জমি দখল করে তারা বসতি নির্মাণ করে। জমিদার তার গুন্ডা বাহিনি পাঠিয়ে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়।

আলোচ্য উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবনের রূপান্তরের কথা বিবৃত হয়েছে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে। উপন্যাসে পূর্ববঙ্গের এক বলিষ্ঠ লোক-কবি সুরেন সরকারের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য। সুরেন পূর্ববঙ্গের এক নিরীহ শান্ত লোক-কবি। দেশে দেশে গান গেয়ে বেড়ানোই ছিল যার পেশা এবং নেশা। তিনি সেই নেশা-পেশাকে পরিত্যাগ করে উদ্বাস্তুদের জন্য গান গেয়ে গেয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তুলতে প্রয়াসী হলেন। বিধান রায় তখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তাকে কেন্দ্র করে গান রচনা করে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন তিনি। ইউ.সি.আর.সির ডাকে উদ্বাস্তুদের প্রতি বঞ্চনার প্রতিবাদে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে, বিরাট এক জনসভায় সুরেন সরকার গাইলেন—

'—তোমারে বলব কী ওহে মন্ত্রী বিধান রায়
বাস্তুহারার দুঃখ সারা- তোমার পক্ষে হল দায়।।
ক্যাম্পে শুয়ে মাঠে মাঠে
আর কতদিন জীবন কাটে
দেখে মোদের দুঃখ-কষ্ট শিয়াল কুকুর লজ্জা পায়।।'[৩৭]

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের গায়েই বিধান রায়ের বাড়ি। মাইকের একটা মুখ সেই দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মঞ্চ থেকে নামামাত্র পুলিশ তাকে লালবাজারে ধরে নিয়ে যায়। চলে জিজ্ঞাসাবাদ। কিন্তু নির্ভীক এই কবিয়ালকে শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় পুলিশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য চারণ কবি মুকুন্দ দাসের মত কবিয়াল সুরেন সরকারও ক্যাম্প-কলোনিতে ঘুরে ঘুরে উদ্বাস্তু মানসে প্রতিবাদের ঝড়

তুলেছিলেন। নানা জায়গায় ঘুরে অবশেষে বাগজোলা ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছেন সুরেন। তার সুর আছে। সেই সুরের আকর্ষণে লোক জড় হয়। ক্যাম্প নিকটবর্তী জগৎপুর বাজারে রোজ বিকেলে গানের আসর বসে তাঁর নেতৃত্বে। সুরেন কাজলকে চিঠিতে জানিয়েছে— 'আমাদের কাজ হল গান গেয়ে লোক জোগাড় করে বাজারটাকে জমিয়ে দেওয়া। পুববাংলার ফেলে আসা গানের টানে মানুষজন এসে হাজির হয়। সেই সুযোগে দোকানীদের বেচাকনা বাড়ে। দু এক পয়সা দক্ষিণা জোটে আমাদেরও।'[৩৮] দেশভাগ পরবর্তী সময়ে এভাবে নানা পেশায় যুক্ত হয়ে মানুষকে বাঁচতে হয়েছে।

'উজানতলীর উপকথা' উপন্যাসের প্রথম পর্বে আমরা দেখেছি ফরিদপুরের জলময় এক নিম্নবর্গীয় জনপদের নিয়ামক বিধুমণ্ডল দেশভাগ পরবর্তী সময়ে উচ্চবর্গীয় সমৃদ্ধশ্রেণির দেশত্যাগের পর নতুন করে সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, বিভিন্ন নিম্নবর্গীয় অঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু তার সে স্বপ্ন ব্যর্থ হয়। উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে আমরা দেখি বিধু মণ্ডলের ভাবনা সঞ্চারিত হয় পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুদের মধ্যে। তাদের মধ্যে কিছু মানুষ সামনে থেকে নদীয়া সীমান্তবর্তী অঞ্চল রাঙ্গিয়া পোতা, মহাখোলা, ধরমপুর, ফুলকলমি, মধুপুর ইত্যাদি অঞ্চলে স্কুল গড়ে তুলেছেন। নিজেদের উদ্যোগে বিদ্যালয় নির্মাণের এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল মূলত উদ্বাস্তুদের ভাঙাচোরা জীবনকে নতুন করে নির্মাণের উদ্দেশ্যে। এরফলে নিম্নবর্গীয় উদ্বাস্তুদের মধ্যে একটি অংশের জীবনধারা দ্রুত বদলাতে শুরু করে।

'উজানতলীর উপকথা' মূলত গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের জীবনধারার প্রকাশ, এখানে ব্যক্তি গৌণ। তবুও উপন্যাসের কোথাও কোথাও ব্যক্তি জীবনের রূপান্তর প্রকট হয়ে উঠেছে। কাজলদের গাঁয়ে বাস ছিল ধীরা পরামানিকের। বংশ পরম্পরায় তারা ক্ষৌরকার্য করে জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। পূর্ববঙ্গে ধীরার বংশধর নিম্নবর্ণের ক্ষৌরকার্য করত। তার পদবী ছিল দাস। এখানে কৌলিন্য বাড়াবার দায়ে তাতে রায় যুক্ত করে হয়েছে দাস রায়। এখন উচ্চবর্ণের চুল দাড়ি কাটতে বাঁধা নেই তার।

উজানতলী অঞ্চলের ডানপিঠে নিমাই মণ্ডলের সঙ্গে ধীরা পরামানিকের দেখা হয় সোদপুরের এক মন্দিরে। চুল-দাড়ি রেখে সে নিজের পূর্ব পরিচয় আড়াল করতে চেয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিনের পরিচিত নিমাই ধীরার কাছে নিজেকে লুকোতে না পেরে অকপটে স্বীকার করেছে সব— 'শোন ধীরা এখন আর আমি নিমাই মণ্ডল নই, নির্মল মুখোপাধ্যায়, এই মন্দিরের সেবাইত।'[৩৯] নিজের পদবী বদলে ব্রাহ্মণ সেজে মন্দিরের পুরোহিত হওয়ার পিছনে রয়েছে চরম দারিদ্র্য, সে কথা সে ধীরাকে জানায়

এবং দিব্যি দেয় তার এই নতুন পরিচয় কাউকে না জানানোর জন্য। বেঁচে থাকার জন্য উদ্বাস্তুদের নিজেকে এভাবে বদলে দেবার ছবি প্রায় সর্বত্র দেখা যায়। বাঁচার জন্য কোনও নিয়ম-নীতির ধার ধারেনি তারা।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মানুষের ঘরবাড়ি' উপন্যাসে পূর্ববঙ্গের এক সচ্ছল ব্রাহ্মণ উদ্বাস্তু পরিবারের ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসের নায়ক বিলুর জবানিতে কাহিনিটি পরিবেশিত হয়েছে। দেশবিভাগের পর পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে এসে বিলুদের পরিবারের বিপর্যয় এবং বিলুর বড় হয়ে ওঠা উপন্যাসের উপজীব্য। এদেশে এসে বিলুদের পারিবারিক জীবনযাত্রা একেবারেই বদলে গিয়েছে। নিজের জীবনের কথা প্রকাশ করতে গিয়ে উপন্যাসের শুরুতেই বিলু বলেছে— 'এদেশে এসেই আমার বাবা খুব গরীব হয়ে গেলেন। হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলাম, দেশে থাকতে আমরা এতটা গরীব ছিলাম না'[৪০] বিভাগ পরবর্তীসময়ে ছেলে মেয়ে স্ত্রীকে নিয়ে দেশ ছাড়েন বিলুর বাবা কিন্তু কিছুতেই থিতু হয়ে বসতে পারছিলেন না। ফলে জীবনের এক গভীর অনিশ্চয়তা তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। সমগ্র উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই তিনি চারবার জায়গা বদল করেছেন।

বিলু তার বাবার পরিচয় দিয়েছে এভাবে— 'বাবার বিদ্যা বলতে যজনযাজন। এবং বাবা দেশ ছেড়ে আসার আগে জমিদার বাড়িতে আমলার কাজ করতেন। পুজো-আর্চা করতেন।'[৪১] সেই সময়কার জমিদারের আমলার প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং অর্থনৈতিক অবস্থা যে জীবন-যাপনের পক্ষে অনুকূল ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিলুরা ঢাকা জেলার রাইনাদি নামক এক সমৃদ্ধ গ্রামের বাসিন্দা। এই জেলাতেই জন্মেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, জগদীশচন্দ্র বসু, এখানকার ডাকসাইটেক জমিদার ছিলেন দীনেশবাবু— এসব কারণে বিলুর বাবার অহংকারও ছিল মনে মনে। বিলুরা এসে আর পাঁচ জন সাধারণ উদ্বাস্তুর মত ক্যাম্প-কলোনিতে আশ্রয় গ্রহণ করেনি। বহরমপুরে বাবার পিসতুতো ভাই মানু কাকার বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলে তিনি বিরক্ত হন। শেষে তাদের ক্যাম্পে চলে যেতে বলেন। কিন্তু বিলুর বাবা ক্যাম্পে গিয়ে জাত খোয়াতে রাজি নন। তাই তিনি পূর্ববঙ্গে যে কাজ করতেন তেমন ধরনের একটি কাজের অনুসন্ধান করেন।

একবার খবর এল গুপ্তিপাড়ায় বনেদি মানুষের বাস। বিলুর বাবার ধারণা হল সেখানে গেলে কিছু একটা ব্যবস্থা হবেই। তাই গুপ্তিপাড়ার একটা ভাঙা মন্দিরের নিচে তারা আশ্রয় নিল। বিলুর বাবা সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের মত চলাফেরা করল কিছুদিন। ঘাটে স্নানের সময় জোরে জোরে স্তোত্র পাঠ

করতে লাগলেন— তার বাবার আশা ছিল ঠিক খবর পৌঁছে যাবে ঘরে ঘরে; লাইন দিয়ে মানুষ আসবে তার কাছে। কিন্তু কেউ আসে না। মন্দিরের চাতালে উপবাসী থাকতে হয়। তাঁর মত সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণকে এখানকার মানুষ বুঝতে পারল না, সেই কারণে সবাইকে ম্লেচ্ছ বলে গালি দিয়ে নতুন আস্তানার অনুসন্ধান করেন। পূর্ব পরিচিত নবর বাবার খোঁজে বর্ধমানের গলসীতে যান, সেখানে না কি তার চালের আড়ৎ আছে। আবার গোপালদির বাবুরাও ওখানে বিরাট খামার করেছে। সুতরাং ওখানে গেলে না খেয়ে মরতে হবে না। গলসীতে গিয়ে তাদের কারও খোঁজ পাওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত বিলুর মায়ের শেষ সম্বলটুকু বিক্রি করে এবং মনু কাকার কিছু আর্থিক সহায়তায় কাশিমবাজারের রাজাদের পাঁচ বিঘা জমি একশো টাকায় কিনে বিলুরা সেখানে চলে যায়। জায়গাটিকে জমি না বলে বনভূমি বলাই শ্রেয়। গভীর জঙ্গল। তার মধ্যে চারিদিকে চারটি শিরীষ গাছ বিলুদের জায়গার সীমানা। বিলু, তার ভাই পিলু, বোন মায়া, ছোট ভাই পুনু এবং তাদের বাবা-মা সমস্ত জঙ্গলটাতে এই ছটি প্রাণীর বাস। সেই বিশাল বনভূমিতে জঙ্গল পরিষ্কার করে বিলুরা কোনও রকমে মাথা গোঁজার মত বাঁশের খুঁটির উপর টিনের চালা ও খলপার দেওয়াল দিয়ে বাসগৃহ তৈরি করে। নতুন করে এই বাসস্থান তৈরি করতে পরিবারের সকলকেই উয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়, বদলে ফেলতে হয় বিজনের অভ্যেস আর রীতি।

এই দুর্দিনে 'বাবার একটা খেরো খাতায় আজকাল রাজ্যের সব মানুষ জনের নাম ঠিকানা লেখা থাকে। পিতামহের আমলের কিছু শিষ্যদের নাম বাবা পুনরায় হেডিং দিয়ে লিখে রাখছেন।... এখন এই দুঃসময়ে তাদের খোঁজ খবর করে বেড়াচ্ছেন বোধহয়।'[৪২] বিলুর কথা থেকে বোঝা যায়, যে ব্যবসা তিনি হেলায় ছেড়ে দিয়েছিলেন, এই অসময়ে তাকে অললম্বন করেই বেঁচে থাকতে চাইছেন। পৌরিহিত্যের বিদ্যাই এখন থেকে বাঁচার মূলধন হবে। তাই যজমানদের খুঁজতে বিলুর বাবা খুশি মত ট্রেনে করে সুদূরে চলে যান, ট্রেনে চড়ার জন্য টিকিটের ধার ধারেন না। এই টিকিট না কাটাও তাঁর কাছে গৌরবের মনে হয়। বিলুর বাবার অকাট্য যুক্তি— তাঁরা ছিন্নমূল মানুষ দেশের স্বার্থে তাদের দেশত্যাগ সুতরাং তাঁদের ভাড়া দেবার দরকার পড়ে না। বিনা ভাড়ায় যাতায়াত করে বিলুর বাবা হয়ত লতায় পাতায় কোনও আত্মীয়তার সম্পর্ক খুঁজে বের করে সেখানেই কাটিয়ে দেন দিনের পর দিন। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার, উদ্বাস্তুরা প্রথমদিকে স্থানীয় মানুষদের কাছ থেকে যে ধরনের আদর-আপ্যায়ন এবং সহানুভূতি পেয়েছিল আস্তে আস্তে তা কমতে থাকে।

বিলুদের পরিবারে লেখাপড়ার চল ছিল না কোনও দিনই। তার বাবা জমিদারী সেরেস্তায়

আদায়পত্র করতেন। ভালভাবে চলে যেত, সুতরাং তার বাবার জীবনে পরীক্ষায় পাশ করার কোনও দায় ছিল না। কিন্তু এদেশে এসে অথৈ জলে পড়ার পর আজ বিলুর বাবার ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। বিলুর জন্য বাবা অহংকারী হয়ে ওঠেন। পারিবারিক অবস্থা প্রকাশিত হয় বিলুর কথায়— 'আসলে আমাদের পরিবারের জীবনে কেউ কোনও বড় পাশ দেয়নি! আমিই প্রথম এবং এতে বাবা খুব অহংকারী ছিলেন।[৪৩] পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু, যারা অর্থ-সম্পদ নিয়ে আসতে পারেনি তারা অনুভব করতে শুরু করে বিদ্যার চর্চা ভিন্ন সচ্ছল জীবন-যাপন করা সম্ভব নয়। তাই দেশভাগ পরবর্তী সময়ে তাদের মধ্যে লেখা-পড়ার ব্যাপক ঝোঁক লক্ষ করা যায়। এই ঝোঁকেরই প্রতিফলন ঘটেছে 'মানুষের ঘরবাড়ি' উপন্যাসে। বিলুরা যখন জঙ্গলের মধ্যে তাদের বসতি গড়ে ছিল কাছে পিঠে তখনও নতুন ব্যারাক, কালীর দীঘি, বাদশাহী সড়ক; আর সেই চৌমাথায় নিমতলার কাছে নিবারণ দাসের বাড়ি। এখন দলে দলে ছিন্নমূল মানুষ এসে খালি জায়গায় বাঁশ পুঁতে আস্তানা গেড়ে নিচ্ছে। এই ক'বছরে এখানে একটা বাজারও হয়ে গেছে। চায়ের দোকান, মুদির দোকান, মাছ, কাঁচা আনাজ সবই পাওয়া যায়। চায়ের দোকানে কাগজ আসে। কলোনির লোকেরা চা খায়, কাগজ পড়ে। এভাবে ক্রমে পুরোনো জীবনের গণ্ডি পেরিয়ে নতুন জীবনের দ্বার প্রান্তে উপস্থিত হয় উপন্যাসের চরিত্রগুলি। গৃহহারা মানুষের স্থায়ী গৃহজীবনের যে আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে লালিত হয়; আলোচ্য উপন্যাসে বিলুদের পরিবার সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণে সমর্থ হয়েছে।

'উচ্ছিন্ন পরবাস' উপন্যাসে দেশভাগের প্রেক্ষিতে উদ্বাস্তু মানুষের জীবন-চিত্রের বদল এবং এর ফলে সৃষ্টি হওয়া সামাজিক সংকটের কথা ব্যক্ত হয়েছে। দেশবিভাগের ঝাঁপটায় প্রায় একবস্ত্রে দেশ ছেড়েছিলেন উমাপতি ঘোষাল। পৈতৃক ভিটে, শিষ্যবাড়ির প্রণামী, জমিজমা— এই অভ্যস্ত জীবনযাত্রা থেকে রিক্ত হয়ে অনিশ্চিত জীবনের দিকে পা বাড়াতে স্বাভাবিক দ্বিধা ছিল তার মনে। কিন্তু প্রাণরক্ষার দায়ে বালক পুত্র এবং স্ত্রীকে নিয়ে দেশ ছেড়েছিলেন। তারপর অনিবার্যভাবেই শুরু হয়েছিল কঠিন লড়াই। দু'মুঠো অন্ন, মাথাগোঁজার ঠাঁই এবং পরিধেয় বস্ত্র— এসব জোগাড় করতে উমাপতির মাথার ঘাম পায়ে পড়েছিল। শেষপর্যন্ত একটু আশ্রয়ের হিল্লে করতে পেরেছিলেন। রেল-স্টেশন থেকে প্রায় মাইল দুয়েক দূরে হোগলা-বাঁশ-জলা জঙ্গল ঠেঙিয়ে সদ্য নির্মিয়মান একটি রিফিউজি কলোনিতে একচিলতে জমি দখল করেছিলেন। ছোট একটা ঘরও তুলেছিলেন। রিফিউজি কলোনির প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতার কাজ জুটিয়ে ছিলেন। ইতিমধ্যে তার এক কন্যার জন্ম হয়। নাম রাখেন বিনতা। ছেলে বি.এস.সি পাশ করার পর একটি নামী প্রতিষ্ঠানে সম্মানজনক পদে চাকরিতে

বহাল হয়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ভিড় বাস থেকে ছিটকে পড়লে অন্য গাড়িতে চাপা দিয়ে চলে যায়। ফলে চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া যায়নি। এই নির্মম শোকের আঘাত উমাপতিকে স্থবির করে দিয়েছিল। ছেলেকে হারানোর বছর খানেকের মধ্যে স্ত্রীর মৃত্যু হয়। কন্যা সন্তানটি খুবই ছোট। বাধ্য হয়ে চাকরি থেকে অবসর নিতে হল উমাপতিকে। সামান্য প্রাইভেট টিউশানি করে জীবিকা-নির্বাহ করতে হয় তাঁকে। সংসারে অভাবের মাত্রা বাড়তেই থাকে। আলোচ্য উপন্যাসে উমাপতি ঘোষালের জীবন ধারণের বদলে যাবার যে কাহিনি তা বাস্তব ক্ষেত্রে অসংখ্য দেশান্তরী মানুষের জীবনে ঘটেছিল। উচ্চবর্গীয়দের মধ্যে একটি শ্রেণি পূর্ববঙ্গে যাদের জমিদারি জোতদারি, ব্যবসা কিংবা চাকরি ছিল না যজনযাজন করে সচ্ছলতার মধ্যে দিন যাপন করত, তাঁরা দেশত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে আসার পর চরম সংকটের মধ্যে পড়ে। কারণ বংশ পরম্পরায় তাঁরা আরাম আয়েশের মধ্যে দিয়ে দিন যাপন করতেন, পরিশ্রম করতে একেবারেই অভ্যস্ত ছিলেন না। এদেশে আসার পর কায়িক পরিশ্রম করে বাঁচা তাদের কাছে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের কোনও পরিচিতিও ছিল না যে তাঁদের দিয়ে লোকে পুজো-পার্বণ করাবে। এক্ষেত্রে আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন দেশবিভাগের পর উদ্বাস্তুদের বেঁচে থাকার সংকট এত প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল যে যাগ-যজ্ঞ, পুজো-পার্বণ কিংবা সামাজিক অনুষ্ঠান করার মত পরিস্থিতি তাদের ছিল না। তবে পরবর্তী সময়ে উদ্বাস্তুরা স্থিতিশীল জীবনে পদার্পণের পর আবারও তারা সমাজ জীবনে ফিরে আসে। উমাপতি ঘোষাল বর্তমানের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় পূর্বপুরুষের পেশাগত ঐতিহ্যকে স্মরণ করেছে— 'আমার বাবা গণপতি ঘোষালের পাঁচশো ঘর যজমান ছিল। পূজা-পার্বণে তার বাড়ীতে কত লোকের পাত পড়েছে। আর আমি বংশের কুলাঙ্গার, ভিটেমাটি ছেড়ে পথের ভিখিরী।'[৪৪]

এই উমাপতি ঘোষালের মেয়ে বিনতা তথা বিন্তি পরিবারের দুর্দিনে চাল ব্ল্যাক করে সংসার চালায়। বিনতা ঘোষাল অধুনা চাল পার্টির পয়লা নম্বরের এই মেয়েটিকে দেখে বছর কয়েক আগেকার বিন্তির শরীরিক অথবা মানসিক রূপ অনুমান করা দুরূহ। চালের চোরাচালানের দলের মিলেমিশে একাকারা হয়ে যাওয়া— বিন্তির কয়েক বছর আগেকার মানসিকতা বা পারিবারিক পারিপার্শ্বিকতার আবহাওয়ায় ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। উপার্জনের তাগিদে বিন্তিকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হয়। অর্থের ধান্ধায় নানা চরিত্রের সঙ্গীদের সঙ্গে মিশতে হয়। বাড়ি ফিরতে হয় গভীর রাতে। মেয়েকে এ বিষয়ে কিছু বলতে পারে না অক্ষম পিতা। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পুরুষের সাংসারিক নিয়ন্ত্রণ এভাবে অনেকটাই কমে গিয়েছিল।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে উদ্বাস্তুরা নতুন করে নানা পেশায় নিজেদের নিযুক্ত করে। এক্ষেত্রে অনেক সময়েই তারা নীতি আদর্শের ধার ধারেনি। আলোচ্য উপন্যাসের নায়ক শঙ্করা, যে শৈশব থেকে প্রচণ্ড দারিদ্রের মধ্যে বড়ো হয়ে উঠেছে। বেঁচে থাকার তাগিদে ন্যায়-অন্যায় বিচারের সুযোগ পায়নি। শৈশবে পরিবারের সকলকে হারিয়ে পকেটমারী করে বাঁচতে শুরু করে। পরবর্তী সময়ে মস্তান হয়ে ওঠে। মেলার মাঠে পকেট মেরে ধরা পড়েছিল; সেই থেকে এ লাইনে তার হাতে খড়ি। পরে অবশ্য সে চালের চোরাচালানকারীদের সর্দার হয়ে ওঠে। একদিন চলন্ত ট্রেনের মধ্যে যাত্রীদের হাতে ধরা পড়ে এক কিশোরকে বেদম মার খেতে দেখে শঙ্করার অতীত জীবনের কথা মনে পড়ে। কৌশলে যাত্রীদের হাত থেকে রক্ষা করে শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তোলে ছেলেটিকে। শঙ্করা ছেলেটির অতীত কাহিনি জেনে নেয়।

ছেলেটির নাম রতন। থাকত অশোকনগরে দাদার কাছে। অভাবের কারণে দাদা বাড়ি থেকে বের করে দেয়। তারপর থেকে রতন একটি চোলাই মদ তৈরির কারখানায় কাজ করত। চোলাই ভাটির লাইসেন্স ছিল না। তাই মাঝে মাঝে পুলিশ আসত। পুলিশের সঙ্গে ভাটির মালিকের যোগাযোগ ছিল। মাসে মাসে পুলিশকে টাকা গুনত মালিক। পুলিশ তার ডিউটি দেখাতে গিয়ে দু'একটা হাড়ি গামলা ভেঙে দিত। তারপর কাউকে না কাউকে ধরে নিয়ে যেত। ভাটির মালিক রতনকে এই কাজে ব্যবহার করত। পুলিশ এলেই রতনকে এগিয়ে দিত মালিক। আগে থেকে সব ব্যবস্থা করাই থাকত হাতে দড়ি বেঁধে পুলিশ রতনকে নিয়ে যেত। তারপর একদিন দুদিন আটকে রেখে ছেড়ে দিতেই রতন ফিরে আসত ভাটিতে। হাজত খাটাই ছিল মূলত রতনের পেশা। দীর্ঘদিন এভাবেই চলছিল। এভাবে ভাড়ায় হাজত বাস তার ভাল লাগছিল না তাই সে মালিকের কাছে স্থায়ী কাজের দাবি করে। মালিক তাতে ক্ষুব্ধ হয়। রতনকে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দেয়। রতনের ছ'মাসের জেল হয়। জেল থেকে বেরিয়ে পকেটমারী শুরু করে। শঙ্করা তাকে চাল ব্ল্যাকের কাজে নিযুক্ত করে। দেশভাগ পরবর্তী সময়ে এ ধরনের অদ্ভুত অদ্ভুত পেশাকে অবলম্বন করে বেঁচে থেকেছে উদ্বাস্তুরা।

চালের আড়তের মালিক নিবারণ, যার আশ্রয়ে শঙ্কররা বড় হয়ে উঠেছে তার ছেলে পলাশের কু-দৃষ্টি পড়ে উমাপতি ঘোষালের মেয়ে বিন্তির উপর। শঙ্করা বিন্তিকে ভালবাসে। বিন্তিকে পলাশের হাত থেকে রক্ষা করতে প্রাণপণে চেষ্টা করে ও ব্যর্থ হয়। পলাশ ও তার বন্ধুরা পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে ভাঙা মসজিদে নিয়ে গিয়ে বিন্তিকে দিনের পর দিন ধরে ধর্ষণ করে। নানা অনুসন্ধানের পর বিন্তির খোঁজ পায় শঙ্করা। পলাশের সঙ্গে শঙ্করার প্রবল লড়াই হয়। শঙ্করার ধাক্কায় পলাশ ছাদ থেকে পড়ে

গিয়ে মারা যায়। বিন্তিকে উদ্ধার করে আনে শঙ্করা, খুনের অপরাধে তার দশ বছরের কারাদণ্ড হয়। ধর্ষণে বিন্তি গর্ভবতী হয়। কিন্তু সন্তানের পিতৃপরিচয় তার অজানা; কারণ পলাশ ও চার সঙ্গী তার উপরে বলাৎকার করেছে— 'পাঁচটি জানোয়ারই তো রাতের পর রাত নিরন্তর ছিঁড়ে খেয়েছে বিন্তিকে।' শঙ্করা জেলে যাবার পরে বিন্তি দেখা করতে আসে তার সঙ্গে। জেলের ভেতরে বাইরে দুই নর-নারী এক মহা সংকটের সম্মুখীন হয়। সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে শঙ্করা বিন্তিকে বলে— 'বাপ না থাকার দুঃখ আমি বুঝি বিন্তি। তোমার যদি আপত্তি না থাকে, যে আসছে তার বাপের পরিচয় আমার নামেই দিও।'[৪৫]

মাতৃগর্ভে থাকতেই শঙ্করা তার বাপকে হারায়, বাবা না থাকার যন্ত্রণা সে প্রতিনিয়ত অনুভব করেছে। তাই বিন্তিকে সামাজিক স্বীকৃতি দিয়ে তার গর্ভের সন্তানকে নিজের পরিচয়ে বড় করে তুলতে চেয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার দেশভাগ সমকালে ধর্ষণজাত সন্তানদের সামাজিক সমস্যা প্রবল আকার ধারণ করেছিল। এই ধরনের সন্তানদের পরিবারের লোকেরা কোনওভাবে মেনে নিতে চায়নি। ফলে বিরাট সংখ্যক শিশুকে সরকারি হোমে পাঠাতে হয়। সাবালক হয়ে তারা যখন হোম থেকে বেরিয়ে আসে তখন তারা নানা ধরনের অপরাধমূলক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। আলোচ্য উপন্যাসে লেখক মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিন্তির ধর্ষণজাত সন্তানের কাহিনি উপস্থাপন করেছেন।

দাঙ্গা, দেশভাগ ও পুনর্দাঙ্গায় বাস্তুচ্যুত মানুষের দেশত্যাগ পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনে নতুন মাত্রা এনে দেয়। সদ্য গঠিত পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে কলকাতা শহরের কাছাকাছি জমি দখল করে বসতি গড়ে অগণিত মানুষ। বিশেষ করে কলকাতার দক্ষিণ শহরতলিতে জমিদারদের পোড়ো জমিতে দ্রুত উপনিবেশ গড়ে ওঠে। স্থানীয় জলাভূমি থেকে হোগলা সরবরাহ করে তা দিয়েই নির্মিত হয় অসংখ্য চালা ঘর। রাতের অন্ধকারে সেই চালাগুলোই ভেঙে দিচ্ছিল জমিদারের ভাড়াটে গুণ্ডাবাহিনী। অগ্নিদগ্ধ ও ভেঙে দেওয়া চালার উপরই নতুন করে নির্মাণ করছে আস্তানা। মাটি কামড়ে লড়াই শুরু করেছে জমির মালিক এবং সরকারের বিরুদ্ধে। এইরকম পরিস্থিতিতে মহীকান্ত গুপ্ত বাঘাযতীনের এক কলোনিতে বসতি গড়েন।

মহীকান্তর আদি নিবাস পূর্ববঙ্গের মাদারীপুরে। চার ভাইয়ের মধ্যে তিনিই বড়ো। মেজোভাই নিশিকান্ত ছিলেন মাদারীপুর স্কুলের খ্যাতনামা ইংরেজির শিক্ষক। শশীকান্ত স্বাধীনতার পূর্বেই চাকরি সূত্রে পাঞ্জাবে চলে আসেন। সুধাকান্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী, ছেচল্লিশের দাঙ্গা পরবর্তী সময়ে গান্ধিজির

সঙ্গে ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন। মহীকান্ত ছিলেন জমিদারের নায়েব। তিনি যখন দেখলেন জীবনের নিরাপত্তার অভাব ঘটছে; পাশাপাশি পড়শি মুসলমানদের অত্যাচার এবং অসম্মান চরম আকার নিয়েছে তখন প্রায় এক বস্ত্রে দেশত্যাগ করেন নিজের এবং ভাই নিশিকান্তের পরিবার নিয়ে। শিয়ালদহ স্টেশনে আশ্রয় গ্রহণ করার পরেই দালালের খপ্পরে পড়ে চলে আসেন বাঘাযতীনের এক কলোনিতে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কলোনির ছবি দ্রুত বদলে যাবার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে আলোচ্য 'মানচিত্র বদলে যায়' উপন্যাসে। শচীন দাশের দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবনকেন্দ্রিক এ উপন্যাসে মহীকান্ত এবং তার তিন ভাই ও তাদের সন্তান-সন্ততি, কলোনি পত্তনের সময়কার ফরিদপুরের কংগ্রেস নেতা যামিনীমোহন, কলোনি গঠনের লড়াকু যুবক অমূল্য সহ নানা চরিত্র ও কাহিনি উঠে এসেছে। সেইসঙ্গে কাহিনি বিন্যাসে ইউ.সি.আর.সি, আর.ই.আর.সি-এর মত উদ্বাস্তু সংগঠনগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। উদ্বাস্তু জীবনের ধরণ-ধারণ দ্রুত বদলে যাবার বিষয়টি উপন্যাসে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

উদ্বাস্তুরা এদেশে আসার পরে মূলত দুইভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়—

ক. সরকারি উদ্যোগ;

খ. ব্যক্তিগত উদ্যোগ।

চল্লিশের দশকের শেষ দিকে সরকারি ব্যবস্থাপনায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজ চলতে থাকে। এই ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণেই মূলত মানুষ অন্যের জমি দখল করে বসতি গড়তে শুরু করে। জমি দখলের ক্ষেত্রে প্রথমদিকে উদ্বস্তুদের সংকট ছিল নানামুখী এক্ষেত্রে সরকারি সহায়তা তো ছিলইনা। উপরন্তু উচ্ছেদের জন্য নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। একদিকে উদরের সংস্থান, অন্য দিকে জমি মালিকের গুণ্ডা বাহিনি ও পুলিশি আক্রমণ দখকলকারীদের বিপর্যস্ত করে তোলে। কিন্তু উদ্বাস্তুরা সুসংহত হয়ে যখন থেকে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয় তখন থেকে তাদের নতুন জীবন ধারা তৈরি হয়। ক্রমে তারা একটি স্থিতিশীল জীবনের দিকে পা বাড়ায়; বদলে যেতে থাকে ঘর-গেরস্থালির ধরন-ধারণ।

আলোচ্য 'মানচিত্র বদলে যায়' উপন্যাসের নামকরণের মধ্যেই উদ্বাস্তু জীবনের বদলে যাবার ইঙ্গিত। বর্তমান মহীকান্ত, অমূল্যদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা কলোনির বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ঝোপ-জঙ্গল কাটা হল, সাপ শেয়াল তাড়িয়ে, খানাখন্দ বুজিয়ে বসবাসের উপযোগী করে তোলা হল। যে অস্থায়ী চাল তৈরি হয়েছিল তা স্থায়ী চালায় রূপ নিল— 'যে চালায় ছিল বাঁশের খুঁটি, সেখানে এল গরান

এবং যে চালায় হোগলারই ছাউনি তাতে উঠল টালি। কোথাও কোথাও গৃহস্থের উঠোন. আর সে উঠোনে লাগানো হল জবার চারা।... বাড়ির কোনায় লাগানো হল তুলসি মঞ্চ।'[৪৬]— উপন্যাসের এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় দেশত্যাগের অব্যবহিত পরেই উদ্বাস্তুরা যাযাবরের মত ভাসমান এবং অনিশ্চিত জীবন-যাপন করছিল, তাকে অতিক্রম করে সুখী গৃহজীবনের দিকে পা বাড়ায়।

জমির মালিকেরা যখন থেকে বুঝতে পারল এই বিরাট সংখ্যক মানুষকে গায়ের জোরে কিছুতেই জমি থেকে উৎখাত করা সম্ভব নয়, তখন থেকেই তারা নতুন কৌশল অবলম্বন করে। ভাড়াটে গুণ্ডা বাহিনী দিয়ে আক্রমণের পরিবর্তে আইনের আশ্রয় নেয় এবং পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করে। পাশাপাশি উচ্ছেদের জন্য সরকারের উপর চাপ বাড়তে থাকে। অন্যদিকে উদ্বাস্তুরাও উচ্ছেদের বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলন তীব্র করে তোলে। শেষ পর্যন্ত সরকার উচ্ছেদ বিল স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়। জীবনের অনিশ্চয়তা কাটিয়ে উঠতে এই সময়ে উদ্বাস্তুরা সংঘবদ্ধ হয়ে লড়াই করতে শুরু করে।

উদ্বাস্তুরা ক্যাম্পে বসবাসের সময় সরকার যেমন বর্ণগত ভাবে বাছবিচার না করেই তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে, তেমনি জবর দখল কলোনিতে পারস্পরিক প্রয়োজনে সামাজিক বৈষম্য ভুলে সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠে। ফলে বর্ণগত বিভাজন শিথিল হয়ে আসে। যে কলোনিতে মহীকান্ত, যামিনী মোহনের মত বর্ণশ্রেষ্ঠদের বসবাস, সেখানেই নমঃশূদ্র ঢাকিরা জায়গা করে নিয়েছে। মহীকান্তর ভাই শশীকান্তর কথায় পাই— 'দেশভাগের আগে তাদের গাঁয়ে জাত অনুযায়ী মানুষের যে পাড়া ছিল অর্থাৎ বামুন পাড়া, কায়স্থ পাড়া, জেলে পাড়া,... সেসব পরিকাঠামোই এখন ভেঙে চুরমার। জাত কেন, শুধু অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই এখন জাতধর্ম ফেলে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে লড়তে অসুবিধা হচ্ছে না তাদের।'[৪৭] উপন্যাসের শেষ দিকে কলোনিরই দুই যুবক নবেন্দু এবং বাচ্চুর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে জাত প্রথা বিলোপের চিত্রটি ফুটে উঠেছে। নবেন্দু রায়চৌধুরী বংশের সন্তান; পূর্ববঙ্গে তাদের জমিদারি ছিল। সে ভালোবাসে সাহা বংশীয় বেবিকে। বন্ধু বাচ্চু বেবি এবং নবেন্দুর বর্ণগত বৈষম্যের কথা বললে নবেন্দু স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছে— 'আরে রাখ জমিদারের কথা। দেশভাগ হওনের পর মুড়িমিছরি বেবাক এক হইয়্যা গেছে।'[৪৮] একসঙ্গে থাকতে থাকতে, বেঁচে থাকার পারস্পরিক প্রয়োজনে একে অপরের কাছাকাছি আসে; ফলে জাত-ধর্ম আর ছোঁয়াছুঁয়ির বালাই গৌণ হয়ে যায়।[৪৯]

গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে উদ্বাস্তু জীবনের যে বিবর্তন ঘটেছে, ভাষা সেক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। উপন্যাসে কলোনির স্কুলে নতুন মাস্টার মশাই তিমির মুখোপাধ্যায় শ্রেণিকক্ষের মধ্যে

উদ্বাস্তু ছেলে-মেয়েদের আঞ্চলিক উচ্চারণের ত্রুটি ধরিয়ে দিয়েছেন। পূর্ববঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে বসবাস ছিল তাদের। সকলের মাতৃভাষা বাংলা হলেও একের সঙ্গে অন্যের ব্যবধান বিস্তর। তাই প্রয়োজন আলাদা একটা ভাষা; যে ভাষায় সবাই লিখবে, পড়বে। তিমির বাবু ছাত্রদের জানালেন 'রবীন্দ্রনাথ তাই একটা পৃথক ভাষার কথা ভাবলেন। যে ভাষায় লেখা হবে। যে ভাষা সবাই পড়বে। তাই যে যার নিজের জন্মভূমির ভাষা বাড়িতে বললেও স্কুলে কলেজে বা সমাবেশে... লিখিত ভাষাটাই বলবে।'[৫০] তাই তিনি ছাত্রদের 'হ' এর জায়গায় 'হ্যাঁ', 'ক্যান'-এর জায়গায় 'কেন' ব্যবহারের কথা বলেন। জন্মগত এই উচ্চারণ অভ্যেস একদিনে হয়ত দূর হবে না, ক্রমে রপ্ত হয়ে যাবে। শুদ্ধ উচ্চারণ নিশিকান্তর ছেলে রণজয় ও তার সহপাঠীরা মাস্টার মশাইয়ের কথা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শোনে— মাস্টার মশাইয়ের ভাষা অনুকরণ করতে চেষ্টা করে; কিন্তু কিছুতেই সে রকম হয়ে ওঠে না। পাশাপাশি মহীকান্তবাবুর ছেলে গগন এদেশে এসে কলেজে ভর্তি হয়েও এখানকার ভাষাটা পুরোপুরি রপ্ত করে উঠতে পারে না। তবু আয়ত্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। উপন্যাসের শেষ দিকে লেখক দেখিয়েছেন 'রণ আজকাল নতুন মাস্টারমশায়ের কথা মতো চট করে আর কাউকে 'হ' বলে না। জবাবে জানায় হ্যাঁ।' বাস্তবেও দেখা গিয়েছে উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গে আসার পর আঞ্চলিক ভাষা ছেড়ে ক্রমে কলকাতার শুদ্ধ কথ্য ভাষায় কথা বলতে নিজেদের অভ্যস্ত করে তোলে। আবার উল্টো রকমের পরিবর্তনও যে ঘটছিল ভাষার ক্ষেত্রে তা লক্ষ করাছেন সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়— এখন অত্যধিক বাঙালদের সংস্পর্শে খাঁটি কলকাতার ভাষা অনেকটাই বদলে গেছে। নুচি, নেবু, নঙ্কা এখন আর শোনা যায় না।'[৫১]

ভাষার বদলের পাশাপাশি বিরাট সংখ্যক উদ্বাস্তুর পেশাগত যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল তা উপন্যাসে উল্লিখিত হয়েছে। যতীন, যে পূর্ববঙ্গে জমিদার বাড়ির বাঁধা ঢাকি ছিল। বিভিন্ন পালা-পার্বণে তার ডাক পড়ত। পাশাপাশি দুর্গাপুজোর সময়ে দেবী দুর্গার আগমন থেকে বিসর্জন পর্যন্ত থাকা-খাওয়া ও বাজনা বাজানো চলত। বিসর্জন শেষ হলে উৎসবের জামাকাপড় সহ পাওনাগণ্ডা নিয়েই বাড়ি ফিরত সে। কিন্তু সেসব দিন আর নেই। ঢাক বাজানোর জন্য যতীনের আর ডাক পড়ে না। তাই সে খুঁজে খুঁজে বেত বন আবিষ্কার করে সেখান থেকে বেত সংগ্রহ করে মোড়াই তৈরি করে। তারপর ঘাড়ে করে সে সব মোড়াই বিক্রি করতে বেরিয়ে পড়ে। যতীন শুনেছে গড়িয়ার হাটে গেলে বিক্রি হতে পারে। একদিন ও যাবে ঠিক করেছে।

পুরুষেরা যেমন বেঁচে থাকার প্রয়োজনে যে কোনও পেশাকে গ্রহণ করেছে তেমনি মহিলারাও

তাদের অন্তপুর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে অফিসে, কারখানায় কিংবা খেত-খামারে কাজ করেছে। উপন্যাসে মহীকান্তর ভাই নিশিকান্তর মৃত্যুর পর সন্তানদের নিয়ে যখন তার স্ত্রী স্নেহলতা দিশেহারা তখন অমূল্য যাদবপুরের বেঙ্গল ল্যাম্পে চাকরির প্রস্তাব দেয়। পুরুষের পাশে গিয়ে স্নেহলতাকে চাকরি করতে হবে শুনে তিনি সংকোচবোধ করেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে চাকরি তিনি গ্রহণও করেন। কাজে যোগ দিতে গিয়ে দেখেন অনেক মহিলাই কাজ করছে সেখানে। তার বেশিরভাগই ওপার বাংলার ছিন্নমূল মানুষ। সংসারের প্রয়োজনে ঘরের বাইরে বেরিয়ে উপার্জনের ফলে নারীর নিজস্ব সত্তা তৈরি হয়। তার মতামতের ও গুরুত্ব পায়। আলোচ্য উপন্যাসে দেখা যায় স্নেহলতা চাকরি করার ফলেই ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভাসুর মহীকান্তর উপরে নির্ভর করতে হয়নি; বরং তার বড় জা, মহীকান্তর স্ত্রী কমলা জামা-কাপড় দিতে এলে সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। নিজের রোজগারে সংসার চালিয়ে ছেলেমেয়েদের মানুষ করছে দেখে কলোনির অন্য সকলের কাছে স্নেহর নিজস্ব ভাবমূর্তি তৈরি হয়।

আলোচ্য উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবনের ধরন-ধারণের আরও কয়েকটি বিষয় লক্ষিত হয়। পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষের মধ্যে চায়ের প্রচলন ছিল না, এদেশে এসে এই সহজলভ্য পানীয়তে উদ্বাস্তুরা অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। মহীকান্তের কলেজ পড়ুয়া ছেলে গগনকে তার বন্ধু সুবিনয় চা খাওয়ার প্রস্তাব দিলে প্রথমে বলেছিলেন সে চা খায় না। কারণ ‘ছোটোদের চা খাওনের চল নাই বাড়িতে’। কিন্তু এই গগনই ক্রমে সুবিনয়দের সঙ্গে কলেজ ক্যান্টিনে চায়ের কাপ সামনে নিয়ে আড্ডা দেয়, কফি হাউসে আড্ডা দিতে যায় বন্ধুদের নিয়ে।

দেশত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে উদ্বাস্তুরা যেমন পূর্ববঙ্গে ফেলে এসেছে নানা সামাজিক রীতিনীতি তেমনি এখানে এসে নতুন সমাজরীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। পূর্ববঙ্গের যে কোনও সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন বিয়ে, শ্রাদ্ধ কিংবা পুজো-পার্বণে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীরা গৃহকর্তার কাছ থেকে পেত উষ্ণ অভ্যর্থনা। সেখানে আয়োজন হয়ত বৃহৎ ছিল না। কিন্তু আন্তরিকতায় অনুষ্ঠানের সমস্ত ঘাটতি পূরণ হয়ে যেত। এদেশে আসার পর উদ্বাস্তুরা যখন থেকে খানিকটা স্থিতিশীল জীবন-যাপন করতে শুরু করল তখন থেকে সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানে বাহ্যিক আড়ম্বর বাড়ল বটে, কিন্তু আন্তরিকতা কমতে শুরু করল। মহীকান্তর বোন-ভগ্নিপতি গৌরী ও ললিত তাদের মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন করতে এসে বিয়ের কার্ড ধরিয়ে দিয়েছে। মহীকান্তর স্ত্রী ‘কমলা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিলেন কার্ডটা। বিয়েয় যে কার্ড করতে হয় এই ব্যাপারটা এই প্রথম জানল কমলা। আগে কখনও

দেখেনি।'[৫২] নতুন রীতিনীতি, নতুন সামাজিক প্রথার সঙ্গে উদ্বাস্তুরা ক্রমে যুক্ত হতে থাকে। ফলে সামাজিক পরিবেশের বদল ঘটে দ্রুত।

উদ্বাস্তুরা এদেশে আসার পরে পশ্চিমবঙ্গীয়রা তাদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক এড়িয়ে চলতেন। বৈবাহিক সম্পর্ক তো দূরের কথা যে কোনও আচার-অনুষ্ঠানে প্রতিবেশী উদ্বাস্তুকে নিমন্ত্রণ করতেন না। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার ঘটি-বাঙালের প্রণয়কলহ সমাজে এখনও বর্তমান। উপন্যাসে মহীকান্তর ছেলে গগনের সঙ্গে তার কলেজের বন্ধু সুবিনয়ের মাসতুতো বোন রেণুর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গগন যথেষ্ট মেধাবী ও যোগ্য। কিন্তু সুবিনয়ের বাবা বরেণ ব্যানার্জী একজন রিফিউজির সঙ্গে তার পরিবারের আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠবে এটা কিছুতেই মানতে পারছিলেননা। কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনিও মানতে বাধ্য হন। দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ-পশ্চিমবঙ্গীয়দের মধ্যে যে মানসিক ও সামাজিক দূরত্ব ছিল। পাশাপাশি বাস করতে করতে, কর্মসূত্রে এবং বৈবাহিক কারণে ঘুচতে শুরু করে।

উদ্বাস্তুরা এদেশে আসার পর পরিস্থিতির চাপে তাদের জীবনের রূপান্তর ঘটেছে দ্রুত। বাংলা উপন্যাসে এই বদলে যাওয়ার কাহিনি নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিবৃত হয়েছে। উভয়বঙ্গে দীর্ঘ দিনের ব্রাহ্মণ শূদ্রের ভেদরেখা মুছে গিয়ে নতুন ভাবে সমাজ গঠনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'মানচিত্র বদলে যায়' 'পরতাল', 'চতুষ্পাঠী', 'উজানতলীর উপকথা' প্রভৃতি উপন্যাসে। 'মানচিত্র বদলে যায়' উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই নবেন্দু জমিদার পরিবারের এবং ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান, সে নিচুজাতের মেয়ে বেবিকে ভালোবাসে। নবেন্দুর পরিবারের প্রবল আপত্তি থাকলেও এই সম্পর্ককে শেষপর্যন্ত মানতে হয় তার পরিবারকে। 'পরতাল' উপন্যাসে বাণীকণ্ঠ নমোপাড়ায় এসে ঘর বাঁধে। সেখানেই সে মুদি দোকন করে। শূদ্ররাই তার খরিদ্দার। শূদ্রদের দয়াতেই সে বেঁচে আছে একথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছে। অথচ দেশভাগ পূর্ববর্তী সময়ে শূদ্র-ব্রাহ্মণের একই সঙ্গে চলাফেরা, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে যোগদান ছিল প্রায় নিষিদ্ধ। দেশভাগ পরবর্তী সময়ে পারস্পরিক প্রয়োজনে একে অপরের কাছে এসেছিল; তারই নিদর্শন পাই আলোচ্য উপন্যাসগুলিতে। আবার 'উজানতলীর উপকথা' উপন্যাসে নিম্নবর্ণের এক কৃষক নিমাই মণ্ডল, শিয়ালদহ স্টেশন হয়ে নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে শেষপর্যন্ত কাঁচড়াপাড়ার কাছাকাছি একটি মন্দিরের সেবায়েতের কাজ গ্রহণ করে। নিজের কাজের ক্ষেত্র তৈরি করতে নাম ও পদবী পাল্টে হয়ে যায় নির্মল মুখোপাধ্যায়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এ ধরনের ঘটনা উদ্বাস্তু জীবনে যথেচ্ছ ঘটেছে। 'চতুষ্পাঠী' উপন্যাসে টোলের নিষ্ঠাবান পণ্ডিত অনঙ্গমোহনের নাতি বিলুর উপবীত ধারনের দিনে শূদ্রের আগমন ঘটেছে বাড়িতে। বিলুর মায়ের

কারখানার সহকর্মী মণ্ডলবাবু কিংবা যশবাবুর মুখ দর্শনও করেছে বিলু। এমন শুভদিনে শূদ্রের আগমনে যজ্ঞের পুরোহিত তারানাথ স্মৃতিতীর্থ ক্ষোভে ফেটে পড়লে অনঙ্গমোহন তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন— জগৎ পরিবর্তনশীল সুতরাং অবস্থার সঙ্গে সকলকেই মানিয়ে নিতে হবে। পাশাপাশি অনঙ্গমোহনের শ্যালক বোবা হরিদাস ছেচল্লিশের নোয়াখালির দাঙ্গায় মুসলমানদের দ্বারা কেটে দেওয়া টিকি নেতাদের দেখিয়ে সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করে। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার পূর্ববঙ্গ থেকে দেশত্যাগের সময় বহু মানুষ তাদের গৃহে প্রতিষ্ঠিত নারায়ণশিলা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন যা পরে ভিক্ষা-উপার্জনের মাধ্যম হয়ে ওঠে।

পূর্ববঙ্গের মানুষ বংশপরম্পরায় যেসব পেশাকে ধারণ করত দেশভাগ পরবর্তী সময়ে ছিন্নমূল মানুষদের পেশার সেই পরম্পরা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। যে যেমন করে পারল সেইভাবে বাঁচার চেষ্টা করল। পেশার এই পরিবর্তনের চিত্র বাংলা উপন্যাসে বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। পেশা বদলের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-কাঠামোর ও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। 'পুব থেকে পশ্চিমে' উপন্যাসে তিলকনগর কলোনির বাসিন্দা জয়দ্রথ পূর্ববঙ্গে লাঠিয়াল ছিলেন। চর দখল, জমি দখল করতে তার ডাক পড়ত। অর্থ উপার্জনের সঙ্গে সঙ্গে তার সামাজিক সম্মান ও ছিল। কিন্তু সে সব ছেড়ে এসে এখন ঘরামির পেশাকে গ্রহণ করেছে। হরিভূষণ ছিলেন নৌকোর মাঝি। তিনিও ঘর বাঁধার কাজে নিযুক্ত। 'পরতাল' উপন্যাসে সুরেশ দাস ছিলেন সাত পুরুষের চাষি, এখানে আসার পর ভূমিহীন হয়ে তাকে পাটকলে শ্রমিকের কাজ নিতে হয়েছে। বনবিহারি ছিলেন খুলনা কোর্টের উকিল, এখানে এসে ওকালতি ছেড়ে তিনি বাড়িতে গরুর খাটাল খুলে দুধের ব্যবসা শুরু করেন। 'চতুষ্পাঠী' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র অনঙ্গমোহন, সংস্কৃত পণ্ডিত হিসেবে পূর্ববঙ্গে যার বিশেষ খ্যাতি ছিল, তিনি এখানে এসে টোল খুলে বিশেষ সুবিধা করতে পারেন না। শেষ পর্যন্ত কাগজের ঠোঙা বানিয়ে দোকানে দোকানে বিক্রি করবার জন্য বেরিয়ে পড়েন। আবার মহালয়ার দিনে গঙ্গার ঘাটের পাশে কিশোর বিলুর সঙ্গে চায়ের দোকান দেন। 'মানচিত্র বদলে যায়' উপন্যাসে ঢাকি যতীন বাঘাযতীন কলোনির ঝোপ-জঙ্গল থেকে বেত সংগ্রহ করে মোড়া বানিয়ে বাড়িতে বাড়িতে ফেরি করে বেড়ায়। 'উচ্ছিন্ন পরবাস' উপন্যাসে চোলাই মদের কারখানার কর্মচারী রতন ভাড়ায় জেল খেটে বেড়ায়। চোলাই এর কারখানায় পুলিশ মাঝে মাঝে লোক দেখানো হানা দেয়। প্রতিবারই মালিক রতনকে এগিয়ে দেয়। পুলিশ রতনের কোমরে দড়ি দিয়ে থানায় নিয়ে যায়। মানুষের পেশাগত পরিবর্তন এবং বিচিত্র ধরনের পেশাকে গ্রহণ এর মাধ্যমে উদ্বাস্তু জীবনের রূপের বদল ঘটেছে দ্রুত।

জীবনের নানা ক্ষেত্রে বদলের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বদল ছিল বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'পূব থেকে পশ্চিমে' উপন্যাসে জবরদখল কলোনির অধিবাসীদের নতুন প্রজন্ম কলকাতার ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু বয়স্করা তাদের ভাষায় আঞ্চলিকতা ত্যাগ করতে পারেন না। 'মানচিত্র বদলে যায়' উপন্যাসে নিশিকান্ত গুপ্তর ছেলে রণদের স্কুলের নতুন মাস্টার মশায় তিমির বাবু উদ্বাস্তু ছেলে মেয়েদের চলতি গদ্যে কথা বলতে শেখান; তাদের উচ্চারণগত ত্রুটি বারেবারে ধরিয়ে দিয়ে সুন্দরভাবে কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করেন।

উদ্বাস্তুদের সামাজিক রীতিনীতিগত পরিবর্তনের দিকগুলিও ঔপন্যাসিকরা তুলে ধরেছেন নিবিড়ভাবে। 'পরতাল' উপন্যাসে নিমাই সাপুড়ে ক্লান্তি ঘুচাতে চা পানে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। 'মহানগর' উপন্যাসে আরতি চাকরির প্রয়োজনে সংসারের অন্য সকলের আগেই খেতে বসেছে, পরিপাটি করে সেজে গুজে অফিসে বেরিয়েছে। সীমিত আয়ে সংসারকে পরিপাটি করে রাখতে সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনগুলিতে নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা করেছে, অল্প কয়লায় রান্নার ব্যবস্থা করেছে। আবার খরচ বাঁচাতে জামাকাপড় ধোপার বাড়িতে না দিয়ে বাড়িতেই কাচার ব্যবস্থা করেছে। 'মানচিত্র বদলে যায়' উপন্যাসে মহীকান্ত গুপ্তর বোন-ভগ্নীপতি গৌরী ও ললিত তাদের মেয়ের বিয়েতে কার্ড দিয়ে নিমন্ত্রণ করলে মহীকান্ত এবং তার স্ত্রী কমলা বিস্মিত হয়েছেন।

শিক্ষার প্রতি প্রবল আগ্রহ লক্ষিত হয়েছে উপন্যাসের মধ্যে। পরবর্তীকালে এই শিক্ষাই উদ্বাস্তু জীবনের ধারাকে বদলে দিয়েছে। 'পুব থেকে পশ্চিমে' উপন্যাসে বিধবা উমার প্রথম বিভাগে মাধ্যমিক পাশ করা এবং পরবর্তীকালে ডাক্তারি পড়ার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক সমাজ বদলের ইঙ্গিত দিয়েছেন। 'পরতাল' উপন্যাসে নিম্নবর্ণের ছেলে রোহন দাস মাধ্যমিক পরীক্ষায় জেলার মধ্যে প্রথম হয়েছে। উচ্চবর্ণের লোকেরাও তাই নমোপাড়াকে অবহেলা করতে পারে না। তাকে অনুসরণ করে এই পাড়ার অন্য ছেলে মেয়েরাও পড়াশোনার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। 'কেয়াপাতার নৌকো' উপন্যাসে অশিক্ষিত যুগল পড়াশোনার গুরুত্ব বুঝে কলোনিতে বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করে। তার জন্য বিনয়কে দিয়ে রাজদিয়া স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক আশু দত্তকে শিক্ষক হবার অনুরোধ জানায়। এই উপন্যাসেই দেখা যায় উদ্বাস্তু কিশোরী আরতি পাল ফুটপাতে দোকানদারির অবসরে বই নিয়ে ক্লাসের পড়া তৈরি করে। 'চতুষ্পাঠী' উপন্যাসে বিলুর লেখাপড়ার খরচ চালাতে তার মা অঞ্জলি অন্যের বাড়িতে বাসন মাজার কাজ করতে শুরু করে।

নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, দিন-রাত পরিশ্রম করে উপার্জন, কোনও কাজকেই অবহেলা না করে তাকে সহজভাবে গ্রহণ করা এবং অনেকক্ষেত্রেই অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া কিংবা নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে উদ্বাস্তুরা তাদের জীবনের ধারাকে বদলাতে চেয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, *প্রান্তিক মানব*, প্রতিক্ষণ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ২০

২. রমেশচন্দ্র সেন, *পুব থেকে পশ্চিমে*, ভারতী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০০-১০১

৩. অক্ষয়কুমার বালা, *বাংলার লাঠিয়ালেরা*, জ্ঞানবিকাশ, প্রথম প্রকাশ, ফরিদপুর, বাংলাদেশ, ১৯৭৮, পৃ. ৩৪

৪. রমেশচন্দ্র সেন, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৮৫

৫. তাপস ভট্টাচার্য, *বাংলা উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবন*, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৪১১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২২

৬. রমেশচন্দ্র সেন, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৪৪

৭. নন্দদুলাল মহান্ত, *মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ*, অন্নপূর্ণা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৩২৪

৮. রমেশচন্দ্র সেন, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৪৪

৯. প্রফুল্ল রায়, *শতধারায় বয়ে যায়*, করুণা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১১

১০. প্রফুল্ল রায়, ‘পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১২১

১১. প্রফুল্ল রায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১২১

১২. সাক্ষাৎকার : হোসেনুর রহমান (ঐতিহাসিক)
সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ১৬ জুন, ২০১৪, পার্কসার্কাস, কলকাতা

১৩. প্রফুল্ল রায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৭৫

১৪. অশ্রুকুমার সিকদার, *ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য*, দে’জ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৬৩

১৫. প্রফুল্ল রায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৭২-৭৩

১৬. উত্তম বিশ্বাস, ‘নিম্নবর্গ’, দলিত, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৪৮

১৭. মহীতোষ বিশ্বাস, *পরতাল*, একবিংশ প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৩০৩

১৮. মহীতোষ বিশ্বাস, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৩২৪

১৯. অশ্রুকুমার সিকদার,পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৬১

২০. Joya Chatterji, 'Bengal Divide, Cambridge University Press, 1st ed. New Delhi, 1995, p. 191

২১. মহীতোষ বিশ্বাস, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৩১৮

২২. মহীতোষ বিশ্বাস, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৩৫৭

২৩. মহীতোষ বিশ্বাস, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৩১১

২৪. স্বপ্নময় চক্রবর্তী, *চতুষ্পাঠী*, দে'জ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৮

২৫. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, *ইতিহাসের দিকে ফিরে ছেচল্লিশের দাঙ্গা*, র‍্যাডিক্যাল, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৬১

২৬. স্বপ্নময় চক্রবর্তী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১০

২৭. স্বপ্নময় চক্রবর্তী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৫

২৮. স্বপ্নময় চক্রবর্তী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৬

২৯. স্বপ্নময় চক্রবর্তী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১১৬

৩০. স্বপ্নময় চক্রবর্তী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১১৮

৩১. প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, *প্রান্তিক মানব*, প্রতিক্ষণ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ১৮

৩২. স্বপ্নময় চক্রবর্তী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৬০

৩৩. নরেন্দ্রনাথ মিত্র, *মহানগর*, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাস সমগ্র, আনন্দ, ১ম সমগ্র, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৬৭০

৩৪. নরেন্দ্রনাথ মিত্র, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৬৯১

৩৫. জাগরী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মেয়েলি জীবনে ভাগাভাগির পরের যুগ', সেমন্তী ঘোষ (সম্পা.), *দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা*, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১০৫

৩৬. স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়, *কথাসাহিত্যে নরেন্দ্রনাথ মিত্র*, স্টুডেন্ট লাইব্রেরী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৬২, পৃ. ১৪২

৩৭. কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর, *উজানতলীর উপকথা*, ১য় পর্ব, নিখিল ভারত, ১ম সং, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১২৩

৩৮. কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৬২

৩৯. কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১২২

৪০. অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, *মানুষের ঘরবাড়ি*, করুণা, ১ম সং, কল, ২০০১, পৃ. ৯

৪১. অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১০

৪২. অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৯

৪৩. অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৭৩

৪৪. মহীতোষ বিশ্বাস, *উচ্ছিন্ন পরবাস*, গ্রন্থতীর্থ, ১ম সং কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৬৬

৪৫. মহীতোষ বিশ্বাস, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৭৬

৪৬. শচীন দাশ, *মানচিত্র বদলে যায়*, দে'জ প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ২৪

৪৭. শচীন দাশ, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৬২

৪৮. শচীন দাশ, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৫০৪

৪৯. অশ্রুকুমার সিকদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৬১

৫০. শচীন দাশ, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৩৩৬

৫১. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *অর্ধেক জীবন*, আনন্দ, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৪৬

৫২. শচীন দাশ, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৪০৪

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা উপন্যাসে ছিন্নমূল মানুষের লড়াই–আন্দোলন

পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গে আসার পর চরম দুরবস্থার মধ্য দিয়ে দিনযাপন করতে থাকে। এদের অধিকাংশই ছিল সহায়-সম্বলহীন। তাই প্রাথমিক প্রয়োজন দাঁড়ায়—.

i) উদরের সংস্থান;

ii) মাথাগোঁজার ঠাঁই।

উপরোক্ত দুই ক্ষেত্রেই মানুষের প্রয়োজনের তুলনায় আয়োজন ছিল নগণ্য। ফলে বাঁচার তাগিদে উদ্বাস্তুদের মধ্যে যেমন বিবাদ বিসংবাদ ঘটে চলে অহরহ, তেমনি অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে কখনও সরকারের বিরুদ্ধে, কখনও জমির মালিকের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ লড়াই আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে জবরদখল কলোনিগুলি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সরকার উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠুভাবে পুনর্বাসন না দিতে পারার ফলে অসংখ্য শরণার্থী নিজেরা সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়। শুধু অকৃষিজীবী মধ্যবিত্তরাই নয়, কৃষিজীবীগণও এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। তারা বাস্তুজমি দখলের সঙ্গে সঙ্গে চাষের জমিও দখল করেছে। এইসব জবরদখলকারীগণই পুনর্বাসন সংগ্রামে প্রধান শক্তি জুগিয়েছে। পাশাপাশি সরকারি পুনর্বাসন সংগ্রামে যুক্ত হয়েছে সংশ্লিষ্ট ক্যাম্প-কলোনির বাসিন্দারা।

পঞ্চাশের দশকের একেবারে গোড়ার দিকে দেখা যেত সুদূর পল্লী অঞ্চলের সরকারি পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে দলে দলে উদ্বাস্তুরা ছুটে আসছে কলকাতা শহরে। তারা মিছিল করছে, পুনর্বাসন দপ্তরের ওক্‌ল্যাণ্ড হাউসের সামনে ভিড় করছে, ঘেরাও করছে অফিসার ও কমিশনারকে। কখনও কখনও অফিসের সামনে দিনের পর দিন অনশন সত্যাগ্রহ চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের অনেক জেলা, মহকুমা অথবা ব্লক অফিসে গণ সত্যাগ্রহ চলেছে। জেল ভরো আন্দোলনে দলে দলে সত্যাগ্রহী উদ্বাস্তুরা কারাবরণ করেছে। ট্রেন বন্ধ করা, রাজপথ অবরোধ করা সে সময়ে নিত্যকার ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছিল[১]। তাদের এই ক্ষেত্রে বিক্ষোভের সংগত কারণগুলি ছিল নিম্নরূপ—

১. সরকারের পরিকল্পনাগুলি বাস্তবসম্মত ছিল না;

২. নিতান্ত অনিচ্ছা ও দায়সারা গোছের পরিকল্পনা, যা উদ্বাস্তুদের প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম ছিল;

৩. পেশা ও শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়নি;

৪. ঋণের টাকা অনেকগুলি কিস্তিতে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, এই টাকা পেতে হয়রানির অন্ত থাকত না;

৫. উদ্বাস্তুরা যে ক্যাশ-ডোলের উপর নির্ভরশীল ছিল, তা তাদের পক্ষে ছিল অপ্রতুল;

৬. সময়মত ক্যাশ ডোল পাওয়া যেত না;

৭. পুনর্বাসন দপ্তরের একশ্রেণির অসাধু কর্মচারীর প্রতারণার শিকার হয়েছে দিনের পর দিন ধরে;

৮. পশ্চিমবঙ্গের বাইরে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া;

৯. অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মানবেতর অবস্থায় জীবন যাপন করতে হয়;

১০. চাল-ডাল-পোশাক-আশাক যা উদ্বাস্তুদের দেওয়া হত তা ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের;

১১. চিকিৎসা পরিষেবা না পাওয়ার ফলে ব্যাপকহারে শিশু মৃত্যু হওয়া;

১২. এক সময়ে পুনর্বাসন ক্যাম্পগুলি বন্ধ করার পরিকল্পনা।

পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের ঢালাও সাহায্য ও পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত করে সরকার। পাশাপাশি পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের চরম উদাসীনতা জনমানসে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার করে, এর ফলে তারা আন্দোলনমুখী হয়ে ওঠে। সরকারি আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের আন্দোলন-সংগ্রামকে মোটা দাগে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে—.

i) উদ্বাস্তুদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা কেন্দ্রিক সংগ্রাম;

ii) স্থায়ী পুনর্বাসন এবং দীর্ঘমেয়াদী সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত আন্দোলন;

iii) জীবিকা ও কর্ম সংস্থানের দাবি।

এরফলে একদিকে সরকার, অন্যদিকে জমির মালিকদের সঙ্গে উদ্বাস্তুদের প্রতিনিয়ত লড়াই-সংগ্রাম চলতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের সিংহভাগ জমি ছিল রাজা, মহারাজা, জমিদার, জোতদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দখলে। সরকারের পুনর্বাসনের ইচ্ছে থাকলেও জমি ছিল দুষ্প্রাপ্য। জমিদারি প্রথা সমূলে উচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত সরকারের হাতে পর্যাপ্ত জমি আসার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। সরকারে যারা বসে ছিলেন তারা মূলত জমিদার-জোতদারদেরই প্রতিনিধি। ফলে উদ্বাস্তু আগমন বন্ধ করার দিকে তাদের বিশেষ নজর দেওয়া ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। বিশাল জনসমষ্টির আকস্মিক উপস্থিতির ফলে বেকার সমস্যা বাড়বে এবং রাজ্যের অর্থনীতির উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি হবে। সে কারণে সরকার উদ্বাস্তুদের প্রতি প্রসন্ন ছিল না। এই সংকটকালীন অবস্থায় দ্রুত শিল্পায়নের ব্যবস্থা করে কর্মসংস্থান ঘটানো সম্ভব ছিল। কিন্তু শিল্পায়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা জমিদারি প্রথা। এই কারণে শরণার্থীদের

জন্য ‘দুরকম অপসন’ নীতি গৃহীত হয়। ক্রমে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সংগ্রাম রাজনৈতিক সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়[২]।

জমিদারদের পতিত জমি উদ্বাস্তুরা দখল করে বসবাস করতে শুরু করলে মালিকপক্ষ প্রথমে ভাড়াটে গুণ্ডাদের দিয়ে দখল আটকানোর চেষ্টা করে। কিন্তু উদ্বাস্তুদের সংঘবদ্ধ সংগ্রাম ও প্রতিরোধের ফলে সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরপরে পুলিশ প্রশাসনকে উচ্ছেদের কাজে লাগানো হয়, কিন্তু সেখানেও মালিকপক্ষ হার মানে। এক্ষেত্রে ইউ.সি.আর.সি এবং আর.সি.আর সি.য়ের মত উদ্বাস্তু সংগঠন বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য প্রথম দিকে উদ্বাস্তু ক্যাম্প-কলোনিতে কংগ্রেসের প্রভাব ছিল একচেটিয়া। কেন্দ্রে ও রাজ্যে তখন কংগ্রেসের শাসন বর্তমান। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের প্রতি সরকারের বঞ্চনার ফলে উদ্বাস্তুরা ক্রমে কংগ্রেস ত্যাগ করে বামপন্থীদের দিকে ঝুঁকতে শুরু করে, সেই সঙ্গে উদ্বাস্তু সংগঠনগুলি বামপন্থীদের নিয়ন্ত্রণে আসে। পরবর্তীকালে তাদের নেতৃত্বে উদ্বাস্তু আন্দোলন পরিচালিত হতে শুরু করে।

উদ্বাস্তু জীবনকেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাসে দেশান্তরী মানুষের লড়াই সংগ্রামের কাহিনি নানাভাবে বিবৃত হয়েছে। ছিন্নমূল মানুষ বাঁচার তাগিদে লড়ে নেবার যে প্রক্রিয়া শুরু করল তা কখনও ঔপন্যাসিকের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় কখনও কাল্পনিক চরিত্রকে সামনে রেখে বিবৃত হয়েছে। গবেষণার এই অংশে আমরা উপন্যাসগুলির অন্য অংশ যথাসম্ভব বর্জন করে লড়াই-আন্দোলনের প্রতিফলনটুকুকে অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করব।

মনোরঞ্জন ব্যাপারীর ‘চণ্ডালজীবন’ উপন্যাসে জীবন নামক নিম্নবর্গের এক মানুষের কথা পাই। জীবনের মধ্য দিয়ে নমঃশূদ্র চণ্ডাল গোষ্ঠীর জীবন-যাপনের যন্ত্রণার কথা উঠে এসেছে। দেশভাগ ক্যাম্প জীবন, উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্য পাঠাবার উদ্যোগ, উদ্বাস্তুদের নিয়ে বামপন্থীদের রাজনীতি এসব স্থান পেয়েছে উপন্যাসে। পাশাপাশি পূর্ববঙ্গের বরিশালের হতদরিদ্র গরিব দাস এবং আরও অনেক নিম্নবর্গীয় পরিবারের জীবনযাপনের ছবি উঠে এসেছে। বাঁচার তাগিদে তাদের সম্মিলিত প্রতিবাদ প্রতিরোধ এবং শেষপর্যন্ত পরাজয়কে মেনে নেওয়ার কাহিনি ব্যক্ত হয়েছে।

পঞ্চাশ পরবর্তী অস্থির পরিবেশে গরিব দাস তার পরিবারসহ নানা বিপর্যয় অতিক্রম করে শিয়ালদহ স্টেশনে আসে।সেখান থেকে তাকে সরকারি উদোগে ট্রাকে করে এনে তোলা হয় বাঁকুড়া জেলার প্রধান শহর বিষ্ণুপুর থেকে আট মাইল দূরে এক নির্জন প্রান্তরে। এর নাম শিরোমণিপুর ক্যাম্প।

গাছপালাহীন এই মাঠের মধ্যে সারি সারি তাঁবু, তারই মধ্যে প্রতিনিয়ত ভিড় জমতে থাকে উদ্বাস্তুদের। পর্যাপ্ত খাদ্য, আলো-বাতাস পয়ঃপ্রণালীহীন এই ক্যাম্পজীবনে ক্রমে তারা অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। ডোল নির্ভর জীবনযাপনে মানুষগুলি ক্রমে অলস ও শ্রমবিমুখ হয়ে পড়ছে এই বিবেচনায় সরকারের পক্ষ থেকে তাদের জানিয়ে দেওয়া হয় এবার তোমাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে— সবাইকে যেতে হবে দণ্ডকারণ্যে। শিরোমণিপুর ক্যাম্পের অফিস ঘরের দেওয়ালে নোটিশ টানিয়ে দেওয়া হল— দণ্ডকারণ্য নামাঙ্কিত প্রকল্পে যারা পুনর্বাসন নিতে ইচ্ছুক তারা নাম নথিভুক্ত করান।

কিন্তু ইতিমধ্যে ক্যাম্পবাসীদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে ভর্তি হয়েছে। গরিব দাসের বংশে যা কেউ কোনও দিন করতে পারেনি সেই কঠিন কাজটি করে বসে তার ছেলে জীবন। হাতে খড়ি হয় তার— লিখে ফেলে ব্যঞ্জনবর্ণের প্রথম অক্ষর— 'ক'। এখানে গরিব দাসের পরিবার ন্যূনতমভাবে বেঁচে থাকার একটি নিশ্চিন্ত আশ্রয় পেয়েছিল কিন্তু সরকার অল্প সময়ের মধ্যে স্থায়ী পুনর্বাসনের নামে এই ক্যাম্প বন্ধ করে দেয়।

চরম দুরবস্থার মধ্যে থাকতে থাকতে কিছু লোকের হাঁপ ধরে গিয়েছিল। তারা সরকারের ডাকে সাড়া দেয়। প্রথমবার শ পাঁচেক পরিবার দণ্ডকারণ্য চলে যায় ক্যাম্প ছেড়ে। দ্বিতীয়বার গেল শ খানেক। তৃতীয় খেপ নিতে এসে খালি ট্রাক ফিরে গেল। এরপর আবার নোটিশ দেওয়া হল নির্দিষ্ট সময় সীমা বেঁধে। গরিব দাস ছুটে যায় ক্যাম্পের লেখাপড়া জানা মানুষ খগেন মণ্ডলের কাছে। রাজ্য রাজনীতির খবর তিনি রাখেন। প্রতিনিয়ত বিষ্ণুপুর থেকে খবরের কাগজ এনে সবাইকে পড়ে শোনান, বলা কথার মধ্যে অনেক না বলা কথা টেনে বের করেন খগেনবাবু। ক্যাম্পে থেকে যাওয়া উদ্বাস্তুরা দণ্ডকারণ্যে যাবার বিষয়ে মতামত চাইলে খগেন মণ্ডল বলেন— 'এইডা কোনো পুনর্বাসনই না। এইডা পুঃনির্বাসন।...আমরা যামু বাংলার বাইরে? কখনো যামু না। আন্দোলন কইরা এই বাংলায় পুনর্বাসন নিমু।'[৩]

দণ্ডকারণ্যে যেতে না চাওয়ার অপরাধে রিফিউজিদের ডোল বন্ধ হয়ে গেছে দুমাস। সরকারি গুদাম থেকে শেষবারের মত যে চাল ডাল ডোল বাবদ দেওয়া হয়েছিল, পনেরো দিনের সেই বরাদ্দে বিশ বাইশ দিন, কেউ কেউ টেনে টুনে এক মাস পর্যন্ত চালিয়ে নিয়েছিল। তারপর শুরু হয় অনাহার। অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে থাকে অসংখ্য মানুষ। মারাও যায় বহু লোক। খিদের জ্বালায় পাগল হয়ে মানুষ ছোটে চারিদিকে। কিন্তু চারদিক জনমানব শূন্য এক জঙ্গল ঘেরা জায়গায়

কোথায় পাবে হাজার হাজার মানুষের পেট ভরার মত এত খাদ্য। এই চরম সংকটের মুহূর্তে ক্যাম্পের একজন রিফিউজি গরিব দাসকে এসে খবর দেয়— 'আমাগো কোনো ভয় নাই। আমরা বাঁচুম। এইবার রিফুজি গো বেবাকের একটা ব্যবস্থা হইব। মোরা বাংলাতেই পুনর্বাসন পামু।'[৪]

কমিউনিস্ট নেতা প্রহ্লাদ চক্রবর্তী কলকাতা থেকে শিরোমণিপুর ক্যাম্পে আসেন উদ্বাস্তুদের সংঘবদ্ধ করার জন্য। তিনি স্বপ্নের ফেরিওয়ালার মত সম্মোহনী বক্তৃতা করেন। এরপর থেকেই মৃতপ্রায় মানুষগুলোর প্রাণে নতুন আশার সঞ্চার হয়। কয়েকদিন পর কলকাতা থেকে প্রহ্লাদ চক্রবর্তীর নির্দেশ আসে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার। মিটিং মিছিল শ্লোগানে উত্তাল হয়ে ওঠে ক্যাম্প। যেখানে ক্যাম্পের অফিসঘর ছিল সেখানে আমরণ অনশনে বসল কয়েকজন। কিন্তু শালবনের প্রাচীর পার হয়ে সে খবর আমলা কর্তাব্যক্তিদের কান পর্যন্ত পৌঁছাল না। অনশন বাইশ দিন অতিক্রান্ত হবার পর সবাই মিলে ঠিক করল সরকার যখন তাদের কাছে এল না, তখন তারা সবাই মিলে যাবে বিষ্ণুপুর শহরে।

শিরোমণিপুর থেকে মাইল কয়েক দূরে আরও তিনটি ক্যাম্পের নাম উল্লিখিত হয়েছে উপন্যাসে— বাসুদেবপুর একনম্বর, দুই নম্বর ও তিন নম্বর রিফিউজি ক্যাম্প। সে ক্যাম্পেও হাজার হাজার দণ্ডকারণ্যে না যেতে চাওয়ার অপরাধে ডোল বন্ধ রিফিউজিদের বাস। আলাপ আলোচনার পর ক্যাম্পগুলি থেকে সম্মিলিতভাবে কয়েক হাজার মানুষ মিছিল করে শ্লোগান দিতে দিতে প্লাকার্ড নিয়ে রওনা দেয় বিষ্ণুপুর শহরের দিকে। উদ্দেশ্য সরকারি কার্যালয় ঘেরাও করা। বাসুদেবপুর ক্যাম্পের সামনে থেকে পাকা রাস্তা ধরে দুটি লাইন সমান তালে হেঁটে চলে। দুই লাইনেই মাঝখানে একজন টিনের চোঙ মুখে দিয়ে হাঁকে— 'আমাদের দাবি মানতে হবে। সে থেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মিছিলের লোক সমস্বরে হেঁকে ওঠে— মানতে হবে মানতে হবে।... ইনকিলাব জিন্দাবাদ।'[৫]

বাসুদেবপুর থেকে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত মিছিল এসেছিল বিনা বাধায়। বিষ্ণুপুর ঢোকার মুখে পুলিশের প্রতিরোধে মিছিল থমকে যায়। পুলিশের ব্যারিকেড অতিক্রম করতে গেলে শুরু হয় বেপরোয়া লাঠিচার্জ। লাঠির আঘাতে জনা চল্লিশ আহত হয়; যার মধ্যে ছ'জনের অবস্থা সংকটজনক হয়ে ওঠে। তাদের বিষ্ণুপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গ্রেপ্তার করা হয় দু-শো জনকে। এই দলে পড়ে গেল গরিব দাস। গরিব দাস এবং অন্যান্যদের পুলিশ ভ্যানে তুলে নিয়ে শহর থেকে পঁচিশ-ত্রিশ মাইল দূরে ফাঁকা মাঠে জোর করে নামিয়ে দেয়। খগেন মণ্ডল সহ বেশ কয়েকজন উদ্বাস্তু নেতাকে একমাস জেলে বন্দি করে রাখে। ক্রমে হতাশা নেমে আসে উদ্বাস্তুদের মনে। এরপরে বেশ কয়েকবার কলকাতার

বাবু নেতারা রিফিউজিদের নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করার চেষ্টা করেছিল; মিটিং মিছিল নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে ছিল বিষ্ণুপর শহরে। প্রতিবারই প্রত্যাঘাত এল বিপুল বীভৎসতায়। ফলে কোমর ভেঙে গেল আন্দোলনের। হতাশ নেতারা আর কিছু হওয়ার নয় বলে ফিরে গেল যে যার নিরাপদ স্থানে।[৬] অবশেষে খগেন মণ্ডল সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি ক্যাম্প ছেড়ে চলে যাবেন। যাবার আগে শেষবারের মত সবাইকে ডেকে বললেন— তোমরা যে যেদিকে পার চলে গিয়ে বাঁচার চেষ্টা কর। এভাবেই শিরোমণিপুর ক্যাম্প একদিন জনশূন্য হয়ে যায়। নিম্নবর্গের মানুষদের এই চরম দুরবস্থা দেখে খগেন মণ্ডলের মনে হয়— 'যারা এখন দেশ চালাইতে আছে, মন্ত্রী হইছে, এয়ারা সব উপর জাইতের মানুষ বইলাই আমাগো কষ্টের দিক চোউখ দিতাছে না এয়ারা কোনোদিনই আমাগো মানুষ ভাবে নাই।'[৭]এ প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে শ্রেণি ও বর্ণের যে বিপুল চিড় ফাট, দেশভাগের সংকটে তার অবধারিত ছায়া পড়েছে; নিম্নবর্গের মানুষকে অপরিমেয় বিপন্নতার মুখে পড়তে হয়েছে। আন্দামান ও দণ্ডকারণ্যে এদেরই নির্বাসনে যেতে হয়েছে। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথায় তারা 'ঘুটে কুড়ানির ছানা।' শঙ্খ ঘোষের কথায় তাদের 'পাথর চাপা কপাল।'[৮]

বাঁচার তাগিদে গরিব দাস শিরোমণিপুর ক্যাম্প ত্যাগ করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার ঘোলা অঞ্চলে একটি ক্যাম্পে তার ভাইদের কাছে চলে আসে। ঠিক এই সময়ে ভারত আর চিনের সীমান্ত সংঘর্ষ শেষ হয়েছে। তখন সারা বাংলা জুড়ে জ্বলছিল দুর্ভিক্ষের আগুন। এই পরিস্থিতিতে গরিব দাস হোগলাপাতার মাদুর বুনে সংসার চালাতে চায়, কিন্তু বেঁচে থাকার এই সংগ্রাম তার কাছে কঠিন থেকে কঠিনতর মনে হয়। গরিব দাসের ছেলে জীবন পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুমুঠো অন্নের জন্যে কলকাতা, অসম, উত্তরবঙ্গসহ নানা স্থানে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। সে উপলব্ধি করে 'আমার নাম জীবন জাইত চণ্ডাল।' উপন্যাসের উপান্তে নিঃসম্বল জীবন হোটেলে পেটপুরে খাবার খেয়ে দাম না মিটিয়ে পেছন দিক দিয়ে প্রাণপণে দৌড়োতে থাকে। অন্তহীন দৌড় দেখে লেখকের মনে হয়— 'মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে তার একক যাত্রা। যে যাত্রার শেষ পরিণতি কী তা সে জানে না। শুধু এটুকু জানে তাকে এখন দৌড়াতে হবে। যতক্ষণ দৌড়াতে পারবে ততক্ষণ বাঁচবে।'[৯] গরিব দাসের ছেলে জীবন দাসের এই একক সংগ্রাম সমগ্র নিম্নবর্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

যতীন বালা তাঁর আত্মজীবনীমূলক 'শিকড় ছেঁড়া জীবন' উপন্যাসে ব্যক্তিজীবনের কথাকে সমগ্র নির্যাতিত উদ্বাস্তু সমাজের প্রাণের কথা করে তুলেছেন। যশোর জেলার মণিরামপুর থানার ছিয়ানব্বই অঞ্চলে ছিল লেখকের চোদ্দপুরুষের বাস। ছিয়ানব্বইটি ছোট বড় গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছিল এই

জনপদ। এখানে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর একচেটিয়া বাস। এই জনগোষ্ঠী সাহসী, বীর যোদ্ধা এবং লাঠিয়াল। যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য এদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন বাহান্ন হাজার ঢালী সৈন্যবাহিনী। এই সৈন্যবাহিনী একদা দিল্লির সম্রাট আকবরের সেনাপতি মানসিংহ সহ মুঘল বাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন। এই জনগোষ্ঠীকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু 'বাংলার রাজপুত' আখ্যা দিয়েছিলেন।[১০] দেশভাগের পর সেই দুর্ধর্ষ নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষজনও সন্ত্রস্ত হয়ে দেশত্যাগে বাধ্য হন। লেখক পরিবার ও উদ্বাস্তু স্রোতে গা ভাসিয়ে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন।

শিয়ালদহ স্টেশন থেকে তাদের এনে ফেলা হয় হুগলি জেলার ত্রিবেণী থানার নসরাইল গ্রামের পাশে কুন্তি নদীর পাড়ে। রেল সেতুর জন্য সংরক্ষিত এই পতিত জমিতে উদ্বাস্তুরা মোম লাগানো তাঁবু টাঙিয়ে ঘর তৈরি করে। দুটি শালের খুঁটি, একটি আড়া, দশটি গোঁজ বা খোঁটা এবং একটি মোম লাগানো হলুদ রঙের তাঁবুতে তৈরি হয় প্রতিটি উদ্বাস্তু পরিবারের বাসস্থান।

শিবির সম্পর্কে লেখক বর্ণনা দিয়েছেন— এলাকায় কোনও গাছ নেই, খোলা আকাশের নিচে দুপুরের সূর্যের তাপ যখন খাড়া ভাবে মোম লাগানো তাঁবুর উপর পড়ে, তখন মানুষজন আধ-পোড়া হয়ে ওঠে। প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য শৌচালয়, অপর্যাপ্ত নলকূপ— সব মিলিয়ে প্রবল প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেই শুরু হয় জীবনধারণ। দু'বছর কুন্তি ট্রানজিট ক্যাম্পে থাকার পর সরকারি নির্দেশে পরিবারের সকলকে নিয়ে যেতে হয় ভাণ্ডারহাটি ওয়ার্ক সাইট ক্যাম্পে। ওয়ার্কসাইট ক্যাম্প সম্পর্কে সরকার সে সময়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল— দৈহিক পরিশ্রমের ক্ষমতা রাখে এমন উদ্বাস্তুদের শিবিরে আশ্রয় না দিয়ে সুবিধা মত কর্মকেন্দ্রের কাছে তাবুতে বাস করতে দেওয়া হবে এবং প্রত্যেক যুবককে কাজ দেওয়া হবে। এরকম ব্যবস্থা সে সময়ে ছিল সময়সাধ্য। কারণ তখন পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে— রাস্তাঘাট তৈরি বাঁধ নির্মাণ, খালকাটার কাজ চলছে ব্যাপক হারে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে পুনর্বাসন বিভাগ উদ্বাস্তুদের এই কাজে লাগায়। কর্মকেন্দ্রের নিকটেই তাদের আশ্রয় শিবির স্থাপন করা হত বলে এই শ্রেণির আশ্রয় শিবিরের স্থাননাম দেওয়া হয়েছিল ওয়ার্কসাইট ক্যাম্প। যারা কাজ করত তাদের কাজের অনুপাতে পারিশ্রমিক দেওয়া হত এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের ডোলের ব্যবস্থা ছিল।[১১]

ভাণ্ডারহাটি উদ্বাস্তু শিবিরে মূলত নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, জেলে, মালো, ধোপা, কামার, কুমোর প্রভৃতি নিম্নবর্ণের শ্রমজীবী মানুষের বাস। ভাণ্ডারহাটি ওয়ার্কসাইটে তাদের আনা হয়েছে চাষের জমিতে

সেচের জল আনবার জন্য খাল খনন করতে। খাল কাটা যখন শেষ হল তখন সরকার ঘোষণা করল এখানে আর উদ্বাস্তুদের রাখার দরকার নেই। লরি এসে দাঁড়ালেই তাদের উঠতে হবে এবং অন্য কোনও শিবিরে গিয়ে ফের আশ্রয় নিতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হয় শিবির ত্যাগের জন্যে।

এই সংবাদে উদ্বাস্তুরা শঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং ক্রমে ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করে। পুলিশ প্রশাসন অন্য ক্যাম্পে যেতে অনিচ্ছুক উদ্বাস্তুদের ধরে ধরে লরিতে তোলে এবং বিভিন্ন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়। ভাণ্ডারহাটি ওয়ার্কসাইট ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে নানা ক্যাম্পে পাঠানোর কারণ মূলত দুটি—

i) এখানকার সমস্ত উদ্বাস্তুদের একই ক্যাম্পে স্থান দেওয়ায় অসুবিধা হচ্ছিল;.

ii) সরকারের ধারণা হয়েছিল সকল উদ্বাস্তু একই জায়গায় থাকলে বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠবে।

ভাণ্ডারহাটি ওয়ার্কসাইট ক্যাম্পের উদ্বাস্তুরা সরকারের কাছে নিম্নলিখিত দাবিগুলি উত্থাপন করে—.

i) ভাণ্ডারহাটি শিবিরকেই স্থায়ী পুনর্বাসন কেন্দ্রে পরিণত করা হোক;

ii) যদি এখান থেকে তাদের সরিয়ে দিতেই হয় তবে তাদের সকলকে যেন একই শিবিরে রাখা হয়;

iii) এভাবে দিনের পর দিন অস্থায়ী শিবিরে না রেখে তাদের স্থায়ী পুনর্বাসন দেওয়া হোক।

নানা প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মধ্যেও ভাণ্ডারহাটি ক্যাম্প জনশূন্য হয়ে যায়। লেখকের পরিবারের স্থান হয় বলাগড় ক্যাম্পে, কিছুদিনের মধ্যে এই শিবিরেও নেমে আসে বিপর্যয়। এখানে এসে উদ্বাস্তুরা যখন তাদের জীবনের ছন্দ খুঁজে পেতে শুরু করেছে সেই সময় শিবির কর্তৃপক্ষ আদেশ জারি করলেন— ‘উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য ভারতবর্ষের মধ্যস্থলে অবস্থিত দণ্ডকারণ্যে পাঠানো হবে। যারা বাংলার বাইরে দণ্ডকারণ্যে যাবে না তাদের সরকারি খয়রাতি সাহায্য ডোল বন্ধ করে দেওয়া হবে।’[১২]

বেঁচে থাকার প্রয়োজনে, মাতৃভাষা ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার লক্ষ্যে এবং পশ্চিমবাংলার মধ্যে সুষ্ঠু পুনর্বাসনের জন্য গড়ে ওঠে ‘বলাগড় ক্যাম্প ও উদ্বাস্তু কল্যাণসমিতি’ সমিতির উদ্যোগে মানুষ ক্রমে ক্রমে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। সভা, সম্মেলন, কর্মী প্রশিক্ষণ, আলোচনা সভা ইত্যাদির মধ্য থেকে সর্বসম্মতভাবে দাবি সনদ তৈরি হয়—,.

i) উদ্বাস্তুদের জন্য পর্যাপ্ত সরকারি ডোল চালু রাখতে হবে, যতক্ষণ না উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন হচ্ছে;

ii) পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই বাঙালি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দিতে হবে এবং আশু সে ব্যবস্থার রূপায়ন ঘটাতে হবে;

iii) উদ্বাস্তু শিবিরে বসবাসকারী ছাত্র-ছাত্রীদের বন্ধ হয়ে যাওয়া সরকারি সাহায্য পুনরায় চালু করতে হবে;

iv) এই সকল দাবি যতক্ষণ না সরকার মানছে, ততক্ষণ বলাগড় ক্যাম্প উদ্বাস্তু কল্যাণসমিতির সদস্যগণ অনশন চালিয়ে যাবে এবং মিটিং মিছিল অব্যাহত থাকবে।

অনশন শুরু হয় ধীমান নামক মতুয়া গোঁসাইয়ের নেতৃত্বে। ক্যাম্পের কিছু নারী-পুরুষ মিলে অনশনরতদের পাহারা দেয়। অনশন বেদিতে প্রদীপ জ্বলে, ধুপের গন্ধে চারিদিক মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। শুরু থেকেই অনশনকারীরা মৌনব্রত অবলম্বন করে। বিশেষ প্রয়োজনে তারা মনের কথা লিখে জানায়। সর্বক্ষণ মঞ্চের পাশে চলে বক্তৃতা; শয়ে-শয়ে মানুষ এসে তাদের সাহস দেয়। দিনের পর দিন অনাহারে তারা নির্জীব হয়ে পড়ে, তবু তারা প্রতিজ্ঞায় অটল— যতক্ষণ না সরকার উদ্বাস্তু সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করছে ততক্ষণ এই আন্দোলন চলবে।

হঠাৎ একদিন বলাগড় রেল স্টেশনের পাশে আধা সামরিক বাহিনিতে ঠাসা ট্রেন এসে দাঁড়ায়। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তারা গোটা শিবির ঘিরে ফেলে। চোখের পলকে সুরক্ষাবাহিনীর প্রতিরোধের বেড়া ভেঙে অনশনকারীদের তুলে নিয়ে যায় রেল গাড়ির কামরায়। সবমিলিয়ে প্রায় চারশো উদ্বাস্তুকে জেলে পোরা হয়। এরা সকলেই দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনে যাবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুক্তি পায়। মুক্তির পর পুলিশ পাহারায় তাদের লরিতে তুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয় দণ্ডকারণ্য অভিমুখে। এরফলে বলাগড় ক্যাম্প উদ্বাস্তু কল্যাণ সমিতির সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন, মনোবল সবই হারিয়ে যায়। ঔপন্যাসিকের কথায়— 'এই ভাঙন কেবল বলাগড় উদ্বাস্তু শিবিরেই সীমাবদ্ধ ছিল না— গোটা পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু শিবিরেই চলল। সরকারের অসৎ উদ্দেশ্য নমঃশূদ্র আর দলিত মানুষদের ঐক্য এবং জীবন সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেবার পরিকল্পনায় তারা সফল হল।'[১৩]

হুগলি জেলার ত্রিবেণী থানার কুন্তি ট্রানজিট ক্যাম্প, ধনিয়াখালি থানার ভাণ্ডারহাটি ওয়ার্ক সাইট ক্যাম্প এবং বলাগড় রিফিউজি ক্যাম্প— উপন্যাসে বর্ণিত এই তিনটি ক্যাম্পে উদ্বাস্তুদের অবস্থানকাল প্রায় দশবছর (১৯৫৪-১৯৬৩)। এই একটি দশক লেখকের কাছে নরকের জীবন-যন্ত্রণা

বলে মনে হয়েছে। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক পশ্চিমবঙ্গের নানা ক্যাম্প-কলোনিতে বসবাসরত উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর কথা তুলে ধরেছেন। পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে ১৯৫০-৬০ অবধি পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুদের মধ্যে সিংহভাগই ছিল নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর। তারা বিভিন্ন ক্যাম্পে সংঘবদ্ধ হয়ে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। ততদিনে নমঃশূদ্র নেতা যোগেন মণ্ডল পাকিস্তানের মন্ত্রী পরিষদে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় বসবাস শুরু করেছেন। তার নেতৃত্বে 'পূর্ব ভারত বাস্তুহারা সংসদ' নামে একটি উদ্বাস্তু সংস্থা তৈরি হয়। যোগেন মণ্ডল নিম্নবর্গীয় উদ্বাস্তুদের একত্রিত করে তাদের দণ্ডকারণ্যে পাঠানোর হাত থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেন। উদ্বাস্তু জনতার বিরাট মিছিল কলকাতার রাজপথ অতিক্রম করে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রীর বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। পুলিশ যোগেন মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে, আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে বেধড়ক লাঠি চার্জ করে। শিকড় ছোঁড়া জনতার আর্তনাদ ভেসে বেড়ায় কলকাতার বুকে। উদ্বাস্তু জনতার রক্তে ভেসে যায় কলকাতার রাজপথ। আন্দোলনরত নিম্নবর্গীয়দের দুর্বিষহ জীবনচিত্র দিয়ে শেষ হয়েছে উপন্যাস। এখানে উদ্বাস্তু আন্দোলনের অংশ হয়ে থাকল মূলত দলিত শ্রেণির মানুষ আর এর সঙ্গে সঙ্গেই বাংলায় ক্রমশ উত্থান হতে থাকল দলিত আন্দোলনের।[১৪]

রমেশচন্দ্র সেনের 'পুব থেকে পশ্চিমে' উপন্যাসে ১৯৫০-এর আগে ও ঠিক তার পরে পুব বাংলা থেকে গৃহহারা মানুষদের দলে দলে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসার সময়টিকে ধরা হয়েছে। যে সকল উদ্বাস্তুরা সরকারি ক্যাম্পে আশ্রয় গ্রহণ করেনি, বরং স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার জন্য কলকাতা বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জমি দখল করে বাসস্থান গড়েছে, তাদের কথা নিবিড় ভাবে চিত্রিত হয়েছে উপন্যাসে। এক দিকে জীবিকার জন্য লড়াই, অন্যদিকে জমি দখল করতে গিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের। উপন্যাসে দেখা যায় দেশবিভাগ নিপাট সহজ সরল লোকগুলিকে আত্মসচেতন ও প্রতিবাদী করে তোলে। দেশ ছাড়ার ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা, পুনরায় বাঁচার জন্য নীড়ের সন্ধান ও স্থায়ী আবাস নির্মাণের জন্য প্রাণপণ লড়াই করে অস্তিত্ব রক্ষার দিকটিও এখানে বিবৃত হয়েছে।[১৫]

আলোচ্য উপন্যাসে মূলত দুই ধরনের লড়াই আন্দোলনের কথা উল্লিখিত হয়েছে—.

i) জমিদারের লেঠেল বাহিনির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন;.

ii) সরকারের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন।

পূর্ববঙ্গের শ্রীপুর অঞ্চলের বাসিন্দারা নানা ঘাত-প্রতিঘাত খেয়ে শেষপর্যন্ত এক দালালের হাত ধরে

উপস্থিত হয় দক্ষিণ কলকাতার এক জবরদখল কলোনিতে। এরপর নানা অঞ্চলের আরও বহু উদ্বাস্তু জড় হয়ে এখানে পরিপূর্ণ উদ্বাস্তু উপনিবেশ গড়ে তুলতে চায়। কলোনির নামকরণ করা হয় বালগঙ্গাধর তিলকের নামে— 'তিলক নগর'। জমিদার তার দখল হয়ে যাওয়া জমি উদ্ধার করতে নানা প্রক্রিয়া শুরু করে। কলোনিকে টিকিয়ে রাখার জন্য অধ্যাপক নির্মল সেন, ধ্রুব কবিরাজ, হরিভূষণ, শিবকালী ভট্টাচার্য প্রমুখের নেতৃত্বে শুরু হয় কলোনি রক্ষার সংগ্রাম।

জমির মালিকেরা তাদের জমি থেকে উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদের জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। গবেষণাপত্রের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে ভূস্বামীরা সকলেই প্রায় প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেসের উত্থান পতন অনেকাংশে তাদের উপর নির্ভর করত। তারা বিধানসভায় উচ্ছেদ আইন পাশ করবার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে উদ্বাস্তুরা স্থির করল উচ্ছেদ আইন যাতে পাশ না হয় তার জন্যে তারা প্রাণপণে লড়বে। বিভিন্ন সময়ে উদ্বাস্তুদের এই আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গকে উত্তাল করে তুলেছে। আলোচ্য উপন্যাসে আন্দোলনের ক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণ একটি উল্লেখযোগ্য দিক। বহু কষ্টে যে আশ্রয়টুকু তারা জুটিয়েছে অচিরেই হয়ত তা চলে যাবে তাই ভেবেই সংগ্রামে লিপ্ত হয় মেয়েরা। কলোনি থেকে উমা, নির্মল সেনের মা নিভাননী, ক্ষিতিশ বাবুর বোন, সাগর, গয়েশ্বরী, হরিভূষণের বউ, নিশির বোন সবাই যাবে কলকাতার মিছিলে। লতিকার অসুখ না হলে তার মাও যেত। পূর্ববঙ্গের অন্তঃপুরের এই নারীরা একান্ত বাঁচার তাগিদে লড়াকু হয়ে উঠল।

মিছিলে সকলের আগে চলেছে সর্দার জয়দ্রথ। লম্বা চওড়া বিরাট পুরুষ। মুখে চোঙ লাগিয়ে জয়দ্রথ বলে বাস্তুহারা উচ্ছেদ আইন— পিছনে শত শত কণ্ঠে ধ্বনি ওঠে, চলবে না চলবে না। সব ছাপিয়ে ওঠে শিবকালীর কণ্ঠ। মাথার উপরে গামছা ঘুরিয়ে সে চেঁচায়— চলবে না চলবে না। মিছিল এগিয়ে চলে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয় নানা প্রান্তের মানুষ। মিছিল এসে থামে মনুমেন্টের পাশে। উপন্যাসের নায়ক সেই সভায় বক্তৃতা করে। কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করে সে বলে— 'গভর্নমেন্টের উচিৎ ছিল উপনিবেশগুলিতে উদ্বাস্তুরা যাতে নির্বিবাদে বসবাস করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। তা না করে তারা কিনা আইন করছে বাস্তুহারাদের উৎখাত করার জন্য।'[১৬] কলোনি প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে সেখানে কংগ্রেসের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। কিন্তু উদ্বাস্তুদের নানা বঞ্চনার ফলে কংগ্রেস থেকে উদ্বাস্তুরা মুখ ঘুরিয়ে নিতে শুরু করে। পক্ষান্তরে বামপন্থী সংগঠনগুলি জমিদারি প্রথা সহ এমন সব দাবি সরকারের কাছে উত্থাপন করতে শুরু করে যা উদ্বাস্তু এবং ভূমিহীন মানুষের

মৌলিক দাবি। এরফলে উদ্বাস্তু আন্দোলন সমগ্র পশ্চিমবঙ্গবাসীদের আন্দোলনে পরিণত হয়।'[১৭]

উপন্যাসে আমরা দেখি অভিরাম পুরোনো কংগ্রেস কর্মী। তিনি তিলকনগর কলোনিতে এসে দেখলেন কংগ্রেসের প্রতি আস্থাবান মাত্র দু-চারজন, বাকিরা বামপন্থী। তিনি কলোনিতে কংগ্রেস সদস্য বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। এ বিষয়ে কলোনির নেতা নির্মলের সঙ্গে পরামর্শ করতে এলে নির্মল তাকে জানায়— কংগ্রেসের পলিসি দেশের শিক্ষিত ও চিন্তাশীল লোকদের খুশি করতে পারেনি, তাই কলোনিতে এই সংগঠনের বৃদ্ধি বিশেষ ঘটবে না। অভিরাম কংগ্রেসের সদস্য ফর্ম নিয়ে এসে সভ্য করতে গিয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে বাধা পায়, অসুবিধাজনক প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। বাড়ি বাড়ি ঘুরে মাত্র চারটি সভ্য করতে পারল সে— ধ্রুব, উটে যদু, সে নিজে এবং তার স্ত্রী। ব্যর্থ হয়ে অভিরামের মনে হল 'লোকে যেমন কংগ্রেসের সভ্য হতে চায় না, কংগ্রেস কর্তৃপক্ষও তেমনি সভ্য সংখ্যা বাড়ানো সম্পর্কে উৎসাহী নন।'[১৮]

উপন্যাসে উল্লিখিত মনুমেন্টের নিচে উদ্বাস্তুদের এই ঐতিহাসিক সভা স্মরণ করিয়ে দেয় ১৯৫১-য়ের ১৮ ফেব্রুয়ারি ইউ.সি.আর.সি.-র নেতৃত্বে কলকাতা ময়দানের সভা। সেই সভার দাবি ছিল—

i) জবরদখল কলোনির স্বীকৃতি দিতে হবে;
ii) উদ্বাস্তু উচ্ছেদ করা চলবে না;
iii) উদ্বাস্তুদের ভোটাধিকার দিতে হবে;
iv) অতি দ্রুত জমিদারি প্রথা বাতিল করতে হবে;
v) ভারত সরকারকে কমনওয়েলথ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে;
vi) এশিয়া থেকে সাম্রাজ্যবাদ দূর হটো;
vii) যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই;
viii) ইঙ্গো-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক।

এই সভায় উপস্থিত হয়েছিল দশ হাজার মানুষ। এরমধ্যে বারোশো মহিলা। উল্লেখ করা যেতে পারে ইউ.সি.আর.সি মহিলাদের প্রথম কলকাতার রাজপথে মিছিলে নিয়ে আসে।

নির্মলদের নেতৃত্বে এই সংঘবদ্ধ আন্দোলনে ফল হয়। উদ্বাস্তু উচ্ছেদ আইনের নাম পাল্টে সরকার নাম রাখে উদ্বাস্তু উচ্ছেদ ও পুনর্বাসন আইন। এটাই বাস্তুহারাদের প্রথম জয়। সময় যায়, কলোনির কলেবর বৃদ্ধি ঘটে। রাস্তাঘাট, ড্রেন তৈরি শুরু হয়। মোটামুটি একটি স্থিতিশীল জীবনের

দিকে পদার্পণ করে কলোনির মানুষগুলি। ইতিমধ্যে সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয় কলকাতার আশেপাশের দু-একটা কলোনির বাসিন্দাদের ইতিমধ্যে সরকার অর্পণপত্র দিয়েছে। এর অর্থ দখলি জমিতে উদ্বাস্তুদের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া। এই খবরে কলোনির বাসিন্দাদের মনে আশার সঞ্চার হয়। পার্শ্ববর্তী একটি কলোনিতে অর্পণপত্র দেওয়ার অনুষ্ঠানে কলোনির লড়াকু নেতা অধ্যাপক নির্মল আমন্ত্রিত হয়ে গেলে দেখা যায় সরকার প্রতিটি অর্পণপত্রে পরিবার পিছু সোয়া দুই কাঠা জমি বরাদ্দ করেছে, এবং এর জন্য জমির দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১২৫০ টাকা। এই অর্থ সরকার তাদের ঋণ হিসেবে দিয়েছে। তাই এই ঋণের জন্য বর্তমানে তাদের সরকারের নামে একটি দলিল সম্পাদন করে দিতে হবে এবং ঋণ নির্দিষ্ট কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে। কলোনির উন্নতিকল্পে পথঘাট, টিউবওয়েল, প্রভৃতি যা যা তৈরি হবে তারও আনুপাতিক ব্যয়ভার জমির মালিককে বইতে হবে। যদি দেখা যায় সোয়া দুই কাঠার বেশি জমি তার দখলে আছে, তবে তার জন্য অতিরিক্ত মূল্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বহন করতে হবে। সে মূল্যও নির্ধারণ করবে সরকার। একথা শুনে তিলক নগরের বাসিন্দাদের মুখ ভার হয়ে আসে। ক্রমে এই খবর ছড়িয়ে পড়ে কলোনিগুলিতে। উদ্বাস্তুরা আবার আন্দোলনে নামে এবং অর্পণপত্র প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করে।

তিলকনগর কলোনিতে নেতা নির্বাচন নিয়ে বিবাদ তুঙ্গে ওঠে। ব্রজ, রক্ষাকালী, অক্রুর, মন্মথ সকলে মিলে নির্মলের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। কলোনি রক্ষা কমিটি নির্বাচনে নির্মল পুনরায় জয়ী হলে রাতের অন্ধকারে তাকে খুনের উদ্দেশ্যে আঘাত করা হয়। সে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে শেষ পর্যন্ত বেঁচে ওঠে।

আলোচ্য উপন্যাসে একদিকে কলোনি গঠনের সংগ্রামের কাহিনি ব্যক্ত হয়েছে, অন্যদিকে কলোনির মধ্যেকার বিবাদের ছবি ফুটে উঠেছে। শেষপর্যন্ত উদ্বাস্তুরা তাদের অধিকার আদায়ে সক্ষম হয়েছে— তারই বাস্তব এবং ঐতিহাসিক সত্যকে তুলে ধরা হয়েছে।

শচীন দাশের ‘উদ্বাস্তুনগরীর চাঁদ’ উপন্যাসে পূর্ববঙ্গের স্বাধীনচেতা শিক্ষিত ও সমৃদ্ধ উদ্বাস্তুদের জবরদখল কলোনি গঠনের অনুপুঙ্খ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। উপন্যাস শুরু হয়েছে উনিশ শো পঞ্চাশ সালের জানুয়ারী মাসে, যখন পূর্ববঙ্গে নতুন করে সংখ্যালঘু বিতাড়নের প্রক্রিয়া চলছে। মহীকান্ত গুপ্ত মাদারিপুরের বাসিন্দা, মস্ত জমিদারের নায়েব। তিনি যখন দেখলেন জীবনের নিরাপত্তার অভাব ঘটছে এবং সামাজিক সম্মান পাওয়া যাচ্ছে না একেবারেই, তখন প্রায় শূন্য হাতে পরিবারের সকলকে

নিয়ে দেশত্যাগ করে শিয়ালদহ স্টেশনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারপর এক দালালের পাল্লায় পড়ে দক্ষিণ কলকাতার পোড়ো জমিতে তাঁর পরিবারের ঠাঁই হয়। জায়গাটিতে আলগা মাটি ফেলে অন্য সকল উদ্বাস্তুর মত তৈরি করা হয় এক টুকরো ভিত। তার উপর হোগলা দিয়ে ঘেরা বেড়া। মাথার উপরের চালাটা ও হোগলার ছাউনি। এই ছোট্ট ছোট্ট ঝুপড়ি দিয়ে তৈরি হয় নতুন উদ্বাস্তু উপনিবেশ। এখানে আসার প্রথম রাতেই জমিদারের গুণ্ডারা আক্রমণ করে কলোনি। মহীকান্ত গুপ্তর ভাই নিশিকান্তর স্ত্রী স্নেহলতা শুনতে পায় ঘন ঘন শঙ্খর আওয়াজ। এ বিষয়ে নিশিকান্ত ও তার স্ত্রীর কথপোকথনে কলোনি আক্রমণের ছবি ফুটে উঠেছে— ‘শঙ্খ ফুয়াইয়া জানান দিতে আছে জমিদারের গুণ্ডারা

হাঙ্গামা বান্ধাইয়া দিছে।

কাগো জানাইতে আছে?

অমূল্যা গো ডিফেন্স পার্টিরে

ক্যান?

বাহ্ তা না-হইলে প্রতিরোধ করব কী কইর‍্যা?’[১৯]

ঘরের ঝাঁপ খুলে উঠোনে দাঁড়াতে থমকে যায় নিশিকান্ত। ঘন অন্ধকারে এপাশে ওপাশে দু’চারটে মশাল জ্বলছে। তারই আলোয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে কয়েকটি তামাটে মূর্তি। মূর্তি-গুলোর হাতে কারও বাঁশের লাঠি, কারও হাতে লোহার রড। দলবেঁধে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত হয়ে তারা পরামর্শ করে কী করে গুণ্ডাদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করা যায়। অবশেষে মশাল নিভিয়ে টর্চের আলো জ্বালিয়ে প্রতি আক্রমণে উদ্যত হয়। সম্মিলিত প্রতিরোধের কাছে গুণ্ডা বাহিনি হার মানে এবং শেষপর্যন্ত তারা কলোনির কয়েকটি ঘরে আগুন লাগিয়ে পালিয়ে যায়। উল্লেখ্য কলোনি রক্ষার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসে। গুণ্ডা বাহিনী কলোনিগুলিতে আক্রমণ করতে এসে বারবার ব্যর্থ হয়। এর কারণ ছিল— জবর দখলকারী উদ্বাস্তুদের বিকল্প কোনও বাসস্থান ছিল না। তাই তারা মরণপণ সংগ্রামে কলোনি রক্ষার জন্য এগিয়ে আসে। তাদের ঐক্য ছিল চোখে পড়বার মত।[২০]

মহীকান্তরা যে জমি দখল করে কলোনি গড়েছে তা রমনীরঞ্জনের। দক্ষিণ কলকাতায় এরকম আরও অনেক কলোনি গঠিত হয়েছে যার আসল মালিক লায়েলকা, ওয়াজেদ আলি, চৌধুরী আর গাঙ্গুলীরা। তাঁরা সবাই একত্রিত হয়ে পরামর্শ করে কীভাবে উদ্বাস্তুদের জমি থেকে উচ্ছিন্ন করা যায়। এক্ষেত্রে তাঁরা মূলত তিনটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন—

i) গুণ্ডা বাহিনী যেমন আক্রমণ চালাচ্ছে তা অব্যাহত থাকবে;

ii) দখলদার উদ্বাস্তুদের নামে আদালতে নালিশ করবে;

iii) সম্মিলিতভাবে চিফমিনিস্টারের কাছে আবেদন করবে।

রমণীরঞ্জনের কানে এসেছে কলোনির লোকজনদের পিছনে রয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি এবং আর.এস.পি। এরাই পিছন থেকে উস্কানি দিচ্ছে, চাঁদা তুলে টাকা পয়সা ও জিনিসপত্র দিয়ে সাহায্য করে সাহস জোগাচ্ছে। উদ্বাস্তু উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির নামে তারা একাধিক সংগঠন গড়ে তোলে। এর মধ্যে প্রধান ছিল দুটি সংগঠন—

i) ইউ.সি.আর.সি;

ii) আর.সি.আর.সি।

কংগ্রেসের বিরোধী দলগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে কলোনি দখল করে নিয়েছে। উদ্বাস্তুদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন প্রফুল্ল ঘোষ, সৌমেন ঠাকুর, লীলা রায়, চারু রায়, সুরেশ ব্যানার্জীর মত ব্যক্তিবর্গ।

এই লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে উদ্বাস্তুদের জীবনধারা এগিয়ে চলে। তারা স্থিতিশীল একটি বাসস্থান গড়ে তোলে। হঠাৎই একদিন মহীকান্ত বাবুর ভাই নিশিকান্ত ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হন দাদার কাছে এবং বলেন— 'অর্ডিন্যান্স জারি হইছে বড়দা' মহীকান্ত অবাক হয়। নিশি বলতে থাকে 'আমাগো তোলোনের লাইগ্যা অর্ডন্যান্স জারি কইর‍্যা উচ্ছেদ বিল জারি কইর‍্যা উচ্ছেদ বিল আনছে সরকার।' রিফিউজি কমিটির অফিসে রাখা আছে অর্ডিন্যান্সের কপি। তা দেখতে কাতারে কাতারে ছুটে আসে লোক। মহীকান্তর স্ত্রী কমলা, নিশিকান্তর স্ত্রী স্নেহময়ীসহ কলোনির নারীদের মধ্যে গভীর দুশ্চিন্তা তৈরি হয়। দক্ষিণ কলকাতার শ্যামা কলোনি, নবনগর, বিক্রমগড়, গান্ধী কলোনি, শ্রী কলোনি, আজাদগড়, পল্লীশ্রী, বিজয়গড়, বাপুজিনগর, বাঘাযতীন কলোনিসহ সব উপনিবেশের প্রতিনিধিরাই মহীকান্তদের কলোনির অফিসে আলোচনায় বসে। আলোচ্য বিষয়, কীভাবে এই বিলকে আটকানো যায়।

আটকানোর রাস্তা বলতে বাধা দেওয়া, কোমর বেঁধে এক জোট হয়ে সবাই নেমে পড়া; সরকারের এই অর্ডিন্যান্সকে অস্বীকার করা। তাই ঠিক হয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে হবে রাস্তাঘাটে, স্টেশন-ফুটপাতে। এই মুহূর্তে নেমে পড়তে হবে। উদ্বাস্তুদের পক্ষ থেকে সরকারকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল যুদ্ধের আগে আটত্রিশ উনচল্লিশ সালে জলাজমির যে দাম ছিল সেই দামে যদি জমিগুলো উদ্বাস্তুদের

দেওয়া হয়, তাহলে কিস্তিতে কিস্তিতে সে দাম পরিশোধ করবে জমির মালিক। তাদের সেই প্রস্তাব সরকার মানেনি। তার পরিবর্তে জমির মালিকদের স্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত সরকার। তাই কলোনির লোকেদের চোখে ঘুম নেই। কলোনির নেতা যামিনীমোহনের বারবার মনে হয় জমি দখল করে যেখানে যে ঘর বানিয়ে বসেছে বিল পাশ করলে দু-চার দিনের মধ্যেই ছেড়ে দিতে হবে সে সব। তা না হলে পুলিশ নামিয়ে জোর করে পুনরুদ্ধার করে জমি আবার ফিরিয়ে দেওয়া হবে জমিদারদের হাতে, সেই সঙ্গে উদ্বাস্তুদের আন্দামান, দণ্ডকারণ্য কিংবা উড়িষ্যা ও বিহারের নানা জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সরকারের এই পুনর্বাসন নির্বাসনেরই সামিল। তাই উচ্ছেদ বিলকে আটকাতে হবে; দেখতে হবে এই কালা কানুন যাতে আইন সভায় সম্মতি না পায়। এটাই ছিল কলোনিবাসীর প্রতিজ্ঞা।

যামিনীমোহনরা ঠিক করে সব কলোনির প্রতিনিধিরা যেন লায়েলকাদের পুকুরপাড়ে মিলিত হয়। আগামী পরশু আইনসভা অভিযান। সরকারিভাবে উচ্ছেদ বিলটা আসবে এই খবরে আর.সি.আর.সি-র কমিটির নেতৃবৃন্দ একসঙ্গে বসে ঠিক করে এই উচ্ছেদ বিলটি প্রতিরোধের জন্য আরও একটি কমিটি তৈরি হয়— আর.ই.আর.সি অর্থাৎ রিফিউজি ইভিকশন রেজিস্ট্যান্স কমিটি বা উদ্বাস্তু উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি। ওই কমিটি এরপর তাদের অধীনে আলাদা আলাদা ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কলোনিগুলিকে একত্রিত করে আইনসভা অভিযানের ডাক দেয়। সিদ্ধান্ত হয় প্রথমে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে উদ্বাস্তুদের নিয়ে একটা জমায়েত হবে। এরপর মিছিল করে তারা যাবে আইনসভার দিকে। আইনসভা ঘেরাও করে প্রতিবাদ জানাবে, যাতে উচ্ছেদ বিলটি পাশ না হয়।

আর.ই.আর.সি এই আন্দোলনে ইউ.সি.আর.সি কে পাশে পেতে চেয়েছে। অর্থাৎ উদ্বাস্তু কলোনিগুলির এই সংকটকালে দুটি সংগঠনই যাতে কাজ করতে পারে তার জন্য এই উদ্যোগ। কিন্তু ইউ.সি.আর.সি এই প্রস্তাবে সাড়া দেয়নি। যামিনীমোহনরা আর.ই.আর.সি-র নেতা; তাই তার উপরে বাড়তি চাপ রয়েছে উদ্বাস্তুদের একত্রিত করণে। ক'দিন ধরে তিনি চোঙা ফুকিয়ে কলোনি ও কলোনির বাইরে প্রচার করে বেড়ান। উদ্বাস্তুদের মুখেচোখে এখন উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠা, চাপা একটা ক্রোধ সবার মধ্যে। যেভাবেই হোক, যে করেই হোক এই অডিন্যান্সকে রুখতে হবে। এ কলোনি তাদের। যামিনীমোহন, ধীরেন চ্যাটার্জী, রমেশ দত্ত, স্নেহাকর ডাক্তার, হরিনাথ, প্রবোধ অজিত, জিতেন মজুমদারের চোখে ঘুম নেই; ঘুম নেই সমগ্র উপনিবেশের চোখে।

এই অর্ডিন্যান্সকে আটকাতে কাতারে কাতারে মানুষ জড় হয়েছে উদ্বাস্তু সংঘের সামনে। সেখান

থেকে গড়িয়াহাট হয়ে যাবে ওয়েলিংটন। ওয়েলিংটন থেকে দুইদলে ভাগ হয়ে একদল যাবে এস্প্লানেডে, আর একদল সরাসরি ধর্ণা দেবে মনুমেন্টের নিচে। উপন্যাসে কাহিনিকে বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক বাস্তব চরিত্রের আশ্রয় নিয়েছেন। কলোনি রক্ষায় যারা উপস্থিত হয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন— ধীরেন বসু, সন্তোষ বাবু, লীলা রায়, মুকুল বোস এবং প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহা। মিছিলের পুরোভাগে রয়েছেন ডাঃ সুবেশ ব্যানার্জী, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ, সৌমেন ঠাকুর, রাম মনোহর লোহিয়ার মত ব্যক্তিত্ববর্গ। সকলের আশা এই মানুষগুলি যখন তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে, তখন উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান হবেই।

আইন সভার কাছাকাছি যেতেই দেখা যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মিছিলের গতিরোধ করতে চাইছে। একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করেছে সরকার। পুলিশ বেষ্টনী ভেঙে মিছিল এগিয়ে যেতে চায়। ফলে শুরু হয় এলোপাথাড়ি লাঠি চার্জ। তাতেও যখন উদ্বাস্তুরা নিরস্ত হয় না তখন শূন্যে গুলি ছোড়ে পুলিশ। এর পর আন্দোলন আরও তীব্র হয়ে ওঠে। সমস্বরে শ্লোগান ওঠে—

‘আমরা কারা?’

‘বাস্তুহারা’।

‘আমা গো দাবি—’

‘মানতে হইব।’

‘উচ্ছেদ আইন—’

‘মানছি না, মানুম না।’

‘কালা-কানুন—’

‘বন্ধ কর... বন্ধ কর।’[২১]

উদ্বাস্তুরা যত চেঁচায়, পুলিশও লাঠি চার্জ করতে থাকে। যামিনীমোহন মিছিলের মানুষের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে ওঠেন— ‘আপনেরা কেউ পিছাইয়া যাইবেন না।’ পুলিশ লাঠি উচিয়ে কলোনির নেতা যামিনীমোহন, ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জি, চারু রায়, লীলা রায় সহ অনেককে গাড়িতে তুলে নেয়। পুলিশের সঙ্গে উদ্বাস্তুদের ধস্তাধস্তির মধ্যে কে একজন এসে খবর দেয় সরকার আইজ আর কালাবিলটা তুলবে না আইনসভায়। এই খবর শোনার পর উদ্বাস্তুরা আশ্বস্ত হয়, শশীকান্তর ছেলে গগন তার দলবল সহ রওনা হতে থাকে কার্জন পার্কের দিকে। যেতে যেতে শোনে মনুমেন্টের নিচে তখনও মিটিং চলছে ইউ.সি.আর.সি-র। এই মিটিং-এ জ্বালাময়ী ভাষণ দিচ্ছেন জ্যোতি বসু। তখন তিনি আইন সভার

বিরোধী দলনেতা। সরকারের আনা বিলের বিষয়ে উদ্বাস্তু সংগঠনগুলি সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চায়। ক্রমাগত তারা সরকারের উপর চাপ বাড়াতে থাকে।

এই পরিস্থিতিতে পুনর্বাসন মন্ত্রী মোহনলাল সাকসেনা পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন নিয়ে আলোচনার জন্য কলকাতায় আসেন। উক্ত আলোচনা সভায় ত্রিপুরা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা রাজ্যের প্রতিনিধিদের ডাকেন। সেই সভায় তিনি ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত জানিয়ে যান। সিদ্ধান্তটি হল— 'পঞ্চাশের আগে যে সমস্ত উদ্বাস্তু পূর্ববঙ্গ থেকে এদেশে এসেছিলেন অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে, তারা পুরোনো উদ্বাস্তু। কিন্তু নতুন করে দাঙ্গার ফলে পঞ্চাশ থেকে যারা সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকেছে তারা নতুন উদ্বাস্তু। পুরোনো উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে ভারত সরকার পুনর্বাসনের চিন্তাভাবনা করলেও নতুনদের পুনর্বাসনের কোনও দায়িত্বই নেবে না।'[২২] এই নতুন উদ্বাস্তুদের জন্য থাকবে শুধু আশ্রয়-শিবির ও ত্রাণকার্য। এর স্বপক্ষে সরকারের যুক্তি ছিল এরকম : এখন যারা ভিটেমাটি ছেড়ে পূর্ববঙ্গ থেকে চলে আসছে, দাঙ্গার পর শান্তি ফিরে এলে ভিটেমাটির আকর্ষণে তারা আবার দেশে ফিরে যাবে। কাজেই এই পরিস্থিতিতে পুনর্বাসনের প্রশ্নই ওঠে না। এরজন্য সরকার আশ্রয় শিবিরগুলিকে যতটা সম্ভব সীমান্তের কাছাকাছি রাখতে চায়; যাতে তারা তাড়াতাড়ি দেশে ফিরতে পারে।[২৩]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য পঞ্চাশ পরবর্তী সময়েই অধিকাংশ উদ্বাস্তুর আগমন ঘটেছিল। সরকারের এই সিদ্ধান্তে বিরাট সংখ্যক উদ্বাস্তুর জীবনে ভয়াবহ দুর্ভোগ নেমে আসবে। একথা ভেবে উদ্বাস্তু দরদি বাঙালি বিজ্ঞানী ড. মেঘনাদ সাহা সাকসেনার কাছে নির্দিষ্ট কতগুলি প্রশ্ন রেখে প্রতিবাদ জানান। তিনি যা বলেন তা সংক্ষেপে এই দাঁড়ায়—

i) পুনর্বাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করার বিপক্ষে যা যুক্তি দেখানো হচ্ছে তা একান্তই দুর্বল;
ii) পূর্ববঙ্গ হতে নতুন হাঙ্গামার ফলে যারা আসছে তাদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব অস্বীকার করা ভারত সরকারের অন্যায় হবে;
iii) দেশ বিভাগের সময় পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা ভঙ্গ করা হলে চরম অমানবিকতার উদাহরণ হয়ে থাকবে।

ড. সাহা পুনর্বাসন মন্ত্রীর কাছে মহাত্মা গান্ধী ও জওহরলাল নেহরুর দেওয়া প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করে বলেন— দিল্লীতে ১৬ জুলাই মহাত্মা গান্ধী প্রার্থনা পরবর্তী সভায় বলেছেন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যে সব হিন্দু পাকিস্তানে তাদের নিজ গৃহে থাকতে পারবে না তাদের দুহাত খুলে গ্রহণ করা এবং সকল প্রকার

যুক্তিসঙ্গত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। তাদের অনুভব করাতে হবে যে তারা অপরিচিত দেশে আসেনি।

জওহরলালের দেওয়া প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন— নেহরু বলেছিলেন পুর্ববঙ্গে যারা বিপন্ন হবে, তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য হবে তাদের নিজের দেশেই তাদের রক্ষার ব্যবস্থা করা আর যদি অন্য উপায় না থাকে এবং বিশেষ অবস্থায় আমাদের দেশে তাদের আশ্রয় দিতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানে যারা সংখ্যালঘু তারা নিশ্চিত আমাদের দায়। তারা যাতে নিরাপদে থাকতে পারে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।[২৪] সাকসেনার কাছে মেঘনাদ সাহা যেভাবে তথ্যসমৃদ্ধ যুক্তি উপস্থাপন করলেন তাতে তিনি আর কোনও জবাব দিতে পারলেন না।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রসঙ্গে শ্রী সাকসেনার প্রস্তাব ছিল ‘ত্রিপুরা ও উড়িষ্যা নিক পঁচিশ হাজার রিফুজির দায়িত্ব। আর বিহার নিক পঞ্চাশ হাজারের দায়িত্ব—। বাকিটা নিক পশ্চিমবঙ্গ সরকার।’[২৫] তাঁর এই প্রস্তাব ছিল পঞ্চাশ সনের পূর্ববর্তী সময়ে আসা উদ্বাস্তুদের জন্য। এরফলে উদ্বাস্তুদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। তারা বাংলার বাইরে না যাবার জন্য এবং পঞ্চাশ পরবর্তী উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য কলকাতাসহ সারা পশ্চিমবঙ্গে লড়াই আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। এর ফলে উচ্ছেদ বিল আইন সভায় তোলা সম্ভব হয় না সরকারের। অবনীমোহন, সুধাকান্ত, যামিনীমোহন, প্রমুখ কলোনির নেতারা খানিকটা হলেও আশ্বস্ত হয়, আশায় বুক বাঁধে এবং এটি তাদের নৈতিক জয় বলে ধরে নেয়। উপন্যাসটি মহীকান্তর পরিবারকে কেন্দ্র করে এগিয়েছে, কিন্তু সমগ্র উপন্যাসে ব্যক্তি থেকে বড় হয়ে উঠেছে লড়াই করে অধিকার আদায়ের কাহিনি। সেই সঙ্গে তা ঐতিহাসিক চরিত্র ও বাস্তবতার সমন্বয়ে রূপায়িত হয়েছে।

শচীন দাশের ‘উদ্বাস্তুনগরীর চাঁদ’ উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব ‘মানচিত্র বদলে যায়।’ এখানে উদ্বাস্তুদের লড়াই-আন্দোলন এবং শেষ পর্যন্ত স্থিতিশীল উপনিবেশ গঠনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। জমিদার-জোতদারদের চাপে সরকার আইনসভায় যে উচ্ছেদ বিল আনতে চেয়েছিল উদ্বাস্তুদের জঙ্গি আন্দোলনের ফলে তা প্রথমে স্থগিত হয়ে যায়; পরবর্তী সময়ে তা কিছুটা সংশোধনের প্রস্তাব রাখে উদ্বাস্তু সংগঠনগুলি। কলোনির নেতা যামিনীমোহন এ সম্পর্কে বলেন— ‘আর.ই.আর.সি.-এর পক্ষ থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায় এই প্রস্তাবের উপরে আলোচনা করতে রাজি হয়েছেন। আসলে রাজি না হয়ে তাঁর উপায় ছিল না। কেননা তিনি জানতেন উচ্ছেদ বিলটি আইনসভায় পাশ হয়ে আইনে পরিণত হলে সে আইন কার্যকর করার দায়িত্ব পড়বে

তাঁর উপরে। তাতে পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। তাছাড়া সামনেই দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন, এই সময়ে সরকার ঝামেলা এড়াতে চাইছে বলেই যামিনীমোহনের মনে হয়। কলোনির নেতাদের একত্রিত করে আর.সি.আর.সি-এর দেওয়া প্রস্তাবগুলির বিষয়ে যামিনীমোহন জানান—

i) যারা জবরদখল করে আছে তাদের মধ্যে কে উদ্বাস্তু এবং কে উদ্বাস্তু নয় তা ঠিক করবেন জেলা জজের সমতুল্য একজন বিচার আধিকারিক;

ii) উচ্চ আদালতের অনুমোদন সাপেক্ষে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এই আধিকারিক;.

iii) প্রকৃত উদ্বাস্তু ধরা হবে তাদেরই, যারা ছেচল্লিশের অক্টোবর মাসের পর থেকে পঞ্চাশের একত্রিশে ডিসেম্বরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে এসেছে;

iv) জবরদখলকারীদের বিকল্প পুনর্বাসন না দিয়ে উচ্ছেদ করা চলবে না;

v) বিকল্প পুনর্বাসন এমন জায়গায় দিতে হবে যাতে উদ্বাস্তুরা রুজি-রোজগারের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হয়;

vi) সরকার নিযুক্ত আধিকারিকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনও ক্ষোভ থাকলে তা জানানোর জন্য একটি ট্রাইব্যুনাল থাকবে;

vi) ট্রাইব্যুনাল হবে তিন সদস্যের, যার সভাপতি হবেন উচ্চ ন্যায়ালয়ের একজন বিচারপতি।

আরও কোনও সংযোজন থাকলে তা খোলামেলা জানাতে বলা হয় সকলকে। সংগঠনের সদস্য হরিনাথ এক্ষেত্রে ইউ.সি.আর.সি এবং আর.সি.আর.সি-কে যুক্ত করার প্রস্তাব দেয়। কারণ উভয় সংগঠনের সম্মিলিত লড়াই উদ্বাস্তুদের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা এনে দেবে বলে তার মনে হয়।

আর.সি.আর.সি-এর পাশাপাশি ইউ.সি.আর.সি জবরদখল কলোনির উদ্বাস্তুদের স্বার্থরক্ষায় এগিয়ে আসে। তারা টালিগঞ্জ এলাকার দুশো কলোনির প্রতিনিধি নিয়ে সভার আয়োজন করে। বাঘাযতীন কলোনিগুলি টালিগঞ্জের আওতায় পড়ে না তবুও বাঘাযতীনের প্রতিনিধি হিসেবে ধীরেন বাবুকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ধীরেন বাবুর শরীর ভালো না থাকায় প্রতিনিধি হিসেবে অমূল্যকে যেতে হয় সেই সভায়। অমূল্যর কাছে যামিনীমোহন সভার সিদ্ধান্তর কথা জানতে চাইলে সে যা জানাল তা এরকম :

এক) সরকারকে এই মুহূর্তে সমস্ত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করতে হবে। আর এর জন্য ঋণ দিতে হবে উদ্বাস্তুদের। ঋণের ব্যবস্থা সরকারকেই করতে হবে;

দুই) কোনও কলোনি থেকে কোনও উদ্বাস্তু পরিবারকে উচ্ছেদ করা চলবে না;

তিন) বিভিন্ন কলোনিতে উদ্বাস্তু প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলিতে সরকারি অনুদান চালু করতে হবে;

চার) টালিগঞ্জের সমস্ত কলোনিগুলিকে মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে আনতে হবে;

পাঁচ) ১৯৫১ সালের যোল আইন প্রত্যাহার করতে হবে। এবং উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য পৃথক আইন চালু করতে হবে;

ছয়) খুব শিগগিরই ময়দানে একটি উদ্বাস্তু সমাবেশ করা হবে। আর এই সমাবেশটি ময়দান থেকে বিধানসভা অভিমুখে যাবে;

সাত) এদিককার দুশো পঞ্চাশটি কলোনির মধ্যে মাত্র ৯৩টি কলোনির স্বীকৃতি দিয়েছে। বাকি কলোনিগুলিকে এখুনি স্বীকৃতি দিতে হবে। [২৬]

অমূল্য আরও জানায় ময়দানের সভায় উপস্থিত থাকবেন সত্যপ্রিয় ব্যানার্জী, অম্বিকা চক্রবর্তী, জ্যোতি বসু, হেমন্ত বসু, জ্যোতিষ জোয়ারদার প্রমুখ বাম নেতৃবৃন্দ। তারা ময়দান থেকে বিধানসভায় গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে উদ্বাস্তুদের দাবি সংক্রান্ত স্মারকলিপি দেবে। এখানে উল্লেখ্য বামনেতারা উদ্বাস্তুদের দাবি নিয়ে যত সোচ্চার হতে থাকে ততই উদ্বাস্তু কলোনিগুলি ইউ.সি.আর.সি-এর দখলে আসতে থাকে এবং এক সময়ে বাম শক্তির নিয়ামক হয়ে ওঠে উদ্বাস্তু কলোনিগুলি।[২৭]

উদ্বাস্তুদের অধিকার আদায়ের লক্ষে লড়াই-সংগ্রামের পাশাপাশি আরও দুটি আন্দোলনের কথা উল্লিখিত হয়েছে উপন্যাসটিতে—

i) ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন;

ii) খাদ্য আন্দোলন।

কলকাতার পথে চলা ট্রাম ভাড়া টিকিট পিছু এক পয়সা বৃদ্ধির কারণে বামপন্থী দলগুলি আন্দোলন শুরু করে। কলোনির নেতা মহীকান্ত অসুস্থ বন্ধু ললিতের বাড়িতে যাবার জন্য ট্রাম ধরেন। ট্রামের কনডাক্টর বাড়তি ভাড়া চাইলে যাত্রীরা সকলে মিলে প্রতিবাদ করে। যেহেতু কলোনিগুলির সমস্যা রয়েছে নানাবিধ, কিন্তু সরকার সেসব সমাধানের দিকে লক্ষ না রেখে জমির মালিকদের হয়ে নানা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে, একথা ভেবে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন মহীকান্ত; কিন্তু বাড়তি ভাড়া দিতে অসম্মত হন। ট্রামের অন্য যাত্রীরাও তাকে সমর্থন করে। ক্রমে উত্তপ্ত হতে থাকে পরিবেশ। ট্রামের মধ্যে পুলিশ ওঠে বাড়তি ভাড়া আদায়ে সাহায্যের জন্যে। এরপর পুলিশ লাঠি চালাতে শুরু করে প্রতিবাদী জনতার উপর। পুলিশকে লক্ষ করে শুরু হয় ইট বৃষ্টি, শুরু হয় একের পর এক ট্রাম পোড়ানো। পুলিশ টিয়ার

গ্যাস শেল ফাটায়। মহীকান্ত ট্রাম থেকে নেমে একটি দোকানে আশ্রয় নেয়। দোকানি তার দোকানের পিছন দরজা দিয়ে তাকে বের করে দেয় এবং নিরাপদ পথের সন্ধান দেয়। মহীকান্ত এগিয়ে যেতে চোখে পড়ে রাস্তায় বিরাট মিছিল আর মিছিল থেকে আওয়াজ ওঠে—

'বাড়তি...ভাড়া...

দিচ্ছি না... দেব না।

ইংরেজ কোম্পানি...

মুর্দাবাদ। মুর্দাবাদ।

ইংরেজ কোম্পানির দালাল কে...

কংগ্রেস সরকার আবার কে!'[২৮]

পুলিশের বাধায় মিছিল বেশি দূর এগিয়ে যেতে পারে না এখানে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করা ছিল। ফলে মিছিল নিষিদ্ধ ছিল। পুলিশ তাই ধরছে নির্বিবাদে আর কালো গাড়িতে তুলছে। সরকার দমননীতির মধ্য দিয়ে রাজ্যের পরিস্থিতি শান্ত রাখতে চাইছে, পক্ষান্তরে বামপন্থীরা ছোট-বড় যে কোনও ইস্যুতে রাজ্যের পরিস্থিতি উত্তাল করে তুলছে।

সাতান্নর শেষে দেশে খাদ্য সংকট শুরু হয়। আটান্নতে এসে তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। খোলা বাজার থেকে চাল-ডাল সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও উধাও হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে ক্রমবর্ধমান উদ্বাস্তু চাপ দেশের খাদ্য সংকটকে আরও তীব্র করে তোলে। উনষাট সাল পড়তে না পড়তেই সমস্যা আরও তীব্র আকার ধারণ করল এবং খাদ্যসংকটে মুখ থুবড়ে পড়ল সারা দেশ। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস উধাও হয়ে যাওয়ায় গ্রাম বাংলায় দুর্ভিক্ষ নেমে এল। ক্ষোভ-বিক্ষোভ ও গণ আন্দোলনে দেশ উত্তাল হয়ে উঠল। এই পরিস্থিতিতে দেশের মানুষের প্রতি সহানুভূতির পরিবর্তে সরকার দমনপীড়ন নীতি বেছে নেয়। আলোচ্য উপন্যাসে খাদ্য আন্দোলনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এভাবে— 'সস্তা দরে প্রয়োজনীয় খাদ্য না পাওয়ায় মানুষ নেমে এল রাস্তায়। বিক্ষোভ আরও তীব্র হয়ে উঠল।... মিটিং-মিছিল ও আন্দোলনে দেশ অচল করে তুলল। বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ল শহর ছেড়ে জেলায় জেলায়।'[২৯] উল্লেখ্য সরকারি আশ্রয় শিবিরে থাকা উদ্বাস্তুদের যাবতীয় দায়িত্ব ছিল সরকারের উপর; কিন্তু জবরদখলকারী উদ্বাস্তুদের কোনও দায়িত্বই সরকার গ্রহণ করেনি। ফলে এই দুর্ভিক্ষে তারাই সব থেকে বেশি অসুবিধায় পড়ে। যেহেতু বামপন্থীরা গণ-আন্দোলনগুলির নেতৃত্ব দিচ্ছিল, তাই তারা কলোনির সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা পায়। ট্রেন-বাস-ট্রাম বন্ধ করতে উদ্বাস্তুদের সাহায্য

বিশেষভাবে কাজে লাগে। কলোনির নেতা মহীকান্ত গুপ্তর ভাই সুধাকান্ত, যিনি এক সময়ে গান্ধিজির সাহচর্যে কাটিয়েছেন, তিনি কংগ্রেসের সংস্রব ত্যাগ করে বামপন্থীদের হয়ে খাদ্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে।

উদ্বাস্তুদের আন্দোলনের ফলে ক্রমে সরকার পিছু হটতে শুরু করে। কলোনি তৈরির একনিষ্ঠ কর্মী অমূল্য এসে সকলকে আশ্বস্ত করে উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদের জন্য তৈরি 'ষোল আইন' নামক কালা কানুন প্রযোজ্য হবে না। পঞ্চাশ সালের পরেও যেসব জবরদখল কলোনি গড়ে উঠেছে সেগুলির স্বীকৃতির বিষয়ে বিবেচনা করছে সরকার। তখন কেন্দ্রে পুনর্বাসন মন্ত্রী ছিলেন অজিত প্রসাদ জৈন। তিনি উদ্বাস্তু সংগঠনগুলির চাপে উদ্বাস্তুদের দবি দাওয়া অনেকাংশে মেনে নেন। শ্রী জৈনের কাছে ইউ.সি.আর.সি-এর পক্ষ থেকে যে দাবিগুলি রাখা হয়েছিল উপন্যাসে তা এভাবে উল্লিখিত হয়েছে—

i) ন্যায্য দামে জমি অধিগ্রহণের জন্য নিয়ম সংশোধন;
ii) আলাপ আলোচনার মাধ্যমে জমি অধিগ্রহণের সমস্যার সমাধান;
iii) সমস্ত কলোনিগুলিকে বৈধতা দেওয়া;
iv) উদ্বাস্তুদের ঘরবাড়ি তৈরি ও ব্যবসাবাণিজ্য করার জন্য ঋণ দেওয়া;
v) কলোনি এলাকার উন্নতি সাধন।

ইউ.সি.আর.সি-ই ক্রমে অন্যান্য সংগঠনকে ছাপিয়ে উদ্বাস্তু আন্দোলনের নিয়ামক হয়ে ওঠে; এবং সরকার বাধ্য হয়ে তাদের দাবির অনেকাংশ মেনে নেয়।

সাতচল্লিশ পরবর্তী সময়ে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশান্তরী হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আসে তাদের শিক্ষার জন্য সরকার যেমন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে, তেমনি জবরদখল কলোনিগুলিতে নিজেদের উদ্যোগে তৈরি হতে থাকে স্কুল। এমন কোনও ক্যাম্প কলোনি ছিল না যেখানে স্কুল তৈরি হয়নি। এই স্কুলগুলিতে সরকার উদ্বাস্তুদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করে। পাশাপাশি জবরদখল কলোনিগুলিতে কলোনি কমিটি নিজেদের মধ্য থেকে শিক্ষক বাছাই করে। এরফলে কলোনিগুলিতে শিক্ষার একটি মনোরম পরিবেশ তৈরি হয়। প্রাথমিকভাবে কলোনির লোকেরা নিজেদের অর্থ দিয়ে প্রতিষ্ঠান চালাতে থাকে। পরবর্তী সময়ে সরকার কলোনির বিদ্যালয়গুলিকে স্বীকৃতি দেয়; কারণ সরকার চিন্তা করেছিল কোনও খরচই করতে হচ্ছে না প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য। তাই অনুমোদন দিতে বাধা কোথায়। পরবর্তী সময়ে অবশ্য সরকার শিক্ষকদের বেতন হিসেবে সামান্য অর্থ দিতে শুরু করে, কিন্তু তা শিক্ষিত ভদ্রলোকের বেঁচে থাকার পক্ষে নিতান্ত অপ্রতুল।[৩০]

বেঁচে থাকার এই জটিল পরিস্থিতিতে শিক্ষকরা তাদের নানাবিধ দাবি জানাতে থাকে সরকারের কাছে। কিন্তু তাদের সেই দাবি উপেক্ষা করে সরকার। বাধ্য হয়ে শিক্ষকরা আন্দোলনে নামে। আলোচ্য উপন্যাসে শিক্ষকদের এই আন্দোলনের বিষয়টি গভীরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। মহীকান্তর ভাই নিশিকান্ত কলোনির স্কুলের শিক্ষক, তার কাছে খবর আসে কাল থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য শিক্ষক ধর্মঘট। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে কলোনির স্কুল বন্ধ রাখা হয়। দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে শিক্ষকরা মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের কাছে নানা দাবি জানিয়ে আসছিল। সরকারের দিক থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ হতে থাকে তারা। ইতিমধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড তাদের দাবিদাওয়ার বিবেচনায় একটি বেতন কাঠামোর সুপারিশ তৈরি করে। সে সুপারিশে পঁয়ত্রিশ টাকা পর্যন্ত মহার্ঘ ভাতা বাড়িয়ে তিয়াত্তর টাকা থেকে একশো আশি টাকা করা উচিৎ বলে জানানো হয়। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সুপারিশ মানতে না চাওয়ায় শিক্ষকরা পথে নামে। তারা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাদের দাবি সনদও পেশ করে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। ফলে চলতে থাকে মিটিং মিছিল। কলোনির বিদ্যালয়ের শিক্ষক ব্যোমকেশ তরফদার নিশিকে জানান 'কাল দুপুরেই মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, সত্যপ্রিয় রায়, অনিলাদেবী প্রমুখ শিক্ষকদলের পরিচালনায় শিক্ষকদের একটি মিছিল রাইটার্সের দিকে এগোলে রাইটার্সের মুখেই তাদের আটকে দেওয়া হয়।... তখন রাজভবনের সামনে গিয়ে অবস্থান শুরু করেন।'[৩১] তাই শিক্ষকদের দাবির সমর্থনে সারা রাজ্যে ধর্মঘট পালিত হয়। তারপর থেকে শুরু হয় অবস্থান ধর্মঘট। কলোনি থেকে নিশি মাস্টার যোগ দেয় এই অবস্থানে। সরকার একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করে অবস্থানরত চারশো শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে। ফলে উত্তাল হয়ে ওঠে বাংলা। শিক্ষকদের দাবির সমর্থনে এগিয়ে আসে হাজার হাজার মানুষ। একশো চুয়াল্লিশ ধারায় মিছিল এগিয়ে গেলে পুলিশ প্রথমে লাঠি চালাতে শুরু করে তাতেও পরিস্থিতি আয়ত্তের মধ্যে না এলে পুলিশের গুলি চলে, ছ'টি প্রাণ চলে যায়। গ্রেপ্তার করা হয় দেড়শোরও বেশি মানুষকে। পুলিশ দিয়ে কাজ হচ্ছে না দেখে মিলিটারি নামানো হয়, সারা কলকাতায় কারফিউ ঘোষণা করা হয়।

বিরোধী দলগুলি বিধানসভার ভিতরে শিক্ষকদের দাবির সমর্থনে ও গুলি চালানোর নিন্দা করে মুলতুবি প্রস্তাব আনে এবং সরকারের বিরোধিতা চালায়। অবশেষে সরকার নতি-স্বীকার করে। বাধ্য হয়ে শিক্ষকদের দাবি মেনে নেয়, সেই সঙ্গে গ্রেপ্তার করা বন্দিদের মুক্তি দেওয়া হয়। শিক্ষকদের এই জয় পরবর্তী সময়ে উদ্বাস্তু আন্দোলনের নতুন অভিমুখ তৈরি করেছে।

আলোচ্য উপন্যাসে মহীকান্ত গুপ্তর পরিবারকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ কলকাতার একটি জবরদখল

কলোনির নানা সমস্যা ও সংকট এবং সেই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য জীবন সংগ্রামের কাহিনি বিবৃত হয়েছে। উপন্যাসের ব্যাপ্তি নির্দিষ্ট কলোনিটির গণ্ডি অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গের সকল জবরদখল কলোনির প্রতিচ্ছবি হয়ে আমাদের সামনে উঠে এসেছে। লক্ষণীয় এই লড়াই-সংগ্রামে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই উদ্বাস্তুরা জয়ী হয়েছে। মূলত বাস্তবতার অনুষঙ্গে উপন্যাসের কাহিনি বিন্যস্ত হয়েছে।

মহীতোষ বিশ্বাসের ‘পরতাল’ উপন্যাসেও লড়াই-সংগ্রামের কাহিনি ব্যক্ত হয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসে কুপার্স ক্যাম্পে আশ্রিত অগণিত অসহায় মহিলাদের উদ্বাস্তু জীবনের যন্ত্রণার চিত্র আঁকতে গিয়ে আন্দোলনের কথা ব্যক্ত হয়েছে। রাণাঘাটের কুপার্স ক্যাম্প পার্শ্ববর্তী এই মহিলা শিবিরে সরকারের পক্ষ থেকে সুতো কাটা, রেশম সুতো বানানো, তাঁত বোনা ইত্যাদি কাজ শেখানো হয়। কিন্তু সেই শিক্ষা কাজে লাগিয়ে তারা যা আয় করে তা পরিশ্রমের তুলনায় নগণ্য। সে কারণে রাণাঘাট বাজার বা তার আশপাশের সেলাই মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে গোপনে অর্ডার এনে কাজ করতে শুরু করে। আবার অনেক মহিলাই বিড়ি মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিজেদের মত করে খুঁজে পেল আয়ের উৎস। কিন্তু ক্যাম্পের নিয়ম অনুযায়ী কোনও মহিলা যদি উপার্জনে সক্ষম হয় তাহলে তাকে সরকার স্থায়ী পোষ্য হিসেবে বিবেচনা করবে না। তাই তারা ক্যাম্পে থাকার অধিকার হারাবে। ক্যাম্পের মহিলারা বাইরে কাজ করে পয়সা উপার্জন করাকে দেখেও না দেখার ভান করে ক্যাম্পের কর্মরত সরকারী মেয়েরা।

ক্যাম্পের মধ্যে বাইরের পুরুষের প্রবেশাধিকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু হঠাৎ একদিন দু’জন পুরুষ লোকের আগমনে সাধনা নামের এক কর্মী তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। পুরুষ দুটির কাছ থেকে জানা যায় তাদের মালিকের কাছ থেকে ক্যাম্পের কোনও একজন মহিলা কাপড় নিয়ে এসে ফেরৎ দেয়নি। তাই তারা সেই মহিলার খোঁজে এসেছে। এই ইস্যুতে জি.এ (জেনারেল অ্যাসিস্টান্ট) রা মহিলাদের বাইরে গিয়ে কাজকর্ম থেকে বিরত রাখতে চায়। তারা বাইরে গিয়ে কাজ করলে ক্যাম্প থেকে বের করে দেবার হুমকি দেওয়া হয়। কিন্তু মহিলারা সমবেতভাবে কথার প্রতিবাদ করে। মাঝ বয়সি শক্তপোক্ত একজন বউ এগিয়ে এসে বলেন— ‘আপনি আমাদের কাজ বন্ধ করার কে?’ তার সঙ্গে গলা মেলায় আরও অনেকে ‘আমরা উদ্বাস্তু বইল্যা আপনাগো কেনা গোলাম না। আমরা বাইরে কাজ করুমই। আমাগো পেছনে লাগতে আইলে আমরা ছাইড়্যা কথা কমুনা। ঝ্যাঁটায়া বিষ দাঁত ভাইঙা দিমুয়ান!’[৩২] উদ্বাস্তু মহিলারা সংখ্যায় অধিক তাই তাদের সম্মিলিত প্রতিবাদের কাছে জি.এ. মহিলারা

পালিয়ে আসে।

উদ্বাস্তু মহিলারা দেশ ছেড়ে এসে ক্যাম্পের জীবনে নানা ঘটনা সংঘাতের মধ্যে পোড়খাওয়া ঝানু মানুষ হয়ে উঠেছে। কিছুতেই এখন তাদের আর ভয় দেখানো যায় না। উদ্বাস্তুদের মধ্যে পচা চাল বিতরণ করলে তারা ক্যাম্প সুপার বৈশাখী ব্যানার্জীর কাছে প্রতিবাদ জানাতে যায়। সুপার তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর পরিবর্তে রূঢ় কথা বলতে শুরু করেন— 'দেশে থাকতে তো খাবার জুটতো না, এদেশে এসে তো বিনা পয়সায় বসে বসে চারবেলা খাচ্ছেন তবু পেট ভরছে না আপনাদের। যত্তো সব হাভাতের দল।'[৩৩] একথার পর উদ্বাস্তু মহিলারা চারপাশ থেকে সুপারকে ঘিরে ধরে। তিনি ক্যাম্পে পুলিশ ডাকার ভয় দেখালে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে এবং সম্মিলিত ভাবে তাড়া করে। সুপার আত্মরক্ষার তাগিদে অফিসঘরে এসে প্রবেশ করে। মহিলারা অফিস ঘরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে। শেফালি নামক এক বয়স্ক মহিলার নির্দেশে অ্যালুমিনিয়ামের থালা-গ্লাস-বাজিয়ে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে। প্রতিবাদ স্বরূপ তারা অরন্ধন কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।' শয়ে শয়ে মহিলা শোভাযাত্রা করে সমগ্র ক্যাম্প ঘুরে সুপারের অফিসের সামনে এসে অবস্থান বিক্ষোভে যোগ দেয়। তাদের মুখের শ্লোগান ছিল— 'উনুনের হাঁড়ি চড়াবো না, পচা চাল খাবো না।' পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে সুপার মহিলাদের কাছে এসে ভুল স্বীকার করেন।

কুপার্স এবং উইমেন্স কলোনির পাশাপাশি নয়া কল্যাণপুর সমবায় কলোনির কথাও উঠে এসেছে উপন্যাসে। শিবনাথ বসুর নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল এই কলোনি। প্রতিনিয়ত কলোনিতে নিত্য-নতুন উদ্বাস্তুদের আগমন ঘটতে থাকে ফলে প্রয়োজনের তুলনায় জায়গার অভাব দেখা দেয়। তাই সমবায় কলোনির পার্শ্ববর্তী ফাঁকা জমি দখল করে রাতারাতি তারা ঘর তুলে লোকজন বসিয়ে দেয়। জমির মালিকের কাছে এই খবর পৌঁছলে গুণ্ডা দিয়ে তিনি সব ঘরদোর ভেঙেচুরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেন। এক্ষেত্রে শিবনাথ বা তার কলোনি কমিটি প্রতি আক্রমণে যাননি— আইনগতভাবে মোকাবেলার পথ বেছে নিয়েছে। সমিতি থানায় এজাহার দিল এবং সেই সঙ্গে ফৌজদারি মামলা করল। অভিযোগ আনা হল গৃহস্থের ঘরে ঢুকে হামলা, ঘর ভেঙে দেওয়া, লুটপাট, মেয়েদের শ্লীলতাহানি ইত্যাদির। পুলিশি তদন্ত হল। পরিবারগুলো যে এখানে দীর্ঘদিন বসবাস করছে তা বিশ্বাসযোগ্য করতে সমিতি কিছু কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করল। গাছ পুতে রাখল ভাঙা ঘরের

আশেপাশে, কালিমাখা ভাতের হাড়ি রাখল ভাঙা উনুনের উপর, মেঝের মাটিতে গোবর লেপা হল। পারিবারিক জীবনের এই নমুনা প্রমাণ করল উদ্বাস্তুরা দীর্ঘদিন ধরে এখানে বসবাস করছে। এরফলে জমির মালিক জায়গার দখল নিতে পারল না। কলোনি গঠনের ক্ষেত্রে এরকম নতুন নতুন কৌশলের হাজারো উদাহরণ বাস্তব ক্ষেত্রে রয়েছে।

উপন্যাসে নকশাল আন্দোলনের বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন দরিদ্র মানুষের শোষণ মুক্তি প্রসঙ্গে। আমাদের দেশের শতকরা সত্তরভাগ মানুষ চাষি; তাদের ঘরেই অনাহার, তারাই শোষিত হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। চাষিদের মধ্যে তপশিলি সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যা অধিক। সরকার, মহাজন, সবাই মিলে শোষণ করছে তাদের। চাষিদের এই শোষণ বঞ্চনা থেকে মুক্ত করবার জন্য ১৯৬৭ সালের মার্চে শুরু হয় নকশালবাড়ি এলাকায় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন। মধ্যবিত্ত ছাত্রযুবরা ব্যাপকহারে অংশ নিয়েছিল এই আন্দোলনে। ক্রমে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে এই আন্দোলন। চিনের চেয়ারম্যান মাও-সে-তুঙের চিন্তাধারায় পরিচালিত হয় এই আন্দোলন। কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে শিক্ষিত যুবকেরা ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। গেরিলা কৌশলের মাধ্যমে জনযুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তারা। অত্যাচারী জমিদার, জোতদারদের খতম করা শুরু হয়। সেইসঙ্গে শ্রেণি শত্রুর রক্ষাকর্তা পুলিশদের খুন করে লুট করতে থাকল তাদের হাতের বন্দুক। এই অবস্থায় পুলিশ ও বসে থাকল না। সরকারের মদতে পুলিশের হাতে মরতে লাগল অসংখ্য যুবক। কাশীপুর, বরানগর, বারাসাত, ব্যারাকপুর, ডায়মণ্ড হারবার, কোন্নগরের রাস্তায় পাওয়া যেতে লাগল অসংখ্য যুবকের লাশ। গারদ খানা ভরে উঠল হাজার হাজার নকশাল বন্দিতে।

নয়াকল্যাণপুর সমবায় কলোনির পাশে উদ্বাস্তু নমঃশূদ্রদের বাস। এর নাম নমঃপাড়া। এই নমঃপাড়ায় ঘর বেঁধেছে সাপুড়িয়া নিমাই মণ্ডল। সাপ-খেলা দেখানো আর টুকটাক মাদুলি-কবচ বিক্রি করে সংসার চলে নিমাইয়ের। একদিন নৈহাটির পাটকলের এক মজুর খবর দেয় ব্যারাকপুরে গঙ্গার কূলে জঙ্গলে অনেক সাপ। সেই সাপের খোঁজে বেরিয়ে নকশালদের হাতে ধরা পড়ে সে। তারা মনে করে নিমাই পুলিশের চর; তাই তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে নকশালদের একজনকে সাপে কামড়ায়। তাকে চিকিৎসা করে ভালো করে তোলে নিমাই। সে কারণে নিমাইকে তারা ছেড়ে দেয়। নিমাই নিজেকে উদ্বাস্তু হিসেবে তাদের কাছে পরিচয় দেয়। নকশালদের মধ্যেকার একটি ছেলে আস্তে আস্তে বলে— 'আমার বাবাও উদ্বাস্তু ছিল। খুব কষ্ট করেছে এদেশে এসে। খুব কষ্ট করে আমাদের ভাই বোনদের বড়ো করেছে।'[৩৪] — এর থেকে প্রমাণ হয় উদ্বাস্তুদের একটি অংশ

নকশাল বাড়ির এই আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখেছিল।

মহীতোষ বিশ্বাসের 'উচ্ছিন্ন পরবাস' উপন্যাসে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের জীবন সংগ্রাম এবং সেই সঙ্গে বেঁচে থাকার জন্য সংঘবদ্ধ আন্দোলনের কাহিনি ব্যক্ত হয়েছে। লতা, বিনতা, শঙ্করার মত অসংখ্য প্রান্তিক আয়ের উদ্বাস্তু; এরা সকলেই চাল পাচারকারী। কলকাতার বিধিবদ্ধ রেশন এলাকার সামগ্রিক চাল জোগানের ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান এবং অপরিহার্য ভূমিকা গ্রহণ করে এই চাল পাচারকারীরা। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে রাজ্যের খাদ্য সংকট নিয়ন্ত্রণে রাখতে সরকার যে আইন প্রণয়ন করে তা ভেঙে প্রতিনিয়ত এরা ট্রেনে করে চাল নিয়ে কলকাতায় যায়, বিক্রি করে আসে হোটেল মালিক কিংবা শিয়ালদহ সন্নিহিত চালের আড়তে। এনফোর্সমেন্ট বিভাগ থেকে মাঝে মাঝে রেল পুলিশের সহযোগিতায় ট্রেনে অভিযান চালানো হয়। ধরা পড়লে সব নামিয়ে নেয় পুলিশে। তাই সকলেই সতর্ক থাকে— একে অপরকে পুলিশি অভিযান সম্পর্কে খবর দেয়। ট্রেন যাত্রীদের পরিভাষায় এরা চাল পার্টি।

এই চালের কারবারে যুক্ত হয় উমাপতি ঘোষালের মেয়ে বিনতা। দেশবিভাগের ঝাপটায় প্রায় একবস্ত্রে দেশ ছেড়েছিলেন উমাপতি ঘোষাল। রেল লাইন থেকে প্রায় মাইল দুয়েক দূরে সদ্য নির্মীয়মান একটি রিফিউজি কলোনিতে কামড়া-কামড়ি করে এক চিলতে জমি দখল করেছিলেন। ছেলে-মেয়ে এবং নিজেরা ঘরে-বাইরে দুজন— এই চারজনের সংসার। কলোনির প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণের পর সংসার যখন ক্রমে সচ্ছল হয়ে উঠেছে, তখনই স্ত্রী এবং পুত্রের অকাল বিয়োগ ঘটে। এরফলে কন্যা বিনতা তথা বিন্তিকে নিয়ে শুরু হয় জীবনের মহাসংগ্রাম। রোগ-শোকে ঘোষাল মশাই শিক্ষকতার চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন। ফলে অভাবের কারণে স্কুল ছেড়ে দিয়ে বিনতা চালের চোরাচালানে বাধ্য হয়। এই কারবারে এসেই বিনতার সঙ্গে পরিচয় হয় শঙ্করার। শঙ্করাও অনাথ ছেলে। শৈশবে দেশত্যাগ কালে মায়ের হাত ছিটকে হারিয়ে যায়। তারপর নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সে আজ চালের কারবারে নেমেছে— বলা ভালো চাল পার্টির লিডার।

কালগতিতে দিন অতিক্রান্ত হয়। চাল-পাচারকারীদের দলও বৃদ্ধি পায় ক্রমশ। ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও মোটামুটি একটা লাভের সম্ভাবনা, ক্রমবর্ধমান বেকারি প্রভৃতি কারণে এ উপজীবিকাটিতে নতুন মুখের আমদানি হতে থাকে। প্রথমদিকের ভীরুতা, লুকোছাপ ইত্যাদি অন্তর্হিত হয়ে এদের মধ্যে ক্রমশঃ প্রকাশ পেতে লাগল সংঘবদ্ধতা এবং বেপরোয়া মনোভাব। ট্রেনে সমস্ত চালের বস্তা না ওঠা

পর্যন্ত ট্রেনের গার্ডের যোগসাজশে ট্রেন আটকে রাখা, কামরায় ওঠার মুখে চাল ভর্তি বিশালাকৃতি বস্তা সারিবদ্ধ সাজিয়ে রাখা, যাত্রীদের উত্তেজিত মেজাজ দেখানো চাল পার্টিদের আচরণের একটি নিয়মিত বৈশিষ্ট্যে পরিণত হতে লাগল। ফলে যাত্রী অসন্তোষ ক্রমেই বাড়তে থাকে। তা ছাড়া প্রতিনিয়ত পুলিশের হাঙ্গামা— এসব কারণে চাল পার্টির লোকেরা শঙ্করার নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হওয়ার পরিকল্পনা করে। নির্দিষ্ট দিনে সব কাজ বন্ধ রেখে, স্টেশন সংলগ্ন বটতলার মাঠে সন্ধেবেলায় ভিন্ন ভিন্ন বয়সে শ'-দেড়েক নরনারীর সমাবেশ ঘটে। এই সমাবেশ থেকে একদিকে যেমন সংঘবদ্ধতার ডাক দেওয়া হয় তেমনি ইউনিয়ন গড়ার পরিকল্পনা করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয়— 'আজকাল কলকারখানা, অফিস সব জায়গায় ইউনিয়ন তৈরি করছে। ইউনিয়ন গ'ড়ে মালিক অথবা সরকারের কাছ থেকে সুযোগ সুবিধা আদায় করছে। আমাদেরও একটা ইউনিয়ন গড়া দরকার।'[৩৫] সকলে এই প্রস্তাবে সহমত পোষণ করে। সকলের সঙ্গে সকলের যোগাযোগ এবং ঐক্য রক্ষার প্রতি জোর দেওয়া হয়, যাতে কারও কোনও অসুবিধা হলে সবাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে তা দূর করা যায়। তাদের এই ঐক্যের সবচেয়ে বড় কারণ— তারা সকলেই বাস্তুহীন এবং সবার সুখ-দুঃখ একইরকম।

সমাবেশের কয়েকদিন পরেই লতা নামে এক চালের কারবারীর ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু ঘটে। শোনা যায় যাত্রীদের সঙ্গে তার নাকি বচসা হয়, তার চালের বস্তা নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া এবং ধাক্কাধাক্কি করে সংঘবদ্ধ যাত্রীরা, এবং সেই সমবেত প্রতিরোধে আত্মরক্ষায় অসমর্থ চালওয়ালীটি তার চালের বস্তা সমেত চলন্ত ট্রেন থেকে গড়িয়ে নিচে পড়ে। দুর্ঘটনার খবর পৌঁছয় চালপার্টির লোকদের কাছে। তারা শঙ্করার নেতৃত্বে লতাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তার মৃত্যু হয়। পরদিন সকাল থেকে শুরু হয় ট্রেন অবরোধ। ট্রেনের গার্ড নেমে আসে কেবিন থেকে। তাকে দেখেই শ্লোগান তুলল শঙ্করা—

> 'চাল-ব্যবসায়ী লতার মৃত্যু হল কেন— সমবেত জনতা যোগ করে
> জবাব দাও জবাব দাও।
> চাল-ব্যবসায়ী লতার মৃত্যুর বদ্‌লা চাই— জনতার কণ্ঠে তার
> প্রতিধ্বনি— বদলা চাই বদলা চাই।'[৩৬]

ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। রেল-কর্তাদের অনুরোধ উপরোধে ও তারা অবরোধ তুলতে সম্মত হয় না। বাধ্য হয়ে অবরোধকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চায় রেলকর্তারা। শঙ্করা ভাবে অবরোধ ওঠানোর এটা হয়ত নতুন কৌশল, তাই একদিকে অবরোধ কর্মসূচি যেমন চলতে থাকে,

অন্যদিকে চলে সমাধানের উপায় খোঁজা। শেষপর্যন্ত লতার বৃদ্ধ অন্ধ মায়ের জন্য দশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হয় রেলের কর্তারা। চাল পার্টির লোকেরা এই ঘটনায় নিজেদের নৈতিক জয় বলে মনে করে।

চালের চোরাচালানদারদের এই জয়বার্তা রেলস্টেশন সংলগ্ন অঞ্চলে প্রচার লাভ করে ব্যাপকভাবে। প্রচারের নায়ক হিসেবে গুরুত্ব পায় শঙ্করার নামটি। এর প্রকাশ পাওয়া গেল বিশেষ একটি ঘটনায়। স্থানীয় একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের অফিসে ডাক পড়ল শঙ্করার। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা অবরোধের ঘটনার দিনটিতে উপস্থিত ছিলেন প্রায় সারাক্ষণ। নীরব থেকে ঘটনার গতিপ্রকৃতি লক্ষ রাখছিলেন এং পরিশেষে শঙ্করা সম্পর্কে বিশেষ চিন্তা আসে তার মনে। এ ধরনের জঙ্গি ছেলেকে ঠিকমত ট্রেনিং দিতে পারলে সে অবিলম্বে দলের একটি স্তম্ভ বিশেষে পরিণত হতে পারে। তাই হীরুদা নামের নেতা পার্টি অফিসে ডেকে পাঠিয়ে দলের সদস্য করে নেবার প্রস্তাব দেয়। যদিও শঙ্করা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ফিরে আসে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য উদ্বাস্তুদের সম্মিলিত প্রতিবাদ প্রতিরোধ স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গে নানা সামাজিক সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হয়। সেই সময়ে উদ্বাস্তু উপনিবেশ থেকে উঠে এসেছে বহু মানুষ, যারা পরবর্তী সময়ে বাম আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রাজনীতিতে বিশেষ স্থান অধিকার করেছে।

উদ্বাস্তু জীবনের লড়াই-আন্দোলন চলেছে নিরন্তর। একাধারে সরকারের সঙ্গে যেমন তারা আইনি লড়াই চালিয়েছে অন্যদিকে তেমনি পুলিশ, পুনর্বাসন কর্মী ও জমির মালিকদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ লড়াই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। গবেষণার এই অধ্যায়ে আমরা যে উপন্যাসগুলি গ্রহণ করেছি, সেখানে মূলত সম্মিলিত আন্দোলনের কথা উঠে এসেছে। ক্যাম্প-কলোনিগুলিকে মনে হয়েছে গোটা একটি পরিবার, পারস্পরিক সুখ-দুঃখে একে অপরের সমব্যথী। এর কারণ সকলেই গৃহহারা এবং দেশান্তরী মানুষ, তাই নিজের প্রয়োজনে অধিকার আদায়ের লক্ষে পথে নেমেছে তারা।

সরকারি ক্যাম্পের অব্যবস্থার বিরুদ্ধে উদ্বাস্তুদের সংঘবদ্ধ লড়াইয়ের কাহিনি উঠে এসেছে মনোরঞ্জন ব্যাপারীর 'চণ্ডাল জীবন' এবং যতীন বালার 'শিকড় ছেঁড়া জীবন' উপন্যাসে। পাশাপাশি জবরদখল কলোনিতে বসবাসরত উদ্বাস্তুদের সমস্যা ও সংকট নিয়ে রচিত হয়েছে রমেশচন্দ্র সেনের 'পুব থেকে পশ্চিমে' শচীন দাশের 'উদ্বাস্তুনগরীর চাঁদ' এবং 'মানচিত্র বদলে যায়' মহীতোষ বিশ্বাসের 'পরতাল'। 'উচ্ছিন্ন পরবাস' উপন্যাসে ক্যাম্প-কলোনির লড়াই না থাকলেও জীবিকার লড়াইয়ের

কথা গভীরভাবে উঠে এসেছে।

‘চণ্ডাল জীবন’ এবং ‘শিকড় ছেঁড়া জীবন’— উভয় উপন্যাসে লেখকের ব্যক্তি জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে। যেহেতু সরকারি ক্যাম্পের আশ্রয় প্রার্থীদের সিংহভাগই ছিল নিম্নবর্গীয়, তাই ক্যাম্পবাসীর জীবন চিত্র আঁকতে গিয়ে তাঁদের জীবনের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার কথা গভীরভাবে ফুটে উঠেছে। এক্ষেত্রে লেখক দ্বয়ের উপলব্ধি নিম্নবর্গীয় হওয়ার কারণেই তাঁদের প্রতি এতো বঞ্চনা আর সেই বঞ্চনার কারণেই তাঁদের মধ্যে লড়ে আদায় করবার মানসিকতা তৈরি হয়। ‘চণ্ডাল জীবন’ উপন্যাসে গরিব দাসের পরিবার শিয়ালদহ থেকে প্রথমে শিরোমণিপুর ক্যাম্পে স্থান পায়। এই ক্যাম্পের সকলেই নিম্নবর্গীয়। সরকারি সাহায্যে যখন দুবেলা দুমুঠো জুটছিল, তখনই তাদের দণ্ডকারণ্য পাঠানোর পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু কমিউনিস্ট নেতারা তাদের রাজনীতির স্বার্থে উদ্বাস্তুদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আন্দোলনে মদত দেয় এক্ষেত্রে ভোটের রাজনীতি কাজ করেছে বলে লেখকের অভিমত। কিন্তু পুলিশের গুলি, লাঠির আঘাতে শেষ পর্যন্ত সে আন্দোলন ব্যর্থ হয়।

যতীন বালা তার ‘শিকড় ছেঁড়া জীবন’ উপন্যাসে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে নিম্নবর্গীয় উদ্বাস্তুদের প্রতি সরকারের চরম অমানবিকতার কথা শুনিয়েছেন। দশ বছরের ক্যাম্প জীবনে সরকারি নির্দেশে লেখককে তিনবার বাসস্থান পরিবর্তন করতে হয়েছে। এই তিনটি ক্যাম্প যথাক্রমে কুন্তি, ভাণ্ডারহাটি ও বলাগড়। নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রতি সরকারের এই বঞ্চনা পরিকল্পিত বলেই লেখকের মনে হয়েছে। ক্যাম্পের উদ্বাস্তুরা সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেয়েছে। কিন্তু প্রতিবারেই পুলিশি অভিযান সেই প্রতিরোধকে চুরমার করে দিয়েছে এবং নির্দিষ্ট ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে নানা জায়গায়,যাতে তারা সংঘবদ্ধ না হতে পারে। প্রতিবাদ-প্রতিরোধ সত্ত্বেও নিম্নবর্গের উদ্বাস্তুদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন ব্যর্থ হয়। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় তারা।

আমাদের আলোচ্য জবরদখল কলোনি কেন্দ্রিক উপন্যাসগুলিতে লড়াই আন্দোলনের ভিন্নতর ছবি ফুটে উঠেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারি ক্যাম্প-কলোনির আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে; এক্ষেত্রে চিত্রটি একেবারেই উল্টো, সমবেত আন্দোলনের ফলে জবরদখল কলোনির বাসিন্দারা তাদের অধিকার আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। কলকাতা সন্নিহিত অঞ্চলে জমিদার জোতদারদের পতিত জমি দখল করে উদ্বাস্তুরা বাসস্থান নির্মাণ করে। তার জন্যে তাদের যেভাবে লড়তে হয়েছে তা অবর্ণনীয়। কতিপয় লোকের নেতৃত্বে সংঘটিত হয়েছে এই সংগ্রাম। কলোনি তৈরির এই বাস্তব লড়াই বর্ণিত হয়েছে

রমেশচন্দ্র সেনের ‘পুব থেকে পশ্চিমে’, শচীন দাশের ‘উদ্বাস্তু নগরীর চাঁদ’, ‘মানচিত্র বদলে যায়’ উপন্যাসে।

‘পুব থেকে পশ্চিমে’ উপন্যাসে অধ্যাপক নির্মল সেন সহ পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কিছু মানুষ যাদবপুর অঞ্চলে গড়ে তোলে তিলকনগর কলোনি। মহামান্য বালগঙ্গাধর তিলকের নাম অনুসারে কলোনির এই নামকরণ করা হয়। উপন্যাসের বর্ণনা অনুযায়ী সরকার এবং জমিদার উভয়ের সম্মিলিত আক্রমণে উদ্বাস্তুরা কঠিন সংগ্রামের সম্মুখীন হয়। কিন্তু শিক্ষিত ও জোটবদ্ধ উদ্বাস্তু গোষ্ঠীর রণকৌশলের কাছে জমিদার এবং সরকার উভয়েই হার মানে।

‘উদ্বাস্তু নগরীর চাঁদ’ এবং ‘মানচিত্র বদলে যায়’ উপন্যাসে কলোনির নাম উল্লেখ করা হয়নি, তবে বলা হয়েছে কমিটি বাঘাযতীন অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে মহীকান্ত গুপ্ত, তার ভাই নিশিকান্ত অমূল্য এবং আরও কিছু মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে কলোনি রক্ষার আন্দোলন। আর পাঁচটা জবরদখল কলোনির মতো এ কলোনিকে রক্ষা করার জন্য তাদের কঠিন সংগ্রামে নামতে হয়। শেষ পর্যন্ত সব প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে একটি স্থিতিশীল জীবন গড়ে ওঠার চিত্র পাওয়া যায় উপন্যাসে।

মহীতোষ বিশ্বাসের ‘পরতাল’ উপন্যাসে কুপার্স ক্যাম্পে মহিলা শিবিরে আশ্রয় প্রাপ্ত অসহায় মহিলাদের জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। পূর্ববঙ্গে যে নারী ছিল সংসারের অন্দরে, যার ঘর ছিল, স্বামী-সন্তান ছিল, দেশভাগের কারণে সে সব হারিয়ে নিঃসহায় হয়ে গেল। ফলে সরকারের দাক্ষিণ্যে তার মাথা গোঁজার ঠাঁই টুকু জুটল। কিন্তু দৈনন্দিন জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে এই মহিলারা নানা বঞ্চনার শিকার হল। অপর্যাপ্ত আহার, অস্বাস্থ্যকর বাসস্থানকে ঘিরে ক্রমে তারা প্রতিবাদী হতে শুরু করে। তাদের সম্মিলিত প্রতিবাদ ক্যাম্পের জীবনে নতুন মাত্রা আনে। ক্যাম্পের দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিক চাপের মুখে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয়। বাস্তব ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই। ক্যাম্পে আশ্রয়প্রাপ্ত এই মহিলারা পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক অঙ্গনে লড়াকু মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে এসেছে। বাম আন্দোলনের প্রসারের ক্ষেত্রে এরাই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

মহীতোষ বিশ্বাসের ‘উচ্ছিন্ন পরবাস’ উপন্যাসে লড়াই সংগ্রামের অভিমুখ ছিল ভিন্ন ধরনের। দেশভাগ পরবর্তী সময়ে উদ্বাস্তুদের বেঁচে থাকাই ছিল মূল লক্ষ। সুতরাং বাঁচার তাগিদে তারা ন্যায়-অন্যায়ের বাছ-বিচার করার সুযোগ পায়নি— যে কোনও পেশাকে সাদরে গ্রহণ করেছে। অভাবের তাড়নায় উমাপতি ঘোষালের মত সম্ভ্রান্ত মানুষের মেয়েকে চালের চোরা চালানের সঙ্গে যুক্ত হতে

হয়েছে; আবার শঙ্করার মত ছেলে সমাজ বিরোধী হয়ে উঠেছে। সরকারের আইন উপেক্ষা করে চাল ব্ল্যাকের পেশা গ্রহণ করেছে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। নিজেদের প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তারা ইউনিয়ন গঠনের পরিকল্পনা করেছে। তাদের একজন চাল-কারবারীকে ট্রেন থেকে ঠেলে ফেলে খুন করার প্রতিবাদে ট্রেন অবরোধ করেছে। বাধ্য হয়ে রেল কর্তৃপক্ষ দশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেবার কথা ঘোষণা করেছে। লতার মৃত্যুতে তারা প্রমাণ করে দেয় সংঘবদ্ধ আন্দোলন অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকরী।

আলোচ্য উপন্যাসগুলির দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় সরকারি কলোনির আন্দোলন পুলিশ ও প্রশাসনের চাপে ধূলিসাৎ হয়ে যায়, কারণ ক্যাম্পের জীবনযাত্রা ছিল সরকার নিয়ন্ত্রিত এবং একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে। ফলে ক্যাম্পের-সংঘটিত হওয়া আন্দোলন সরকার শক্ত হাতে দমন করতে পেরেছে। আবার জবর-দখল কলোনিগুলি সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল না তাই তারা সংঘবদ্ধভাবে লড়াই করে অধিকার ছিনিয়ে আনে। শেষ পর্যন্ত সরকার নমনীয় হয়ে উদ্বাস্তুদের জমির অধিকার মেনে নেয়। এই জয় তাদের কাছে পরবর্তী জীবনের পাথেয় হয়ে দেখা দিয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. অনিল সিংহ, *পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু উপনিবেশ*, বুক ক্লাব, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ১৭

২. অনিল সিংহ, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ৩৭

৩. মনোরঞ্জন ব্যাপারী, *চণ্ডাল জীবন*, প্রিয় শিল্প, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৯০

৪. মনোরঞ্জন ব্যাপারী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৯৭

৫. মনোরঞ্জন ব্যাপারী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১০৫

৬. মনোরঞ্জন ব্যাপারী, 'অনন্ত রাত্রির চণ্ডাল', মধুময় পাল (সম্পা.), *দেশভাগ বিনাশ ও বিনির্মাণ*, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ২২০

৭. মনোরঞ্জন ব্যাপারী, *চণ্ডাল জীবন*, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১০৮

৮. মধুময় পাল (সম্পা.), *দেশভাগ বিনাশ ও বিনির্মাণ*, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১১, ভূমিকা

৯. মনোরঞ্জন ব্যাপারী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৬৩

১০. যতীন বালা, 'যশোরের স্মৃতি ও উদ্বাস্তু ক্যাম্পের জীবন', মননকুমার মণ্ডল (সম্পা.), *পার্টিশন সাহিত্য দেশকাল স্মৃতি*, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ২৫৩

১১. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *উদ্বাস্তু*, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ. ১৯৬

১২. যতীন বালা, *শিকড় ছেঁড়া জীবন*, চতুর্থ দুনিয়া, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ২৪১

১৩. যতীন বালা, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৯৮

১৪. মৃন্ময় প্রামাণিক, 'দেশভাগ, উদ্বাস্তু জীবন ও বাংলার দলিত শ্রেণি : একটি প্রান্তিক ইতিহাসের সন্ধান", মননকুমার মণ্ডল (সম্পা.), *পার্টিশন সাহিত্য দেশ কাল স্মৃতি*, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ২৮৭

১৫. তুষারকান্তি মুখোপাধ্যায়, 'অভিযোজিত অস্তিত্বের সন্ধানে রমেশচন্দ্র সেনের পুব থেকে পশ্চিমে', উদয়চাঁদ দাশ ও অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), *দেশবিভাগ ও বাংলা উপন্যাস*, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, বর্ধমান, ২০০৫, পৃ. ২২২

১৬. রমেশচন্দ্র সেন, *পুব থেকে পশ্চিমে*, ভারতী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১১৪

১৭. প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, *প্রান্তিক মানব*, প্রতিক্ষণ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৬৫

১৮. রমেশচন্দ্র সেন, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৩৫

১৯. শচীন দাশ, *উদ্বাস্তু নগরীর চাঁদ*, দে'জ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৩০-৩১

২০. জনেশ বসু, 'জবরদখল : সেদিনের পশ্চিমবঙ্গ", বাদল বসু (সম্পা.), *জনজীবন*, চতুর্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা, হাবড়া, ২০১০, পৃ. ৮৬

২১. শচীন দাশ, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ২১০-২১১

২২. শচীন দাশ, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ২৬৭

২৩. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *উদ্বাস্তু*, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ. ৬৪

২৪. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ৬১

২৫. শচীন দাশ, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ২৬৯

২৬. শচীন দাশ, *মানচিত্র বদলে যায়*, দে'জ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ২৫৬

২৭. জীবন বসু, *কলোনির কথা*, মায়া, প্রথম প্রকাশ, বারাসত, ১৯৯৮, পৃ. ৩৮

২৮. শচীন দাশ, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ২৭৫

২৯. শচীন দাশ, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ৪৮২

৩০. নারায়ণ বসু (সাক্ষাৎকার), বয়স-৮১, বহিরাগত হিন্দু কলোনি দমদম, উত্তর ২৪ পরঘণা, সাক্ষাৎকার গ্রহণ ১২.০২.২০১২

৩১. শচীন দাশ, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৯০

৩২. মহীতোষ বিশ্বাস, '*পরতাল*, একবিংশ,প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৫১

৩৩. মহীতোষ বিশ্বাস, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৭৫

৩৪. মহীতোষ বিশ্বাস, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৩৪৫

৩৫. মহীতোষ বিশ্বাস, *উচ্ছিন্ন পরবাস*, গ্রন্থতীর্থ, সর্বাধুনিক সংস্করণ, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৫৭

৩৬. মহীতোষ বিশ্বাস, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৭৩

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবনের স্মৃতি

দেশান্তরী মানুষের জীবনধারা নিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যে মাটিতে তার জন্ম, বেড়ে ওঠা, তার চারপাশের মানুষ-জন, জল-হাওয়া, নদী-নালা, গাছপালা, পাহাড়, জঙ্গল, জলাভূমির সঙ্গে নাড়ির যোগসূত্র গড়ে ওঠে। গড়ে ওঠে তার সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল: রুচি, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, সংস্কারসহ জীবনধারণের নানা প্রক্রিয়া। সেই পিতৃ-পিতামহের পূণ্য স্মৃতিজড়িত বাস্তুভিটে ত্যাগ করে দেশের সীমানা অতিক্রম করে নতুন করে যখন বসতি গড়তে হয়, তখন না থাকে তার অতীত স্বীকৃতি, না থাকে স্থির ভবিষ্যৎ। তাই স্মৃতি তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।

স্বাধীনতা এবং দেশভাগ পরবর্তী সময়ে অগণিত মানুষ পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে যায়; সংখ্যায় কম হলেও পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষ থেকেও কিছু মানুষ চলে আসে পূর্ববঙ্গে। উভয়বঙ্গের মানুষের কাছে এই দেশান্তর বেদনার। এই বেদনাজনিত স্মৃতির অভিমুখ ত্রিমাত্রিক—

i. অতীত জীবনের বিপর্যয় ও তিক্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতি;
ii. ফেলে আসা জীবনের মধুর স্মৃতি রোমন্থন;
iii. বর্তমান জীবনের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে অতীতকে বৃহৎ করে দেখা।

দেশভাগ উত্তর সময়ে উদ্বাস্তুরা সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা— উভয় পরিস্থিতিতে স্মৃতির ঝাঁপি খুলে বসে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তবের সঙ্গে স্মৃতির অ-মিল লক্ষিত হয়। বিশেষ করে ঘটনার সময়ে কিংবা তার পর পরই যদি লিখে রাখা না হয় তাহলে সেখানে তথ্য বিকৃত হবার সম্ভাবনা থাকে। এ-ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি দেশভাগ পরবর্তী সময়ে উদ্বাস্তুদের আবছা স্মৃতি অনেকাংশে অতিরঞ্জিত হয়েছে। বর্ণনার ক্ষেত্রে আবেগ-তাড়িত হয়ে কিংবা স্মৃতিভ্রংশতার কারণে অতিরঞ্জন কিংবা বিকৃতি থাকলেও বিচ্ছেদের বেদনা যে তাকে সারা জীবন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় তা দেশান্তরী মানুষের সঙ্গে কথা বললেই বোঝা যায়। এই বিচ্ছেদের বিষয়ে এডোয়ার্ড সয়ীদ লিখেছেন— 'Its essential sadness can never be surmounted.'[১]

গবেষণার এই অংশের বিষয়বস্তু দেশবিভাগ কেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাসের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন উদ্বাস্তু চরিত্রের স্মৃতির রোমন্থন। পূর্ববঙ্গে তাদের ফেলে আসা জীবনের যে টুকরো টুকরো তিক্ত কিংবা মধুর স্মৃতি উপন্যাসের কাহিনিতে উঠে এসেছে তাকে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে

এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন গবেষণার এই অংশে স্মৃতিকথা কিংবা আত্মকথামূলক গ্রন্থগুলিকে গ্রহণ করা হয়নি।

প্রফুল্ল রায়ের ‘নোনা জল মিঠে মাটি’ উপন্যাসে পাল সাহেবের স্মৃতিতে ভেসে উঠেছে পূর্ববঙ্গের কথা। পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহের বাসিন্দা পাল সাহেব। জমিজায়গা সংক্রান্ত ব্যাপারে দাঙ্গা ও খুনের অপরাধে তাঁর পঁচিশ বছরের দ্বীপান্তরী সাজা হয়। সেলুলার জেলে দুমাস বিশ দিন মেয়াদ খেটে ‘আন্দামান রিলিজ’ নিয়ে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাজে নিযুক্ত হন। সাজার মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও পাল সাহেব দেশে ফিরে যাননি। পরবর্তী সময়ে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তর তাকে পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল মানুষদের জন্য কাজের দায়িত্ব দিয়ে পাঠায়। পোর্টব্লেয়ার থেকে শ-খানেক মাইল দূরে এরিয়াল বে তীরবর্তী এই দ্বীপে পুনর্বাসনের কাজের প্রধান দায়িত্বে থাকেন পাল সাহেব। তার পদের পোষাকী নাম ‘কলোনাইজেশন অ্যাসিসট্যান্ট’। সংক্ষেপে সি.এ। দীর্ঘকাল আন্দামানে কাটানোর পর দেশের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন পাল সাহেব। কিন্তু উদ্বাস্তুরা দ্বীপে আসার পর ফেলে আসা জীবনের স্মৃতি আবছায়ার মত ভেসে ওঠে। ‘দুপুরে রোদে ঢেউ টিনের চালাটা পালিশ করা রূপোর মত জ্বলত। কোথায় যেন ঘু ঘু ডাকত।... কৃষাণ সর্বাঙ্গে মাটি মেখে কাঁদে লাঙল ফেলে ফিরে আসত।... কোমলমুখী বউ তখন গোলগাল নাদুস নুদুস ছেলে কোলে নিয়ে বসেছে বাতাবী লেবুর ছায়ায়।’[২] আচ্ছন্ন স্মৃতির গভীর থেকে মাঝে মাঝে এখনও সেই বউ, ভরদুপুরের ঘুঘুর ডাক, সেই মুগ্ধ কৃষাণের ছবি ভেসে ওঠে। কোথায় কত দূরে তাদের ফেলে এসেছে, ঠিক করে উঠতে পারেন না পাল সাহেব।

উপন্যাসে সংসার বিবাগি উদ্ধব বৈরাগীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়; সঙ্গীতই তার সাধনা, গৃহকর্মে বিশেষ মন নেই। উদ্বাস্তুদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে সে গান করে। বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে আসার আগে অন্য এক জীবন ছিল উদ্ধবের। সেই জীবনের স্মৃতি ভেসে ওঠে মানস পটে। মনে পড়ে পূর্ববঙ্গের সেই জিরানিয়া গ্রামের কথা ‘গ্রামের শিয়র ঘেঁষে একটি মাঝারি নদী তির তির করে বয়ে যেত। নদীর নাম ধলেশ্বরী।... নদীর পারে কত যে হিজল গাছ তার লেখাজোখা নেই। ধলেশ্বরীর জল যেমন মিঠে, হিজলের ছায়া তেমনি মিঠে। হিজলের ঠাণ্ডা ছায়ায় জিরানিয়া গ্রামটি জুড়িয়ে থাকত।’[৩] এই বিদেশ বিভুঁইয়ে মন টেকে না তার। এখানে চেনা পড়শি নেই, পরিচিত সমাজ নেই, মন খুলে কথা বলার লোকের বড় অভাব। তাই গান গেয়ে সব কিছুকে ভুলে থাকতে চায় সে। কিন্তু বারবার ঘুরে ফিরে আসে পূর্ববঙ্গের পল্লির প্রকৃতি।

আন্দামানে নির্বাসিত হওয়া নিত্য ঢালীর মেয়ে কাপাসীর অতীত জীবনের বিপর্যয়ের স্মৃতি বিবৃত হয়েছে এই উপন্যাসে। পূর্ববঙ্গের এক নিম্নবর্গের বিত্তহীন পরিবারের লোক নিত্য ঢালী। দেশভাগ পরবর্তী দাঙ্গার সময়ে নিত্য ঢালীর গ্রাম আক্রান্ত হয়। হামলাকারীদের নজর পড়ে তার যুবতী মেয়ে কাপাসীর উপর। দিনের পর দিন ধরে তার শরীরের উপর অত্যাচার চলে। অবশেষে মেয়ে যখন ফিরে আসে তখন সে যেন অন্য কাপাসী— কারও সঙ্গে কথা বলতে চায় না, যখন তখন খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে, একা একা বিড় বিড় করে কথা বলে; কারও বারণ শোনে না। মেয়ের শোক নিত্য ঢালীকে অথর্ব করে দিয়েছে। আন্দামানের এক শেল ব্যবসায়ী পানিকর কাপাসীকে পাচার করার উদ্দেশ্যে নৌকায় তুললে কাপাসী জলে ঝাপিয়ে পড়ে। জল থেকে তাকে উদ্ধার করা হলে কাপাসী ক্রমে সুস্থ হয়ে ওঠে। তার হারানো স্মৃতি স্পষ্ট হতে শুরু করে। আচ্ছন্নভাবে তাড়িত কাপাসীর মনে পড়ে টুকরো টুকরো শিথিল কতগুলি ছবি— 'কোথায় যেন একটা চর ছিল। ছোট একটা দোচালা ঘরে তাকে আটকে রাখা হয়েছিল। একদিন, দুদিন, দুমাস, এক বছর— কত দিন যে সে এখানে বন্দী হয়ে ছিল মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে কারা যেন তার কাছে আসত। তারা এলেই সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলত।'[৪]

কাপাসী এখন আর হাসে না, সারাদিন মুখ লুকিয়ে কাঁদে আর মন মরা হয়ে বসে থাকে। তার ভালোবাসার মানুষ হারাণ অতীত স্মৃতিকে ভুলিয়ে দিতে পাশে এসে দাঁড়ায়। হারাণ বলে— 'জীবনে কিছুই নষ্ট হয় না। ধৈর্য ধর, মনের বুঝ মানাও।' হারাণের গলা তার কাছে পরম আশ্বাসের মত শোনায়। উপন্যাসে পুরোনো বিষাদময় স্মৃতি মুছে গিয়ে নতুন স্বপ্নে বিভোর হওয়ার ছবি ফুটে উঠেছে।

বাংলা-বিহার সীমান্তে পরিত্যক্ত সেনানিবাসে গড়ে ওঠা পি.এল ক্যাম্পের কাহিনি নিয়ে নারায়ণ সান্যাল রচনা করেছেন 'বকুলতলা পি.এল. ক্যাম্প' উপন্যাস। এই ক্যাম্পের সকলেই পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু— নদী মাতৃক দেশের বাসিন্দা। খাল-বিল-জল-জঙ্গলের সঙ্গে তাদের আজন্মের সম্পর্ক। কিন্তু তাদের যেখানে বসতি দেওয়া হয়েছে সে অঞ্চল রুক্ষ-শুষ্ক পাথর-কাঁকড়ে ভরপুর। ক্যাম্পের বাসিন্দাদের জলের প্রয়োজন মেটাতে বসানো হয়েছে নলকূপ। ক্যাম্প অঞ্চলে রয়েছে একটিমাত্র পুকুর। নলকূপের জলে তাদের তৃষ্ণা মেটে, কিন্তু প্রাণ ভরে না। তারা অলস জীবনে পুকুরের ঢালু পাড়ে এসে বসে সময় কাটায়; একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে পুকুরের দিকে। বালক, কিশোরেরা যেমন দেশের বাড়ির পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ত তেমনি ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কাটে 'ঐ একফোঁটা গোস্পদই আজ পদ্মা-মেঘনা-যমুনা-আড়িয়াল খাঁ বিধৌত গ্রামবাসীর সান্ত্বনা।'[৫]

কলকাতার ছেলে ঋতব্রত এই ক্যাম্পের ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজে যোগদান করেছে। ক্যাম্পের বাসিন্দাদের সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক। কাজের অবসরে সে উদ্বাস্তুদের ব্যক্তিগত সমস্যা শোনে। উপন্যাসে ঋতব্রতের কাছে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ রামনিধি চৌধুরীর অতীত জীবনের কাহিনি বলতে শোনা যায়। গল্প করতে করতে তিনি পৌঁছে গিয়েছেন তার প্রিয় মাতৃভূমিতে। বংশ পরম্পরায় তার পরিবার পেশায় পুরোহিত। ঘরে প্রতিষ্ঠিত সাত পুরুষের নারায়ণ। পিতা-প্রপিতামহের আমল থেকে তার পরিবার রাণিপুরের জমিদারের মাসোহারা পায়। স্মৃতির পথ ধরে তিনি পৌঁছে যান প্রকাণ্ড সেই রাণিপুরের জমিদার বাড়িতে— সামনে বার-মহল, এপাশে কাছারি— তারপর একটা বিরাট অঙ্গন পার হয়ে আসতে হত অন্দরে। বলতে বলতে রামনিধি বিমর্ষ হয়ে পড়েন। ঋতব্রত রামনিধির কাছে তার ব্যক্তিজীবনের কথা শুনতে চাইলে গভীরভাবে ফুটে ওঠে পূর্ববঙ্গের চিত্র। যে মাঠে কবাডি খেলত ছেলেরা ফাল্গুন-চৈত্র মাসে, বর্ষায় সেখানেই অগাধ ঘোলা জল ঘূর্ণিপাক খায়। জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ে ধানের চারা। সেই ধান যখন পাকে, নৌকো করে কাটতে যেতে হয়। সেই জল একদিন সরে যায়, পলির চাদর মুড়ি দিয়ে জেগে ওঠে তলাকার মাটি। 'আর সেই সঙ্গে আকাশে এসে জোট পাকায় পুঞ্জ পুঞ্জ তুলো পেঁজা মেঘ। নৌকো ছেড়ে পথে পা দেয় মানুষ। এই মহালগ্নেই হয় মায়ের বোধন। সে মহাপূজার আনন্দ কোথায় পাবেন?

গলাভারি হয়ে আসে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের। যুক্তকর কপালে ঠেকান তিনি।'[৬]

পূর্ববঙ্গের এক কালের দুর্ধর্ষ জমিদার যিনি বর্তমানে পক্ষাঘাতগ্রস্ত, তিনিও তার অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করেন— 'নিজ পরিবার-সাম্রাজ্যে ছিল তারা সার্বভৌম সম্রাট। আজ পড়ে আছে শুধু পরমুখাপেক্ষী পক্ষাঘাতগ্রস্ত শেষের দিনগুলি।'[৭]

কাহিনি, উপ-কাহিনির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায় উপন্যাস। ক্রমে এখানকার উদ্বাস্তুরা একটি স্থিতিশীল জীবনের সন্ধান পায়, কিন্তু মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা পূর্ববঙ্গের স্মৃতি ভেসে ওঠে বারবার।

প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকো' উপন্যাস বিনু তথা বিনয়ের বাল্য ও কৈশোরের স্মৃতির উপাদান নিয়ে গড়ে উঠেছে। একটি বালক ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার নিজস্ব বাসভূমির অভিজ্ঞতা, সেই বাসভূমি হারানোর যন্ত্রণা এবং পরবর্তী জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে উদ্বাস্তু জীবনের নানা অভিমুখ প্রকাশিত হয়েছে।

চল্লিশের দশকে অবনীমোহন তার তিন সন্তান বিনু ওরফে বিনয়, সুনীতি, সুধা এবং স্ত্রী সুরমাকে

নিয়ে কলকাতা থেকে বিনুর দাদুর (মায়ের মামা) বাড়ি পূর্ববঙ্গের রাজদিয়াতে আসেন। পূর্ববঙ্গের গ্রাম, সেখানকার মানুষ, নদী-নালা-খাল-বিল, শান্ত জনজীবন দেখে ভালো লাগে অবনীমোহনের। তাই এখানেই ছেলে-মেয়ে স্ত্রীকে নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। বিনু ও তার দিদিরা স্কুল-কলেজে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যায়। বিনুর দাদু হেমকান্ত মিত্র রাজদিয়া অঞ্চলের অত্যন্ত সম্মানীয় একজন মানুষ। এলাকার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তাকে শ্রদ্ধা করে। বিনয়ের বাবা অবনীমোহনও ক্রমে এলাকায় পরিচিত জন হয়ে ওঠেন। বিনয়ের বন্ধু মহল তৈরি হয়। ইতিমধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলন শেষপর্যায়ে পৌঁছোয়; চারিদিকে দাঙ্গা শুরু হয়। অবশেষে স্বাধীনতা আসে এবং সেই সঙ্গে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হয়। এতদিন যে মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে ছিল অবহেলিত তারা নিজেদের অধিকার আদায় এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নানাভাবে অত্যাচার শুরু করে, ফলে হিন্দুদের সেখানে বসবাস করাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

ইতিমধ্যে বিনয়ের দাদু হেমনাথের বাড়িতে আশ্রিতা ঝিনুক তার বাবার সঙ্গে ঢাকায় গিয়ে ধর্ষিতা হয়। মানবিক কারণে বিনয় তাকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসে। কিন্তু কিশোর বয়সের সেই স্মৃতিগুলি তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। পূর্ববঙ্গের রাজদিয়ায় নির্জন দুপুরে সমবয়সি ঝুমাকে (জামাইবাবুর ভাগিনী) নিয়ে শাপলা আর জলপদ্ম তোলা, কাউফল পাড়তে গিয়ে ডাল ভেঙে মাটিতে পড়া, বাড়ির কামলা (সর্বক্ষণের গৃহভৃত্য) যুগলের সঙ্গে নদী পেরিয়ে সুজনগঞ্জের হাটে যাত্রা শুনতে যাবার পরিকল্পনা, স্কুল ছুটির পরে কিংবা কোনও কোনও দিন ক্লাস কামাই করে তীব্র এক আকর্ষণে ঝুমাদের বাড়িতে ছুটে যাওয়া— এসব স্মৃতি জ্বল-জ্বল করে ওঠে।

ধর্ষিতা ঝিনুককে নিয়ে বিনয় তার দিদি সুধার কলকাতার বাড়িতে গিয়ে ওঠে। ঝিনুকের মনে বারবার ফিরে আসে পূর্ববঙ্গের সেই অত্যাচারের স্মৃতি। সে বিমর্ষ হয়ে থাকে সারাদিন। তার অতীত স্মৃতি ভুলিয়ে দিতে সুধা ঝিনুককে নিয়ে গল্পে মেতে ওঠে। বেশিরভাগই রাজদিয়ার গল্প। 'সেখানকার খাল-বিল-নদী, ধানের খেত, পাটের খেত, যাত্রাগান, সারিগান, পুজোর সময় সারা রাজদিয়ায় টহল দিয়ে সাতখানা প্রতিমা বারবার দেখা, নবমী নিশিতে 'বিজয়া', কি 'মেবার পতন' নাটক, দশমীর পরদিন নদীতে নৌকো বাইচ, কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোয় বাড়ি বাড়ি প্রসাদ খেয়ে বেড়ানো'[৮]— এই সবই ঘুরে ফিরে আসে। কিন্তু অতীতের গ্লানিকে ভুলতে না পারার কারণে 'রাজাদিয়ার রাজেকের নৌকোয় ওঠার পর থেকে কেঁদেই চলেছে ঝিনুক। ত্রাসে। আতঙ্কে।'[৯] ঝিনুককে নিয়ে প্রথম বিনয় তার দিদি সুনীতিদের বাড়িতে উঠেছিল। সেখানে দিদির শাশুড়ি হেমনলিনী ঝিনুকের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলেছে।

ঠাকুর ঘর উপরে থাকায় সেখানে তাকে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে যেমন তার অতীত স্মৃতি সামনে এসেছে। তেমনি সুধার স্নেহের স্পর্শ-তাকে অতীত দিনের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।

উপন্যাসে হেমনাথের গৃহভৃত্য যুগল দেশত্যাগ করে আসার পর স্মৃতির ভারে আক্রান্ত। বহু সংগ্রাম করে সে কলকাতার উপকণ্ঠে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের নিয়ে কলোনি গড়ে তুলেছে। বর্তমানে সে কলোনির নেতা, স্বাধীনভাবে তার জীবন-যাপন, অর্থনৈতিক ভাবেও সচ্ছল। তবু এই সচ্ছলতা তাকে খুশি করতে পারে না। 'কলকাতা কেমন লাগছে', বিনুর এই প্রশ্নের উত্তরে যুগল জানায়— 'ভালো না ছুটোবাবু। পদ্মা নাই, ম্যাঘনা নাই, ধলেশ্বরী নাই, কালাবদর নাই, আইড়ল খাঁ নাই— এটা এট্টা দ্যাশ হইল! কইলকাতার কিনার দিয়া বড় একহান খাল চইলা গ্যাছে হেইটার নাম গঙ্গা। এই নাকি নদী! শুইনা আমি আটাস (অবাক)। ইচ্ছা হয় এই পারের মানুষগুলারে ঘেটি ধইরা উইপারে লইয়া গিয়া দেখাই নদী কারে কয়।'[১০] এ প্রসঙ্গে অশ্রুকুমার সিকদারের মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— উত্তরকালে উদ্বাস্তুরা জীবনে যতোই সাফল্য পাক, সেই সাফল্য চিরকালের জন্য ক্ষুণ্ণ হয়ে যায়, পিছনে ফেলে আসা অস্তিত্বের দরুণ।[১১] বর্তমানের সমৃদ্ধ ও নিরাপদ জীবনে তারা যে সুখী নয়, তা দেখে বিস্মিত হতে হয়। আরও বিস্ময় জাগে যখন দেখা যায় তারা কেবল পূর্ববঙ্গের সুদূর অতীতের স্মৃতিমণ্ডিত জগতে নয়, ফিরতে চায় শরণার্থী জীবনের প্রথম দুর্দশা-ক্লিষ্ট দিনগুলিতে।[১২]

শৈশবে দেখা যুগলকে দেখে ঝিনুক আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু যুগল ঝিনুকের অতীত স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলে— রাজদিয়ায় থাকতে তার কাছে ঝিনুক কত না আবদার করেছে কত যে বায়না মেটাতে হয়েছে তাকে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। আকাশ উঁচু গাছের মাথা থেকে তাকে পেড়ে আনতে হয়েছে কাউফল, বিলিতিগাব, থোকা থোকা বেত ফল। কখনও হলুদ রঙের বোয়াইল, পাকা কুল ডেইয়া, কামরাঙা, কখন বা অথৈ জল থেকে তুলে আনতে হয়েছে শাপলা শালুক অথবা জলপদ্ম। 'ভাসানের পরদিন হেমনাথের সঙ্গে ঝিনুক যখন বড় গাঙে যেত, সেই নৌকো বেয়ে নিয়ে যেত কে? যুগল। চৈত্র সংক্রান্তির মেলায় যখন কাঠের পুতুল, জ্যান্ত টিয়া পাখি বা তিলা কদমা, চিনির মঠ কিনতে যেত, সঙ্গে থাকত কে? যুগল।'[১৩] এই ছোট ছোট ঘটনা, টুকরো টুকরো আনন্দের স্মৃতি, সারি সারি স্বপ্ন-দৃশ্য টেনে নিয়ে যায় পূর্ববঙ্গের সেই গ্রামে। এই সরল অকপট, মারপ্যাঁচহীন যুবকের স্মৃতিচারণায় ঝিনুকের সব আড়ষ্টতা উধাও হয়ে যায়। ঝিনুককে স্বপ্নের রাজ্যে টেনে আনে যুগল।

এইরকম হারিয়ে যাওয়া অনেক ঘটনার কথা, বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত, আলোড়ন তোলে ছিন্নমূল মানুষের মনে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য— শুধু নস্ট্যালজিয়া এই উপন্যাসের শেষ কথা নয়, কঠোর বাস্তব ইতিহাসের নিষ্ঠুর তথ্য এখানে স্বীকৃত। কিন্তু তাকে ছাপিয়ে গিয়েছে লেখকের মমতা দেশের প্রতি, সমকালের প্রতি, গ্রাম্য জীবন ও সাধারণ মানুষের প্রতি।[১৪]

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বাস্তু জীবনের পটভূমিকায় রচনা করেছেন 'মানুষের ঘরবাড়ি' উপন্যাস। এখানে পূর্ব-পাকিস্তান ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে আসা বিলুদের বিভিন্ন রকম সমস্যা চিত্রিত হয়েছে। সমস্যাগুলি প্রধানত বাসস্থানের, খাদ্যের, সর্বোপরি অস্তিত্বের। দেশ ছেড়ে এসে বিলুদের কাটাতে হয়েছে স্টেশনে, খোলা আকাশের নিচে কিংবা পরিত্যক্ত কোনও মন্দিরে। দেশত্যাগের পর এই কঠিন পরিস্থিতিতে বিলুর আক্ষেপ— 'এদেশে এসেই আমার বাবা গরীব হয়ে গেলেন। হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলাম দেশে থাকতে আমরা এতটা গরীব ছিলাম না।... এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা— কখনো কোনো প্ল্যাটফর্মে অথবা ভাঙা মন্দিরে পরিত্যক্ত কারো আবাসে থাকতে থাকতে কিছুটা যাযাবরের মতো জীবন বয়ে যাচ্ছিল।'[১৫] অথচ এই মানুষগুলির পূর্ববঙ্গে নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল, স্থিতিশীল জীবন ছিল।

প্রায় সহায়-সম্বলহীন মানুষগুলি এদেশে এসে খাদ্য সমস্যার সম্মুখীন হয়। বিলুরা বহু দিন উপোস করে থেকেছে, কখনও লোকের গাছের শশা চুরি করে খেয়েছে কতদিন যে পেঁপে সেদ্ধ, গাছের ফল-মূল খেয়ে থেকেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। ভাত হলেও বেশিরভাগ জল; কখনও মেটে আলু সেদ্ধ খেয়ে তাদের দিন কেটেছে। বিলুর বাবা যদি কোনও যজমান বাড়ি থেকে কিছু আনতে পেরেছেন তখন তারা পেট ভরে খেয়েছে। এই অনিশ্চিত জীবনের ছবি বিলুর কথায় ফুটে ওঠে— 'আমাদের খাওয়া-দাওয়াটা এখন কোন নিয়ম মাফিক ব্যাপার নয়। ভাত খাওয়াটা আমাদের কাছে ভোজের ব্যাপার।'[১৬]

পূর্ববঙ্গে যথেষ্ট মান-সম্মানের অধিকারী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরাও এদেশে এসে চরম বিপন্নতার মধ্যে এসে পড়ে। বিলুর বাবা ওদেশে জমিদারের গোমস্তা ছিলেন এবং যজনযাজন করেও কিছু উপার্জন করতেন। এদেশে এসে সেই পৌরহিত্যের কাজও ঠিকমতো জোটে না। স্নানের ঘাটে জোরে জোরে স্তোত্র পাঠ করেন— বিলুর বাবার মনে ক্ষীণ আশা ঠিক খবর পৌঁছে যাবে ঘরে ঘরে— লাইন দিয়ে আসবে মানুষজন। এই অঞ্চলের যাবতীয় পূজা-পার্বনে ডাক পড়বে। কিন্তু কোথাও কারও

দেখা মেলে না। এই অসহায় অবস্থায় বিলুর বাবার পিসতুতো ভাই মনু কাকার বহরমপুরের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিলে সেখানেও তাদের অবজ্ঞার শিকার হতে হয়।

এদেশে এসে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অবহেলা-অবমাননা পেয়ে মাঝে মাঝেই বিলুর মন ফিরে যায় পূর্ববঙ্গের মাটিতে। স্মৃতিমধুর অতীতের কথা মনে পড়ে যায়— 'আমাদের আবাস ছিল একটা। সেখানে সিউলি ফুলের গাছ ছিল। শরৎকালে আমরা ভাই বোনেরা মিলে পদ্ম তুলেছি। শতদলপদ্ম গাছ থেকে পদ্ম তুলেছি। বাবা হাট থেকে তাজা আস্ত ইলিশ মাছ কিনে এনেছেন। বাড়িতে লক্ষ্মীপূজা হয়েছে। আমের দিনে আম, লিচুর দিনে লিচু পেট ভরে খেয়েছি।'[১৭] উপন্যাসটিতে উদ্বাস্তু মানুষের নানা সংকট এবং পূর্ববঙ্গের জন্য নানা আক্ষেপ থাকলেও বিলুর প্রতিষ্ঠিত হওয়া বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'নির্বাস' উপন্যাসে পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল মানুষের আশ্রয় গ্রহণ এবং তাদের জীবনের নানা বিপর্যয়ের প্রতিচ্ছবি প্রস্ফুটিত হয়েছে, সেই সঙ্গে অতীত স্মৃতির প্রসঙ্গ এসেছে ঘুরে ফিরে। উপন্যাসের সব চরিত্রই জলের দেশের মানুষ; নদী-নালা বেষ্টিত তাদের জীবন। এই শুকনো খটখটে দেশে তাদের মন টেকে না। পদ্মা তাদের মহাশিরা. পদ্মার সঙ্গে তাদের বেঁচে থাকার যোগ। সবাই হয়তো জেলে নয়, আবার পদ্মার পলি জমিকে উর্বর করবে এমন কৃষকও নয় সবাই। পদ্মা যা কিছু দেয়, মাঝে মাঝে তার থেকেও অধিক কেড়ে নেয়। তবু তারা পদ্মার কাছেই থাকতে চায়। ঔপন্যাসিকের কথায় 'মাঝে মাঝে অভিশাপের মতো এগিয়ে এসে আঘাত ক'রে আবার দূরেই সরে যায়। প্রাণভয়ে এপার ওপার করে আশ্রয় খোঁজে তবু কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করে।'[১৮]

শুধু কি পদ্মা, তার শাখা নদী , উপনদী কিংবা উপনদীর শাখা রয়েছে যাদের সঙ্গে এই মানুষগুলির নিত্য দিনের সম্পর্ক। তাই পদ্মাকে না পেলে তার শাখা নদী কিংবা উপনদীর তীরে স্থান করে নেবার জন্য আকুল হয়ে ওঠে। তাই তাদের কাছে 'পদ্মা যে দেশে প্রবাহিতা সেটাই দেশ। তার বাইরে পৃথিবী আছে, দেশ নেই।'[১৯] চাঁদের সঙ্গে পৃথিবীর যেমন অদৃশ্য বন্ধন রয়েছে। সেই বন্ধনের ফলেই জোয়ারের জল ফুলে ওঠে, তেমনি পদ্মার জন্য এখানকার মানুষ দুর্নিবার টান অনুভব করে।

উপন্যাস শুরু হয়েছে হলুদমোহন ক্যাম্পে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের নানা টানাপোড়েনের কথা দিয়ে। এই উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে বিমি তথা বিমলপ্রভা। সে ও এই ক্যাম্পের বাসিন্দা। গোটা উপন্যাসটি বিমলপ্রভার স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে তৎকালীন উদ্বাস্তু ক্যাম্পের মানুষগুলির জীবনযন্ত্রণা রূপায়িত হয়েছে।

উপন্যাসের কাহিনি শুরু হয়েছে বসন্তকালে। কিন্তু সাহিত্যে বসন্ত যেভাবে রূপায়িত হয়েছে অদ্যাবধি, এ উপন্যাস তাকে গ্রহণ করতে পারবে না বিষয়গত কারণেই। সমগ্র উপন্যাসে উঠে আসা চরিত্রগুলি মুখোমুখি হয়ে বেদনা-যন্ত্রণার আলোড়ন হৃদয়ে অনুভব করতে করতেই পরিণতিতে পৌঁছায়। বিমির স্মৃতি সুখের নয়। বিমি যদিও ভাবে 'দুঃখ নয়, শোক করেও লাভ নেই।' পাশাপাশি এটাও অনুভব না করে পারে না— 'কতগুলি কথা আছে যা ঘুরে ঘুরে মনে আসে, কিছুক্ষণ থেকে আবার কিছুদিনের জন্য বিদায় নেয়।' তার মনে পড়ে রেঙ্গুন থেকে বজ্রযোগিনীতে পৌঁছবার কথা; আজ এই হলুদমোহন ক্যাম্পের তুলনায় সেখানকার ও সেদিনের জীবন-ব্যবস্থার কথা। আজকের পরিস্থিতি ভাবলে বিমির মনে হয়— 'বজ্রযোগিনীতে গরীব ছিলো, মধ্যবিত্ত ছিলো, অভাব ছিলো। কিন্তু নিজের অভাবকে মানুষ নিজের মধ্যেই রাখতো। তাকে দোকানের মতো সাজিয়ে বা পথে তাদের মিছিলের মতো চালিয়ে নিয়ে বেড়ানোর কথা কেউ ভাবতো না যেন।...এখন অচেনা লোকও যদি কুশল প্রশ্ন করে, তার উত্তরে তবে, আর বলেন কেন, ক্যাশডোল বন্ধ, দিন চলে না।'[২০]— মানুষের এই দীনতার প্রকাশ দেখে দুঃখিত হয় বিমলা।

বেদনা-যন্ত্রণায় জীবন যখন নানাভাবে আক্রান্ত হয়, তখন ছোটোখাটো তুচ্ছ বিষয় ও বেশ গুরুত্বপূর্ণ রূপ নিয়ে স্মৃতির পর্দায় ভেসে ওঠে। দুর্ভাগ্যের কবলে পড়তে পড়তে আজ তেত্রিশ বছর বয়সে পৌঁছে আয়নায় নিজের চোখ দুটো দেখে বিমির মনে পড়ে মায়ের কাছে প্রতিবেশী বৃদ্ধার ভবিষ্যৎ বাণী—

> 'এ চোখ তো ভালো নয়।
> ...
> না বাছা স্বামী টেকে না এমন সব মেয়ের'[২১]

স্বামী টেকে না এ প্রশ্ন তো অনেক দূরের, বিমির এখনও স্বামীই জুটল না, দিদির স্বামী ভুবনবাবুর সঙ্গে পার্টানারশিপে তার জীবন-যাপন। নারী-পুরুষের সম্পর্কের বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা মারাত্মক। দেশত্যাগের সময় সে ধর্ষিতা হয়েছে, এরপর একাধিক পুরুষের সঙ্গে স্বেচ্ছায় কিংবা বাধ্য হয়ে মিলিত হয়েছে। এ সবই বর্ণিত হয়েছে প্রধান চরিত্র বিমির স্মৃতির পথ ধরে। বিভিন্ন কাজের ফাঁকে ফাঁকে একের পর এক স্মৃতিচিত্র আসতে থাকে এক একটা ঘটনাকে ধারণ করে— যা মারাত্মক তিক্ত, গ্লানিময়, শত চেষ্টা করেও যা ভোলা যায় না।

জ্যোতির্ময় মণ্ডলের 'সুখ চাঁদ' উপন্যাস শুরু হয়েছে পূর্ববঙ্গের গোপালগঞ্জ অঞ্চলের নিম্নবর্গীয়

মানুষের কথা দিয়ে। অসংখ্য ছোট দ্বীপের মত বাড়িগুলির চারদিকে বর্ষার জল থৈ থৈ করে। গাইনবাড়ি, হালদারবাড়ি, কৈঠাবাড়ি, পাগলাবাড়ি, ঢালীবাড়ি, মাতব্বরবাড়ি—নামগুলো এমন ধারা। এমন নামকরণের পিছনে বহুকালের আগের কোনও একটি কাহিনি যুক্ত হয়ে আছে। পাগলাবাড়ির সবাই পাগল নয়, বাড়ির বয়ঃজ্যেষ্ঠ কেউ কোনও এক কালে পাগল হয়েছিল; সেই থেকে সে বাড়ি এ নামে পরিচিত। মাতব্বরবাড়ির লোকেরা সে অর্থে কেউই 'মোড়ল নয়', ঢালীবাড়ির ঢাল ধরে না কেউই। তবু পুরোনো স্মৃতি আঁকড়ে ধরে বাড়ির নাম হয় ঢালীবাড়ি। বাড়িগুলির সমন্বয়ে গ্রামের নাম 'কদম বাড়ি'। এই গ্রামের মাতব্বরবাড়ির সেজোকত্তার ছেলে সুখচাঁদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ম্যাট্রিকিউলেট' — গ্রাম-গাঁয়ের হাজার এক শিক্ষিতদের মধ্যে একজন। তাকে ঘিরেই উপন্যাসের উত্থান-পতন।

ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার বছর সুখচাঁদকে বিয়ে দিয়ে বসলেন বাবা গয়ালী। পড়শিরা বারণ করেছিল, শোনেননি গয়ালী। 'লক্ষ্মীর' সরার ছবির মতো পয়মন্ত মেয়ে। রাঙা শরীর। রাঙা বউ, রাঙা বউ এল ঘরে।'[২২] সুখচাঁদ পরীক্ষায় ফেল করল, আবার পাশও করল দুবারের বার। দেশ তখন সদ্য স্বাধীন হয়েছে। পূর্ববঙ্গের সর্বত্র কাজিয়া-ফ্যাসাদ, দাঙ্গা-বিবাদ লেগেই আছে; নিত্য দিন খুন হচ্ছে লোক। এই অবস্থায় গয়ালীর ছেলে সুখচাঁদ, রাঙা বউ এবং ছেলে শচীনকে নিয়ে দেশ ছাড়ে।

শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের খালবিল বেষ্টিত অখ্যাত এক গ্রাম দমবাড়িতে কাটিয়েছে সুখচাঁদ। এখানকার জল-মাটি-বায়ুর সঙ্গে তার নাড়ির সম্পর্ক। তাকে ছেড়ে যেতে সুখচাঁদের কষ্ট হয়। স্মৃতি পটে ভেসে ওঠে চারপাশের ছবি— 'দূরে সরে যেতে থাকে পুববাংলার নদীনালার দেশ— ফরিদপুরের কদমবাড়ি গ্রাম। সুখচাঁদের জন্মভূমি। মা-বাপের ভিটে। যতদূর নজর চলে ছইয়ের তলায় রাঙাবউ দুচোখ ভরে দেখে তার শ্বশুরের ভিটে।'[২৩]

আর পাঁচজন উদ্বাস্তুর মত সীমান্তের নির্যাতন সয়ে বউ-ছেলে নিয়ে সুখচাঁদ শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছায়। তার কাছে মনে হয় এ এক আজব শহর— লোকে লোকারণ্য। পূর্ববঙ্গের সঙ্গে খাপ খায় না এখানকার কোনও কিছুর। সুখচাঁদ ভাবতে বসে পূর্ববঙ্গ ত্যাগীদের ফেলে আসা আম-জাম-কাঁঠাল, পদ্ম দিঘি, খাল-বিল আর হিজল ফুলের দেশের কাছে বড়ই বেমানান এই বিরাট শহর।'[২৪] শিয়ালদহ ছুঁয়ে তাদের যেতে হয় উদ্বাস্তু শিবিরে। যাত্রাপথে পরিচয় হয় রাঙা বউয়ের বাপের দেশের মেয়ে আয়নামতী এবং তার স্বামীর সঙ্গে। দুই পরিবারে ভাব হয়। পূর্ববঙ্গের স্মৃতির ঝাঁপি খুলে বসে তারা

সহযাত্রী এক বৈরাগী 'লাউবশ' দিয়ে তৈরি একতারা হাতে গান ধরে—

'স্বদেশ ছাইড়া হইলাম রে, ভাই, কোন্ বা পরদ্যাশী

নাইয়া রে-এ-এ-এ

বন্ধুর সনে মনে বিবাগী-ই-ই, কান্দি অহর্নিশি।

নাইয়ারে-এ-এ

নাওয়ের বাদাম তুইলা, কোন্ দ্যাশে যাও চইলা?'[২৫]

কিন্তু কোথায় সে নৌকো, কোথায় সে খাল-বিল-নদী, কোথায়ই বা সে দাঁড়ি-মাঝি; ট্রেনের ড্রাইভার হুইসাল বাজিয়ে পাগলা ঘোড়ার মত ট্রেনকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। সেই ছুটন্ত ট্রেনের কামরায় বৈরাগীর মনের অন্দরে বাদাম তোলা নাও এসে ভিড় জমিয়েছে।

বর্ধমানের যজ্ঞেশ্বর ডিহির ট্রানজিট ক্যাম্পে আশ্রয় পায় সুখচাঁদের পরিবার। সেখানেই মৃত্যু হয় তার একমাত্র ছেলে শচীনের। 'রাঙাবউ আছাড়ি-পিছাড়ি খায়'। আয়নামতী তাকে সামলায়। সুখচাঁদের মনে পড়ে বাবা গয়ালীর কথা, যিনি সুখচাঁদের দেশত্যাগের সময় ঘাটে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন— 'নাতিডার আমার খাওয়ার রোগ আছে। খাওয়ার কষ্ট য্যান না পায় শচীন।' দেশ ছাড়ার সময়ে সুখচাঁদের স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে পুববাংলার স্মৃতি— বাড়ির কানাচ কলা গাছে ঘেরা, তারই পাশে ঢেঁকি ঘর। নারদের ঢেঁকির মত ঢেঁকির পাড় চলতে থাকে; সে পাড় যেন বুকের মধ্যে চলতে থাকে। লেখকের কথায়— 'স্মৃতির খাড়ু পরা মোনাই দ্রুত-ওঠা-নামায় সুখচাঁদের বুকের 'নোট'-এর গর্ত থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চায় তরতাজা রক্তের স্রোত।'[২৬] তার চোখের কোণা থেকে জল টলমল করে পিছলে পড়ে মাটির উপরে। 'হাহাকারের কান্না কেঁদে ওঠে সুখচাঁদ'।

পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু আগমন অব্যাহত থাকার ফলে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আগত উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পুনর্বাসিত করা হবে। এই সুবাদে সুখচাঁদের যজ্ঞেশ্বর ডিহি ক্যাম্প তুলে দিয়ে এক প্রকার জোর করে তাদের দণ্ডকারণ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে অভাব-অনটন আর নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে দিন কাটে উদ্বাস্তুদের। সুখচাঁদের নেতৃত্বে তারা সরকারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সুখচাঁদকে জেলে যেতে হয়। সরকারি দমন-পীড়নে উদ্বাস্তুরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে শোনা যায় সুন্দরবনের মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুরা বসতি স্থাপন করছে। সুখচাঁদ রাঙা বউকে নিয়ে চলে আসে হাসনাবাদে। ইতিমধ্যে সুখচাঁদ দুই সন্তানের জনক।

চর হাসনাবাদ বাগনার মাটি, বউঠাকুরানির চর, কুমীরমারী, বড় কলাগাছিয়া নদী, পুঁইজালি

সুখচাঁদের স্বপ্নের জগতে আশা জাগায়। সাগরমুখে ছড়ানো ছিটানো হাজার হাজার খাঁড়ি, খরস্রোতা লোনা নদী ঘেরা ছোট ছোট কাদার দ্বীপ তাদের পদ্মার কিনারার কথা মনে করিয়ে দেয়। সুখ-চাঁদের চোখে আড়িয়াল খাঁ, মেঘনা, মধুমতী, পশর, ভৈরবের সঙ্গে ইছামতী যেন একাকার হয়ে যায়। শৈশবে ফিরে যায় সুখচাঁদ— 'কচুচুসির বিল, সবুজ ধানের বাহারে হাতছানি দিয়ে ডাকে তাকে। শবরীকলার রঙে ধান পাকে সে বিলে। লক্ষ্মীদিঘা ধান। বিলের জলে হাড়ি ভাসিয়ে তার উপর পেছন ঠেকিয়ে ধান কাটছে কিষানেরা।'[২৭]—এসব স্মৃতি বিষণ্ণ করে তোলে সুখচাঁদকে। সরকার চায় না উদ্বাস্তুরা মরিচঝাঁপিতে বসতি গড়ুক। তাই তারা যাতে পুনরায় দণ্ডকারণ্যে ফিরে যায় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য দণ্ডকারণ্য থেকে উদ্বাস্তুরা মরিচঝাঁপিতে আসতে শুরু করে। ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ট্রেনে করে এসে তারা হাওড়া স্টেশনের আশেপাশে, ময়দানে এবং অন্যত্র গৃহহীন দিন যাপন করে। সেখান থেকে তাড়া খেয়ে হাসনাবাদে চলে যায় এপ্রিল মাসে। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে হাসনাবাদ থেকে দলে দলে মানুষ জলপথে মরিচঝাঁপি দ্বীপে পাড়ি দিচ্ছিল। সরকার প্রতিরোধের নামে খাবার ও পানীয় জল নিয়ে যাওয়ার পথ বন্ধ করে দেয়। বিশেষ করে মরিচঝাঁপির জলে নুনের ভাগ বেশি, তাই তা পানের অযোগ্য। দ্বীপ থেকে ডাঙায় যাওয়ার সব পথ অবরুদ্ধ করে, বড় বড় লঞ্চ দিয়ে নৌকোগুলোকে ডুবিয়ে দেয়। ৩১ মার্চ ১৯৭৮ দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকায় হাসনাবাদে উদ্বাস্তুদের খাদ্য ও পানীয় জলের অভাবে শিশুদের অসুস্থ হয়ে পড়ার খবরটি প্রকাশিত হয়। সেখানে চব্বিশ পরগণার জেলা শাসকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়— সরকার উদ্বাস্তুদের আর কোনও রিলিফ দেবে না।

প্রাথমিক পর্যায়ে হাসনাবাদ থেকে প্রায় তিরিশ হাজার মানুষ আসে এই দ্বীপে। পরে সংখ্যাটা আরও বাড়ে।[২৮] তারা রীতিমতো একটি গ্রাম সমাজ গড়ে তুলেছিল। দোকানপাট, স্কুল, চিকিৎসাকেন্দ্র, বিড়ি বাঁধা, নৌকো তৈরির কারখানা— ইত্যাদির মাধ্যমে একটি স্বয়ম্ভর জনপদ তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছিল উদ্বাস্তুরা। কিন্তু তদানীন্তন বাম সরকার তাদের পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করতে যেসব অভিযোগ আনে তা নিম্নরূপ।

১. দ্বীপের বাসিন্দাদের প্রধান জীবিকা বে-আইনিভাবে গাছ কেটে বিক্রি করা;
২. প্রতিবেশী বাংলাদেশের লোক এসে এখানে অবৈধভাবে বসতি স্থাপন করছে এবং সমান্তরাল একটি সরকার চালানোর চেষ্টা করছে;
৩. তারা অবৈধ কাজ-কর্মের সঙ্গে যুক্ত।

এই অজুহাতে মরিচঝাঁপিকে বারো দিন অবরুদ্ধ করে রেখে এখানকার মানুষদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়।[২৯] অমিয় সামন্ত নামে এক পুলিশ অফিসারকে দায়িত্ব দেওয়া হয় মরিচঝাঁপি দ্বীপকে খালি করে দেবার জন্য। শ্রী সামন্ত এই কাজকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলেন বলে জানা যায়। উদ্বাস্তুরা মরিয়া হয়ে ওঠে দ্বীপে বসবাস করবার জন্য। কিন্তু শেষপর্যন্ত হার মানতে হয় তাদের।

উপন্যাসের উপান্তে দেখা যায় সুখচাঁদ তার পরিবার নিয়ে যখন মরিচঝাঁপিতে যাত্রা করছে, তখন পুলিশ তার নৌকো ডুবিয়ে দিয়েছে। স্ত্রী সন্তান ভেসে যাচ্ছে নদীর জলে। তার মনে ভেসে উঠছে পূর্ববঙ্গের ফেলে আসা দিনগুলির কথা। উদ্বাস্তুদের ভাসমান জীবনের সঙ্গে সুখচাঁদের ভেসে যাওয়াকে একত্রিত করে উপন্যাস শেষ করা হয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসে সুখচাঁদ যতবারই বাসভূমির স্বপ্ন দেখেছে, ততবারই তাকে উচ্ছিন্ন হতে হয়েছে। বারবার স্থান ত্যাগের সংকটময় মুহূর্তে তার মনে পড়েছে দেশের কথা।

রমেশচন্দ্র সেনের ‘পুব থেকে পশ্চিমে’ উপন্যাসে পূর্ববঙ্গের শ্রীপুর অঞ্চলের বাসিন্দাদের দক্ষিণ কলকাতায় কলোনি স্থাপন এবং তাদের জীবনসংগ্রামের কথা বিবৃত হয়েছে। সেই সঙ্গে ফেলে আসা জীবনের নানা স্মৃতি উঠে এসেছে। শ্রীপুরের পাশের গ্রাম ফাঁসিপোতায় হিন্দুদের ঘরে আগুন লাগানোর মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে উপন্যাস। এর পরেই আতঙ্কিত হয়ে দলবদ্ধভাবে এই অঞ্চলের মানুষ দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই দলে রয়েছে অধ্যাপক নির্মল সেন ও তার বিধবা মা নিভাননী, পূর্ববঙ্গ খ্যাত ধ্রুব কবিরাজ, তার ভাই ব্রজ এবং তাদের পরিবার, নবকুমার শীল, হরিভূষণ, গয়েশ্বরী, রক্ষাকালী সহ আরও অনেকে। জীবনের নিরাপত্তার জন্য বাধ্য হয়ে তারা সকলে দেশত্যাগ করে। অচেনা-অজানা জায়গায় অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ জীবন-যাপন তাদের শঙ্কিত করে তোলে। পূর্ববঙ্গে তবু মাথা গুজবার ঠাঁই আছে, দু-এক বিঘে জমি আছে, যার কোনও সম্বল নেই সে ও খাল-নদী-ডোবা-পুকুর থেকে দুটো মাছ ধরে খেতে পারে; ডোবা থেকে শাক সংগ্রহ হতে পারে। এখানেই তাদের আত্মীয়-স্বজন, সমাজ-সংসার। এখানকার মুক্ত আলো-বাতাস, সবুজ গাছপালা, টলটলে জল ‘যেন সুন্দরী তরুণীর ডাগর চোখের চাহনি’— এসব ছেড়ে শ্রীপুরের মায়া ছেড়ে যেতে তাদের বুক টনটন করে ওঠে। তাই দেশ ছাড়ার যাত্রাকালে উপন্যাসের নায়ক নির্মলের মনে বেদনার ছবি ভেসে ওঠে— ‘সে একবার গাছের সারির দিকে তাকায়, আবার তাকায় শ্রীর জলের দিকে। এই শ্রীপুর, ঐ অনন্তপুর, মানিকডাল, এদের প্রতিটি গাছপালা ঝোঁপঝাড়, বালুকণা, জলকণার সঙ্গে কী নিবিড় সম্পর্ক।’[৩০] — এই মাটিতে সে খেলেছে, এখানেই সাঁতার কেটেছে, নৌকো বেয়েছে। আজ দেশত্যাগের সঙ্গে

সঙ্গে সে সব স্মৃতি ভাসছে।

সীমান্তের নানা প্রতিকূলতা ও অসম্মান সহ্য করে শিয়ালদহ স্টেশনে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে শ্রীপুরের লোকজন। সেখানেও বেঁচে থাকার নানা সমস্যা। এই সমস্যা ও সংকটের সময়ে তাদের মনে পড়ে ফেলে আসা দেশের কথা। ধ্রুব কবিরাজের বোন উমাকে স্বেচ্ছা সেবিকা সেজে পাচার করতে এসে একটি মেয়ে ধরা পড়ে যায়। উমা সহ তার পরিবারের সকলকে কোর্টে উঠতে হয়। বিপক্ষের উকিলের নানা অস্বস্তিকর প্রশ্নের জবাব দিতে হয় উমাকে। উঠে আসে গাব্বু শেখ-এর প্রসঙ্গ, যে তাকে অশালীন চিঠি লিখেছিল, বিয়ে করবার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। কোর্টের মধ্যে সেই তিক্ত স্মৃতি ভেসে উঠতেই উমা জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

নির্মলের নেতৃত্বে কলোনি তৈরির জায়গা দেখতে এসে পূর্ববঙ্গে তারা যে অঞ্চলে বাস করত সেই শ্রীপুর অঞ্চলের সঙ্গে এর সাদৃশ্য খুঁজে পায়। ডোবা পুকুরে লাল শাপলা ফুটে রয়েছে, হাঁস সাঁতার কাটছে, শেওলার পুরু স্তর জমে আছে জলের উপর। আলতো পায়ে ছোট ছোট পাখিরা এসে বসেছে কলমী ও মালঞ্চলতার উপর। গাছের ডালে বাবুয়ের বাসা ঝুলছে, কোথাও ফুটেছে আমের বোল। টিনের চালা ঘরের ছাউনি, লাউ-কুমড়োর মাচা, গরু-মোষের বাথান— এসব দিয়ে মানুষ নিজেদের মিশিয়ে দিয়েছে প্রকৃতির মধ্যে। মাটির পোতা, দরমার বেড়া, সব মিলিয়ে তাদের ফেলে আসা দেশের স্মৃতি জাগে এই অঞ্চল দেখে।

পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে কলোনি তৈরির পরেও অনেকেরই শুধু স্মৃতির মধ্যে থাকেনি দেশ। কেউ কেউ পালা-পার্বণ, দোল, দুর্গোৎসবে কিংবা ফেলে আসা জমির জায়গা, ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-স্বজনদের দেখতে দেশে ছুটে গিয়েছে। 'আর কিছু না পেলে দেশের স্মারক হিসেবে নিদেনপক্ষে গাছের দুটো ফল-পাকুড় আনে। পরিবারের ছেলে-বুড়ো সবাই মিলে বাড়ির গাছের ফল খেয়ে তৃপ্তি পায়। সে এক অনির্বচনীয় তৃপ্তি।'[৩১] আবার দেশ থেকে একজন এলেই আর পাঁচজন গিয়ে তাকে ঘিরে ধরে। খুঁটিনাটি পাঁচটা খবর জিজ্ঞাসা করে; দেশের কথা ভেবে তারা আনন্দ বোধ করে। জন্মভূমি ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে বলে বিষাদে ভরে ওঠে ওদের মন। দেশের টানেই নির্মলকে নিয়ে নিভাননী পূর্ববঙ্গে শ্বশুরের বাড়িতে যান। শীতলাতলা, মনসাতলা, চড়কের পৈঠান, দোলমঞ্চ গোঁসাই ঘর সর্বত্র প্রণাম করেন। অনেক দিন আগে ফেলে যাওয়া সেই ঘর-পুকুর-মাটি-মানুষের কথা মনে পড়ে। অতীত স্মৃতিতে তিনি ভারাক্রান্ত হন। কলোনির বাসিন্দারা অবসর সময়ে কারণে-অকারণে তাদের স্মৃতির

রোমন্থন করে।

কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের 'উজানতলীর উপকথা' উপন্যাসে ছয় পুরুষক্রমে গড়ে ওঠা পূর্ববঙ্গের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠীর দিন-যাপনের কথা উঠে এসেছে। প্রায় পঞ্চাশটি গ্রাম নিয়ে গড়ে ওঠা চার'শ বর্গ মাইলের এই জনপদ। তার একদিকে চান্দার বিল, আরেক দিকে বিল বাঘিয়া। উত্তরে কুমার নদী, দক্ষিণে মধুমতী। এখানকার জনজীবন দ্বন্দ্ব-সংকট, আনন্দ আহ্লাদ, দারিদ্র্য-বভুক্ষতায় পরিপূর্ণ। উপন্যাসে তাদের কথা ব্যক্ত করবার সঙ্গে সঙ্গে তেভাগা আন্দোলন, চল্লিশের দশকের হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা, গান্ধীজীর অহিংসা, দেশভাগ এবং উদ্বাস্তু জীবনের দৈনন্দিনতা নিবিড়ভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

উপন্যাস শুরু হয়েছে পশ্চাদ্ প্রজ্জ্বলন (Flash back) প্রণালীতে; অর্থাৎ পূর্বকথা শুরু হয়েছে দেশভাগের ফলে পূর্ববাংলা থেকে কাজলের পশ্চিমবাংলায় চলে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে, যে কাজল উজানতলীকে ভালোবেসেই সমস্ত পৃথিবীকে ভালোবাসতে শিখেছিল একদিন। আজ সে অনুভব করছে উজানতলীর প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি তরুলতা, জল-জঙ্গল-পথ-প্রান্তর জন্মদাগের মত সেটে আছে তার গায়ে। অপরিসীম মমতায় সহস্রদল পদ্মের মতো একটু একটু করে তার জীবনকে পূর্ণ করে তুলেছে তারা। স্টিমারের ডেকে রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাজল; তার চোখের সামনে দিয়ে চলচ্ছবির মত দ্রুত সরে যাচ্ছে সব কিছু। মাটি যে এত মায়া জানে সে কথা এমন করে আগে বোঝেনি সে। তাই ফেলে আসা জীবনের স্মৃতি বারবার তাকে ব্যথিত করে তোলে।

অনন্ত-সুধাময়ীর সন্তান কাজল শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত দেখেছে নদীবিধৌত উজানতলীর অপরূপ নিসর্গ, সে পেয়েছে দুঃসাহসী কিশোরের সান্নিধ্য, পারুর সাহচর্য। পাশাপাশি হারিয়েছে স্নেহময়ী ঠাকুরমাকে; দেখেছে দুর্ভিক্ষ, রক্তক্ষয়ী হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা, মর্মান্তিক দেশভাগ।

উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে বিধু মণ্ডল, যিনি উজানতলীর এই জনপদকে নতুন করে গঠন করার স্বপ্ন দেখেন। এখানে নিম্নবর্গীয় মানুষের বাস; তার মধ্যেও পেশাগত বিভাজন রয়েছে। লেখকের কথায়— 'জীবিকা ভেদে শেফালি, বেরুয়া, বারিক, সর্দার, কারবারি ধানী, ক্ষেতী ও কাড়ার— এভাবে সাতটি ভাগে বিভক্ত থাকলেও তাদের ছিল সংঘবদ্ধ সমাজ। ছিল প্রখর সামাজিক অনুশাসন, ফলে একটি ঐক্যবদ্ধ চেতনাও।'[৩২] দেশবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার মানুষগুলি দেশত্যাগে উদ্যোগী হয়। ফলে দ্রুত গ্রাম সমাজ ভাঙতে থাকে; বিধু মণ্ডলের স্বপ্ন ক্রমে ফিকে হতে

থাকে। বিশেষ করে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ উজানতলী অঞ্চলের সামাজিক গঠনকে ভেঙে দেয়।

উপন্যাসের নায়ক কাজলও দেশত্যাগ করে। যাত্রা কালে জলছবির মত হারিয়ে যায় 'কালো কালো ওইসব বাড়ি, ওই ধানক্ষেত, গো-চর, নববধূর মতো ঘোমটা টেনে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ঝাড়, হিজল বন, খইবাবলার সারি, বার মাসে তের পার্বণে সেজে ওঠা গৃহ প্রাঙ্গণ। তারা সবাই যেন অবাক চোখে তাকিয়ে আছে কাজলের মুখের দিকে।'[৩৩]

পশ্চিমবঙ্গে এসে কাজলকে আশ্রয় নিতে হয় কাপাসডাঙায়; যেখানে উদ্বাস্তুরা জমিদারের পতিত জমিতে নতুন করে উপনিবেশ গড়ে তোলে। এই অঞ্চলে পুনরায় নিম্নবর্গীয় উদ্বাস্তুদের বসবাস শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঔপন্যাসিক স্মৃতির হাত ধরে বারবার ফিরে গিয়েছেন পূর্ববঙ্গের উজানতলীতে; সেখানকার জনজীবনের বদলে যাওয়া কাহিনিকে বর্ণনা করেছেন।

দুই খণ্ডে সমাপ্ত এই উপন্যাসের উপান্তে কাজল তার বাবার অসুস্থতার কারণে 'নিজের জন্মভিটেয় ফিরে যাচ্ছে চোরের মত চুপিসারে।' স্টিমারের লম্বা সিঁড়িটা উজানতলীতে স্পর্শ করতেই বুকের মধ্যে অদ্ভুত শিহরণ জাগে। আবারও ভেসে ওঠে উজানতলীর অতীত স্মৃতি— 'নদীর কূল থেকে নোঙর করা নৌকোগুলো সারি সারি মোচার খোলার মতো মৃদু মৃদু ঢেউয়ে দুলছে... কোথাও কোনও কোলাহল হাঁকাহাঁকি নেই। যেন কেমন এক নিস্তব্ধতায় মগ্ন হয়ে আছে সব। এই তার মাতৃভূমি, তার জন্মভিটে। এখানেই মাটির তলে নীল হয়ে আছে পিতৃপুরুষের স্মৃতি।'[৩৪] সেখানকার মাটি, স্কুলের টিনের চালার সারি সারি ক্লাস ঘরগুলি যেখানে বসে তার প্রথম পাঠ গ্রহণ সে সব তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

'উজানতলীর উপকথা' কাজলের জীবনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও আসলে তা একটি জনগোষ্ঠীর সার্বিকরূপ। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির আচরণে কথাবার্তায় উঠে এসেছে গোটা নমঃশূদ্র জাতির ইতিহাস। দেশবিভাগের পর কাজলের দেশত্যাগ এবং অতীত স্মৃতি আবিষ্ট করেছে আমাদের।[৩৫]

যতীন বালা তার আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'শিকড়ছেঁড়া জীবন'য়ে নিম্নবর্গীয় নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর পরিমণ্ডলে নিজের কথাকে ব্যক্ত করেছেন। দেশভাগ পূর্ববর্তী দাঙ্গাবিধ্বস্ত ছিয়ানব্বই অঞ্চলের বাসিন্দা লেখকের পরিবার। দেশের অবস্থা ক্রমে খারাপ হতে থাকলে লেখকের বাবা পাকিস্তান সীমান্ত লাগোয়া নাভারণ থানার বৌলপোতা গ্রামে এসে ঘরবাড়ি বেঁধে বসবাস শুরু করেন। তিনি এটা চিন্তাভাবনা

করলেন দেশভাগ এবং দেশত্যাগের হুজুগ কেটে গেলে তাঁরা আবার ছিয়ানব্বই অঞ্চলে ফিরে আসতে পারবেন। আর যদি মুসলমানের অত্যাচার সীমা ছাড়ায়, তবে সীমান্ত ডিঙিয়ে দ্রুত এবং সহজে ভারতে গিয়ে প্রাণ বাঁচাতে পারবেন।[৩৬]

এক্ষেত্রে বুঝতে অসুবিধা হয় না পূর্ববঙ্গে নিজের বাসভূমির উপর কতখানি ভালোবাসা থাকলে তিনি সেখানকারই অন্য অঞ্চলে গিয়ে বাসস্থান নির্মাণ করতে পারেন। অত্যাচার ক্রমে বাড়তে থাকায় লেখকের পরিবারের দেশে থাকার সমস্ত আশা ব্যর্থ হয়ে যায়। তারা আর পাঁচটি পরিবারের মত বনগাঁ সীমান্ত অতিক্রম করে প্রাথমিক আশ্রয়স্থল হিসেবে শিয়ালদহ স্টেশনে গিয়ে ওঠেন। নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে সরকারি নির্দেশে সেখান থেকে প্রথমে তাদের হুগলী জেলার ত্রিবেণী থানার কুন্তি নদীর তীরে আশ্রয় মেলে। সামান্য ক্যাশ ও ডোলের উপর নির্ভর করে সেখানে তাদের কাটে দীর্ঘ তিন বছর। তারপর নানা অজুহাতে সেখান থেকে তাদের পাঠানো হয় হুগলীর ভাণ্ডারহাটি ওয়ার্ক সাইট ক্যাম্পে, সেখানে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে উদ্বাস্তুরা জলা-জঙ্গলময় জমির উন্নয়ন ঘটায়। উদ্বাস্তুদের আশা ছিল তাদের হাতে উন্নয়ন ঘটানো জমিতেই তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। কিন্তু এবারেও তারা বঞ্চনার শিকার হয়। তাদের এক প্রকার জোর করে বলাগড় উদ্বাস্তু শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়। বলাগড় উদ্বাস্তু শিবির বন্ধ করে দিয়ে যাবার উদ্যোগ গ্রহণ করে সরকার। এই দীর্ঘ টানাপোড়েনের মধ্যে লেখক এবং তার পরিবার পরিজনেরা একপ্রকার হতাশ হয়ে ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। লেখকের কথায় ‘তিনটি উদ্বাস্তু শিবিরে প্রায় দশ বছর (১৯৫৪-১৯৬৩) এক টানা জীবন্ত নরক ভোগ করেছি আমি। ছোটবেলার ভোগ করা সেই নরকের জীবন্ত যন্ত্রণা আমার রক্তস্রোতে বিষের মতো মিশে আছে। আমার হৃদয়ে সেই নরক-জীবন-ছবি খোদাই হয়ে আছে।’[৩৭]

ক্যাম্প জীবনের এই তিক্ত স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে ফেলে আসা জীবনের স্মৃতি ভেসে উঠেছে উপন্যাসে। ক্যাম্পের মানুষগুলি যখন অবসর সময়ে একত্রিত হয়, একে-অপরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে পৌঁছে যায় পূর্ববঙ্গের সেই গ্রামে। কেউ হয়ত বলে ‘আমার ঘরের আড়ায় ঝুলছে পুঁটুলি-বাঁধা শাক-মুলো, বেগুন-সরষে, লাউ-এর বিচি, তুষ ভর্তি জালা, ঢেঁকিশালে নোটভর্তি শুকনো ধান— সব ফেলে রেখে চলে এসেছি। মা গো; মা আর কবে ফিরি পাব তা সব।’[৩৮] কারও স্মৃতিতে মাঠ থেকে ভরদুপুরে গোবর কুড়োনোর স্মৃতি ভেসে উঠেছে, কেউ বা বলছে কুড়োল মেরে কাঠ ফাড়া, টুলি জালে মাছ ধরার কথা। তাদের সকলেরই আক্ষেপ আর কোনও দিনই তারা বিগত সেই জীবনকে ফিরে পাবে না।

শঙ্খ ঘোষের 'সুপুরি বনের সারি' উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্র নীলুর দৃষ্টিকোণ থেকে কাহিনি বিবৃত হয়েছে। নীলুরা থাকে কলকাতায়। তার ঠাকুর দা এবং দাদুর বাড়ি পূর্ববঙ্গের বরিশাল অঞ্চলের একই গ্রামে। প্রতিবারই তারা পরিবারের সকলে মিলে পুজোর ছুটিতে সেখানে যায়। তবে এবারের যাওয়া তার কাছে একটু অন্যরকম। অন্যবার মামাতো-পিসতুতো ভাই বোনেরা মিলে সেখানে যায়; ঘোড়ার পথে পরবর্তী পুজোর জন্য দিন গোনা শুরু হয়। এবারে ভাই-বোনদের মধ্যে নীলু একা; সঙ্গে রয়েছে কেবল বড়ো মামা আর মামি। 'এবারে তারা দেশে যাচ্ছে আর কোনো দিন না যাবার জন্য।'[৩৯] যাবে না এবার কেউই কেন না দেশটা না কি এবার ভাগ হয়ে গিয়েছে, নীলুদের গ্রামটা না কি অন্য একটা দেশে। 'ভারি আজব কথা।' এবারে এসে নীলু গ্রামের বাড়ির যে পরিবর্তন লক্ষ করেছে এবং বিগত দিনের স্মৃতি মনের অন্দরে ভেসে উঠতে যে বেদনা অনুভব করেছে, সেটাই উপন্যাসের উপজীব্য।

স্টিমার থেকে হুলার হাট নেমে তারা নৌকোয় ওঠে। এবারের যাত্রাপথে নীলুদের মনে সব সময় একটা ভয় কাজ করে। পরিচিত রহমত মাঝিকে পেয়ে তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। প্রায় সন্ধের সময় নীলুরা গ্রামের বাড়িতে পৌঁছায়। গ্রামে ঢোকার আগেই সুপুরি গাছের সারি দেখে নীলুরা বুঝতে পারে তারা এসে গেছে।

এবারের পুজোয় আচার-নিয়ম বজায় থাকলেও প্রাণ খুঁজে পায় না নীলু। অন্যবারের পুজোর সঙ্গে এবারের পুজোকে মেলাতে পারে না— পুজোটা যে কোনও রকমে দায়সারা তা বোঝা যায় নীলুর মায়ের কথায়— 'এবার যেন কোনো উটকো বায়না করবি না। এবার কোনো রকমে দায়সারা পুজো, নমো নমো করে।'[৪০] প্রতি বছর সপ্তমীর সকালে পুজো শুরু হবার আগে দাদু ধুতি শাড়ির বাণ্ডিল নিয়ে বসতেন তারপর একে একে ছোট বড় সকলের নাম ধরে ডেকে ছেলেদের ধুতি আর মহিলাদের শাড়ি দিতেন। এবারে অনেকেই নেই যারা বিগত বছরে ধুতি-শাড়ি নিত।

প্রতি বছর অষ্টমী পুজোর দিন দিদিমা বেছে বেছে আটটি প্রতিমা দেখতে যেতেন। এবার সারা অঞ্চল জুড়ে বেছে আটটি প্রতিমা বের করা দুষ্কর। কারণ দেশভাগের পর বহু হিন্দু পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করেছে, তাই প্রতিমার সংখ্যাও কমে গেছে। অন্যবার বাড়ির সকলের সঙ্গে নীলুর বন্ধু হারুন ও তার মা ফতেমা নীলুদের সঙ্গী হিসেবে যেত, বন্ধু কিন্তু গ্রামে আসার পরে একবারের জন্যেও হারুণ নীলুর সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। আগের বারের মত তাপ-উত্তাপ নেই হারুনের মনে।

নবমী পুজোর দিনে ন'টি ঢাক এক জায়গায় বাজত 'যেন শব্দের ঢেউ ছড়িয়ে যেত গ্রাম জুড়ে।'

কিন্তু কোনও রকম ভিড় নেই এবার। নীলু মনখারাপ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বন্ধুর সন্ধানে। হারুনের বাড়িতে গিয়ে সে দেখে হারুণ তার মাসির ছেলে হোসেনের সঙ্গে বাঁশ চিরছে। হারুনের কাছে আগ্রহ নিয়ে গিয়ে হতাশ হয় নীলু। কারণ বিগত বছরগুলিতে নীলুর সঙ্গে হারুন যেভাবে মিশে যেত, এবার ঠিক তার উল্টো। নীলুর মনে ভেসে ওঠে বিগত পুজোর স্মৃতি, সে ব্যথায় কাতর হয়ে পড়ে।

নবমীর সন্ধ্যায় ধুনুচি নাচ এবং আরতি একরকম নীরবেই সম্পন্ন হয়। সেই রাতেই নীলুর বড়মামা সকলের সামনে নীলুর দাদুকে বর্তমান বিপজ্জনক অবস্থার কথা জানায়; কিন্তু নীলুর দাদু ভিটেমাটি, সুপুরিবন, কাছারিবাড়ি, বাপ-ঠাকুরদার মঠ ছেড়ে যেতে কোনক্রমেই রাজি নন।

দশমীর দিন যথা নিয়মে মা দুর্গাকে বরণ করে নেন নীলুর দিদিমা। তারপর বিসর্জন। এবারে নীলুরা পুরো পুজোর ছুটি গ্রামে থাকেনি। দ্বাদশীর দিনই সেখান থেকে রওনা হতে হবে— তিনটেয়। এবারেও রহমতের নৌকো ঘাটে বাঁধা। অন্যান্য বছরগুলিতে দালান থেকে ঘাট পর্যন্ত জিনিসপত্র গুছিয়ে দিত ঝুম্পা, আলো, রঞ্জনা, সোনা দিদি— সকলে মিলে। এবছর তারা নেই। নীলু পায়ে পায়ে হেঁটে বেড়ায় এ-ঘর থেকে ও-ঘর। আর কোনও দিন পা পড়বে না এখানে সে কথা মনে করে মনখারাপ হয় নীলুর। নীলুরা তাই ভাবে সবাইকে যখন দেশ ছেড়ে চলে যেতেই হবে, তখন কলকাতাতে গিয়ে পাশাপাশি থাকবে সবাই। সেজোমামা নীলুকে বলেন— 'পাশাপাশি সবার বাড়ি থাকবে— সব্বার। কলকাতার মধ্যেই আমাদের গোটা গ্রামকে দেখতে পাবি তখন।'[৪১] পুরোনো বাসস্থান নতুন জায়গায় নির্মাণের যে স্বপ্ন তার মধ্যে বিগত জীবনের গভীর আকর্ষণ লক্ষিত হয়।

পারিবারিক আচার মেনে যাত্রা করে নীলুরা। রহমত হাঁক দেয় 'তাড়াতাড়ি করেন কত্তারা, জোয়ারের কিন্তু সময় হইল।'একে একে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে নীলুর মা, বড়োমাসি, বড়োমামা। পিছন ফিরে নীলু দেখল তাদের অনেকটা দূরে পিছন ফিরে এগিয়ে আসছে দাদু।

কাদার ওপর বিছানো পাটাতনের ওপর দিয়ে নৌকোয় উঠে যায় নীলু। চোখ মোছে দিদিমা; ভেজা গলায় বলে— 'নারকলের পুঁটুলিটা নিয়ে ছিলি তো মনে করে? সুপুরিগুলি?' পাড় থেকে অল্প অল্প সরতে থাকে নৌকো। এই আকাশ, মাটি জল, ঘরবড়ি সবকিছুকে চিরদিনের জন্য ছেড়ে চলে যাচ্ছে সে। তাই একবার মাটিতে পড়ে প্রণাম করতে ইচ্ছে করে নীলুর। সে মনে মনে বলে 'প্রণাম ওই পুকুরের পিছল ঘাটকে। প্রণাম ওই খালপাড়ের অনেক দিনের পড়ে থাকা ভাঙা নৌকোকে।.... প্রণাম মাটি, প্রণাম সাঁকো, প্রণাম ঢাক কাঁসর। টিনের চালা, নিকোনো উঠোন, হাট

খোলা প্রণাম।'[৪২]

নৌকো এগিয়ে যায়, বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে নৌকো খাল ছেড়ে নদীতে পড়ার মুখে নীলু দেখতে পায় হাট খোলার কোণে উল্টে রাখা প্রকাণ্ড একটি মাটির জালার উপর বসে সবুজ রুমাল উড়িয়ে হারুন চিৎকার করে বলছে 'এই যে আমি নীলাই। এই যে রে। আসিস কিন্তু আবার সামনের বার।' জালার থেকে নেমে নদীর পাড় ধরে হাঁটতে থাকে হারুন। মাঝে মাঝে বলে— কী রে কথা কইসনা ক্যান, আসবি তো?'— নীলু এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে পায় না। ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যেতে থাকে। হারুন, মিলিয়ে যেতে থাকে গোটা গ্রাম। মনের কোণে ভেসে ওঠে দ্বাদশীর বিকেল, খালের মুখে নদীর জলের ঢেউ, তুলসীতলা, মাঠ, সেজো মামি তথা ফুলমামি, গ্রামের প্রান্তে বড়ো সুপুরি বন— সব কিছুকেই নীলু শেষ প্রণাম জানায়। কারণ এটাই তার শেষ আগমন।

পূর্ব বাংলার গ্রামজীবনের প্রেক্ষাপটে রচিত অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাস। ত্রিশের দশক থেকে শুরু করে পরবর্তী আরও দুটি দশক পর্যন্ত বিস্তৃত উপন্যাসের কাহিনি। এখানে বাঙালি জীবনের আবেগ-অনুভূতি, স্বপ্ন এবং স্বপ্নভঙ্গের কাহিনি ফুটে উঠেছে। হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত বাস্তবতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন ঔপন্যাসিক। স্বদেশ ও স্বভূমির প্রতি নিবিড় মমতা ও ভালোবাসার অভিব্যক্তি আলোচ্য উপন্যাসের অত্যন্ত আকর্ষণীয় বিষয়।

উপন্যাসের কাহিনি মূলত ব্যক্তিগত বা পারিবারিক নয়, পূর্ববাংলার পল্লিপ্রকৃতি ও সাধারণ মানুষের কাহিনি। রাইনাদি গ্রামের সম্ভ্রান্ত ঠাকুর পরিবারের বহু প্রজন্মের বাসভূমি ত্যাগ করে নতুন করে শিকড়ের সন্ধানে পশ্চিমবঙ্গে যাত্রা করতে বাধ্য হওয়ার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এখানে। উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে অপাপবিদ্ধ শিশু 'সোনা', যার চোখ দিয়ে উপন্যাসের প্রায় সমস্ত ঘটনা দেখানো হয়েছে। সোনার জন্ম, শৈশব, বাল্য, কৈশোর এবং যৌবনে পদার্পণ— এই আঠারো-উনিশ বছরের কাহিনি পরিবেশিত হয়েছে। সোনা পরিবারের সকলের প্রিয় পাত্র। পাগল জ্যাঠামশাই যেমন তাকে ভালোবাসেন, সোনা ও তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করে। বাড়ির চাকর ঈশমের সান্নিধ্যে সে বেড়ে উঠেছে। তার কাছে গল্প শোনা, তার সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো ছিল সোনার নিত্য দিনের কাজ। ঈশমের ছায়া সঙ্গী সে। তাই সোনাবাবুর দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ায় খুবই কষ্ট পায় ঈশম— 'কি সুখ হে পারে জানি না আল্লা। এমন সোনার দ্যাশ ফালাইয়া পাগল না হইলে কেউ যায়।' ফতিমা ভিন্ন সম্প্রদায়ের মেয়ে;

কিন্তু তার সঙ্গে সোনার খুব ভাব। সে ফতিমাকে প্রজাপতি ধরে দেয়,তার সঙ্গে জ্যাঠামশাইকে খুঁজতে যায়। ফতিমাও সোনাবাবুকে অসময়ে লটকন ফল জোগাড় করে এনে দেয়, ঢাকা থেকে ফিরলেই ছুটে আসে সোনাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। সেই সোনাবাবুরা দেশ ছেড়ে চলে গেলে ফতিমার গ্রামে আসার আকর্ষণ কমে যায়। মুড়াপাতায় দুর্গাপুজো দেখতে গিয়ে জমিদার বাড়ির অমলা-কমলার সঙ্গে সোনার বন্ধুত্ব হয়। পরে ভিন্ন সময়ে তাদের কথা মনে পড়েছে তার।

রাইনাদি ও মুড়াপাড়াকে অবলম্বন করে উপন্যাসের কাহিনি এগিয়ে অগ্রসর হলেও এর প্রাণকেন্দ্র পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য জনপদ। তাই পারিবারিক চিত্রের পাশাপাশি রয়েছে একদিকে শীতলক্ষ্যা, অন্যদিকে মেঘনা; একদিকে লাঙ্গলবন্দ অন্য দিকে গোয়ালন্দ। তার মধ্যেকার গ্রাম, মাঠ, খাল-বিল, চর। হিন্দু-মুসলমান ধনী-গরিব— মধ্যবিত্তের মিলিত গ্রামীণ জীবনের ছবি ধরা পড়ে উপন্যাসের প্রথম দিকে। ক্রমে মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্ম পরিচয় এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে। জব্বর, সামসুদ্দিন (সামু) এরা মুসলিম লিগে নাম লেখায়— নিজেদের অবস্থান খুঁজে নিতে চায়। বাসন্তী ও সামুর কথোপকথনে এই সম্পর্কের কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

‘দেশটা কেবল তর জাত ভাইদের?

ক্যান আমার জাতভাইদের হইব। দেশটা তর আমার সকলের।

— তবে ইসলাম ইসলাম করস ক্যান

— করি আমার জাত ভাইরা বড় বেশি গরু-ঘোড়া হইয়া আছে। একবার চোখ তুইলা দ্যাখ চাকরি তগ, জমি তগ, জমিদারী তগ। শিক্ষা-দীক্ষা সব হিন্দুদের।’[৪৩]

দীর্ঘকাল ধরে হিন্দুদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি মুসলিম মানসে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মানসিক দূরত্ব বাড়তে থাকে। পারাপরদি গ্রামে মাদ্রাসার মাঠে সামসুদ্দিন বক্তৃতা করে ‘হিন্দু-মুসলমান একই রাষ্ট্রে একই পতাকার নিচে বাস করতে পারে না।... ভিন্ন দেশ বাদে মুসলমানের গতি নাই।’[৪৪] শুধু সভা-সমিতি বা আন্দোলন নয়, তারা প্রকাশ্যে হিন্দু নিধন চাইছে— ‘পুব দেশে যত কাফের আছে, কাফের নিধন করে পতাকা ওড়াও।’ এই চরম অনৈক্যের মাঝে সোনার পরিবার রাইনাদির ঘর-বাড়ি জমি-জায়গা বিক্রি করে হিন্দুস্তানে যেতে উদ্যোগ গ্রহণ করে। ঠাকুর পরিবারের দায়িত্বশীল সদস্য ভূপেন্দ্রনাথের ব্যথাভরা মনে উদয় হয় পারিবারিক ঐতিহ্য ও শৈশবের কথা। ‘এক একটা টিন যখন খুলছে তখন মনে হচ্ছে ভূপেন্দ্রনাথের এক একটা পাঁজর বুক থেকে কেউ তুলে নিচ্ছে।.... অন্যমনস্ক হবার জন্য ভূপেন্দ্রনাথ তাদের সঙ্গে তাঁর ছোটবেলার

গল্প করছেন।'[৪৫]

দেশবিভাগের পূর্বে সোনার বাবা চন্দ্রনাথ একান্নবর্তী পরিবারে বেশ নিশ্চিন্তে জীবন-যাপন করতেন, কিন্তু বিভাগ পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গে আসার পর তাকে চরম অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে পড়তে হয়। দেশে থাকতে যে মানুষটি ছিল হাসি-খুশি, আয়েসী, তাকেই কঠোর পরিশ্রম করে দিন-যাপন করতে হয়। এক্ষেত্রে সোনার মনে পড়ে পূর্ববঙ্গের সুখের দিনগুলির কথা- সোনার কথাতেই জানা যায়— 'বাবার চোখমুখের দিকে তাকানো যায় না। ক্রমে বাবা কেমন হয়ে যাচ্ছে। তবু বাবাই একমাত্র মানুষ যিনি বাড়ি ফিরে এলে পেটভরে খেতে পায়। আবার চলে গেলে সংসারে অন্ধকার।'[৪৬]

পূর্ববঙ্গের মাটি আর মানুষের সঙ্গে একাত্ম থাকা সোনার দেশ ছেড়ে যেতে বড় কষ্ট হয়। সোনার মনে হয় জ্যাঠামশাই তাদের দেশত্যাগ সম্পর্কে কোনও দিনও জানতে পারবে না তাই দেশত্যাগের আগে অর্জুন গাছে সোনা লিখে রেখে যায় তাদের ঠিকানা— 'জ্যাঠামশাই, আমরা হিন্দুস্তানে চলিয়া গিয়াছি, ইতি সোনা।' আত্মীয়বর্গ, পল্লি প্রকৃতিকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে সোনার ভারি কষ্ট। বারবার মনে পড়ছে তরমুজের জমি, নদীর জল, মালিনী মাছ—এসব ভুলে বেশি দিন সে থাকতে পারবে না। 'সে বড় হলে ঠিক চলে আসবে' নিজের বাসভূমিতে।

সম্পন্ন হিন্দুরা দেশ ছেড়ে গেলে দরিদ্র চাষিরা জমির উপর তাদের অধিকার হারায়। দেশবিভাগ তাদের কাছে এনেছে হতাশা। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক পিনাকেশ সরকারের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য— দেশবিভাগ শুধু হিন্দুদেরই উদ্বাস্তু করেনি, উদ্বাস্তু করেছিল সেই সব মুসলমান চাষিদেরও যারা দীর্ঘদিন ধরে সম্পন্ন হিন্দুদের বাড়ির লোক ছিল। জমির মালিকানা হিন্দুদের হাতে থাকলেও, জমির সর্বময় কর্তা ছিল এই মুসলমান কামলারাই।[৪৭] সোনাদের বাড়ির কামলা ঈশম ভূমিহীন হবার পর তার মনে পড়ে ঠাকুর পরিবারের কথা। 'সে যে এত দিন ভূমিহীন ছিল টেরই পায়নি। আজ প্রথম জমির আলে ওর সেই প্রিয় ছই পড়ে থাকতে দেখে ভাবল, তার সব গেছে, সে সব কিছু হারিয়েছে।'[৪৮]

দেশভাগের পর মালতী হিন্দুস্তানে চলে যাওয়ায় মাঝে মাঝেই সামুর মনে পড়েছে বাল্যসাথী মালতীর কথা— 'ফসলের খেতে সে এবং মালতী বড় হয়েছে। মালতীর কথা মনে আসতেই তার চোখ কেমন চিকচিক করে ওঠে। লক্ষণীয় সামুর অতীত স্মৃতিতে মালতী গভীরভাবে ফুটে উঠেছে— 'এই এক যুবতী তাকে বারেবারে কোথাও টেনে নিয়ে যায়— বুঝি সেই শৈশবকাল, ধানখেত এবং পাটখেতের আল অতিক্রম করে বকুল ফুল কুড়োতে যাওয়া। সে আজকাল বাড়িতে গেলে যেন

তার পাশে থাকে না— হিন্দুপাড়া খালি, খাঁ খাঁ করছে এসব ওকে পীড়ন করলে নিজের কাছেই যেন কৈফিয়ৎ পায় না।'[৪৯] সামু দেশবিভাগের বেশ কিছুদিন পরে বাড়িতে গেলে অতীতের স্মৃতি জড়ানো জায়গায় পৌঁছে শৈশবে হারিয়ে যায়। সামুর মনে হয়— মালতী বুঝি তাকে ডাকছে আর বলছে— 'যাবি না চুকৈর আনতে, যাবি না নদী সাঁতরে ওপারে তুই ডুব সাঁতার দিয়া নদীর অতল থাইকা আমার লাইগা মাটি তুলবি না?' সামুর মনে পড়ে য়ায় পুতুল তৈরির জন্য সামুই মালতীকে মাটি তুলে দিত।

মালতী দেশত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে এসে চালের চোরাকারবারির সঙ্গে যুক্ত হয়। মালতীর চাল কারবারের সঙ্গী কুসুমের স্বপ্নে ভেসে ওঠে পূর্ববঙ্গের ছবি— 'গান শুনতে শুনতে বোধহয় কুসুম ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে। এক পুকুর জল, বড় বড় সরপুঁটি জলের ভিতর খেলা করছে, শাপলা-শালুকের জমি— বর্ষার জন্য মানুষের এক পরিণত ভালোবাসা।... সেই ভালোবাসার ছবি আর দেখা যাচ্ছে না।'[৫০] এই স্বপ্ন-দৃশ্যে রয়েছে হারিয়ে যাওয়া সুখের অতীত এবং ভালোবাসাহীন বর্তমান জীবনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। দেশের প্রতি মালতীর এই গভীর ভালোবাসার নিদর্শন মেলে দক্ষিণারঞ্জন বসুর 'ছেড়ে আসা গ্রাম' গ্রন্থে— 'জন্মেছিলাম যার আঁচল-জড়ানো কোমল মাটির নরম ধুলোয় তাকে তো ভুলতে পারিনি। দুঃখ আছে মনে, দিন-রাত্রির খাটুনিতে অবসাদ নামে দেহে, আর্থিক দৈন্যও থেকেই যায়। তবু ছুটি পেলেই এক ছুটে চলে যেতে ইচ্ছে করে প্রায় তিনশ মাইল দূরে সেই গ্রামে।'[৫১] পূর্ববঙ্গ থেকে আসা বাস্তুহারা মানুষের চেতনায় শৈশব-কৈশোরের যে করুণ মধুর নস্টালজিয়া, তার চিত্রণ আছে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে। এই নস্টালজিয়া আসলে নিজেরই সত্তার কাছে উজান বেয়ে ফিরে যাওয়া, সে সত্তা ছিল বাসনার ও বিশ্বাসে শুদ্ধ আর অমলিন।[৫২]

জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসে ছেচল্লিশের দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে ইতিহাসের অধ্যাপিকা সুতারা দত্তর ব্যক্তিগত জীবনের লড়াইয়ের কাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে। নোয়াখালির মেয়ে সুতারা বিগত জীবনে ঘটে যাওয়া ভয়ংকর স্মৃতি আজও ভুলতে পারে না। ছেচল্লিশের দাঙ্গা থেকে পরবর্তী একযুগ সময় ধরে উপন্যাসের কাহিনি বিস্তৃত। উপন্যাস শুরুর কালে সুতারা দশম শ্রেণীর ছাত্রী। উভয় বাংলা তখন উত্তাল। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত। এমত অবস্থায় সুতারার জামাইবাবুর চিঠি এল 'কলকাতায় বড় গোলমাল।' সুতারার দিদিকে তার বাবা কিছুদিন আগেই কলকাতা থেকে নোয়াখালিতে নিয়ে এসেছেন। পূর্ববঙ্গের নানা জায়গা থেকে প্রতিনিয়ত দাঙ্গার খবর আসছে। এইরকম পরিস্থিতিতে হঠাৎ একদিন সুতারাদের হিন্দু পাড়ার আকাশ লাল হয়ে উঠল

আগুনে। মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন— ঘোষালদের বাড়ির দিকে আগুন জ্বলছে। রহিম এবং করিম যারা দু'জন সুতারাদের বাড়িতে গৃহভৃত্যের কাজ করত তারা সন্ধেবেলায় ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে। বাড়িতে অন্য পুরুষ মানুষ নেই, তাই বাবা বিরক্ত হন এবং খানিকটা শঙ্কিত অবস্থায় আগুনের উৎস খুঁজতে বেরিয়ে যান। কিছু সময় পরে ফিরে এসে তাঁর স্কুলের প্রধান শিক্ষক তমিজ সাহেবের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং মাকে ডেকে বলেন 'তোমরা ঐ কোণের ছোট করে দরজায় খিল দিয়ে বোসো, আমি একবার তামিজ সাহেবের বাড়িতে যাই। ঘর থেকে কেউ বেরিও না। ডাকলেও না, ধাক্কা দিলেও না।'[৫৩] সুতারার বাবা আর ফেরেন নি। ইতিমধ্যে সুতারার উপর অত্যাচার সুরু হয়। মা তাকে প্রতিহত করতে ছুটে এলে কালো কালো অনেক ছায়া মা'র সামনে হাজির হয়। মা তাদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই অবস্থায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলে সুতারা। যখন সে জ্ঞান ফিরে পায় তখন দেখে তার পাশে বসে আছে তার বাবার স্কুলের প্রধান শিক্ষক তামিজ কাকা এবং তার মেয়ে সাকিনা।

দীর্ঘ ছ'মাস তামিজ সাহেবের বাড়িতে থাকার পর ক্রমে সুস্থ হয়ে ওঠে সুতারা। বাবা-মা-দিদিকে হারিয়ে সে কলকাতায় দাদার কাছে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু দাদা তাকে নিয়ে যেতে আগ্রহী নয়। কলকাতায় সুতারার দাদার সঙ্গে তমিজ সাহেব যোগাযোগ করলে তার দায়সারা গোছের উত্তর আসে। শেষপর্যন্ত তিনি নিজেই উদ্যোগ নিয়ে সুতারাকে কলকাতায় পৌঁছে দেন। দাদার শ্বশুর বাড়ি আশ্রয় গ্রহণের পর সেখানে তাকে গঞ্জনা ও মানসিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়। কিন্তু সব প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে সুতারা নিজের যোগ্যতায় দিল্লীর যাজ্ঞসেনী কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপিকার পদে যোগ দেয়। শ্রেণিকক্ষে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুল্লিখিত ইতিহাস প্রসঙ্গে সুতারা ছাত্রীদের বলে— 'তোমরা ভালো করে পড়াশুনা করে তোমাদের জাতির ইতিহাস তোমরাই লিখো।'[৫৪] উপন্যাস শুরু হয়েছে এখান থেকে। এর পরেই বিগত জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি পশ্চাত প্রজ্জ্বলনে (Flash back) বিবৃত হয়েছে।

কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে ক্লাসে আলোচনার রেশ কাটিয়ে উঠতে পারে না সুতারা— মনের পর্দায় ভেসে ওঠে পূর্ববঙ্গের স্মৃতি— 'সেই ছোট্ট গ্রাম খানি। প্রতিবেশীও অনেক নয়। এক দিকে নদী, পদ্মারই একটি ছোট্ট মেয়ে। ছোট্ট শাখা। বাড়ির পেছনে পুকুর দু'টি। একটি মাঝারি বাগান। ফলের ফুলের গাছে মেশানো পৈত্রিক ভিটা।'[৫৫] আরও মনে পড়ে ঝড়ের সময় আম কুড়োতে যাওয়া, পুকুরে সাঁতার-কাটা, কোঁচড়ে করে চুনোপুঁটি মাছ ধরার কথা। এই মিষ্টি-মধুর স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে

বীভৎস সেই নারকীয় দৃশ্যের চিত্র ফুটে ওঠে স্মৃতিতে। দাঙ্গাবাজরা সুতারাদের গোয়ালে আগুন লাগিয়ে দিল। মা গোরুগুলোকে বের করে দিতে গোয়ালের ঝাপ কাটতে যান। তখন তার মায়ের সামনে পিছনে যে ছায়াগুলি জড় হয়েছিল তাদের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে সুতারার, মা-র হাত ধরার চেষ্টা করছে। মা হাত ছাড়িয়ে খিড়কির দিকে গিয়ে খিড়কির পুকুরে ঝাঁপ দিলেন।... একজন মা কে ধরতে গেলে আর একজন বললে 'যাক্ যাক্ ওটা ওদের মা!-ও যাক গে।' দিদির অর সাড়া নেই, দিদি কি মরে গেল।'[৫৬] পূর্ববঙ্গের এই স্মৃতি সুতারাকে প্রতিনিয়ত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।

সুতারা তার কলেজের ইংরেজির অধ্যাপিকা কৌশল্যাবতী ও তার মায়ের সঙ্গে গরমের ছুটিতে তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে দেবপ্রয়াগ সঙ্গমে পৌঁছায়। পাণ্ডাদের অনুরোধে স্বজনদের জল, পিণ্ড দিতে গিয়ে তার চোখ জলে ভেসে যায়। সেই জলের সাগরে ফুটে ওঠে বিভীষিকাময় রাত। পাণ্ডা বলেন— 'জল নিন। ফুল নিন, নাম বলুন পিতা-মাতার।'— কিন্তু সুতারা বুঝে উঠতে পারে না কার নাম বলবে। তমিজ সাহেব বাবার মৃত্যুর কথা বলেছিলেন, কিন্তু মা ও দিদির কী অবস্থা হয়েছিল সে কথা খুলে বলেন নি।তাই কাঁপা হাতে সঙ্গমের জল, ফুল নিয়ে বারবার মনের পর্দায় ভেসে ওঠে ভয়ঙ্কর ছবি। 'গোয়ালের আগুনের আলোয় উদ্‌ভ্রান্ত-মূর্তি জননীর মুখটি, দিদির পড়ে যাওয়া আর অন্ধকার বাড়ীর চারিদিকে কাদের অন্ধকার ছায়া ছায়া মূর্তি।'[৫৭]

সুতারা কলকাতায় আসার পর পরিবার এবং পরিজনের কাছ থেকে নানাভাবে অসম্মানিত হয়েছে। তমিজ সাহেবের পরিবারের সকলেই সুতরাকে আজিজের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ঘরের বউ করতে চায়। আজিজ সুতারাকে পছন্দ করে। সুতারাও তাকে অপছন্দ করে না তবু এ সম্পর্ক পরিণতি পায় না। এক্ষেত্রেও অতীতের স্মৃতি যে তাকে বিরত করেছে তা সাকিনার উদ্দেশ্যে সুতারার কথাতে পাওয়া যায়— 'ভাই, আমি সেদিনের কথা, আমার বাবা মা দিদির কথা ভুলব কি করে।'[৫৮] বিগত দিনের বিষাক্ত স্মৃতি অগণতি উদ্বাস্তুর মত সুতারাও ভুলতে পারেনি কোনও দিন। তাই উপন্যাসের উপান্তে বউদির ভাই প্রমোদ যখন সুতারার সারা জীবনের ভার বহন করতে চেয়েছে তখনও সুতরার চোখের জলের বান ডেকেছে। এক্ষেত্রেও আমরা লক্ষ করি তার অতীত স্মৃতি।

শচীন দাশের 'উদ্বাস্তু নগরীর চাঁদ' উপন্যাস মূলত দক্ষিণ কলকাতায় উদ্বাস্তুদের কলোনি গঠনকে কেন্দ্র করে রচিত। উনিশ শো পঞ্চাশের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে উপন্যাসের শুরু। দেশবিভাগের অব্যবহিত পরেই পশ্চিমবাংলায় উদ্বাস্তু আগমনের ঢেউ কিছুটা হলেও কমে যায়। কিন্তু

পঞ্চাশের শুরুতে পূর্ববঙ্গের নানা জায়গায় ব্যাপক হারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। এর ফলে উদ্বাস্তুদের আগমনের হার বাড়ে। এই সময়ে বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলের মাদারীপুর থেকে মহীকান্ত গুপ্ত প্রায় এক বস্ত্রে পরিবারের সকলকে নিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে শিয়ালদহ স্টেশনে এসে পৌঁছোন। স্টেশনের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পরিবারের সকলেই হাপিয়ে ওঠেন। কিন্তু আভিজাত্যের কারণে তারা সরকারি ক্যাম্পে যেতে চাননি। তাই দালাল ধরে দক্ষিণ কলকাতায় জমি দখল করেন। এখানকার জলা-জঙ্গলময় জমিতে মাটির পোতায় দড়মার চালা, মুলি বাঁশের বেড়ার ঘরে বাস করতে হয়। অথচ এই মহীকান্ত গুপ্ত ছিলেন জাঁদরেল জমিদারি এস্টেটের নায়েব। আজ কলোনির এই কুঁড়ে ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ভেসে ওঠে পূর্ববঙ্গের স্মৃতি। মস্ত সেই টিনের ঘর। লোক লস্কর বিত্ত-বৈভব প্রচুর। অতবড় বাড়িটায় আগুন লাগিয়ে দেয় মুসলমানরা। মহীকান্তর চোখের সামনে পুড়ে সব ছাই হয়ে যায়। হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সুমধুর সম্পর্ক এক শ্রেণির মানুষের জন্য কীভাবে নষ্ট হয়ে গেল ক্যাম্পের বিচ্ছিন্ন জীবনে মনে পড়ে মহীকান্তর।

আবার মহীকান্তবাবুর স্ত্রীর স্মৃতিতে ভাসে পূর্ববঙ্গের পল্লিপ্রকৃতির স্মৃতি— ‘কত গঞ্জ, কত গ্রাম। কত নদী ও কত পাটের আড়ত নদী পাড়ে। নৌকো যাচ্ছে। গয়না, টাবুরিয়া, ঘুমটি, একমল্লাই, দো-মল্লাই বাচারি, বাতালি, লাখাই, সরঙ্গা, সম্মান, শলতি, ডোঙা। কত মানুষের চিৎকার কত না গান। পল্লিগীতি, ভাটিয়ালি ও লালন সংগীত। রাতের নৌকায় তাই মাঝি গাইছে : ‘এমন মানব জন্ম আর কি হবে...’।’[৫৯] এসব ভাবতে ভাবতে কমলা হারিয়ে যায় নিজের মধ্যে। মহীকান্তর পরিবার কলোনির আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, লড়াই সংগ্রাম করে পরবর্তী প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা একটি স্থিতিশীল জীবনযাপন করতে পেরেছে। কিন্তু মহীকান্ত, তাঁর ভাই নিশিকান্ত, তাঁদের দুই স্ত্রী যথাক্রমে কমলা ও স্নেহলতা সচ্ছল জীবন যাপনের মধ্যেও ভুলতে পারেনি দেশের স্মৃতি।

উপন্যাসে আরও একটি চরিত্র হরেন্দ্রনাথ যিনি উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আসার পর ছাপাখানায় চাকরি নিয়েছেন। তিনি পূর্ববঙ্গে থাকতে ধলেশ্বরীর পাড়ে পাটের আড়তে খাতা লেখার কাজ করতেন। পয়লা বৈশাখে হরেন্দ্রনাথ এসেছেন কলেজস্ট্রিটে। বছরের এই প্রথম দিনটিতে এখানে নতুন খাতার উদ্বোধন হয়। নতুন বইও অনেক বেরোয় এ-উপলক্ষে। আজকের এই দিনে পূর্ববঙ্গের কথা ভেসে ওঠে হরেনের স্মৃতিতে। সেখানেও পয়লা বৈশাখে জমজমাট হয়ে উঠত তার কর্মস্থল— সহদেববাবুর পাটের আড়ত। ‘এই দিনে কলকাতা থেকে আনানো হত গোলাপ জল। সেই জল তিনি অতিথিদের গায়ে ছিটিয়ে দিতেন।. . . আড়তের সব কর্মীকেই জামাটামা তুলে দিতেন। বছরের এই দিনটিতে

সবাইকেই সেই কাপড়চোপড় পরতে হত। সত্যি, কী সে সব দিন ছিল।'[৬০] সেই সব দিনগুলির কথা মনে করে হরেন্দ্রনাথ কল্পনার পাখায় ভর করে পৌঁছে যান পূর্ববঙ্গের মাটিতে। উপন্যাসে মহীকান্ত গুপ্তর পরিবারকে সামনে রেখে দেশভাগ এবং উদ্বাস্তুদের প্রসঙ্গে ইতিহাসের নানা বিষয় ও চরিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। তার মধ্যে থেকে কোনও কোনও মানুষের টুকরো টুকরো স্মৃতি ভেসে উঠেছে মনের কোণে।

দেশত্যাগী মানুষের মনে স্মৃতির বিষণ্নতা তৈরি হয়েছে মূলত অভাববোধ থেকে। নিজের দেশের একটি স্থিতিশীল জীবন থেকে যখন তারা পা বাড়ালেন ভিন্ন দেশে তখন থেকেই শুরু হল খাদ্য এবং বাসস্থানের জন্য প্রাত্যহিক লড়াই। জীবনের এই টানাপোড়েনের মধ্যে মানুষগুলো স্মরণ করেছে তাদের ফেলে আসা ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীকে। স্মৃতি মেদুরতায় উঠে এসেছে নিজের দেশের প্রকৃতির আবহে সৌন্দর্যের অনুভূতি। প্রবল সংকটের ক্ষণে বারেবারে তারা নস্টালজিক আবেগে ফিরে গিয়েছে স্বভূমির কাছে। দেশত্যাগের কিছুদিন পর থেকেই 'দৈনিক যুগান্তর' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'ছেড়ে আসা গ্রাম' নামক স্মৃতির বয়ান। কথকেরা আলাদা আলাদা জেলার বাসিন্দা, গ্রামও আলাদা আলাদা, তবু অনুভূতির সুর সকলেরই এক।

আমাদের গবেষণার এই অংশে উদ্বাস্তু জীবনকে কেন্দ্র করে লেখা বাংলা উপন্যাসের নানা চরিত্রের মধ্যে স্মৃতির বিষাদময় রূপ ফুটে উঠেছে। যে কোনও দেশত্যাগ একটি বিকল্পহীন বিশেষ পরিস্থিতিতে ঘটে। আমাদের দেশের উভয় বাংলার এই গণপ্রব্রাজন ঘটেছিল মূলত তিনটি কারণে—

১. সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে জীবনের নিরাপত্তা;

২. নারীর সম্ভ্রম রক্ষা;

৩. সামাজিক সম্মান রক্ষা।

বাংলা উপন্যাসের নানা চরিত্রের মধ্যে উপরোক্ত তিন ধরনের তিক্ত স্মৃতিই নানা আঙ্গিকে ঘুরে ফিরে এসেছে। স্মৃতিচারণার ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় প্রবলভাবে যুক্ত হয়েছে তা হল— পূর্ববঙ্গে ফেলে আসা জীবনের প্রতি গভীর আকর্ষণ বোধ। উদ্বাস্তুদের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ চারিতায় একটি কথা বারবার উঠে এসেছে— 'দেশে থাকতেই ভালো ছিলাম'। অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মুখে শোনা গিয়েছে— 'দেশে যেতে খুব ইচ্ছে করে একবার শেষ দেখা দেখবার জন্য।' উদ্বাস্তুদের দেশের প্রতি এই গভীর আকর্ষণবোধ অনেক উপন্যাসেই বিবৃত হয়েছে।

প্রফুল্ল রায়ের ‘নোনাজল মিঠে মাটি উপন্যাসে’ দেশবিভাগ পরবর্তী সময়ে দাঙ্গায় নিত্য ঢালীর মেয়ে কাপাসী ধর্ষিতা হয়। সেই থেকে সে অর্ধ উন্মাদ। সামাজিক সম্মান রক্ষার জন্যে নিত্য ঢালী দেশত্যাগ করে। মেয়ের প্রতি অত্যাচারের কথা ভুলতে পারেনি নিত্য। আবার কাপাসী উন্মাদ অবস্থা কাটিয়ে যখন সুস্থ জীবন ফিরে পায় তখন তার স্মৃতিতে ভাসে অপহরণ ও ধর্ষণের চিত্র। তখন দিন-রাত শুধুই কাঁদে। ‘কেয়াপাতার নৌকো’ উপন্যাসে ঝিনুকের স্মৃতির মধ্যেও বারবার নির্মম অত্যাচারের দৃশ্য ফিরে এসেছে। মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে বাবার সঙ্গে ঢাকাতে গিয়ে দাঙ্গার মধ্যে পড়ে সে। বাবার মৃত্যু হয়; ঝিনুক ধর্ষিতা হয়। বিনয়ের মানবিক সহযোগিতায় ঝিনুক কলকাতায় আসে। সেখানে বিনয়ের দিদির শাশুড়ির চরম লাঞ্ছনা বারবার তার অতীতকে মনে করায়। অতীত স্মৃতি ভুলতে না পারার কারণেই ঝিনুক নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। জ্যোতির্ময়ী দেবীর ‘এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা’ উপন্যাসে দাঙ্গায় সুতারার বাবার মৃত্যু, মায়ের পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা, দিদির ধর্ষণের স্মৃতি বারবার ভেসে উঠেছে। মুসলমানদের দ্বারা অত্যাচারিত হওয়ার ফলেই নানা সামাজিক সংকটের মধ্যেও বাবার স্কুলের প্রধান শিক্ষক তমিজ সাহেবের ছেলে আজিজকে সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে।

‘পুব থেকে পশ্চিমে’ উপন্যাস শুরু হয়েছে শ্রীপুর অঞ্চলে রাতের আকাশে জ্বলে ওঠা আগুনের দৃশ্য দিয়ে। সারা অঞ্চল জুড়ে প্রতিনিয়ত দাঙ্গার খবর আসতে থাকে। এই প্রেক্ষাপটে এখানকার বাসিন্দারা দেশত্যাগ করে। তারা যেমন কেউই ভুলতে পারে না দাঙ্গার স্মৃতি; তেমনি ধ্রুব কবিরাজের বোন উমা ভুলতে পারে না গাব্বুর অশালীন আচরণ। গাব্বু তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। পুকুরে স্নান করতে নামলে গাছের আড়ালে বসে দেখা, অন্ধকারে জড়িয়ে ধরা এসব স্মৃতি তার মনে ঘৃণার জন্ম দিয়েছে। যতীন বালার ‘শিকড় ছেড়া জীবন’ উপন্যাসে যশোরের ছিয়ানব্বই অঞ্চলের বাসিন্দা লেখকের পিতা নিজের গ্রাম ত্যাগ করেছেন অত্যচারিত হয়ে। দেশভাগ পরবর্তী দাঙ্গার সেই জ্বলন্ত স্মৃতি ভুলতে পারেন না লেখক।

প্রফুল্ল রায়ের ‘কেয়াপাতার নৌকো’ উপন্যাসে বিনুদের পরিবার সরাসরি দাঙ্গা কিংবা অত্যাচারের শিকার না হলেও মানসিক দ্বন্দ্ব এবং সামাজিক সংকটের কারণে পূর্ববঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েও শেষ পর্যন্ত সকলেই দেশত্যাগ করেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ‘নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে’ উপন্যাসে সোনাদের পরিবার দেশত্যাগ করেছে আত্মসম্মান রক্ষার তাগিদে। ‘উজানতলীর উপকথা’ উপন্যাসে চারশো বর্গ মাইলের এক গ্রাম্য জনপদে নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং মুসলমানের সম্পর্ক ছিল মধুর। সেই সম্পর্কের ক্রমে অবনতি ঘটতে থাকে, তবু আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে দেশত্যাগের নিদর্শন পাওয়া

যায় না, মূলত ভবিষ্যতে দেশের অবস্থা খারাপ হবার সম্ভাবনায় কাজলের দেশত্যাগ ঘটেছে।

উপন্যাসগুলিতে উদ্বাস্তুদের মধ্যে দাঙ্গা, নারীর প্রতি অত্যাচার, সামাজিক অসম্মানের তিক্ত স্মৃতি যত না রোমন্থিত হয়েছে তার চেয়েও বেশি ফুটে উঠেছে পূর্ববঙ্গের শান্ত মধুর জীবন-যাপনের চিত্র। নানা সংকটের সম্মুখীন হয়ে দেশত্যাগ করলেও প্রতিটি মুহূর্তে তারা ফেলে আসা দেশকে মনে করেছে। 'নোনা জল মিঠে মাটি' উপন্যাসে প্রথম জীবনে খুনের অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত পরে যিনি আন্দামানে পুনর্বাসিত উদ্বাস্তুদের কাজে নিযুক্ত সেই পাল সাহেবের চোখের সামনে ভেসে উঠেছে পূর্ববঙ্গের পল্লি-প্রকৃতির ছবি। আবার উদ্ধব বৈরাগী যিনি সংসার বিবাগী হয়ে পথে পথে গান করে বেড়ান তার স্মৃতিতে নিয়ত ভাসে ধলেশ্বরীর মিঠেজল, হিজলের ছায়া, ফেলে আসা জিরানিয়া গ্রাম। নারায়ণ সান্যালের 'বকুলতলা পি.এল.ক্যাম্প' উপন্যাসে নদী-নালাবেষ্টিত পূর্ববঙ্গের বাসিন্দারা বাংলা-বিহার সীমান্তে রুক্ষ-শুষ্ক জমিতে পুনর্বাসিত হবার পর তাদের স্মৃতিতে ভেসে ওঠে সেই জলাজঙ্গলময় দেশ। বয়স্করা ক্যাম্পের পুকুরের জলের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওই একটিমাত্র পুকুরের মধ্যেই তারা মেঘনা-যমুনা-অড়িয়াল খাঁয়ের উষ্ণতা অনুভব করে। ক্যাম্পের বাসিন্দা রামনিধির স্মৃতিতে ভেসে উঠেছে পূর্ববঙ্গের পল্লিপ্রকৃতির চিত্র। বর্ষার ঘোলা জল, জলের সঙ্গে বেড়ে ওঠা আমন ধানের চারা, আকাশে জমে ওঠা পেঁজা তুলো মেঘ। ক্যাম্পের ইঞ্জিনিয়ার ঋতব্রতর সঙ্গে গল্প করতে করতে রামনিধি পৌঁছে যায় তার বিগত জীবনে।

প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকো' উপন্যাসে পূর্ববঙ্গের নিসর্গ চিত্রের স্মৃতি ফুটে উঠেছে একাধিক চরিত্রের মধ্যে।

১. উপন্যাসের নায়ক বিনয় পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে ঝিনুককে নিয়ে দিদির বাড়িতে গিয়ে ঝিনুকের অপমান বিনয়কে ব্যথিত করেছে। স্মৃতির ঝাঁপি খুলে বিনয় পৌঁছে গিয়েছে রাজদিয়ায়। নির্জন দুপুরে ঝুমা (জামাইবাবুর ভাগনি)কে নিয়ে শাপলা-পদ্ম তোলা, কাউ ফল পাড়তে গিয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়া, যুগলের সঙ্গে নদী পেরিয়ে সুজনগঞ্জের হাটে যাওয়া, স্কুল পালিয়ে ঝুমাদের বাড়িতে যাওয়ার স্মৃতি জ্বল-জ্বল করে ওঠে।
২. বিনয়ের দিদি সুধার স্মৃতিতে ভাসে রাজদিয়ার খাল-বিল, ধানের খেত, জারি-সারি, রাত জেগে দুর্গা প্রতিমা দেখা, বিজয়া উৎসব, নৌকো বাইচ, লক্ষ্মীপুজোর প্রসাদ খাওয়ার কথা। কলকাতা শহরে স্থিতিশীল জীবন-যাপনের মধ্যেও এইসব স্মৃতি প্রতিনিয়ত তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।
৩. হেমনাথের বাড়ির কামলা যুগল যে নিজের উদ্যোগে জবরদখল কলোনি গড়েছে, পূর্ববঙ্গের

তুলনায় অর্থনৈতিকভাবে অনেকটাই সচ্ছল হয়ে উঠেছে, তার স্মৃতিতেও বিগত জীবনের জন্য আক্ষেপের সুর ভেসে উঠেছে। যে দেশে পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী নেই সে দেশকে তার দেশ বলেই মনে হয় না। দুর্গাপুজোর ভাসানের পরের দিন বড়গাঙে নৌকো বেয়ে নিয়ে যাওয়া, চৈত্র সংক্রান্তির মেলায় কাঠের পুতুল, চিনির মঠ, জ্যান্ত টিয়া পাখি, তিলা কদমা কিনে বাড়ি ফেরা আজও তার স্মৃতিতে ভেসে ওঠে।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মানুষের ঘর বাড়ি' উপন্যাসে বিলুর মনেও পূর্ববঙ্গের সেই গ্রাম্য প্রকৃতি জেগে উঠেছে। শরৎকালে পদ্মফুল তুলতে যাওয়া, আম-লিচু-কাঁঠাল-কলা-এসব নানা ফল খেতে পারত সে, যা এখন পায় না। তার আরও আক্ষেপ পূর্ববঙ্গের সেই স্থিতিশীল জীবন এখানে নেই বলে। অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'নির্বাস' উপন্যাসে দেখা যায় হলুদমোহন ক্যাম্পের এই শুকনো মাটিতে উদ্বাস্তুদের মন টেকে না, কারণ 'পদ্মা তাদের মহাশিরা'। সেখানকার সবাই হয়তো জেলে নয় তবু পদ্মা তাদের নানাভাবে টানে। নদীর সঙ্গে তাদের এই অদৃশ্য বন্ধন আজও স্মৃতিতে ভাসে। জ্যোতির্ময় মণ্ডলের 'সুখচাঁদ' উপন্যাসে সুখচাঁদের একাধিক ক্যাম্পে স্থানান্তরিত হওয়ার ফাঁকে ফাঁকে উঠে এসেছে পূর্ববঙ্গের গ্রাম্যজীবনের স্মৃতি, যেখানে সে শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনের এক একটি অংশ কাটিয়ে এসেছে। তার মনে হয়েছে আম-জাম-কাঁঠাল, খাল-বিল হিজল ফুলের দেশের কাছে এই দেশ, ঝকঝকে শহর বড় বেমানান। দেশত্যাগের সময় তার নৌকো যত এগিয়ে যায় ততই দূরে সরে যেতে থাকে তার গ্রাম, মাঠ-ঘাট টিনের চালার ঘর। সে সব স্মৃতি তাকে ব্যথিত করে। রমেশচন্দ্র সেনের 'পুব থেকে পশ্চিমে' উপন্যাসে নায়ক নির্মলের দেশত্যাগের স্মৃতি ফুটে উঠেছে। শ্রীপুর অনন্তপুরের গাছপালা, পশুপাখি আজও তাকে টানে। দক্ষিণ কলকাতায় জবর দখল কলোনিতে তার নেতৃত্বে বসতি গড়তে গিয়ে শ্রীপুরের বাসিন্দারা পূর্ববঙ্গের সঙ্গে অঞ্চলটির কিছু মিল খুঁজে পেয়ে আনন্দিত হয়। 'উজানতলীর উপকথা' উপন্যাসে অনন্ত সুধাময়ীর সন্তান কাজল শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত নদী বিধৌত উজানতলীর অপরূপ নিসর্গ দেখেছে। সেখানকার প্রতিটি মানুষ, তরুলতা, জল-জঙ্গল প্রান্তর জন্মদাগের মত সেটে আছে তার গায়ে। দেশত্যাগের পরে বড় বয়সেও কাজল ভুলতে পারে না বিগত জীবনের স্মৃতি। 'সুপুরি বনের সারি' উপন্যাসে নিলু দেশের বাড়িতে গিয়ে যে পরিবর্তন দেখতে পেয়েছে তাতে তার মন বিষণ্ন হয়ে উঠেছে। অন্যান্য বার এসে যে উষ্ণতা, যে উৎসবের মেজাজ থাকে দাদুর বাড়িতে এবারে তা নেই, তাই বিগত বছরের কথা ভাবতে বসে সে।

পুজো দেখতে যাবার সময় নীলুর বন্ধু হারুন ও তার মায়ের সঙ্গী হওয়া, নবমী পুজোয় নয়টি ঢাক এক জায়গায় বসে বাজানো, এসব কিছুই হয় না। নবমীর সন্ধ্যায় ধুনচি নাচ, এবং আরতি এক প্রকার নীরব হয়ে যায়। বিগত পুজোর স্মৃতি নীলুকে ব্যথাতুর করে তোলে তাই মাঠঘাট পথ প্রান্তর পুকুরঘাট সব কিছুকে সে শেষ প্রণাম জানায়। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের সোনার রাইনাদি ত্যাগ করে চলে যাবার সময় মনে পড়ে বিগত জীবনের স্মৃতি। পাগল জ্যাঠামশায়ের কথা ভেবে ভেবে সে অস্থির। তাই অর্জুন গাছে সোনা লিখে রেখে যায় তাদের দেশত্যাগের সংবাদ। আবার মালতীর দেশত্যাগের পর লিগের মন্ত্রে দীক্ষিত সামুর মনে জেগে উঠেছে বেদনার স্মৃতি। ধানখেত-পাটখেতের আল অতিক্রম করে বকুলফুল কুড়োতে যাওয়া, ডুব সাঁতার দিয়ে নদী পার হওয়া— এসব স্মৃতিতে ভাসে। উপন্যাসে আরও এক উদ্বাস্তু নারী কুসুমের স্মৃতি কাতরতা উঠে এসেছে। কুসুম স্বপ্নের মধ্যে দেখে ফেলে আসা দেশের সেই জল থৈ থৈ পুকুর, পুকুরের মধ্যে সরপুঁটি মাছের কেলি, শাপলা-পদ্ম ফোটা। এই স্বপ্ন-দৃশ্যে রয়েছে হারিয়ে যাওয়া অতীতের সুখ।

উপন্যাসের কাহিনি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় দেশভাগ পরবর্তী হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা, নারীর প্রতি অবমাননা, ধর্মীয় গোঁড়ামি, অর্থনৈতিক সংকটের কারণেই মূলত মানুষের দেশত্যাগ। দেশত্যাগের সেই জ্বলন্ত স্মৃতি উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে উঠে এসেছে, কিন্তু এই ভয়াবহ তিক্ত স্মৃতিকে ছাপিয়ে তাদের মনের পর্দায় বেশি করে ভেসে উঠেছে পূর্ববঙ্গের শান্ত-সুমধুর পল্লিজীবনের স্মৃতি, যেখানে তাদের জীবন ছিল সচ্ছল ও শান্তিপূর্ণ। দেশত্যাগের সময় থেকে তাদের জীবনের নানা সংকট বারবার মনে করিয়েছে পূর্ববঙ্গের ফেলে আসা জীবনের কথা। খাল-বিল-নদী-নালা-গাছপালা ঘেরা জীবনের প্রতি আসক্তি আর আক্ষেপ লক্ষিত হয়েছে প্রতিটি উপন্যাসে।

তথ্যসূত্র

১. অশ্রুকুমার সিকদার, *ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য*, দে'জ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৩৭

২. প্রফুল্ল রায়, *নোনাজল মিঠে মাটি*, দে'জ, ৩য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৩২

৩. প্রফুল্ল রায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৫৭

৪. প্রফুল্ল রায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২০৭

৫. নারায়ণ সান্যাল, *বকুলতলা পি.এল.ক্যাম্প*, নাথ, নাথ ১ম সংস্করণ, ৩য় মুদ্রণ, কলকাতা,

১৯৯৭, পৃ. ১১

৬. নারায়ণ সান্যাল, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৯৪

৭. নারায়ণ সান্যাল, পূর্ব উল্লিখিত, পৃ. ১৪৮

৮. প্রফুল্ল রায়, *কেয়াপাতার নৌকো*, করুণা, ৩য় অখণ্ড সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৫৩৮

৯. প্রফুল্ল রায়, ‘পূর্বে উল্লিখিত’, পৃ. ৫৩৯

১০. প্রফুল্ল রায়, পূর্বে উল্লিখিত’, পৃ. ১৭২

১১. অশ্রুকুমার সিকদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৩৭

১২. ত্রিদিব চক্রবর্তী, নিরুপমা রায় মণ্ডল, পৌলমী ঘোষাল (সম্পা.), ‘ধ্বংস ও নির্মাণ বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের স্বকথিত বিবরণ, সেরিবান, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা ২০০৭, পৃ. (ভূমিকা) ১৬.

১৩. প্রফুল্ল রায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৭০

১৪. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ‘কালের প্রতিমা’, দে’জ পরিবর্ধিত ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৯, পৃ. ১৭০

১৫. অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘মানুষের ঘরবাড়ি, করুণা, ২য় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ১

১৬. অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৩৪

১৭. অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৮

১৮. অমিয়ভূষণ মজুমদার, *নির্বাস*, দে’জ, ১ম দে’জ সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৫০

১৯. অমিয়ভূষণ মজুমদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৫০

২০. অমিয়ভূষণ মজুমদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৬

২১. অমিয়ভূষণ মজুমদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৮

২২. জ্যোতির্ময় মণ্ডল, *সুখচাঁদ*, ডানা, ২য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৩

২৩. জ্যোতির্ময় মণ্ডল, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৩

২৪. জ্যোতির্ময় মণ্ডল, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৪১

২৫. জ্যোতির্ময় মণ্ডল, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৪৪

২৬. জ্যোতির্ময় মণ্ডল, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৬১

২৭. জ্যোতির্ময় মণ্ডল, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১১০

২৮. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, *মরিচঝাঁপি দণ্ডক বন থেকে সুন্দরবন*, হৃতাক্ষর, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ২১

২৯. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৩-২৪

৩০. রমেশচন্দ্র সেন, *পুব থেকে পশ্চিমে,* ভারতী, প্রথম প্রকাশ কলকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫২

৩১. রমেশচন্দ্র সেন, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৫৪

৩২. কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর, *উজানতলীর উপকথা* (১ম পর্ব), চতুর্থ দুনিয়া, ২য় সংস্করণ কলকাতা, ১৪১২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১১

৩৩. কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২০৫

৩৪. কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর, *উজানতলীর উপকথা (২য় পর্ব),* নিখিল ভারত, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২১৯

৩৫. অনিলরঞ্জন বিশ্বাস, *ঔপন্যাসিক মহাকাব্য,* মনোহর মৌলী বিশ্বাস (সম্পা.), 'চতুর্থ দুনিয়া', কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৭০

৩৬. যতীন বালা, 'যশোরের স্মৃতি ও উদ্বাস্তু ক্যাম্পের জীবন', মননকুমার মণ্ডল (সম্পা.), *পার্টিশন সাহিত্য দেশ-কাল-স্মৃতি,* গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ২৫৬

৩৭. যতীন বালা, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৭০ৃ

৩৮. যতীন বালা, *শিকড় ছেড়া জীবন,* চতুর্থ দুনিয়া, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১৪৮

৩৯. শঙ্খ ঘোষ, *সুপুরি বনের সারি,* অরুণা, প্রথম প্রকাশ ২য় মুদ্রণ, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১২

৪০. শঙ্খ ঘোষ, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৬

৪১. শঙ্খ ঘোষ, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৫০

৪২. শঙ্খ ঘোষ, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৯১

৪৩. অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, *নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে,* করুণা, অখণ্ড সংস্করণ, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৩১

৪৪. অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৫৪

৪৫. অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৩৭৬

৪৬. অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৪০১

৪৭. পিনাকেশ সরকার, *প্রবাহমান নিসর্গ ও মনুষ্যত্ব : নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে*, দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), *পরিকথা,* ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ১০০

৪৮. অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৩৮০

৪৯. অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৩৮৫

৫০. অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৩৯০

৫১. দক্ষিণারঞ্জন বসু (সম্পা.), *ছেড়ে আসা গ্রাম*, জিজ্ঞাসা, ১ম জিজ্ঞাসা সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ৫

৫২. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *উপন্যাস : রবীন্দ্র চেতনার আলোকে পঞ্চাশৎ পরিক্রমা*, বিশ্বভারতী, বোলপুর, ১৯৯৩, পৃ. ৬১

৫৩. জ্যোতির্ময়ী দেবী, *এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা*,রূপা, ১ম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃ. ৭

৫৪. জ্যোতির্ময়ী দেবী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৩

৫৫. জ্যোতির্ময়ী দেবী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৪

৫৬. জ্যোতির্ময়ী দেবী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৮

৫৭. জ্যোতির্ময়ী দেবী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১২০

৫৮. জ্যোতির্ময়ী দেবী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৯৮

৫৯. শচীন দাশ, *উদ্বাস্তু নগরীর চাঁদ*, দে'জ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৯৮

৬০. শচীন দাশ, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৭৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলা উপন্যাসে উদ্বাস্তু নারীর সমস্যা ও সংকট

সাতচল্লিশের দেশভাগ একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের ফলে বাঙালির জীবনে নেমে আসে এক ভয়ংকর বিপর্যয়। এই বিপর্যয় ভারতবর্ষের মানচিত্রকে বদলে দিয়েছে। এই বদল কেবলমাত্র ভৌগোলিক নয়— সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রই বদলেছে অতি দ্রুত। বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষের দেশান্তর ঘটেছে— সাত পুরুষের পুরোনো আবাস ছেড়ে নতুন বসতি গড়েছে। পুরোনো বাসস্থানের সঙ্গে নতুন বসতির, নতুন প্রতিবেশীর নানা দিক থেকে ভিন্নতা, বেঁচে থাকার লড়াই। সব মিলিয়ে দেশভাগ ছিন্নমূল মানুষের জীবনকে আমূল বদলে দিয়েছে।

স্থায়ীভাবে পুরুষের দেশান্তরের সঙ্গে সঙ্গে নারীও দেশান্তরী হয়েছে, এবং বলা ভালো সংকটের আবর্তে নারীই সবচেয়ে বেশি ঘুরপাক খেয়েছে। প্রকৃতির নিয়মেই নারীর উপর পুরুষের শারীরিক উৎপীড়ন সম্ভব। তাই সকল যুগে সকল সভ্যতায় নারীর সম্ভ্রম ছিল রক্ষণযোগ্য সম্পদ। পৃথিবীর ইতিহাসে নানা সময়ে মানুষ শত্রুপক্ষের নারীকে বিবস্ত্র ও ধর্ষণ করার মধ্য দিয়ে লালসা ও প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করে এসেছে। বস্তুত আমাদের দেশভাগ, দাঙ্গা বাস্তুত্যাগ সবই পুরুষের সৃষ্টি, অথচ নারীকে দিতে হয়েছে তার চরম মূল্য। বহুক্ষেত্রে নারীরা পারিবারিক সম্মানের চাপে আত্মহত্যা করেছে; অগণিত নারী বলাৎকারের শিকার হয়েছে। এরফলে অনেকেই সন্তান সম্ভাবনা হয়েছে এবং মনে গভীরে তৈরি হয়েছে গভীর সংকট।

পাশাপাশি শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়নি এমন নারীর সংকট ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। পুব বাংলার শান্ত গৃহকোণে ছিল যে নারীর বাস; সে দেশান্তরী হয়ে শিয়ালদহ স্টেশনে কিংবা ক্যাম্পে নির্বাসিত হবার পর তৈরি হয়েছে ভিন্নতর সমস্যা। প্রধানত তিন ধরনের সমস্যা ছিল তাদের—

i) অর্থনৈতিক সমস্যা;

ii) বাসস্থানের সমস্যা;

iii) নারীর আব্রুর সমস্যা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষ সহ সারা পৃথিবীর অর্থনৈতিক চিত্র বদলে যাচ্ছিল দ্রুত। ভারতবর্ষে এই বদল ত্বরান্বিত হচ্ছিল দেশভাগ ও বঙ্গবিভাগ জনিত কারণে; যার ঢেউ নারীর

অন্দরমহলে এসে পড়ল প্রবলভাবে। ভাঙনের পর নারীর জীবন নতুন করে গড়ে ওঠে। পূর্ববঙ্গে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে নারীর একটি নিজস্ব জগৎ ছিল, সে জগৎ অনেকটা এরকম—

i) সংসারের গণ্ডির মধ্যেই ছিল তার বিচরণ, বাইরের জগৎ একেবারেই অজানা;

ii) বাইরের পুরুষ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপন;

iii) রোজগারের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা ছিল নগণ্য;

vi) বাইরে বেরিয়ে কাজে যাওয়া পারিবারিক সম্মানের অন্তরায়;

v) পরিবারের নারীর মতামতের ভূমিকা ছিল না বললেই চলে;

vi) বর্ণগত ও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ এমন পরিবারের মেয়েদেরই কেবলমাত্র শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল;

vii) যৌথ পরিবারে অভ্যস্ত ছিল মেয়েরা।

কিন্তু দেশান্তর মেয়েলি জীবনকে বদলে দিয়েছে এক লহমায়। ঘরছাড়া মানুষ যখন তার স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে বের হল তখনই নারী হারাল তার আব্রু। বোচকা-বুচকি মাথায় করে লঞ্চ-স্টিমার-নৌকায় করে, পায়ে হেঁটে, ট্রেনে চড়ে আসতে আসতে নারীর সামনের পর্দা সরে গেল; স্টেশনে কিংবা ক্যাম্পে নির্বাসিত হল গৃহস্থ নারী। ফলে বদলে যেতে লাগল পরিবারের গড়ন, সদর-অন্দরের ব্যবধান, ঘর-গেরস্থালির ধরন-ধারণ, কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ, শহরের রাস্তা-ঘাটে অবাধ বিচরণ নারীকে এক নতুন জগতের সন্ধান দেয়। কলোনি রক্ষার সংগ্রামে, রাজনৈতিক প্রসঙ্গ নিয়ে পুরুষদের সঙ্গে মেয়েরাও আলোচনায় যোগ দিতে শুরু করে, কাছাকাছি আসে দুই জগৎ। মেয়েদের রাস্তার কলে জল আনতে আসতে হয়, বাজারে যেতে হয়, উপার্জনে বেরোতে হয়, ফলে পুরুষের পৃথিবী আর মেয়েদের পৃথিবীর মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা সম্ভব হয় না। পুরুষের জগতের সন্নিধ্যে আসার ফলে নতুন বোধের সঙ্গে, ধারণার সঙ্গে নারীর পরিচয় ঘটে। ভেতরের-বাইরের ব্যবধানে মুছে যাওয়া প্রসঙ্গে গায়ত্রী চক্রবর্তী যথার্থই বলেছেন— 'The private public divided break down.'[১]

যে মুহূর্তে মেয়েরা রোজগারের জন্য ঘরের বাইরে পা রাখল, তখন থেকেই তার কাছে এত দিনের আবছায়া জগৎ স্পষ্ট হতে লাগল। তাদের উপার্জিত অর্থ যখন থেকে সংসারের কাজে লাগল তখন থেকেই সংসারে মেয়েদের কথা বলার জায়গা তৈরি হল। কেমন যেন নারী-পুরুষের সম্পর্কের ধরন বদলে গেল। নারীর এই বদলের কতগুলি অভিমুখ রয়েছে—

i) মানব বিপর্যয়ের অভিঘাতে নারী নতুন মনোবল নিয়ে বেঁচে উঠেছে;

ii) পুরুষের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলার সাহস ও ক্ষমতা অর্জন করেছে;

iii) ঘরে-বাইরে উভয় দিক সামলে নারীর নিজস্ব সত্তা তৈরি হয়েছে;

iv) নারী কর্মব্যস্ত হয়ে উঠেছে;

v) পূর্ববঙ্গে যৌথ ও বৃহৎ পরিবারে অভ্যস্ত নারী ছোট পরিবারে আবদ্ধ হল;

vi) পারিবারিক জটিলতা বাড়তে শুরু করল।

আমাদের গবেষণাপত্রের এই অংশে বাংলা উপন্যাসে দেশান্তরী নারীর বিপন্নতা, নারীর শ্রেণিগত বিন্যাস, দেশভাগ। পরবর্তী সময়ে প্ল্যাটফর্মে, ক্যাম্প-কলোনিতে নারীর বেঁচে থাকার সংগ্রাম, সমাজ নির্মাণে তাদের ভূমিকা, পুরুষের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিজেকে গড়ে তোলার বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পূর্ববঙ্গের সীমানা অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গের সীমানায় পা দেওয়া মাত্রই উদ্বাস্তুদের যাবতীয় তথ্য নথিবদ্ধ করে একটি সরকারি চিরকূট ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার নাম 'বর্ডার স্লিপ'। তা নিয়ে তারা এসে পৌঁছেছে শিয়ালদহ স্টেশনে। তাদের পোটলা-পুঁটলি, নোংরা বিছানাপত্র প্ল্যাটফর্মের সর্বত্র ছড়িয়ে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডায়েরিয়া, বদহজম, আমাশা, কলেরায় আক্রান্ত হতে থাকে অগণিত মানুষ। এর মধ্য দিয়ে সরকারি শিবিরে যাবার জন্য প্রতীক্ষায় থাকতে হয়। হাজার হাজার নিত্যযাত্রী যারা প্রতিদিন কলকাতায় আসত, তারা ধুলোকালি মাখা মানুষগুলির দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকত। কালিঝুলি মাখা পুরুষ, নারী ও শিশুর দেহের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলত। সাপ্তাহিক মাথাপিছু দু-টাকা ও শুকনো চিঁড়ে গুড়ের বরাদ্দের (ডোল) জন্য এদের কাড়াকাড়ি; কল থেকে জল আনবার জন্য মারামারি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ শোকের জন্য এদের ছিল নিত্য দিনের হাহাকার। যাত্রীদের নিত্যযাত্রীদের ভিড়ের চাপে অন্তঃসত্ত্বা মহিলার সন্তান প্রসবের উদাহরণ আছে।[২]

প্রফুল্ল রায়ের 'নোনা জল মিঠে মাটি'তে উদ্বাস্তু নারীর নানা সংকট চিত্রিত হয়েছে। দেশত্যাগের পর উজানী বুড়ী, হারান, কাপাসী, নিত্যঢালীদের অনিশ্চিত যাত্রা শুরু হয়। মানুষগুলো আর কিছু জানুক না জানুক, সহজ বুদ্ধিতে এটুকু বুঝেছে, এই যাত্রা অনন্ত অফুরন্ত দুঃখের যাত্রা। গোয়ালন্দের ঘাট থেকে ট্রেনে করে নাম না জানা নানা স্টেশনে থামতে থামতে শেষ পর্যন্ত দর্শনা সীমান্ত পেরিয়ে তারা রাণাঘাট স্টেশনে পৌঁছোয়। বর্ডার স্লিপ নেবার পর তারা শুনতে পায় রাণাঘাটের রিফিউজি ক্যাম্পে জায়গা নেই, পরের ট্রেন ধরে তারা পৌঁছোয় শিয়ালদহ স্টেশনে। সেখানেই তারা একে অপরের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। লেখক প্ল্যাটফর্মের করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন উপন্যাসে—

'প্ল্যাটফরমের ওপর হাত চার পাঁচেক জায়গা দখল করে এক একজন ইট দিয়ে সীমানা ঠিক করে নিয়েছে। ঐ নিরাবরণ নগ্ন জায়গাটুকুর মধ্যে বউ-ঝি-মেয়ে-পুরুষ গাদাগাদি করে পড়ে থাকে। গোপনতা নেই, আব্রু নেই। ওখানে যুবতী নারী গর্ভিনী হচ্ছে, মানুষ জন্মাচ্ছে, মানুষ মরছে। ওখানেই ঘর-সংসার, জীবন মৃত্যু সবকিছু।'[৩] এইরকম দুর্বিষহ অবস্থার মধ্য দিয়ে স্টেশনের এক কোণে হাত পাঁচেক জায়গা দখল করে উজানীবুড়ি ও তার নাতি হারান। তারই পাশে আস্তানা গাড়ে নিত্য ঢালী ও তার যুবতী মেয়ে কাপাসী। কাপাসী ধর্ষিতা। অর্ধ-উন্মাদের মতো শিয়ালদহ স্টেশনের উপর দিয়ে ঘুরে বেড়ায়, কলকলিয়ে হেসে ওঠে, আবার কখনও কান্নায় ভেঙে পড়ে। এখানেই তাদের অপেক্ষা করতে হয় দিনের পর দিন। দলা পাকিয়ে থাকতে থাকতে একে অপরের সুখ দুঃখের সাথী হয়ে ওঠে— আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরি হয়। একজন আর একজনের কাছে এসে বসে, পরামর্শ দেয়; কেউ হতাশ হয়ে পড়লে ভরসা দেয়, বিগত জীবনের স্মৃতিচারণে মত্ত হয়ে ভুলতে চায় বর্তমানের দুর্বিষহ অবস্থা। ঔপন্যাসিক শিয়ালদহ স্টেশনের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার সত্যতা ও সমর্থন মেলে অশোকনগরের পি.এল. ক্যাম্পের বাসিন্দা হরিদাসী মণ্ডলের কথায়। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় তিনি তার ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন— 'পঞ্চাশ সালে কালশিরা দাঙ্গার[৪] পর পুলিশ অত্যাচার শুরু করে। এর কিছুদিন পরেই সবকিছু ছেড়েছুঁড়ে দিয়ে চলে আসি। আমি পোয়াতি। প্রায় নয়মাস। স্বামীর ক্ষয় রোগ। ছোট ছোট দুই মেয়ে আর স্বামীকে নিয়ে যখন শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছলাম, তখন সেখানে লোক আর লোক। গুঁতোগুঁতি করে স্টেশনের পুব-দক্ষিণ কোণে একটু জায়গা নিলাম। জল নেই, খাবার নেই, মশা মাছি ভনভন করছে, স্বামী দিন-রাত কাঁশে। বাঁচেনি বেশি দিন। দশ-বারো দিনের মাথায় আমার ব্যথা উঠল। যন্ত্রণায় ছটফট করছি। আশপাশ থেকে বয়স্ক ধরনের কয়েকজন এসে কাপড় টানিয়ে ধরল। ছেলে হল। নাম রাখলাম স্বাধীন। সে ছেলেকে বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারিনি। তারপর থেকে অনেক জায়গা ঘুরে এই অশোকনগরে।[৫]

এই অসহায় উদ্বাস্তুদের জীবন এভাবেই কলকাতার ফুটপাতে, প্ল্যাটফর্মে, গাছতলায় শেষ হয়ে গেল। বাঁচার তাগিদে তারা যে কোনও কাজের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রেখেছে— ন্যায়-অন্যায়ের ধার ধারেনি। পরিবার পরিজনের কথা ভেবে কত মেয়ে যে জীবনের কানাগলিতে হারিয়ে গিয়েছে তার হিসেব নেই। নারীদের প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিকের এই মতামত তাৎপর্যপূর্ণ— 'প্রাণ বাঁচাবার অন্ধ তাগিদে কত যুবতী মেয়ের দেহ যে বিকিয়ে গেল, কত ঘরের বউ যে ঘর-সংসার-স্বামী-সন্তান ছেড়ে শহর বাজারের খাপরা ছাওয়া রং মহলে গিয়ে ঘুঙুর বেঁধে, চোখে সুরমা টেনে দাঁড়াল তার লেখা-জোখা

নেই। পুব বাঙলার কত কুমারী মেয়ে আড়কাঠির কারসাজিতে রাত্রির অন্ধকারে কোথায় যে পাচার হয়ে গেল কে তা বলে দেবে।’[৬]

উপন্যাসের কাহিনিতে লেখকের বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দেশ দু’টুকরো হবার পর আর দশজনের মত রামকেশবও দেশ ছেড়েছিল। সঙ্গে ছিল স্ত্রী ক্ষিরি, ছেলে সুবল ও মেয়ে পরী। পরী বড়, বয়স যোলো, সুবল দশ। শিয়ালদহ স্টেশনের পাশে ফুটপাত দখল করে রামকেশব পুরোনা চট, পেটা টিন, পিচবোর্ড দিয়ে ছাউনি তৈরি করল। এখানে থাকা আর শিয়ালদহ স্টেশনের লঙ্গরখানার খিচুড়ি খাওয়ার মধ্য দিয়েই চলছিল। প্রতিনিয়ত খিচুড়ি খেয়ে আমাশা ধরল সুবলের। আমাশা থেকে রক্ত আমাশা; একদিন মরল ছেলেটা। লঙ্গর খানার খিচুড়ি খেয়েও অঢেল স্বাস্থ্যে শুধু যুবতীই নয় রূপসীও হয়ে উঠেছে পরী। রামকেশবের স্ত্রী ক্ষিরি যুবতী মেয়েকে নিয়ে ছাউনিতে থাকত আর রামকেশব স্টেশনে ভিক্ষে করত। মেয়েকে আগলে রাখার অবস্থা তার ছিল না। এই অবসরে রঙিন স্বপ্নে প্রলুব্ধ করে দিনের পর দিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা বিড়ি খাওয়া ফোকলা দাঁতের এক যুবক। শত বাধা সত্ত্বেও পরীকে নিয়ে সে একদিন উধাও হয়ে যায়। লেখকের কথায়— ‘সুবল মরল। পরী নিখোঁজ হল। ঠিক নিখোঁজ নয়, সেও আরেকভাবে মরল। দেশভাগ তাকে মারল[৭]।’

উদ্বাস্তুদের চাপে পশ্চিমবঙ্গের ক্যাম্পগুলি যখন জনাকীর্ণ তখন সরকার পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পুনর্বাসনের পরিকল্পনা করে। এর মধ্যে যে দুটি পরিকল্পনা করে তা হল-

i) আন্দামান পরিকল্পনা;
ii) দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা।

‘নোনা জল মিঠে মাটি’ উপন্যাসের কুশিলবেরা শিয়ালদহ স্টেশন থেকে কালাপানি পেরিয়ে পোর্টব্লেয়ার থেকে একশো মাইল দূরে উত্তর আন্দামান দ্বীপে সরকারের তৈরি ট্রানজিট ক্যাম্পে আশ্রয় পায়। তাদের জীবনের নানা সংকটে পূর্ণ উপন্যাসটি। উপন্যাসে আমরা যেমন পরীর জীবন কাহিনি পাই যে জীবনের চোরা স্রোতে ডুবে গিয়েছে, তেমনি পূর্ববঙ্গে ধর্ষিতা কাপাসীর জীবনের নানা সংকট দেখা গিয়েছে উপন্যাসটিতে। মেয়ের সম্ভ্রম হারানোর পর মাতৃহারা মেয়েকে নিয়ে প্রথমে শিয়ালদহ পরে আন্দামানের এই দ্বীপে এসেছে নিত্যঢালী। তার সাথেই উজানীর নাতি হারানের প্রণয়-সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তারই সংস্পর্শে এসে অর্ধ উন্মাদ কাপাসী ক্রমে সুস্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু সে সম্পর্ক পরিণতি পায় না, কারণ একাধারে নিত্য ঢালীর মেয়েও ধর্ষিতা। দেশভাগের সময়ের এই ধর্ষিতা নারীদের সমাজ

ঠাঁই দিতে চায়নি। এই বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে উপন্যাসে। অন্যদিকে এই প্রণয়ী প্রণয়িনী ছিল আলাদা জাতের। পেশা ও বৃত্তি অনুযায়ী যে জাত ব্যবস্থা বর্তমান ছিল পূর্ববঙ্গে দেশভাগ তার সীমারেখা চুরমার করে দিয়েছিল। তখন তাদের একটিই পরিচয়—উদ্বাস্তু। কিন্তু ক্যাম্প কলোনিতে স্থিতি লাভ করবার পর জাতের বিচার আবার প্রবল হয়ে ওঠে। তারই ফলস্বরূপ উজানী বুড়ি নিত্য ঢালীর বাড়িতে এসে নানা কথা শুনিয়ে গিয়েছে। জাতের দোহাই দিয়ে উভয়ের সম্পর্ক ভেঙে দিয়েছে— 'নিত্যা তুই কি ভুইল্যা গেলি তরা ঢালীর জাত। আমরা কাপালী যে সে কাপালী না, শিউলি কাপালী। পাগল চান আমাগো গুরু। ভিনজাতের লগে কি আমাগো বিয়া হয়, না হইতে পারে। হে ছাড়া—'[৮] এই হে ছাড়া কথাটির মধ্য দিয়ে উজানী বুড়ি কাপাসীর অতীত জীবনের কথা তুলে ধরেছেন।

নিত্য ঢালীর অসহায়তার সুযোগ নিয়ে পানিকর (সামুদ্রিক শঙ্খ, কড়ি বা শামুক ব্যবসায়ী) কাপাসীকে পাচার করে দিতে চেয়েছে। মোটর বোটে করে যখন কাপাসী ও নিত্যঢালীকে অজানা জায়গায় নিয়ে যেতে উদ্যত হয়েছে তখনই কাপাসীর অতীত স্মৃতি ভেসে উঠেছে— 'কোথায় যেন একটা চর ছিল। ছোট একটা দোচালা ঘরে তাকে আটকে রাখা হয়েছিল। একদিন দুদিন, দুমাস, একবছর কত দিন যে সে সেখানে বন্দী হয়েছিল মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে, কারা যেন তার কাছে আসত। তারা এলেই সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলত।'[৯] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য দেশভাগের সময় এই অত্যাচারিত মেয়েদের অতীত জীবনের স্মৃতি কুরে কুরে খেয়েছে সারা জীবন। উপন্যাসে পানিকর কাপাসী ও তার বাবা নিত্য ঢালীকে নৌকায় বসিয়েছে নানা প্রলোভন দেখিয়েছে। আসল উদ্দেশ্য কাপাসীকে পাচার করা। পানিকর বোট চালিয়ে দিলে অতীত অভিজ্ঞতাকে মাথায় রেখে আত্মরক্ষার তাগিদে কাপাসী সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

মহীতোষ বিশ্বাসের উদ্বাস্তু জীবন কেন্দ্রিক উপন্যাস 'পরতাল'। সেখানে নারীর সমস্যা ও সংকট আবর্তিত হয়েছে প্রধানত তিনটি বৃত্তে—

i) উইমেন্স ক্যাম্পের শিক্ষিকা মীরার জীবন বৃত্ত;

ii) রূপসীর ব্যক্তিগত জীবনের সংকট;

iii) ক্যাম্পবাসী মহিলাদের সমবেত জীবন।

উপন্যাস শুরু হয়েছে ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত উদ্বাস্তু বান্ধব বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, শশধর মাস্টারের মেয়ে মীরা দিদিমণির ক্লাসরুমের কাহিনি দিয়ে। প্রৌঢ় বয়সে দাঁড়িয়ে ক্লাসরুমের মধ্যেই অতীতের স্মৃতিতে ডুবে গিয়ে চোখের জলে দুচোখ ভাসিয়েছে মীরা।

ঢাকার একটি কলেজ থেকে আই.এ পাশ করে বি.এ পড়ার প্রস্তুতি চলছিল। এমন সময় দেশভাগের বিপর্যয় নেমে আসে। মূলত দুটি কারণে স্ত্রী ও কন্যা মীরাকে নিয়ে শশধরবাবু দেশত্যাগ করেন।

i) শশধর বাবুর সম্পত্তি দখল এবং দেশত্যাগের পর তার শিক্ষকতার চাকরির স্থলে নতুন কোনও লোক নিয়োগ করা যাবে সেই কারণে স্থানীয় মুসলমানদের চাপ সৃষ্টি;

ii) যুবতী মেয়ে মীরার প্রতি স্থানীয় যুবক জুলফিকারের নজর।

নারীর সম্ভ্রম সুরক্ষিত নয়, সেটাই ছিল শশধরবাবুর দেশত্যাগের মূল কারণ। সীমান্ত পার হতে না হতেই স্ত্রী বিয়োগ হয়। এরপর বাবা-মেয়ের ঠাঁই হয় রাণাঘাট কুপার্স ক্যাম্পে। সেখানে সর্পদংশনে শশধরবাবুর মৃত্যু হলে মীরাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় উইমেন্স ক্যাম্পে। তখন থেকে তার জীবনে শুরু হয় একক সংগ্রাম। বাস্তবে অভিভাবকহীন মেয়েদের নানা ধরনের সংকট তৈরি হয়েছিল সে সময়ে। বিশেষ করে যুবতী মেয়েদের নিরাপত্তার প্রশ্নে প্রবল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। উপন্যাসে মীরার জীবনেও এই ধরনের অসুবিধা আসে। তবু অদম্য ইচ্ছার বলে ক্যাম্প সুপার সুলেখা সেনের সহযেগিতায় স্কুলে শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে রাণাঘাটের একটি কলেজে ভর্তি হয়। অনেক সহকর্মীই তার এই লেখাপড়ার বিষয়টি ভালো চোখে দেখেনি। ক্যাম্পকর্মী সাধনা মীরাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে— 'দালাল কোথাকার! সুপারের দালালি করে, তেল মেরে ভর্তি হয়েছিস। ওরকম দালালি করতে পারলে আমিও কলেজে ভর্তি হতে পারতাম।'[১০]

ক্যাম্প সুপার সুলেখা সেন বদলি হয়ে যাবার পর নতুন সুপার বৈশাখী ব্যানার্জীও মীরাকে ভালোভাবে গ্রহণ করেননি। কলেজে যাওয়া আসার পথে রাণাঘাটের এক প্রসিদ্ধ কাপড় ব্যবসায়ীর ছেলে সুজনের সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মীরার সব গুণ থাকা সত্ত্বেও উদ্বাস্তু হওয়ার সুবাদে এই প্রণয়ে সুজনের বাবা বাদ সাধলেন। তিনি গুণ্ডা লাগিয়ে মীরাকে মেরে ফেলে রেখে যান ক্যাম্পের পাশে ফাঁকা মাঠে। ভাগ্যের জোরে মীরা বেঁচে উঠলেও সুজনের সঙ্গে তার সম্পর্কের পরিণতি পায়নি। মীরাও সারা জীবন কুমারী থেকেছে।

উপন্যাসের দ্বিতীয় বৃত্তে রয়েছে পূর্ববঙ্গের খুলনা জেলার অমরগাতী গ্রামের মেয়ে রূপসী। এই অঞ্চলে পঞ্চাশ পরবর্তী সময়ে বড় একটি দাঙ্গার পর সিরাজ মনিরুল সহ পাঁচ দুর্বৃত্ত রূপসীকে অপহরণ করে ধর্ষণ করে। অবশেষে তাকে বিহারী মুসলমান ব্যবসায়ী জাহিদ আলির কাছে বিক্রি করে দেবার পরিকল্পনা করে। সেই কারণে ধর্ষণের পর কয়েকটা গ্রাম পেরিয়ে বিলের ধারে একটি ফাঁকা বাড়িতে

তাকে আটকে রাখে। সেখান থেকে কোনওক্রমে পালিয়ে খুলনা রেল স্টেশনে পৌঁছোয়, ট্রেন ধরে ভারতে যাবার উদ্দেশ্যে। সেই গাড়িতে এমন এক দম্পতি উদ্বাস্তু হয়ে চলেছে, যাদের নমিতা নামের যুবতী মেয়েকে মুসলমানেরা তুলে নিয়ে গিয়েছে। কন্যা হারা দম্পতি রূপসীকে ভুল করে নমিতা ভাবে। ক্রমে সে ভুল ভাঙে; তবু রূপসী নমিতা নামেই তাদের সঙ্গে রওনা হয়। কন্যা হারা এই বুড়োবুড়ির সঙ্গে তার আশ্রয় হয় কুপার্স ক্যাম্পে। ততদিনে সে জরাজীর্ণ হাড় পাঁজরা বের করা একটা কাঠামো। এই সময়ে রূপসীর জীবনে শুরু হয় নতুন সংকট। 'রূপসী টের পায় তার পেটে কেউ এসেছে। আর সেটা যে কোথা থেকে এসেছে সেটা ভাবতেই গা ঘিন ঘিন করে ওঠে এর মন। মনে পড়ে যায় বাওড়ের কুলের সেই রাত্রিটার কথা। পাঁচ পাঁচটা জন্তু সারারাত ধরে ছিঁড়ে খুঁড়ে খেয়েছিল ওকে। সেই জন্তুগুলোরই কোনওটার পাপের বীজ ছড়িয়ে পড়েছে তার পেটে।'[১১] লজ্জায় ঘৃণায় দু-দুবার গলায় দড়ি দিতে গিয়েও পারেনি। ছ'মাসের মাথায় গর্ভপাত হয় তার। মৃত সন্তান। এরই মধ্যে ক্যাম্পে শুরু হয় কলেরা। আশ্রয়দাতা বুড়ো-বুড়ি দু'জনেই মারা যায়। সরকারের নির্দেশে অভিভাবকহীন রূপসীকে সরিয়ে নেওয়া হয় কল্যাণপুর কলোনিতে। সেখানেই বাবা মায়ের খোঁজ মেলে।

দেশভাগের সময়ে যে সকল মেয়েরা অত্যাচারিত হয়েছে, এদের মধ্যেই অনেকেই গর্ভবতী হয়েছে। পরিবারের চাপে তাদের কেউ কেউ গর্ভপাতে বাধ্য হয়। আবার অনেকেই গর্ভের সন্তানকে বড় করে তুলেছে। সন্তানের মিথ্যে পিতৃপরিচয় দিতে হয়েছে সারাজীবন। এর ফলে প্রতিনিয়ত মানসিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়েছে নারীকে। পাশাপাশি পরিবারকে পড়তে হয়েছে সামজিক সংকটে। কাপাসীকে আশ্রয় দেবার পর ভরত বিশ্বাসের এই সংকট যেন সব ধর্ষিতা কন্যার পিতার। কোথাও নিরিবিলি দু'চারজনকে ফিস ফিস করতে দেখলেই ভরত বিশ্বাসের মনের মধ্যে নানারকম চিন্তার উদয় হয়। তার ভাবনাটা এই রকম—

''ঐ লোকটাকে চিনিস?

--- হ্যাঁ ও তো ভরত বিশ্বাস

--- হ্যাঁরে, দেশ-গায়ে খুব বড়ো মাতব্বর ছিল

--- মাতব্বর না ছাই। ওর মেয়েটাকে মুসলমানরা ধরে নিয়ে গেল। সেই মুসলমানের এঁটো মেয়েকে আবার ঘরে তুলেছে। জাত-ধম্মো বলে আর থাকল না কিছু'[১২]

তাই পারিবারিক সম্মান বাঁচাতে ভরত বিশ্বাস চলে যেতে চায় পরিচিত জনের বাইরে; যেখানে কেউ তাকে মেয়ের কলঙ্ক নিয়ে প্রশ্ন তুলবে না। স্থির হয় বর্ধমানে যাবে। লেখকের কথায়— 'বর্ধমানে

গেলে হয়ত ভুলে যেতে পারবে কলঙ্কময় অতীতটাকে। মনের যে জ্বলুনিতে খাঁক হয়ে যাচ্ছে দিন-রাত, অচেনা জায়গায় গিয়ে তার হাত থেকে হয়ত রেহাই পাবে কিছুটা। রূপসীও হয়ত কিছুটা স্বস্তি পাবে ওখানে গেলে।'[১৩]

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সরকার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে অসহায় মহিলাদের জন্য ক্যাম্প তৈরি করে। 'পরতাল' উপন্যাসে এমনই একটি ক্যাম্পের কথা উল্লিখিত হয়েছে। ক্যাম্পবাসী এই মহিলাদের ব্যক্তিগত জীবনের খণ্ড খণ্ড চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনের খুটিনাটি বিষয় নিয়ে বিবাদ বিসম্বাদ লেগেই থাকে; তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুন একটি বিষয়— 'তাঁবুর মহিলারা সবাই দো তেকেলে বুড়ি তা তো নয়। ভরা বয়সের যবুতী মেয়েও আছেন কেউ কেউ তাদের মধ্যে। ক্যাম্পে প্রমীলা রাজ্যের অতৃপ্ত জীবন। ফলে ঐ মহিলাদের কেউ কেউ শিকার হতে লাগলেন প্রলোভনের।'[১৪] আবার এদের মধ্যে এক শ্রেণি নিজেদের শরীরকে পণ্য করে উপার্জন করতে শুরু করে; কেউ কেউ অপরাধ জগতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। ফলে যত্রতত্র বাইরের পুরুষদের আনাগোনা ঘটে এবং তা দ্রুত বাড়তে থাকে। এক সময়ে ক্যাম্পের আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হতে থাকে।

ক্যাম্পের অপর্যাপ্ত ডোল, বাসস্থানের সমস্যা প্রতিনিয়ত লেগেই ছিল। এই সমস্যাগুলিতে তারা অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু ক্যাম্প সুপার বৈশাখী ব্যানার্জী তাদেরকে পচা চাল খাওয়াতে বাধ্য করতেন। তারা সমবেত ভাবে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। ক্যাম্প সুপার পুলিশ ডেকে শাসন করার কথা বললে তার চরম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় উদ্বাস্তু মহিলাদের মধ্যে। উপন্যাসে এভাবে ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে— 'বৈশাখীর একথায় যেন ঘি পড়ল আগুনে। মহিলারা আর সভ্যতা ভদ্রতার ধার ধারলেন না। ওপাশ থেকে জবাব এলো সপাটে 'পুলিশ দেখাচ্ছিস হারামজাদী। ডাক, তোর কোন পুলিশ বাবারে ডাকবি— ডাক। দেখি তোর মুরোদ কতখানি।' শুধু এই টুকুতেই শান্তি এলো না। চারিদিক থেকে রব উঠল— 'ধর শালিকে-মার শালিকে'। মারমুখী মহিলাদের হুড়োহুড়ি শুরু হল চারপাশে।'[১৫] তারা মিছিল করে গিয়ে ঘেরাও করেছে ক্যাম্প সুপারকে, সমস্যার সমাধান না হলে অরন্ধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, থালা-গ্লাস বাজিয়ে স্লোগান দিয়েছে— 'উনুনে হাড়ি চড়াবো না, পচা চাল খাবো না।' শেষ পর্যন্ত ক্যাম্প সুপার উদ্বাস্তু মহিলাদের কাছে নতিস্বীকার করেছে। স্বাধীনতা পূর্বকালীন সময়ে এরা সকলেই ছিল শান্ত গৃহবধূ, যে কোনও কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করত পুরুষেরা— নারী তার গৃহের গণ্ডি নিয়ে ব্যস্ত থাকত। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সংসার হারা, অভিভাবক হারা এই নারী সমাজ ব্যক্তিগত লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে হতে সামগ্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে

যায়, যা পরবর্তী সময়ে উদ্বাস্তু আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হয়ে ওঠে।

রমেশচন্দ্র সেনের 'পুব থেকে পশ্চিমে' উপন্যাসটি পঞ্চাশ সালের আগে-পরে পূর্ববাংলা থেকে গৃহহারা মানুষদের দলে দলে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসার সময়টিকে নিয়ে লেখা। উপন্যাসের শুরুতে বাংলাদেশের শ্রীপুর গ্রামকে পটভূমি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এই গ্রামে অনেক হিন্দুর বাস। তারা প্রত্যেকেই মোটামুটি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল। এই গ্রামেই বাস করে সৎ বিনয়ী ভদ্র সাম্যবাদে বিশ্বাসী যুবক নির্মল, নির্মলের মা নিভাননী, কবিরাজ ধ্রুব, তার ভাই ব্রজ ও বিধবা বোন উমা। উপন্যাস শুরু হয়েছে শ্রীপুরের পার্শ্ববর্তী গ্রাম ফাঁসিপোতায় দাঙ্গা ও আগুনের ছবি দিয়ে। তার পরেই গ্রামের লোক সম্মিলিতভাবে দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উপন্যাসে দেশত্যাগের সময় থেকে শিয়ালদহ স্টেশনে অবস্থান এবং তার পরবর্তী সময়ে কলোনি স্থাপন করতে গিয়ে নারীর নানা ধরনের সমস্যা তৈরি হয়েছে। আবার সেই সংকট থেকে উত্তরণের পথ খুঁজেছে নারীরাই।

ধ্রুব কবিরাজের সুন্দরী বিধবা বোন উমাকে অশালীন ইঙ্গিত করে ও নানা প্রলোভন দেখিয়ে গ্রামেরই এক মুসলমান যুবক গাব্বু শেখ চিঠি লেখে, জোর করে ধরে নিয়ে যাবার হুমকি দেয়, পুরুষদের অনুপস্থিতিতে বাগানে এসে শিস দেয়, গান ধরে— 'বনকে চিরিয়া...'। দিনের পর দিন এই অশালীন আচরণ ক্রমে বাড়তেই থাকে। ফলে উমা আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়। বউদি সাগরের তৎপরতায় উমা বেঁচে যায়। এর পরেই তারা দ্রুত দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

দেশভাগ সমকালে নারীর প্রতি এই ধরনের লাঞ্ছনার উদাহরণ রয়েছে অগণিত। ঐ বিষয়ে তদানীন্তন সময়কার উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরের আধিকারিক হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'উদ্বাস্তু' গ্রন্থে পূর্ববঙ্গের এক উদ্বাস্তুর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন— হিন্দু মেয়েরা ঘাটে স্নান করতে গেলে নবীন-প্রবীণ সব বয়সের লোক মিলে তাকে ঘিরে ধরে ছড়া কাটে—

—পাক পাক পাকিস্তান

— হিঁদুর ভাতার মুসলমান।"

এই অদ্ভুত আচরণে মেয়েদের আড়ষ্টতা বাড়লে নির্যাতনকারীদের মধ্যে ভারি কৌতুক বোধ জাগায়। এই ধরনের ঘটনা পূর্ববঙ্গে যত্রতত্র ঘটছিল; ফলে মেয়েদের ইজ্জৎ রাখাই দুষ্কর হয়ে ওঠে। তাই দ্রুত দেশত্যাগ করে দেশের হিন্দু সম্প্রদায়।[১৬]

শ্রীপুরের বাসিন্দারা যখন সীমান্ত পার হয়, সে সময় তল্লাসির নামে টাকা-পয়সা সোনা-দানা

কেড়ে নেয় স্বেচ্ছা সেবিকারা, সেই সঙ্গে অভব্য আচরণ করে। প্রায় শূন্য হাতে তারা শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছোয়। এখানে আসার পর নারীর সমস্যা প্রবল আকার ধারণ করে। পূর্ববঙ্গে নারী তার মনের মধ্যে যে সংস্কার বাঁচিয়ে রেখেছিল এখানে আসার পর তা প্রবল ধাক্কা খায়।— 'এ যেন এক নতুন জগন্নাথ ক্ষেত্র, মেয়ে পুরুষে ভেদ নেই, জাত বিচর নেই, ছোঁয়াছুঁয়ির বিধিনিষেধ নেই।'[১৭] সেই কারণেই অধ্যাপক নির্মলের মা সাবু-দুধ-ফল খেয়ে দিন যাপন করেন। আবার উমার জীবনে আসে নতুন সংকট— 'এক তরুণী প্রায়ই উমার কাছে এসে বসে। নিজের পরিচয় দিয়েছে সে একজন স্বেচ্ছাসেবিকা। সে খালি থিয়েটার সিনেমার গল্প করে। উমার সামনে তুলে ধরে এক রঙিন ছবি, মোটর-গাড়ী, ধনদৌলত, সুখস্বাচ্ছন্দ্যে ভরা স্বপ্নময় জীবন।'[১৮] রেলপুলিশের হাতে মেয়েটি ধরা পড়লে জানা যায়— মেয়েটির নাম শীলা, তার পিছনে আছে শহরের নামজাদা সব লোকজন; যারা শিয়ালদহ ও উদ্বাস্তু ক্যাম্প থেকে মেয়েদের ভুলিয়ে নিয়ে যায়। নিজেরা ভোগ করে সিন্ধী-পাঞ্জাবীদের কাছে বেঁচে দেয়।

নারীর সম্মান রক্ষার্থে যে মানুষগুলি সবকিছু ফেলে দেশান্তরী হয়েছিল, এখানে এসেও সেই নারীকে কম লাঞ্ছনা পোহাতে হয়নি। পরিবারের মেয়েদের রক্ষা করতে তাই শ্রীপুর অঞ্চলের বাসিন্দারা শিয়ালদহ স্টেশন ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ধ্রুব নির্মলকে বলে— 'এখানে আর নয়। চল শ্যামচাঁদের সেই কলোনিতে গিয়ে ওঠা যাক।' গ্রামের সাতটি পরিবার একত্রিত হয়ে দক্ষিণ কলকাতার তিলকনগর কলোনিতে এসে উপস্থিত হয়, সেখানে তাদের গ্রামের শ্যামচাঁদ ইতিপূর্বেই বসতি স্থাপন করেছে।

কলোনিতে এসে তাদের জীবনধারা নতুন খাতে বইতে শুরু করে— লড়াই সংগ্রাম করে নতুন করে বাঁচতে তারা জোট বাঁধে। এক্ষেত্রে নারীরা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। জমি দখল করে কলোনি গঠন করলে জমির মালিক পুলিশ এবং গুণ্ডাদের দিয়ে জমি উদ্ধার করতে চাইলে মহিলারা শাঁখ বাজিয়ে, উলু দিয়ে পাহারারত পুরুষদের সতর্ক করে দিয়েছে; প্রতিরোধের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সাহায্য করেছে। আবার কলোনি থেকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে নারীরা কলকাতার রাজপথে মিছিলে নেমেছে— 'প্রথমে শ-দুই পুরুষ, তারপর মেয়েরা— সংখ্যায় পঞ্চাশষাট জন। মেয়েদের প্রথম দলে স্কুলের ছাত্রীরা। তাদের মধ্যে শুধু উমা ও সাগর নয়, এসেছে গয়েশ্বরী, হরিভূষণ, জটিলের বউ ও নিশির বোন।' কলোনির মেয়েদের এই রাজপথে নামা উপন্যাসে নতুন দিক নির্দেশ করেছে। তারা অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে নিজেদের গ্রহণযোগ্য ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, পূর্ববঙ্গের নারীর উত্তরণ ঘটেছিল দেশভাগের কারণে। পরবর্তী সময়ে নারীর সচেতনতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার

ক্ষেত্রে এই প্রেরণা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

'পুব থেকে পশ্চিমে' উপন্যাসে নারীর যে সংগ্রামের চিত্র আমরা পাই তা বাস্তব হয়ে দেখা যায় দুর্গাপুরে উদ্বাস্তু নারীদের আন্দোলনে। সেখানে সরকারি জমিতে উদ্বাস্তুরা কলোনি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করলে পুলিশ বাধা দেয়। উদ্বাস্তু মেয়েরা চারদিন ধরে লড়াই চালায় পুলিশের বিরুদ্ধে। শুধু কলোনি স্থাপনে প্রতিরোধ দুর্গ গড়তেই নয়, উদ্বাস্তু আন্দোলনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা ছিল সক্রিয়[১৯]। তারা কোলের শিশুদের পর্যন্ত সঙ্গে নিয়েছে আন্দোলন করতে ও আক্রমণ প্রতিরোধে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন মহিলাদের এই সংগঠিত ও সমবেত প্রতিবাদের ক্ষেত্রে 'ইউ.সি.আর.সি'র ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। প্রফুল্ল চক্রবর্তীর বর্ণনায় পাই— Indeed, it may not be an exaggeration to say that it was the UCRC which had first brought woman in such large numbers in the streets of Calcutta.[২০]

সংঘবদ্ধ এই লড়াই নারীকে যেমন বাইরের শক্তি জুগিয়েছে তেমনি ভেতরটা বদলে দিয়েছে পুরোপুরি। দেশে থাকতে যারা হেঁশেল আর ঠাকুর পুজো নিয়ে দিন কাটাত তারাই আজ শিয়ালদহের নরককুণ্ড পেরিয়ে, চোরাগলির প্রলোভন উপেক্ষা করে নতুন মানুষ তৈরি হয়েছে। নারীর অভ্যন্তরীণ বদলের চিত্র গভীরভাবে ফুটে উঠেছে 'পুব থেকে পশ্চিমে' উপন্যাসে। নারীর এই বদল প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক বলেছেন— 'উমা বদলেছে, সাগর বদলেছে, বদলেছে তাদের রুচি, স্বভাব সংস্কার। ছিল মাটির মানুষ, ভিতরে পাথরের খাদ মিশানো লোহার খবর রাখত না। পুড়ে পুড়ে সেই লোহা ইস্পাত হয়ে। মানুষ না, তারা যেন ইস্পাতের তীক্ষ্ণধার এক একটা ফলা'।[২১] উপন্যাসের কাহিনিতে আমরা পাই— পরিবারের অন্য সকলের সঙ্গে বাল্য বিধবা উমা দেশত্যাগ করেছে। আর পাঁচ জন বাল্য বিধবার মত সেও নিয়মিত গোপালের পুজো করে, সাদা থান পরে আর নিরামিষ আহার করে। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে তিলকনগর কলোনিতে আসার পর নির্মলের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কলোনির বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। প্রবল অধ্যাবসায়ের বলে এস.এস.সি (মাধ্যমিক) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করে আই.এস.সি তথা উচ্চ মাধ্যমিকে সায়েন্স নিয়ে পড়তে শুরু করে ভবিষ্যতে ডাক্তার হবার আশায়। ঠাকুর-দেবতা ছিল যার জীবনের অবলম্বন সেই উমার জীবনের বিবর্তনকে উপন্যাসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে— 'সর্বাধিক পরিবর্তন হয়েছে উমার। নাড়ুগোপালকে নিয়ে যে পুতুল খেলত, বেতসলতার মতন নমনীয়, সে আজ কলেজে পড়ে, সভা-সমিতিতে যায় প্রাচীরপত্র লেখে।'[২২] নাড়ুগোপালকে সে আর আগের মতন ডাকে না, পুরোনো অভ্যেস মত ভোগ দেওয়াটা তার কাছে

নিয়ম রক্ষার পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে। নারীর এই মৌলিক পরিবর্তন পরবর্তীকালে সামাজিক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করেছে। দেশভাগের পরে মেয়েদের মধ্যে যে দ্রুত শিক্ষার বিস্তার ঘটতে শুরু করল তারও কারণ চাকরি করে উপার্জন করতে গেলে শিক্ষা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না।[২৩] এই বাস্তব ভাবনাই বিধবা উমাকে বাস্তবমুখী করে তুলেছে। উপন্যাসের শেষে নির্মলের মা তার ছেলের সঙ্গে উমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলে উমা সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করেছে, কারণ উমার মনে হয়েছে সুরী নামক একটি আশ্রিতা মেয়ের কবল থেকে ছেলেকে বাঁচাতে তিনি এই প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। উমার এই স্বকীয় স্বাধীন ভাবনা পূর্ববঙ্গের দেশান্তরী নারীর ভাবনাকে প্রতিনিধিত্ব করে।

নারীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক সংকটের কথা উঠে এসেছে জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসে। উপন্যাসের নায়িকা সুতারা দত্ত ইতিহাসের অধ্যাপিকা। ছাত্রীদের প্রশ্নের উত্তরে যাকে জানাতে হয়— 'ইতিহাস তো একটুখানি ব্যাপার নয়। এক জনেও লেখেন না। তোমরা ভালো করে পড়াশোনা করে তোমাদের জাতির ইতিহাস তোমরাই লিখো।'[২৪] তারপরই শুরু হয়েছে উপন্যাসের আদি পর্ব। আদিপর্ব, অনুশাসন পর্ব আর স্ত্রী পর্ব— উপন্যাসের এই পর্বভাগ মহাকাব্যের কথাই মনে করিয়ে দেয়। ঔপন্যাসিক বারবার এনেছেন মহাকাব্যের নায়িকা সীতা-দ্রৌপদীর যন্ত্রণার কথা। উপন্যাসে সুতারা যেন তাদেরই উত্তরসূরী।

সুতারাদের পরিবার দাঙ্গায় আক্রান্ত হয়। অন্য সদস্যরা মারা যাবার পর সে পিতৃবন্ধু তমিজ সাহেবের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে। দীর্ঘ ছ'মাস তাকে সেখানে থাকতে হয়। কলকাতায় থাকা দাদার কাছ থেকে কোনও সাড়া পাওয়া যায় না। অবশেষে তমিজ সাহেব নিজেই সুতারার দাদার সঙ্গে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু দাদারা বোনকে ফিরে পাবার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখান নি। তমিজ সাহেবের ছেলে আজিজ সুতারার দাদার চিঠি পড়ে জানিয়েছেন— 'মনে হচ্ছে ওরা সুতরার জন্য মোটেই ভাবছে না।' কর্তব্যের খাতিরে সুতারাকে নিয়ে তমিজ সাহেব কলকাতায় পৌঁছোলে গভীর সমস্যা তৈরি হয়।

দেশত্যাগ করে দাদা ইতিপূর্বেই কলকাতায় শ্বশুর বাড়িতে এসে উঠেছে। অনন্যোপায় হয়ে সুতারাকে সেখানেই আশ্রয় নিতে হয়। প্রথম পরিচয়ে বউদির মাকে প্রণাম করতে গেলে তিনি পিছিয়ে গিয়ে স্পর্শ বাঁচিয়েছেন। মেয়েকে তিরস্কারের সুরে বলেছেন— 'একেবারে গিয়ে জড়িয়ে ধরলি।' সুতারা যাতে বিছানাপত্র ছুঁয়ে একাকার না করে, জলের জ্বালাতে হাত না দেয় সেই বিষয়ে গৃহকর্ত্রী

সব সময়ে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। সুতারার মনে হয় সে যেন বাড়ির কেউ নয়, কারও সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। বাড়ির গৃহিনীর কথায়— 'এতদিন ধরে মুসলমানের ঘরে পড়েছিল। এক-আধ দিন নয়, ছ'মাসের ওপর। তাতে কি আর মেয়ে মানুষের জাত জন্ম থাকে। তাকে এনেছিস বেশ করেছিস। তা এক পাশে হাড়ী-বাগদীর মত বসে দাঁড়িয়ে থাক্ তা না, সব যজাতে, একাক্কার করতে বসল। কিছু বাকী রইল না। কিনা খেয়েছে। কি করেছে না করেছে কে তার খবর জানে।'[২৫] নিজেদের শুচিতাকে রক্ষা করতে সুতারাকে হোস্টেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ম্যাট্রিক পাশের পর গরমের ছুটিতে বাড়ি যাবার জন্য সুতারা অপেক্ষা করে উৎসুক মনে। 'না বাড়ির আহ্বান এলো না।' বউদির বোন শুভার বিয়েতে আমন্ত্রিত হয়ে এলে সকলের থেকে আলাদা বসিয়ে তাকে খেতে দেওয়া হয়েছে।

ঘরে-বাইরের এই বঞ্চনা সহ্য করে প্রবল প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে সুতারা দিল্লিতে হস্তিনাপুর যাজ্ঞসেনী কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপিকা হয়েছেন। সেখানে তার সহকর্মী ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপিকা কৌশল্যাবতী, যিনি পশ্চিম পাঞ্জাবের অধিবাসী, তার কাছ থেকে একই ধরনের গল্প শোনেন সুতারা; পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশের দাঙ্গার গল্প। যে হিন্দুরা শিখরা, মুসলমান পুরুষদের মেরে ফেলেছিল কিন্তু মেয়েদের নিয়ে এসেছিল তাদের গল্প। এইসব মেয়েদের যমুনায় স্নান করিয়ে, গঙ্গাজল খাইয়ে, রাম নাম বলিয়ে হিন্দু করিয়ে নেওয়া হয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সেইসব মেয়েদের কী হয়েছিল সে বিষয়ে কৌশল্যাবতীর কাছে জানতে চেয়েছে সুতারা। কৌশল্যাবতী এই নির্যাতিতা মেয়েদের সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দিতে পারেননি, তবে ইসলামে সামাজিক বিধিনিষেধ কঠোর না হলেও বাস্তবক্ষেত্রে অপহৃতাদের জীবনে গভীর সংকট নেমে এসেছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। সুতারা ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে অনুভব করেছিল হিন্দুদের সামাজিক কঠোরতা। শুধুমাত্র ভিন্নধর্মীয় বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করার অপরাধে নিকটজন তাকে ত্যাগ করেছে। ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার পরেও স্বজনের কাছ থেকে দূরে থাকার যন্ত্রণা তাকে দগ্ধ করেছে সারা জীবন।

'কেয়াপাতার নৌকো' উপন্যাসে প্রফুল্ল রায় দেশবিভাগের সংকটের সামগ্রিকতার মধ্যে নারীর সমস্যাকে ভিন্ন দিক থেকে ধরার চেষ্টা করেছেন। চল্লিশের দশকে বিনয় তথা বিনু, তার বাবা অবনীমোহন, মা সুরমা, দুই দিদি সুনীতি ও সুধার সঙ্গে দাদু (মায়ের মামা) হেমকান্তবাবুর বাড়ি রাজদিয়ায় পাকাপাকিভাবে চলে আসে। বিনুও তার দিদিরা স্কুল কলেজে ভর্তি হয় এবং পড়াশোনা চালিয়ে যায়। ইতিমধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলন শেষ পর্যায়ে পৌঁছোয়; চারিদিকে শুরু হয় দাঙ্গা। এই সময়ে তার প্রতিবেশী ভবতোষ বাবু স্ত্রীর অসুস্থতার কারণে কিশোরী কন্যা ঝিনুককে নিয়ে ঢাকা যান।

সেখানে রায়টে তিনি প্রাণ হারান এবং ঝিনুক ধর্ষিতা হয়। মানবিক কারণে ঝিনুককে নিয়ে বিনয় কলকাতায় রওনা হয়। পথে নানা বিপদ অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত বিনয়ের দিদি সুনীতির শ্বশুর বাড়িতে এসে পৌঁছোয়। কিন্তু ঝিনুককে নিয়ে নতুন সংকটের বাতাবরণ তৈরি হয়।

দিদির শাশুড়ি হেমনলিনী ঝিনুককে দেখে যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হন। পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেলে নিজেকে ঝিনুকের স্পর্শ বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন। ঠাকুরের পবিত্রতা নষ্ট হবার আশঙ্কায় হেমনলিনী স্পষ্টভাষায় ঝিনুককে জানিয়ে দিয়েছেন— 'দোতলায় আমাদের ঠাকুর ঘর। তুমি ওপরে না উঠলেই ভালো হয়।'[২৬] ঝিনুককে রাতের বেলায় কাজের মহিলা দুলালীর ঘরে শুতে দেওয়া হয়েছে। ঝিনুক কে এই মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে রক্ষা করতে বিনয় তাকে বাবার বাসায় নিয়ে গিয়েছে। সেখানেও সে সাদরে গৃহীত হয়নি। বিনয়ের বাবাও ঝিনুকের ভবিষ্যৎ বিড়ম্বনার কথাই বলেছেন, যে কথা দরজার বাইরে থেকে শুনে ঝিনুক চিরকালের জন্য নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে। সামাজিক চাপ তাকে পরিচিত জগতের বাইরে পাড়ি জমাতে বাধ্য করেছে।

উপন্যাসে নারীর আরও একটি সংকটের চিত্র পাই। শিয়ালদহ স্টেশন, যেখানে উদ্বাস্তুরা প্রাথমিক আশ্রয় পেয়েছিল সেখানে নারীর অবস্থা ছিল সঙ্গীন। নারী তার গোপনীয়তা হারাচ্ছিল, তদুপরি যুবতী নারীর প্রতি গোপন হাতছানি। রাজদিয়া অঞ্চলের বাসিন্দা হরিন্দর ঝিনুককে জানায়— 'ইস্টিশনে ছয় সাত হাত জাগার (জায়গার) মইদ্যে আমাকো পাঁচজন মাইনষের শোওন-বসন। হের উপর শয়তানের গুষ্টি মাইয়াগো ভাগাইয়া লইয়া যাইতে আছে।'[২৭] হরিন্দর বিনুর কাছে অনুরোধ জানায়— অন্য কোনও জায়গায় একটা থাকার ব্যবস্থা করে দিতে যাতে খেতে পাক বা না পাক মেয়ের সম্মান যেন বাঁচাতে পারে। পূর্ববঙ্গের আরও এক উদ্বাস্তু পতিতপাবন মেয়েকে নিয়ে একই সমস্যায় পড়ে সে দেখে শিয়ালদহ স্টেশনে একটা মেয়ে পাচার চক্র কাজ করছে। যুবতি মেয়ে দেখলে টাকা পয়সার লোভ দেখিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে, তাদের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। পতিত পাবনের মেয়ে শান্তিকে একটি লোক পকেট থেকে একগোছা নোট দিতে গেলে পতিতপাবন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং প্রহার করে। পরে সে বিনুকে জানায়— 'এই মাইয়াটার সোম্মান বাঁচানোর লেইগা পাকিসতান ছাইড়া ইণ্ডিয়ায় আসলাম। কিন্তু এইখানেও শকুনের পাল তরে ছিড়া খাওনের লেইগা জিভ্যা মেইলা রইছে।'[২৮]

দেশভাগের সময় নারীর সম্মানহানি দুই বাংলাতেই একটা প্রবল আকার ধারণ করে। কলকাতায়

উদ্বাস্তু মেয়েদের নিরাপত্তার অভাব অর্থনৈতিক দুরবস্থা ইত্যাদির সুযোগ নিয়ে অনেক দুর্বৃত্ত নারী নির্যাতনে প্রবৃত্ত হয়। তার সঙ্গে আবার একদল অসাধু ব্যবসায়ী অর্থ উপার্জনে নেমে পড়ে। সামাজিক প্রেক্ষাপটে উদ্বাস্তু নারীর এই মহাসংকট ঔপন্যাসিক দরদ দিয়ে ব্যক্ত করেছেন।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক প্রয়োজনে উদ্বাস্তু নারীকে পূর্ববঙ্গীয় সামাজিক বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে কাজে নামতে হয়। প্রায় শূন্য হাতে তারা দেশত্যাগ করেছিল, তাই নারী-পুরুষ উভয়ে মিলে রোজগারে না নামলে চলছিল না। কিন্তু সামাজিক সংস্কার এবং বংশ গৌরবের কারণে অনেকেই ঘরের মেয়ে বউদের বাইরে বেরিয়ে কাজে যোগ দেওয়া পছন্দ করেন নি; কিন্তু প্রয়োজনের কাছে তাদের এই অনীহা হার মেনেছে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'দূরভাষিণী' উপন্যাসে এমনই চিত্র ফুটে উঠেছে। উপন্যাসে পূর্ববঙ্গের একজন ধনী মানুষ গিরীন গুহঠাকুরতার পারিবারিক জীবনের কথা উঠে এসেছে। গিরীনবাবু দেশান্তরের পর অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে পড়েন। ফলে বাধ্য হয়ে তার মেয়ে বীণাকে টেলিফোন অপারেটারের কাজে যোগ দিতে হয়। কিন্তু পারিবারিক ঐতিহ্যের কারণে গিরীনবাবু তা মন থেকে মানতে পারেন নি— 'দুবছর আগে আমিই কি ভাবতে পারতাম নগেন গুহঠাকুরতার নাতিনী গিরীন গুহঠাকুরতার মেয়ে টেলিফোন অফিসে ঢুকবে। সেখানে কতরকম কথা শুনেছি। অবস্য আজকাল আর সে সব নেই। বেশিরভাগই আমাদের মত বাঙালি গেরস্ত ঘরের মেয়ে।'[২৯] আবার টেলিফোনে অপারেটর কমলার স্বামী বিনয় স্ত্রীর অর্থনৈতিক আধিপত্য সহ্য করতে পারে না— পুরুষ সুলভ কর্তৃত্ব খাটায় কমলার উপর।

যারা এই বংশ গৌরবে গৌরবান্বিত তাদের সিংহভাগই পূর্ববঙ্গের মধ্যস্বত্বভোগী হিন্দু ভদ্রলোক। বাংলার ভারপ্রাপ্ত সচিব বারালির বর্ণনা অনুযায়ী জমিদার এবং রায়তের মাঝখানে এইরকম প্রায় আড়াই লক্ষ মধ্যস্বত্বভোগী ছিল, যারা বিনাশ্রমে আয়েসী জীবন-যাপন করত। জমিদারী ব্যবস্থা বিলোপের পর এই শ্রেণির মানুষকে চরম অর্থ সংকটের মধ্য দিয়ে কাটাতে হয়। এ প্রসঙ্গে 'বিষাদ বৃক্ষ' গ্রন্থে আলোচিত মিহির সেনগুপ্তের পারিবারিক জীবনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। জমিদারী ব্যবস্থা বিলোপের পর চরম অর্থ সংকটের মধ্যে পড়তে হয় তাদের। তা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে শুরু করে নিজেরা। তাদের পরিবারের কর্তা জ্যাঠামশায় অন্য সদস্যদের বলেন— "We have now to decide what to do next and how to survive.[৩০]

একদিকে অর্থ সংকট, অন্য দিকে দীর্ঘদিনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক আভিজাত্যের

অবনমন— এই দুয়ের দ্বন্দ্বে মধ্যস্বত্বভোগীদের দেশত্যাগ ঘটে। পশ্চিমবঙ্গে এসে তাদের চরম অসচ্ছলতার মধ্য দিয়ে দিন যাপন করতে হয়। ফলে সমস্ত অহংকার ত্যাগ করেই ঘরের মেয়ে বউদের কাজে পাঠাতে হয়।

মহীতোষ বিশ্বাসের 'উচ্ছিন্ন পরবাস' উপন্যাসে বাধ্য হয়ে ঘরের মেয়েকে কাজে পাঠানোর চিত্র ফুটে উঠেছে। উমাপতি মাস্টার পূর্ববঙ্গে বৃহৎ এক সমৃদ্ধ পরিবারের কর্তা। দেশভাগের পরে সেই যৌথ পরিবার ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং যে-যার মত করে দেশত্যাগ করে। নানা জায়গায় ঘুরে ফিরে অবশেষে রেলস্টেশন থেকে মাইল দুয়েক দূরে সদ্য নির্মীয়মান একটি কলোনিতে উমাপতি মাস্টার ঘর বাঁধে। তিনি দুই সন্তানের জনক। বড়টি পুত্র। ছোটটি কন্যা, নাম বিনতা বা বিন্তি। ছেলে-মেয়েরা মেধাবী। ছেলে বড় হয়ে একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি গ্রহণ করে। কিন্তু পথ দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়। ইতিপূর্বেই উমাপতি বাবুর স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। ফলে বাবা ও মেয়ে এক চরম দুরবস্থার মধ্যে পড়ে। বয়সজনিত কারণে উমাপতি কর্মে অক্ষম। ফলে মেয়েই একমাত্র ভরসা, যে সংসারকে ধরে রাখতে পারে। তাই লেখাপড়া বাদ দিয়ে বিন্তিকে কাজে নামতে হয়। লেখাপড়া সে বেশিদূর করতে পারেনি সংসারের হাল ধরতে তাই সে ট্রেনে করে অবৈধ ভাবে চাল নিয়ে কলকাতায় বিক্রি করতে যায়। বিন্তির এই কাজে বাবার ঘোরতর আপত্তি। পূর্ববঙ্গে উমাপতি মাস্টারের বংশ মর্যাদা ছিল, দশ গাঁয়ের লোকে তাকে চিনত, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ছিল; সেই ঘরের মেয়ে বিন্তিকে লজ্জা শরম বিসর্জন দিয়ে রোজ কলকাতায় যেতে হয়। পূর্ববঙ্গে থাকলে এই মেয়েই হয়ত এত দিনে শ্বশুর ঘর সামাল দিত, ছেলে-মেয়ের মা হত; অথচ তাকেই পুলিশ, চেকার সামলে, পুরুষের সাথে পাল্লা দিয়ে ব্যবসায় নামতে হয়েছে। বিনতা সম্পর্কে অন্য চাল ব্যবসায়ীদের অকপট স্বীকারোক্তি— "এ লাইনে বিন্তির মতো এস্‌পার্ট (এক্সপার্ট) মেয়ে আর নেই।"[৩১]

চাল নিয়ে কলকাতা যাবার সময়ে স্পেশাল চেকিংএ অন্য সবার চাল ধরা পড়লে বিন্তি চালের বস্তার মুখ খুলে দিয়ে ট্রেনের মেঝেতে চাল ছড়িয়ে দিয়ে চেকারের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করেছে। আর একজন চাল ব্যবসায়ী শঙ্করা, যার সঙ্গে বিন্তির প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেদিন শঙ্করা বিন্তির পিঠের উপর হাত রেখে বলেছিল— 'তুমি মাইরি গুরু— আমাকেও হার মানিয়ে দিলে।' এই বিন্তিকেই বছর পাঁচেক আগে স্কুলে গানের প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হওয়ার কারণে এস.ডি.ও সাহেব পিঠ চাপড়ে কণ্ঠস্বরের মধুরতার তারিফ করেছিলেন। সেদিনও বিন্তিও হেসেছিল। ওর চাল-পাচারের দক্ষতায় শঙ্করার পিঠ চাপড়ানো প্রশংসা বাক্যে আজও বিন্তি হাসল। জীবনের চরম দুর্দিনে দুই হাসিকে

সে মেলানোর চেষ্টা করে।

এই বিন্তিই এক রাতে এলাকার নামকরা ব্যবসায়ী নিবারণবাবুর বকে যাওয়া ছেলে পলাশ ও তার সঙ্গীদের দ্বারা অপহৃত হয় এবং বেশ কয়েকদিন ধরে ধর্ষিতা হয়। বহু অনুসন্ধানের পর বিন্তিকে শঙ্করা উদ্ধার করে। শঙ্করার সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে পলাশ মারা যায়। শঙ্করার জেল হয়; কিন্তু বিন্তির জীবনে তৈরি হয় নতুন সংকট। কারণ ততদিনে সে গর্ভবতী। বিন্তি নিজের পরিচয়ে সন্তানকে মানুষ করতে চায়।

দেশভাগ সমকালে নারীর এই ধর্ষণ এবং ধর্ষণের ফলে গর্ভজাত সন্তানকে নিয়ে নানা ধরনের সামাজিক সংকট তৈরি হয়েছিল। এক দিকে ধর্ষিতা মেয়েকে পরিবারের লোকেরা যেমন গ্রহণ করতে চায়নি, তেমনি সমাজও তাদের সন্তানদের ভালো চোখে দেখেনি। এরাই এক সময়ে সমাজ বিরোধী বলে আখ্যা পেয়েছে।

বাস্তুচ্যুত মানুষের অর্থ সংকট সত্ত্বেও নিতান্ত সামাজিক অহংকারবশত এক শ্রেণির মানুষ তাদের ঘরের মেয়ে বউদের চাকরি করতে দিতে বা বাইরে বেরিয়ে কাজ করতে দিতে চায়নি এমন চিত্র নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘মহানগর’ উপন্যাসে পাই। প্রিয়গোপালবাবু নিঃস্ব হয়ে পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করেন। এখানে এসে তার চরম অর্থ সংকটের মধ্যে দিন কাটে। তাই পুত্র সুব্রতর অনুরোধে বউমা আরতিকে ক্যানিং স্ট্রিটে মুখার্জি অ্যাণ্ড মুখার্জি ফার্মে চাকরি নিতে হয়। তাতে সংসারের সচ্ছলতা বাড়ে। বৃদ্ধ বাবা-মা, বোন-স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে সুব্রতর একার রোজগারে সংসার চলছিল না তাই স্ত্রীকে চাকরি করাতে এত আগ্রহ। কিন্তু প্রিয়গোপাল ও তার স্ত্রীর এ বিষয়ে ঘোরতর আপত্তি। স্ত্রীর চাকরির খবর বাবাকে শোনাতে গেলে পুত্র সুব্রতর প্রতি প্রিয়গোপালবাবুর প্রতিক্রিয়া ছিল এরকম— ‘আমি বেঁচে থাকতে মজুমদার বাড়ির বউ চাকরি করবে, আর আমি তা চোখ মেলে দেখব?.... আমাদের বংশে ও সব কোনও দিন হয়নি, হবেও না।’[৩২] কিন্তু সংসার কীভাবে চলবে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নি প্রিয়গোপাল। বাস্তবতা ও যুক্তির কাছে তিনি পরাজিত হন, আরতিও চাকরিতে যোগ দেয়। কিন্তু প্রিয়গোপাল তার বদ্ধসংস্কার থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। তাই অফিসের প্রয়োজনে কোনও কোনও দিন আরতি রাত করে বাড়ি ফিরলে নানা গুঞ্জন শোনা যায় পরিবারের লোকজনদের কাছ থেকে— ‘যার বিকেল সাড়ে পাঁচটা-ছ’টার মধ্যে আসবার কথা, রাত আটটা বাজলেও তার যদি দেখা না মেলে, আর সে যদি ঘরের কম বয়সি বউ হয়, তাহলে বাড়ির অন্য মানুষগুলি স্থির থাকে

কেমন করে?... মানুষ তো আর বনে-জঙ্গলে; পাহাড়-পর্বতে বাস করে না।... ঘরের বউ যদি রাত আটটা পর্যন্ত— এমনকী ন'টা দশটা পর্যন্ত বাইরে বাইরে কাটায়— লোকে কী মনে করতে পারে?'[৩৩] কিন্তু আরতিকে এসব কথা উপেক্ষা করতে হয় স্বামী সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে। পাশাপাশি তার সম্পর্কে যাতে কোনও কথা না ওঠে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়। তার জন্য তাকে সংসারের কাজগুলি সারতে হয় দ্রুততার সঙ্গে। লেখকের কথায়— 'ভোরে উঠে সংসার যাত্রা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরতির অফিস যাত্রা চলতেই থাকে। সকালেই স্নান সেরে নেয়, চায়ের পাটটা কোনও রকমে সারে, চোখ বুলায় খবরের কাগজে।'[৩৪]

কোম্পানিতে নানা ভাষাভাষীর লোক আসে জিনিসপত্র কিনতে; আরতি সেলসের দায়িত্বে থাকায় তাকেই খরিদ্দার সামলাতে হয়, তাই হিন্দিতে কথা বলা শিখে নিতে হয়েছে; সহকর্মী এডিথের কাছ থেকে ইংরেজি বলার কৌশল রপ্ত করতে হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে সংসারের সব দায়িত্ব সেরে পরিপাটি হয়ে নিয়মিত অফিসে যেতে হয় তাকে। নারীর ব্যস্ত ও পরিপাটি জীবন স্বাধীনতার আগে দেখা যায়নি। সমাজ-সংসারে টিকে থাকতেই নারীর জীবনযাত্রার এই বদল। উপন্যাসে আরতির যাপিত জীবন লেখকের বর্ণনায় এভাবে ফুটে উঠেছে— 'খেয়ে উঠে আরতি দশ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিল। অন্তত আধঘন্টার কমে যার সাজসজ্জা হত না, সে আজ কাজের চাপে কীভাবেই না বদলেছে।'[৩৫] নিজেকে বদলাতে গিয়ে আরতিকে মধ্যবিত্ত বাঙালি নারীর ঐতিহ্য ভেঙে স্বামীর আগেই কিংবা তার সঙ্গেই খেতে বসতে হয়েছে। যা রান্না হয়েছে তাই দেবার জন্য শাশুড়ি সরোজিনীকে বলেছে— 'দিন মা, কী রান্না হয়েছে, দিন তাড়াতাড়ি।' এখন আগের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি খেয়ে নেয় সে, পাতে ভাত পড়ে থাকে না।

সারাদিন বাড়িতে না থাকার কারণে অনেক কাজ জমে থাকে। সে কাজের দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে শাশুড়ি যাতে বিরক্ত না হয় তার জন্য নিজের টাকায় ঝি রাখে, শাশুড়িকে এটা-ওটা কিনে দিয়ে খুশি করে। ফলে কাজকর্ম নিয়ে কেউ আর কথা বলার সাহস করে না— 'আরতি তাই সব সময়ের জন্য একটি ঝি রেখে নিল। সে খাবে পরবে আর মাসে দশ টাকা করে মাইনে নেবে। যে কাজটা সে করত, সেই কাজটা বাড়ির ঝি করবে। শাশুড়িও একটু আসান পাবেন, তাঁর খোটার মুখও বন্ধ থাকবে।'[৩৬]

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরতির বেতন বাড়ে, কাজের দায়িত্বও বাড়ে। ছুটির পরেও অনেক সময়

কাজ করতে হয়। আরতি আগের মতো সময় দিতে পারে না সুব্রতকে। অবশেষে সুব্রত স্থির করে স্ত্রীকে সে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে আনবে। আরতি তাকে সংসারের অবস্থা সম্পর্কে বোঝাতে গিয়েও ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত সংসারের শান্তি বজায় রাখতে সুব্রতর নিজের হাতে লিখে দেওয়া ইস্তফাপত্র নিয়ে আরতি অফিসে যায়। কিন্তু অফিসে গিয়ে সুব্রত শোনে তার ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই আরতিকে সে তৎক্ষণাৎ টেলিফোন করে চাকরি না ছাড়তে অনুরোধ জানায়। যদিও আরতি সহকর্মী এডিথের প্রতি অফিস কর্তৃপক্ষের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে স্বেচ্ছায় চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। এডিথের প্রতি অসম্মান সমগ্র নারী সমাজের অপমান বলে মনে হয়েছে আরতির।

উপন্যাসের এই চিত্র আমরা বাস্তবেও পাই। সংসারের কথা মাথায় রেখেই প্রখ্যাত যাত্রা-অভিনেত্রী জোৎস্না দত্ত পরিবারের অনিচ্ছার মধ্যে দিয়েও জীবিকার সন্ধানে বাইরে বেরিয়েছেন। যাত্রা-শিল্পী বীণা দাশগুপ্তার ইতিহাসও একই রকমের। নর্তকী-অভিনেত্রী মিস্ শেফালির পরিবার ঢাকা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এসে আশ্রয় নিয়ে ছিল আহেরিটোলায়। তার কথায় নারী জীবনের সংকটের চিত্র গভীরভাবে ফুটে ওঠে— 'সেখানে মায়ের পরের বাড়িতে বাসন মাজা, আশ্রয়দাতার ফাই ফরমাস খাটা, ঠাকুমার অসহায় মুখ-প্রতিটা দিনই ছিল বিভীষিকাময়। রাতগুলো কেটে যায় যেমন তেমন, দিনে আলো ফোটার ভয়ে সিটিয়ে থাকতাম। তখন থেকে মরিয়া হলাম পরিবারের মুখে অন্ন জোগানোর চিন্তায়।'[৩৭] এই চিন্তা থেকেই পরবর্তী সময়ে তিনি পানশালার পেশাদার নর্তকী হয়েছেন।

দেশভাগের পরে পূর্ববঙ্গের সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারীরাও সম্মানের আসন থেকে বিচ্যুত হয়ে অসহায় ভাবে পথে নামতে বাধ্য হয়েছে। প্রবোধকুমার সান্যালের 'হাসুবানু' উপন্যাসে এই চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। কলকাতায় সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে নির্বাসিত জমিদার জীবেন্দ্রনারায়ণের কন্যা মীরা ও ভ্রাতৃবধূ সুমিত্রার আর্থিক কষ্ট ও নৈতিক অবনমনের দিকটি উঠে এসেছে। জমিদার বাড়িতে বিমলাক্ষ এতদিন প্রতিপালিত; জমিদার কন্যার সঙ্গে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হতো। মীরার অতীত গৌরব সম্পর্কে লেখক বলছেন— 'সেদিনকার নবাব-নন্দিনী যার আত্মাভিমান ছিল আকাশ ছোঁয়া। এ মেয়ে সেই প্রাসাদ শিখরবাসিনী সম্রাজ্ঞী, যার চরণপ্রান্তে পৌঁছাতে গেলে অসংখ্য দ্বাররক্ষীকে কুর্ণিশ জানিয়ে ছাড়পত্র নিতে হতো'[৩৮]— সমস্ত মান সম্মান বিসর্জন দিয়ে বাঁচার প্রয়োজনে মীরাকেই এখন বিমলাক্ষের কাছে চাকরির দরবার করতে হয়, মান-সম্মানের সঙ্গে দৈহিক শুচিতা ও বিসর্জন দিতে হয় মীরা ও তার কাকিমা সুমিত্রাকে। তাদের কাছে তখন বাঁচার প্রশ্নটা বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। সেজন্য জমিদার গিন্নি সুমিত্রাকে হাত পেতে গ্রহণ করতে হয় বেলু মল্লিকের দান। সুমিত্রার ছেলে

অত্রি বুঝতে পারে মায়ের অধঃপতন, তাই সে মাকে সম্মান করে না। মায়ের সম্পর্কে তার মন্তব্য— ‘মা, না ডাইনি। চাইনে অমন মা কে।’ সুমিত্রাও সন্তানের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত, তার বাৎসল্য বোধ বিপন্ন। সুমিত্রাও বলেন— ‘এমন ছেলের মরণই ভালো। ও থাকলেই বা কি, গেলেই বা কি! কথায় কথায় আমাকে মারতে আসে।... অমন কুলঙ্গারের মরণ হলেও আমার কোনো দুঃখ নেই। আমার পায়ের কাঁটা দূর হয়ে যাক— গেলেই আমি বাঁচি।’[৩৯] উপন্যাসে মা-ছেলের স্নেহ ও শ্রদ্ধার সম্পর্কের পরিবর্তে দুজনের প্রতি দুজনের আক্রোশ ফেটে পড়ে। সারা জীবন অপূর্ণতার গ্লানি বয়ে চলে সুমিত্রা।

উদ্বাস্তু নারী মান-সম্মান বিসর্জন দিল, সতীত্ব নামক মূল্যবোধ তাদের কাছে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ল, পথে-ঘাটে তারা অর্থের বিনিময়ে শরীর বিক্রি করল। এক সময়ের জমিদার বাড়ির গৃহবধূ সুমিত্রা অর্থের প্রয়োজনে পর-পুরুষের কাছে আশ্রয় নিলে— ছিন্নমূল নারীর এই বিপন্নতা পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে।[৪০]

বনফুলের ‘ত্রিবর্ণ’ উপন্যাসে উদ্বাস্তু নারীর সংকটের চিত্র ফুটে উঠেছে গভীরভাবে। উপন্যাসের শুরুতে পাই দেশবিভাগের পরে পূর্ব পাকিস্তানের গনেশ হালদার উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাবেন। এই সময়ে সেখানে দাঙ্গা শুরু হয়।গনেশ হালদারের মা তাঁর মেয়েকে নিয়ে পাকিস্তান সীমান্ত পার হবার সময় গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হন, প্রবল লড়াই করে মা মারা যান, এরপর কন্যা ধর্ষিতা হন।

এই উপন্যাসে আরও একটি পরিবারের দেশত্যাগের কথা উঠে এসেছে। ঝিনুক ও শামুক দুই বোন, তাদের দূর সম্পর্কের কাকা যতীশ বাবুর সঙ্গে দেশত্যাগের সময় আক্রান্ত হয়। কাকা তাদের সুরক্ষা বাদ দিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সহযাত্রী ডাক্তার সুঠাম ঘোষালের আপ্রাণ চেষ্টায় দুই বোন রক্ষা পায়। পরবর্তী সময়ে তাদের বাঁচতে হয়েছে লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। এমন কী তাদের বৈবাহিক সমস্যার কথা উঠে এসেছে উপন্যাসে। ঝিনুককে সুঠাম ডাক্তার বলেছেন— ‘তোমার মত যোগ্য মেয়ের অনেক ভাল পাত্র জোটা উচিৎ, কিন্তু আমি জানি জুটবে না, তুমি পাকিস্তানের রিফুজি, এই তোমার বড় কলঙ্ক।’[৪১]

উপন্যাসে নারীর প্রতি বিভৎস অত্যাচারের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে— একদিন গভীর রাতে একদল লোক চিৎকার করতে করতে একটি মেয়েকে নিয়ে হাজির হয়, যার দুটি স্তনই কেটে গুণ্ডারা সীমান্তের এপারে ফেলে গিয়েছে। এই চিত্রের পাশাপাশি নারীর আরও যে চিত্রটি আমরা উপন্যাসে পাই তা হল— অতীতের সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদা ভুলেছে নারী। ‘হাসুবানু’ উপন্যাসে জমিদার

পত্নী সুমিত্রার মত এ উপন্যাসেও বহু নারীকে তার দৈহিক শুচিতাকে বিসর্জন দিতে হয়েছে; ঝিনুকের কথার মধ্য দিয়ে তা ব্যক্ত হয়েছে। গণেশ হালদারকে সে উদ্বাস্তু মেয়েদের সম্পর্কে জানিয়েছে— 'তেলিপাড়ার মোহিনীকে মনে আছে? সে আজকাল দেহ বেচে পয়সা রোজগার করে কলকাতার রাস্তায় দাঁড়িয়ে। ছবি হয়েছে পকেটমার। শাপলা বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে একটা কসাইকে।... আমরাও পালিয়ে এসে যে নরক ঘাটছি, যে অপমান সহ্য করছি মাঝে মাঝে মনে হয় তার চেয়ে মৃত্যুও ভালো ছিল।'[৪২] এই ঝিনুকই আবার আশাবাদ ব্যক্ত করেছে— 'যখন মরিনি তখন বাঁচার মত বাঁচতে হবে।' শত সমস্যা ও সংকট থাকা সত্ত্বেও নারীর আশাবাদের কথাই এখানে ব্যক্ত হয়েছে।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'নির্বাস' উপন্যাসে বিমি ওরফে বিমলা ওরফে বিমলপ্রভার স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে হলুদমোহন ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের জীবন এবং নারীর যন্ত্রণার কথা রূপায়িত হয়েছে। উপন্যাসে ক্যাম্পের চিত্র এভাবে পাই— 'এক সন্ধ্যায় একজন লোক এল। প্রথমে সে ঘুরে ঘুরে দেখল। শেয়ালের মতো ছোক ছোক করল। প্রায় মাঝ রাতে সে এল সোজাসুজি প্রস্তাব নিয়ে। আভাস ইঙ্গিতে নয়, সুস্পষ্ট প্রস্তাব টাকার অঙ্কসমেত।'[৪৩] দেশভাগ পরবর্তী কালে নারীর উপর এভাবেই চলে বিড়ম্বনা।

যুদ্ধের কারণে বিমলা, তার দিদি ও ভগ্নীপতি বাবার নির্দেশে রেঙ্গুন ত্যাগ করে। বিমলার বাবা তার স্ত্রীর স্মৃতি নিয়ে সেখানেই থেকে যান। পরে বোমা বিস্ফোরণে তার মৃত্যু হয়। রেঙ্গুন থেকে যাত্রা করার পরে ওষুধের অভাবে বিমলার দিদির রাস্তায় মৃত্যু হয়। তারপর ভুবনবাবু থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বিমলা। সে বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে বনগাঁ স্টেশনে উপস্থিত হয়। অত্যন্ত অসুস্থতার মধ্যে এক দরদী উদ্বাস্তু মরণচাঁদের সহায়তায় ক্রমে সে সুস্থ হয়ে ওঠে। রেঙ্গুনের বজ্রযোগিনী থেকে কলকাতার পথ ছুঁয়ে হলুদমোহন ক্যাম্পে আসা— বিমির জীবনের এক দীর্ঘ পরিক্রমা।

হলুদমোহন ক্যাম্পে কিছুদিন থাকার পর সেখানে বন্যা দেখা দেয়, ফলে উদ্বাস্তুদের স্থানীয় একটি স্কুল বাড়িতে গিয়ে উঠতে হয়। বিমলার ভগ্নিপতি ভুবনবাবু ঠিকানা পেয়ে সেখানে উপস্থিত হয়। পরে বিমলা আর ক্যাম্পে ফিরে যায়নি— একটা বাসা ভাড়া করে ভুবনবাবু ও বিমলা সেখানে উঠে যায়।

ভুবনের সঙ্গে বিমলা একসঙ্গে বসবাস করেছে কিন্তু কখনও স্বামী-স্ত্রী হতে পারেনি। কারণ— 'দুজনের পার্টনারশিপে সংসার চালানো আর স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধে উত্তীর্ণ হওয়া এক কথায় নয়।'[৪৪] ভুবনবাবু বিমলাকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে চেয়েছেন, কিন্তু বিমলার পূর্ণ সম্মতি না থাকায়

তিনি জোর করেন নি। হলুদমোহন ক্যাম্পের এক কর্মী সৌম্যর সঙ্গে বিমলার একধরনের বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। যদিও সেই সম্পর্কের মধ্যে প্রেমের কোনও উল্লেখ নেই। প্রশ্ন জাগে ভুবনবাবুর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা সত্ত্বেও, নির্ভর করা সত্ত্বেও স্বামী হিসেবে বিমলার তাকে গ্রহণ না করার কারণ কি তাহলে সৌম্য? উপন্যাসে তার উত্তর পাওয়া যায়নি।

পুরুষ সম্পর্কে বিমলার অভিজ্ঞতা ব্যাপক ও মারাত্মক। একদিকে দেশত্যাগের সময় সে যেমন ধর্ষিতা হয়েছে, তেমনি আবার কর্মক্ষেত্রের সঙ্গী চার্চের পক্ষে কাজ করা খ্রিস্টীয় চিন্তা-চেতনায় আত্মসমর্পিত পুরুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এবং তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে; আবার কর্মহারা হয়ে সেখানকার বাসস্থান হারানোর হাত থেকে বাঁচতে কুদর্শন হলেও ক্ষমতাশালী পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হওয়া— ইত্যাদি অভিজ্ঞতাগুলি তাকে যেন চূড়ান্ত অসহায় মুহূর্তে নিক্ষেপ করে সীমাহীন যন্ত্রণা দিয়েছে। বিমি তথা বিমলপ্রভা যেন টুকরো টুকরো অসহায় উদ্বাস্তু নারীর সমন্বিত রূপ। আবার উদ্বাস্তু নারী লতার স্বামী থাকা সত্ত্বেও বৃদ্ধ রায়মশাই এং তার ছেলে লতার উপর লোলুপ দৃষ্টি দেয়। বাস্তুচ্যুত নারীর এ এক অপরিসীম যন্ত্রণা। যে যন্ত্রণার জন্য নারী বিন্দুমাত্র দায়ী নয়; তার সমস্ত দায়ভার বহন করে চলতে হয় অসহায় নারীদের।

অসহায়তার সুযোগ নিয়ে নারীকে ভোগ করার মতো পুরুষের কদর্যতার প্রকাশ লক্ষ করা যায় জীবনের নানা ক্ষেত্রে; বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে তা ঘটতে দেখা যায়। কিন্তু 'নির্বাস' উপন্যাসে দেশত্যাগ নারীকে চূড়ান্ত রূপে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। উপন্যাসে সবকিছুই বর্ণিত হয়েছে বিমলার স্মৃতির পথ ধরে। বর্তমান জীবনের কাজের ফাঁকে ফাঁকে একের পর এক স্মৃতিচিত্র ভাসতে থাকে— যা অত্যন্ত তিক্ত, গ্লানিময়; শত চেষ্টা করেও যা ভোলা যায় না।

অচ্যুত গোস্বামীর 'কানাগলির কাহিনি'তে উদ্বাস্তু জীবনের তথ্যনিষ্ঠ চিত্র পাই। পূর্ববঙ্গ থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে একদল মানুষ কলকাতার একটি বহু কুঠুরি বিশিষ্ট বাগান বাড়িতে আশ্রয় নেয়। বাড়িটি রাজাবাহাদুর নামে অজ্ঞাত কোনও জমিদারের। সেখানে কল্যাণবাবু মনোরম বাবু; দীপঙ্কর বাবু, লক্ষ্মীকান্ত বাবুরা পরিবার পিছু একটি করে ঘর নিয়ে কোনও রকমে মাথা গুঁজে দিনাতিপাত করে। কিছুদিন পরেই বাড়ির মালিক তাদের উৎখাত করার চেষ্টা করে। বাড়ির বাসিন্দারা সকলে মিলে চাঁদা তুলে অল্প ভাড়ার বিনিময়ে থাকতে চায় কিন্তু বাড়ির মালিক তাতে কিছুতেই রাজি হয় না। শেষ পর্যন্ত পুলিশের সহায়তায় তাদের বিতাড়িত করা হয়। রাতারাতি মানুষগুলি নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে বের হয়।

উপন্যাসে উদ্বাস্তুদের গভীর টানাপোড়নের মাঝে নারীর সংকটও চিত্রিত হয়েছে। জীবনধারণের প্রয়োজনে নারীরাও নেমে পড়ল চোরা কারবারে— 'লক্ষণের হাতে যে পুঁজি জমল তাই দিয়ে সে সোডার চোরা কারবার শুরু করে দিল। প্রতিবেশী ধোবা-বৌরা হল তার বিশ্বস্ত সহচর। রুক্মিনী, কৃষ্ণা, সুভদ্রা এবং আরও অনেকে।"[৪৫]

পূর্ববঙ্গে নারীর যে আব্রু ও সম্ভ্রম ছিল এদেশে এসে তারা তা রক্ষা করতে পারল না। লেখক বর্ণনা করেছেন— দেশের বাড়ির সেই পুরোনো নীতিবোধ আর মূল্যবোধ কর্পূরের মত মিলিয়ে যাচ্ছে যেন। দেশের বাড়িতে থাকতে ভাবাই যেত না অনাত্মীয় যুবক ছেলেদের সঙ্গে তরুণী মেয়ে বউরা ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করবে। এ বিষয়ে এখন কোনও প্রশ্নই জাগে না বাড়ির লোকজনদের মনে। বাস্তবিক প্রয়োজন মেটাতে অনেক অবাঞ্ছিত ও অস্বস্তিকর পরিবেশে এই মেলামেশা করতে হয়।

প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই নারীদের নানা পেশা অবলম্বন করতে হয়েছে। কল্যাণবাবুর স্ত্রী মনোরমা তাই মন্তব্য করেন— 'মাস্টার কার্তিকবাবুর বৌ নাচের মাস্টারি করে। আবার নাকি বদমায়েশির রাজত্ব সিনেমায় ঢুকবে। এ বাড়ির আরও অনেক মেয়ে অফিসে অফিসে ঘুরছে চাকরির জন্য বা যাচ্ছে অকল্যাণ্ড হাউসে সাহায্যের প্রত্যাশায়। না, মেয়েদের আব্রু একেবারে ঘুচে গেল আর সেইসঙ্গে নৈতিক মানদণ্ড।'[৪৬] আবার সুধা অর্থনৈতিক সহায়তা এবং সমাজের প্রতি একটা তীব্র অভিমানবোধ থেকে নিজেকে যুক্ত করে দেহ ব্যবসায়। অর্থ আসে তা থেকে; রাজা বাহাদুরের বাড়ির লোকের কাছ থেকে সে সম্মান, সামাজিকতা পায়, কিন্তু মনের দিক থেকে সে শান্তি পায় না, কারণ নিজেকে পণ্য ভাবতে পারে না সে। শেষ পর্যন্ত ওই পেশা ছেড়ে দেয় সুধা।

'কানাগলির কাহিনী' উপন্যাসে নারীর জীবনের সংগ্রাম যেমন আছে তেমনি সেই সংগ্রামে মেয়েদের কর্মক্ষমতার বিকাশ, আত্মবিশ্বাসের উন্মেষ এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রকাশিত হয়েছে।

সুভাষচন্দ্র মৈত্রের 'কুসুমের ঘর সংসার' উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবনের চরম লাঞ্ছনার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। কুসুমের বাবা সুধাংশু বাবু বনেদি পরিবারের কর্তা দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও পূর্ববঙ্গ থেকে চলে আসার চেষ্টা করেন। কিন্তু জমি-জায়গার উপর নির্ভর করে সংসার চলত। জমি হস্তান্তর করা সম্ভব ছিল না তাই আসা হয়ে ওঠে না। দিন যায়, দেশের পরিস্থিতি ক্রমে খারাপ হতে থাকে;

সুধাংশু বাবুর ভাবনা বাড়ে। বাড়িতে তার যুবতী মেয়ে কুসুম এবং তারই সংসারে আশ্রিতা ময়না। ময়নার বাবার ধড়মুণ্ডু আলাদা হয়েছে দাঙ্গায়। প্রতিবেশীদের কেউ কেউ সুধাংশুবাবুর জমি দখলের লোভে তাকে দেশত্যাগে উৎসাহিত করে, বেনামী চিঠি দেয়, শেষে সরাসরি হুমকি দেয়। তাতেও কাজ না হওয়ায় রাতের বেলা ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সুধাংশুবাবু পরিবারের সকলকে নিয়ে খালি হাতে দেশত্যাগ করেন। তাদের সঙ্গী হয় ময়না ও তার মা। পথে ময়না ও কুসুম দুজনেই ধর্ষিতা হয়, ময়নার মাও বাদ যায় না অত্যাচারের হাত থেকে। ময়নার মা এই আঘাত সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে। এর পর কুসুম ও ময়নার জীবনে শুরু হয় কঠিন সংগ্রাম, সুধাংশু বাবু পঙ্গু হয়ে ঘরে পড়ে আছে। বেঁচে থাকার জন্য কুসুম কারখানায় কাজ নেয়, রাতের বেলায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে পড়ায়। সে স্বপ্ন দেখে অতীতের গ্লানি ভুলে ছোট্ট একটি সুখী সংসারের। কিন্তু যতবারই সে সেই স্বপ্নের সংসার গড়তে স্বপ্নের পুরুষ খুঁজেছে ততবারই তার সেই স্বপ্ন ভেঙেছে— শরীরকে ভোগ করে তারা চলে গিয়েছে অন্যত্র।

পাশাপাশি ময়না ধর্ষিতা হবার পর তার মনে জেগেছে প্রতিশোধ স্পৃহা। কোনও পুরুষকে সে বিশ্বাস করে না, শরীরের পবিত্রতাকে আমল দিতে চায় না, পুরুষদের সে নষ্ট করে দিতে চায়। ধর্ষণের লজ্জা ঢাকতে কলোনির ববিতা নামের মেয়েটি গত রাতে গলায় দড়ি দিয়েছে। বান্ধবী কবিতা সেকথা ময়নাকে জানাতে গেলে সে চিৎকার করে বলেছে— 'কার লাইগা মরুম! জেবন তো বারবার আসপে না। বাঁচন নিজের জন্যি। কাপড়ে দাগ লাগলে ধুইতে হয় সোডা দিয়া, মোনের দাগ ধোবো ঘেন্না দিয়া।'[৪৭]

সমীরণ পালের 'উজান গাঙের নাইয়া' উপন্যাসে পাবনা জেলার সুরেন ব্যাপারী পঞ্চাশ দশকের শেষে দেশত্যাগ করে পশ্চিমে আসে। দেশে থাকতে তার জমি-জায়গা, হালের বলদ, তিন তিনটে ধানের গোলা ছিল। এ সবের মায়া কাটিয়ে খালি হাতে সেই দিনই দেশত্যাগ করেন যেদিন ধানের গোলা তিনটিতে পড়শি মুসলমান আগুন ধরিয়ে দেয়। দেশান্তরের পর সম্পন্ন কৃষক হয়ে যান, দিন মজুর। প্রায় বিনা চিকিৎসায় স্ত্রী মারা যাবার পর একমাত্র সন্তান সুমিতাকে নিয়ে তার সংসার। সুমিতাকে নিয়ে তিনি স্বপ্ন দেখেন সুমিতা ডাক্তার হবে রোজ স্কুলে যাবার পথে এই অঞ্চলের সাতপুরুষের বাসিন্দা দেবেন ঘোষের মেয়ে জলির সঙ্গে পরিচয় হয়। ক্রমে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব গাঢ় হয়। সুমিতার দেখাদেখি জলিও স্কুলে যেতে চায়, বিয়ের প্রস্তাব এলে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের পড়ালেখার

বিশেষ চল ছিল না, উদ্বাস্তু মেয়েদের দেখাদেখি তারাও স্কুলে যেতে শুরু করে। এর ফলে মেয়েদের বিয়ের গড় বয়স বাড়তে শুরু করে।[৪৮] দেশান্তরী নারী সময় ও সমাজের দাবিকে সামনে রেখে দ্রুত নিজেদের বদল ঘটিয়েছে, পাশাপাশি বদলে দিয়েছে তার চারপাশের জগৎ। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুদেষ্ণা চক্রবর্তীর মতামত উল্লেখযোগ্য— 'জীবন সংগ্রামে উদ্বাস্তু মেয়েরা যেভাবে এগিয়ে এসেছিল, তাতে কেবল ঐ ছিন্নমূল মানুষেরা পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পায়নি; সাধারণভাবে পশ্চিমবঙ্গের নারী মুক্তির পথ উন্মোচিত করেছিল।"[৪৯]

উপন্যাসে সুমিতা ডাক্তার হতে না পারলেও সরকারি অফিসে চাকরি পায়। কিন্তু সুরেনবাবু যুবতী মেয়ের বিয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেন না, কারণ- 'বৃদ্ধ বয়সে এই মেয়েই তার একমাত্র অবলম্বন।' পাড়া-পড়শী মেয়ের বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন তুললে তাদের তিনি দু'কথা শুনিয়ে দেন; বিয়ের সম্বন্ধ এলে পাত্র পক্ষের নানা ত্রুটি বিচ্যুতি বের করে বিয়ে ভেঙেছেন। সুমিতাকে শেষপর্যন্ত আইবুড়ো থাকতে হয়।[৫০] সংসারের দাবি মেটাতে গিয়ে স্বাধীনতা সমকালে অনেক নারীই সংসার করতে পারে নি এমন উদাহরণ অনেক রয়েছে।

দেশভাগ ও দেশত্যাগকে কেন্দ্র করে লেখা বাংলা উপন্যাসে দেশান্তরী নারীর ব্যক্তিগত জীবন এবং তার পারিপার্শ্বিক সামাজিক পরিমণ্ডলের সংকটের চিত্র ফুটে উঠেছে। সাধারণভাবে উপন্যাসগুলির দুটি অভিমুখ তৈরি হয়েছে—

i) নারী-হৃদয়ের যন্ত্রণা;

ii) অতীতের গ্লানি ভুলে ঘুরে দাঁড়াবার প্রচেষ্টা;।

উপন্যাসগুলি বিশ্লেষণ করলে একদিকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে— দেশবিভাগ সমকালে কিংবা তার অপেক্ষাকৃত পূর্ববর্তী সময়ে দাঙ্গা বিধ্বস্ত নারীর প্রতি নির্মম অত্যাচারের কথা; অন্যদিকে তার চেয়ে অনেক বেশি এবং গভীরভাবে প্রকাশিত হয়েছে বিভাগ পরবর্তী ছিন্নমূল নারীর কথা। এই নারীদের অধিকাংশই প্রবল উজান ঠেলে কিনারায় আসতে চেয়েছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ তার নির্দিষ্ট লক্ষে পৌঁছেছে, কেউবা 'মেঘে ঢাকা তারা' উপন্যাসের নীরার মতো জীবনের প্রতি চরম আসক্তি নিয়ে বলেছে— 'আমি বাঁচতে চাই।' অথচ বাঁচতে পারেনি।

উপন্যাসগুলিতে চিরাচরিত বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে এসে বৃহত্তর সামাজিক পরিমণ্ডলে নারীর পদার্পণের কথা নিবিড়ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। পূর্ববঙ্গের যে সমাজে সে বেড়ে উঠেছে সেখান থেকে উচ্ছেদ হয়ে সম্পূর্ণ নতুন একটি অবস্থা তাকে নতুনভাবে গড়ে তুলেছে। দেশান্তরী নারীর দীর্ঘদিনের যে

সংস্কার ভাঙতে শুরু করেছিল, উপন্যাসগুলিতে তার ছবি যেমন আছে, তেমনি অর্থনৈতিক প্রয়োজনে সামাজিক বৃত্ত ভেঙে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের কথা উঠে এসেছে।

আশ্রয়ের সন্ধানে গৃহচ্যুত নারীর অভিযান, রাস্তায়, স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে, উদ্বাস্তু শিবিরে তাদের মনুষ্যেতর জীবন-যাপনের চিত্র পাই 'পুব থেকে পশ্চিমে' 'বকুলতলা পি.এল. ক্যাম্প', 'উচ্ছিন্ন পরবাস', 'পরতাল' প্রভৃতি উপন্যাসে। নির্যাতিতা নারীর প্রসঙ্গ উঠে এসেছে 'ত্রিবর্ণ' 'কেয়াপাতার নৌকো', 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা', 'কুসুমের ঘর সংসার' ইত্যাদিতে। বাঁচার তাগিদে নারীর মূল্যবোধ ও সতীত্বের বিসর্জনের চিত্র পাই 'কানাগলির কাহিনি', 'নির্বাস', 'হাসুবানু' প্রভৃতি উপন্যাসে। পাশাপাশি পূর্ববঙ্গের বংশ গৌরবকে বিসর্জন দিয়ে ঘরের মেয়ে-বউকে বাইরে কাজ করতে পাঠানোর কথা ব্যক্ত হয়েছে 'দূরভাষিণী', 'মহানগর' প্রভৃতি উপন্যাসে।

'পুব থেকে পশ্চিমে' উপন্যাসের উমার জীবনে বাইরের লড়াই ছিল না, লড়াই ছিল তার ভিতরের— পুরোনো ধ্যান-ধারণার সঙ্গে নতুনের দ্বন্দ্বে ভুগেছে সে। অবশেষে নতুনকেই গ্রহণ করেছে! সর্বক্ষণের সঙ্গী গোপালকে (পাথরের কৃষ্ণমূর্তী) দূরে সরিয়ে রেখে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছে; সংস্কার মুক্ত মন নিয়ে ডাক্তারি পড়বার সংকল্প করেছে। 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসের সুতারা, 'কেয়াপাতার নৌকো' উপন্যাসে ঝিনুক পূর্ববঙ্গ থেকে অত্যাচারিত হয়ে আত্মীয়-স্বজনের দ্বারা চরম ভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে। এর মধ্যে সুতারা হাল ছাড়েনি, অধ্যাপনা করেছে নামী কলেজে। কিন্তু ঝিনুক অভিমান নিয়ে নিরুদ্দেশে পাড়ি জমিয়েছে— কেউ তাকে খুঁজে পায়নি। 'পরতাল' উপন্যাসে মীরা পরিবারের সকলকে হারিয়ে নানা প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে শিক্ষিকা হয়েছে। 'মহানগর' উপন্যাসের আরতি কিংবা 'দূরভাষিণী' উপন্যাসের বীণাকে বংশ গৌরব উপেক্ষা করেই কাজে নামতে হয়েছে। আরতিকে বিগত জীবনের নানা সংস্কার ভাঙতে হয়েছে। চাকরি করেও ঘরে বাইরের নানা দায়িত্ব সামলাতে হয়েছে দ্রুততার সঙ্গে। 'হাসুবানু' উপন্যাসে অর্থের প্রয়োজনে সুমিত্রাকে শরীর বিক্রি করতে হয়েছে। 'নির্বাস' উপন্যাসে বিমলা জীবনের নানা বাধা অতিক্রম করেছে দক্ষতার সঙ্গে। 'কুসুমের ঘর সংসার' উপন্যাসে কুসুম বারবার প্রতারিত হয়েও স্বপ্ন দেখতে ভোলেনি।

দেশান্তরী মানুষের জীবন সর্বত্রই সংকটাকীর্ণ। স্বাভাবিকভাবেই তাদের সম্পর্কে রচিত বাংলা উপন্যাসে সেই সংকট নানাভাবে বিধৃত হয়েছে। পুরুষের সংকটের সঙ্গে সঙ্গে নারীর সমস্যাগুলি উঠে এসেছে সমানভাবে। আমাদের গবেষণা পত্রে সেই সব উদ্বাস্তু নারীর কাহিনিকে বিশ্লেষণ করতে

চেয়েছি, যাদের সমস্যা ও সংকট স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা যায়।

তথ্যসূত্র

১. অশ্রুকুমার সিকদার, *ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য*, দে'জ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৬৪

২. প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, *প্রান্তিক মানব*, প্রতিক্ষণ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ১৯

৩. প্রফুল্ল রায়, *নোনাজল মিঠে মাটি*, দে'জ ৩য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ২২১

৪. কালশিরা দাঙ্গা: ১৯৪৯ সলের ২০ ডিসেম্বর বাগেরহাটের কালশিরা গ্রামে জনৈক দীপক ব্রহ্মের বাড়িতে কমিউনিস্ট পার্টির কয়েকজন কর্মী লুকিয়ে আছে এই খবর পেয়ে পুলিশ এসে ব্যাপক অত্যাচার শুরু করে। এক মহিলাকে বলাৎকারে উদ্যত হলে গ্রামবাসীরা একজন পুলিশ হত্যা করে লাশ গায়েব করে, বাকি পুলিশ পালিয়ে যায়। পরের দিন বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে আশপাশের গ্রামের মুসলমানদের সহযোগিতায় বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে হিন্দুদের উপর অত্যাচার শুরু করে। এই ঘটনার প্রভাব পড়ে সারা পূর্ববঙ্গে; ফলে ব্যাপক সংখ্যক হিন্দু দেশত্যাগ করে।

৫. সাক্ষাৎকার : হরিদাসী মণ্ডল
পিএল. ক্যাম্প, অশোকনগর
পেশা : প্রাক্তন তাঁতকলকর্মী (পি.এল ক্যাম্পের জন্য সরকার পরিচালিত)
বয়স : আনুমানিক ৮৪ বছর, সাক্ষাৎকার গ্রহণ ; ১২.১০.২০১২ (পি.এল.ক্যাম্প, অশোকনগর)

৬. প্রফুল্ল রায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১২৫

৭. প্রফুল্ল রায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৬১

৮. প্রফুল্ল রায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৫৪

৯. প্রফুল্ল রায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৭০

১০. মহীতোষ বিশ্বাস, *পরতাল*, একবিংশ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৪৪

১১. মহীতোষ বিশ্বাস, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৫৩

১২. মহীতোষ বিশ্বাস, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৫৫

১৩. মহীতোষ বিশ্বাস, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৫৬

১৪. মহীতোষ বিশ্বাস, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৪৯

১৫. মহীতোষ বিশ্বাস, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৭৫

১৬. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *উদ্বাস্তু*, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ কলকাতা, ১৯৭০, পৃ. ১৬

১৭. রমেশচন্দ্র সেন, *পুব থেকে পশ্চিমে*, ভারতী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১১১

১৮. তদেব, পৃ. ৯১

১৯. অশ্রুকুমার সিকদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৬৬

২০. Prafulla K Chakrabarty, *The Marginal Men*, Naya Udyog, Naya Udyog edition, Kolkata, 1999, p. 95

২১. রমেশচন্দ্র সেন, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১০৯

২২. রমেশচন্দ্র সেন, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২২১

২৩. অশ্রুকুমার সিকদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৬৩

২৪. জ্যোতির্ময়ী দেবী, *এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা*, রূপা, ১ম সংস্করণ, ১৯৬৮, পৃ. ৩

২৫. জ্যোতির্ময়ী দেবী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৩৬-৩৭

২৬. প্রফুল্ল রায়, *কেয়াপাতার নৌকা*, করুণা, ৩য় সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৫০৪

২৭. তদেব, পৃ. ৫৭৮

২৮. তদেব, পৃ. ৫৭৫

২৯. নরেন্দ্রনাথ মিত্র, *দূরভাষিণী*, (নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনা সমগ্র) আনন্দ, ১ম সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৪৪২

৩০. মিহির সেনগুপ্ত, *বিষাদবৃক্ষ*, সুবর্ণরেখা, প্রথম প্রকাশ, ৩য় মুদ্রণ, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৮৮

৩১. মহীতোষ বিশ্বাস, *উচ্ছিন্ন পরবাস*, ‘গ্রন্থতীর্থ’, সর্বাধুনিক সংস্করণ, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১১

৩২. নরেন্দ্রনাথ মিত্র, *মহানগর* (নরেন্দ্রনাথ মিত্র উপন্যাস সমগ্র— ৩য় খণ্ড), আনন্দ, ১ম সংস্করণ, কলকাতা,

৩৩. তদেব, পৃ. ৬৬৭

৩৪. তদেব, পৃ. ৬৮২

৩৫. তদেব, পৃ. ৬৮২

৩৬. তদেব, পৃ. ৬৫৩

৩৭. অশ্রুকুমার সিকদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৬৪

৩৮. প্রবোধকুমার সান্যাল, *হাসুবানু*, সাহিত্য সংস্থা, ১ম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৬০

৩৯. তদেব পৃ. ২৯৯

৪০. তাপস ভট্টাচার্য, *বাংলা উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবন*, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৪১১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৪৪

৪১. বনফুল, *ত্রিবর্ণ* (বনফুল রচনাবলী-১৬ খণ্ড), গ্রন্থালয়, কলকাতা ১৯৯৯, পৃ. ৩৩৬

৪২. প্রবোধকুমার সান্যাল, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৩৬৭

৪৩. অমিয়ভূষণ মজুমদার, *নির্বাস* (অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র), দে'জ, ২০০৫, পৃ. ১৭৬

৪৪. অমিয়ভূষণ মজুমদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১১২

৪৫. অচ্যুত গোস্বামী, *কানাগলির কাহিনী*, র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, ১ম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৫৫, পৃ. ৩৯

৪৬. অচ্যুত গোস্বামী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৩৬

৪৭. সুভাষ মৈত্র, *কুসুমের ঘর সংসার*, বাতায়ন, প্রথম প্রকাশ, বারাসাত, ২০০০, পৃ. ২৮০

৪৮. সুনীল রায়চৌধুরী, *পূর্ববাংলার জনপদ*, সময়, ১ম সংস্করণ, ফরিদপুর (বাংলাদেশ), ১৯৭৪, পৃ. ২৮০

৪৯. সুদেষ্ণা চক্রবর্তী, 'বাংলা ভাগ ও মেয়েরা : বাস্তবে ও কথা সাহিত্যে', উদয়চাঁদ দাশ ও অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), *দেশ বিভাগ ও বাংলা উপন্যাস*, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ২০০৫, পৃ. ১০৪

৫০. সমীরণ পাল, *উজান গাঙের নাইয়া*, সন্তোষ পাল, প্রথম প্রকাশ, বনগাঁ, ২০০৪, পৃ. ৯৪

সপ্তম অধ্যায়

বাংলা উপন্যাসে সম্পত্তিবিনিময় প্রসঙ্গ

মানুষ একই স্থানে বংশপরম্পরায় বসবাসের ফলে তার যেমন একটি সামাজিক পরিচয় তৈরি হয়, তেমনি অর্থনৈতিক ও পেশাগত ভিত্তি তৈরি হয়। এই সুবাদে দেশভাগ পরবর্তী উভয়বঙ্গের যে গণপ্রব্রাজন তা বাংলা এবং পাঞ্জাবকে তো বটেই, গোটা ভারতবর্ষকেই নাড়িয়ে দিয়েছিল। ফলে দেশভাগে বলি হওয়া মানুষের সঙ্গে সঙ্গে তাদের উত্তর প্রজন্মের মানুষও এর প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি। তাই তাদের মধ্যে ঘুরে ফিরে আসে দেশভাগের সাতকাহন।

দেশভাগজনিত কারণে ভারতবর্ষের পূর্ব-পশ্চিম উভয় প্রান্তে অগণিত মানুষ দেশান্তরী হয়। জীবনের নিরাপত্তা, সামাজিক সম্মান সর্বোপরি নারীর সম্ভ্রম রক্ষার জন্য শূন্য হাতে দেশত্যাগ করা মানুষের সংখ্যাই অধিক। এদের মধ্যে কেউ ক্যাম্প কলোনিতে আশ্রয় নিয়েছে, কেউ বা আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে কিংবা নিজের উদ্যোগে বেঁচে থাকার উপায় খুঁজেছে। এছাড়া আরও একশ্রেণির উদ্বাস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়, যারা সম্পূর্ণ নিজেদের চেষ্টায় পারিবারিক সম্পত্তি বিনিময়ের মাধ্যমে দেশত্যাগ করেছে।[১] উদ্বাস্তু জীবনের নানাদিক নানাভাবে আলোচিত হয়েছে। বিশেষ করে ক্যাম্প কলোনি, জবর দখল কলোনি, উদ্বাস্তুদের রাজনৈতিক ও সামাজিক লড়াই- আন্দোলন, আত্মকথা-স্মৃতিকথা ইত্যাদি নানা বিষয় উঠে এসেছে উপন্যাসগুলিতে। কিন্তু সবচেয়ে অনুল্লিখিত থেকে গিয়েছে সম্পত্তি বিনিময়কারী উদ্বাস্তুদের বিষয়টি।

যে বিরাট সংখ্যক উদ্বাস্তু সম্পত্তি বিনিময় করে দেশত্যাগ করেছে, তাদের সম্পর্কে সরকারের কাছে কোনও রেকর্ড ছিল না। এই কারণে তাদের সংখ্যা এবং বসবাসের অঞ্চল সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণাও পাওয়া যায় না। যেসব কারণে তারা সম্পত্তি বিনিময়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা নিম্নরূপ—

১. দেশভাগ সমকালে সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা জমির খরিদ্দার জোগাড় করা বেশ ঝামেলার ও ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। এই ঝুঁকি এড়াতেই মূলত সম্পত্তি বিনিময়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়;

২. উভয়দেশের ক্ষেত্রেই সংখ্যাগুরু দ্বারা জমি জায়গা বেদখল হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল;

৩. নগদ অর্থ নিয়ে দেশত্যাগ করার ঝামেলা অনেক বেশি, তাই বিনিময়ের প্রতি ঝোঁক দেখা যায়;

৪. যদি জমি বিক্রি করে নগদ অর্থ আনা হয়, তাহলে সেই অর্থ দিয়ে নতুন দেশে এসে জমি

কেনা ও বসতি স্থাপনের অনেক ঝুঁকি থাকে;

৫. সবকিছু তৈরি অবস্থায় পেলে বসবাসের পক্ষে সুবিধা অনেক, এই সুবিধা বিনিময়কারীরা গ্রহণ করেছিল;

৬. এক সঙ্গে বড় জোতের জমির খরিদ্দার পাওয়া মুশকিল হচ্ছিল;

৭. খণ্ড খণ্ড জমি ভিন্ন ভিন্ন খরিদ্দারের কাছে বিক্রি করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল।[৩] তাই যে যেভাবে পেরেছে সম্পত্তি বিনিময় করে দেশত্যাগ করেছে। ইতিহাসের এই সত্যতা বাংলা উপন্যাস বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থন করে।

'পরতাল' উপন্যাসে কাশীনাথ দাস, যিনি প্রথম দিককার উদ্বাস্তু, তিনি 'স্টেশন থেকে বেশ খানিকটা দূরে খালপাড়ের এক মুসলমানের সঙ্গে বাড়ি বিনিময় করেছেন। সে মুসলমান পরিবারটি খুলনার দৌলতপুরে কাশীনাথের বাড়িটার দখল পেয়েছে। আর এখানে কাশীনাথ পেয়েছেন ঐ মুসলমান পরিবারের বিঘে খানেক জমির উপর তার বসত বাড়িটি।'[৪] প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকো' উপন্যাসে শওকত সাহেবের কলকাতার খান মঞ্জিলের সঙ্গে রাজাদিয়ার দ্বারিক দত্তের সম্পত্তি বিনিময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। গোটা পঞ্চাশের দশক এবং ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত চলে এই বিনিময় কার্য। জমি-বাড়ি বিক্রি করে দেশান্তরী হওয়ার ঝামেলা অনেক, তাই অনেকেই বিনিময়ের সুযোগ খুঁজছিল। শচীন দাশের 'উদ্বাস্তু নগরীর চাঁদ'-য়ের ললিতমোহনের কথায় পাই— 'হ তা ঠিক আর আমি না বুঝলেও হইব। এইয়া বোধয় বুঝতে পারছিল আমার বাবা কাকারা। বুঝতে পারছিল এই দেশটা আর আমাগো দেশ হইতে পারে না। ওইখানে আর আমরা থাকতে পারলাম না। তাই তখন থিকাই খুব চিন্তায় পড়ছিলাম। শ্যাষে একদিন সুযোগটা আইসা গেল। বাবা-কাকারা আর দেরি করল না। রাতারাতি এক্সচেঞ্জ কইরা নিল।'[৫]

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ভারত থেকে যাওয়া বিহারি উদ্বাস্তুরা ক্রমে জবরদখল করে নিচ্ছিল ঘর-বাড়ি-জমি-জায়গা। সেই তুলনায় স্থানীয় মুসলমানেরা খানিকটা সহানুভূতিশীল ছিল। এই বিহারি রাজাকারদের জন্য চিন্তিত দ্বারিক দত্ত— 'রাজাকার বা ইণ্ডিয়া থেকে চলে যাওয়া বিহারী মুসলমানরা একবার সে সব দখল করে বসলে কে তাদের কবল থেকে তা উদ্ধার করবে? কলকাতা থেকে ওদের চুলের ডগাও ছোঁয়া যাবে না। কেউ যদি দখল করে না-ও নেয়, অন্যদিক থেকে প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা রয়েছে। হাওয়ায় হাওয়ায় এমন একটা গুজব ভেসে বেড়াচ্ছে, পাকিস্তান গভর্ণমেন্ট খুব তাড়াতাড়িই হিন্দুদের ফাঁকা বাড়ি-টাড়ি শত্রু সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করবে। তাহলে সব আশায় জলাঞ্জলি।'[৬] দ্বারিক দত্ত'-র

এই অনুমান বাস্তবে রূপান্তরিত হয়েছিল পাকিস্তান সরকারের দুটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে—

১. .East Bengal Evacuees Property (Restoration Possession) Act of 1951;

২. East Bengal Evacuees (Administration of Immovable Property) Act of 1951.[৭]

পরবর্তী সময়ে আরও একটি আইন সংখ্যালঘুদের দুরবস্থা বৃদ্ধি করে—

১. East Pakistan Enemy Property (Land and Buildings) Administration and Disposal order of 1965.[৮]

এই আইনগত জটিলতার কথা মাথায় রেখে উভয়বঙ্গের সংখ্যালঘু শ্রেণি যে বিনিময় প্রক্রিয়া শুরু করেছিল তার মধ্যে খুব একটা আইনি জটিলতা ছিল না। বিনিময়ের অনেকগুলি প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি প্রক্রিয়া ছিল— স্ট্যাম্প পেপারে পক্ষের একে অপরকে দানপত্রের মাধ্যমে সম্পত্তি বিনিময়। এই প্রক্রিয়ায় উভয়পক্ষের দুইজন করে মোট চারজন সাক্ষী করা হতো। ঔপন্যাসিক প্রফুল্ল রায় তাঁর 'শতধারায় বয়ে যায়' উপন্যাসে বিনিময় প্রক্রিয়ার কথা এভাবে বর্ণনা করেছেন— 'শওকতের দানপত্রের বয়ানটা আগেই তৈরি করেছিলেন তার উকিল নৃসিংহ রাহা। সেটা দ্বারিক এদের উকিল সুরঞ্জন লাহিড়ি খুঁটিয়ে দেখার পর সামান্য অদল বদল করে দু'কপি টাইপ করা হয়েছে। একটা কপি আগেই সুরঞ্জনের কাছে পাঠানো হয়েছিল। অ্যাটাচি কেস থেকে সেটা বার করে তিনি পড়তে লাগলেন। 'আমি শওকত আলি খান, পিতা মরহুম রহমত আলি খান, পৈত্রিক সূত্রে কলিকাতাস্থ টালিগঞ্জের ১৮/২ আমিনুল হক স্ট্রিট অবস্থিত তৃতল বসত গৃহ 'খান মঞ্জিল'... বিনামূল্যে দানপত্র করিয়া দিলাম...'[৯]

পাশাপাশি পাওয়ার অব এ্যাটর্নির মাধ্যমেও বিস্তর সম্পত্তি বিনিময় হয়েছিল। 'শতধারায় বয়ে যায়' উপন্যাসে নিত্য দাস নামে একজন দালাল জানায়— 'বিনয় সুধা আর সুনীতি তিন ভাই বোন স্ট্যাম্প পেপারে লিখে জমি বিক্রি বা হস্তান্তরের ক্ষমতা হেমনাথকে দেবে। নিত্যর লোক সেটা নিয়ে রাজদিয়ায় তার সঙ্গে দেখা করবে। কলকাতা থেকে পাকিস্তানে চলে যেতে চায় নিত্যর হাতে এমন বহু ক্রেতা আছে।'[১০]

সম্পত্তি বিনিময়ের সিংহভাগই হয়েছিল সীমান্তবর্তী অঞ্চলে। ২৪ পরগণা, নদিয়া, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর প্রভৃতি সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বেশিরভাগ জায়গায় হিন্দু-মুসলমানের মিশ্র বসবাস ছিল। দেশভাগ পরবর্তী সময়ে নিকটবর্তী অঞ্চলের মানুষ পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সম্পত্তি

বিনিময় করে দেশত্যাগ করেছে।[১১] জমির ভৌগোলিক অবস্থান, নির্দিষ্ট অঞ্চলের সামাজিক গঠন সম্পর্কে উভয়ের পূর্ববর্তী ধারণা থাকায় বিনিময়ের ক্ষেত্রে তা বিশেষ সহায়তা করেছিল। তবে সীমান্ত দূরবর্তী অঞ্চলেও কিছু কিছু বিনিময় হয়েছিল।

শহর কেন্দ্রিক এই বিনিময়ের সমর্থন মেলে 'শতধারায় বয়ে যায়' উপন্যাসে। শওকত আলি দ্বারিক দত্তকে জানায়— 'আমার চেনাজানা যারা কলকাতা থেকে পাকিস্তানে গেছে, তাদের বেশি উঠেছে ঢাকায়, কেউ কেউ নারায়ণগঞ্জে।'[১২] এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন, দক্ষিণ নিম্নবঙ্গভূমি যথা ফরিদপুর, বরিশাল অঞ্চলে বিনিময় প্রথা বিশেষ কার্যকর হয়নি; কারণ পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জলাভূমিতে বসবাসের অভ্যেস ছিল না।[১৩]

অভিজিৎ সেনের 'স্বপ্ন ও অন্যান্য নীলিমা' উপন্যাসে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বিনিময় প্রসঙ্গটি উঠে এসেছে— 'তৈমুর যার সঙ্গে বদল করেছে, শিশিরবাবুর পিসতুতো ভাই, কিন্তু সরোজদের এমন সৌভাগ্য হয়নি। প্রায় এক বস্ত্রেই চলে আসা। আর সেই সুদূর দক্ষিণে যাওয়ার মতো গরিব মুসলমানও পাওয়া যায়নি। কার্যত বিনিময় সম্ভব হয়েছিল সীমান্তের কাছাকাছি জেলাগুলিতে।'[১৪]

বাস্তবে বিনিময়ের ক্ষেত্রে ঘটেছিল নানা প্রবঞ্চনা। ভুয়ো কাগজপত্র দেখিয়ে অনেকেই সম্পত্তি আদান-প্রদান করেছিল, এ নিদর্শন পাই 'স্বপ্ন ও অন্যান্য নীলিমা' উপন্যাসে। চিঙ্গিস-য়ের কথায় পাই— শিশিরবাবুরা বিনিময়ে বারো বিঘা জমি কম দিয়েছিল। মিথ্যা কথা বলেছিল। তাছাড়া এই বাড়ির বদলে যে বাড়ি আমরা পেয়েছিলাম সেটাকে বাড়ি না বলে, গোয়ালঘর বলাই ভাল। পাশাপাশি সুধীররঞ্জন হালদারের 'অরণ্যের অন্ধকারে' উপন্যাসে পাঁচু শেখ-য়ের সঙ্গে সুধাংশু মণ্ডলের যে সম্পত্তি বিনিময় হয়েছিল তা ছিল একেবারেই ভিত্তিহীন। জমি ইতিপূর্বেই অন্য একজনের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। উপন্যাসে সুধাংশু মণ্ডল বলে— 'শুমুন্দির পো রাম ঠগান ঠগাইছে। অতো খানিক জমির বদলা এক ফোটা জমি পাইলাম না এহোন যে কী করি। যে জমি দেহাই ছেলো তা তো আগেই বিক্রি কইরা দিছে কানাই ঘোষের কাছে। আমার দুই কুলই গেলো। এহোন যে কী করি।'[১৫]

সম্পত্তি বিনিময়কে কেন্দ্র করে তখন এক শ্রেণির দালাল সৃষ্টি হয়েছিল যারা বিনিময়কারীদের মধ্যে যোগাযোগ করিয়ে দিয়ে অল্প দিনের মধ্যে ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। 'কেয়াপাতার নৌকো'য় এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে— 'ইণ্ডিয়া এবং পাকিস্তান দুই দেশেই বিরাট করে জাল বিছিয়েছে নিপুণভাবে। এপারে ওপারে বিনিময় করে টাকা লুটছে।'[১৬] তারা উভয়পক্ষ থেকে পারিতোষিক পেতো। 'কেয়া

পাতার নৌকো'-য় হিরণদের রাজদিয়ার জমি বাড়ি এক্সচেঞ্জের পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়ে যাবার দু'দিন বাদে নিত্যদাস নামে এক দালাল এসে হাজির হয়েছে। নিজের ব্যবসা সম্পর্কে সে বলেছে— 'মাগো সম্পত্তি এচ্চেঞ্জ করি হেরা দুই পক্ষই আমারে কিছু কিছু দ্যায়।'[১৭] অনুযোগের সুরে সে হিরণকে বলেছে— 'এই যে দ্যাশের বাড়ি জমির এচ্চেঞ্জ করলেন হেই খবরটা একবার আমাকে জানাইলেন না?... কিন্তু আমি আপনাগো দ্যাশের লোক। আপনি তো জানেন আমি হিন্দুস্থান-পাকিস্তান সম্পত্তি এচ্চেঞ্জের কারবার করি।'[১৮]

সম্পত্তি বিনিময় করে যে মানুষগুলি দেশত্যাগ করেছে তারা তাদের দীর্ঘদিনের লালিত সংস্কার মুছে ফেলতে পারেনি। 'গঙ্গা খোঁজে ভগীরথ' উপন্যাসে সেই সংস্কারের কথা উঠে এসেছে— 'দুদুমিয়ার মেজো ছেলে ঢাকার বাসিন্দা। তার মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী একটি সম্পন্ন হিন্দু কৃষক পরিবারের সঙ্গে কথাবার্তা চলছিল অনেকদিন ধরেই। সম্প্রতি চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করেছে আলোচনাটি। ফলে, অবিলম্বে এদেশ থেকে দুদুমিয়ার ওদেশে চলে যাওয়া এবং ওদেশের হিন্দু পরিবারটির আগমন ঘটল এদেশে। আশপাশের মুসলিম গ্রামগুলো থেকেও এরকম বিনিময় ঘটল আরও কয়েকটি।

'এই বিনিময়ের মাধ্যমে ঘর-বাড়ি জমি-জায়গা হয়তো হাত বদল হয়, কিন্তু দীর্ঘ বসবাসে এক একটা বাড়িকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক ও সংস্কারের যে ভিত তৈরি হয় তার রূপান্তর ঘটানো যায় কতখানি। একটা হিন্দু বাড়িতে গৃহস্থালির নানা উপাদানে, জীবনযাত্রার পরবর্তী পদক্ষেপে, নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে তৈরি হয় একটি বিশিষ্টতা, স্বাতন্ত্র্য। সেই একই ব্যাপার ঘটে একটি মুসলিম পরিবারের বাসগৃহে, এর কী কোনো বিনিময় ঘটানো সম্ভব?'[১৯] 'শতধারায় বয়ে যায়' উপন্যাসে এই সংস্কার আরও প্রকট আকারে ফুটে উঠেছে খান মঞ্জিলকে কেন্দ্র করে। দ্বারিক দত্ত তার স্ত্রীর সংস্কারের কথা মাথায় রেখে রান্নাঘর ভেঙে নতুন করে তৈরি করতে চেয়েছেন; মুসলমানের ব্যবহার করা আসবাব ব্যবহার করতে চায়নি বলেই হিরণ বলেছে— 'শওকত সাহেবকে তাঁর খাটটাট নিয়ে যেতে বলব।' দ্বারিক দত্ত কিছুদিন আগেও মুসলমানের সঙ্গে প্রপার্টি এক্সচেঞ্জ করতে চাননি। লেখকের কথায়— 'অন্ধ সংস্কার তার রক্তে ডালপালা ছড়িয়ে রেখেছে কত কাল ধরে।'[২০]

শচীন দাশের 'মানচিত্র বদলে যায়' উপন্যাসে দুটি পরিবারের সম্পত্তি বিনিময়ের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। দক্ষিণ কলিকাতার এক জবরদখল কলোনির নেতা মহীকান্ত গুপ্তর পূর্ববঙ্গের প্রতিবেশী ললিত বাবুর পরিবার সম্পত্তি বিনিময় করে এপার বাংলায় চলে আসেন। তাদের মাদারিপুরের সম্পত্তির

সঙ্গে পার্কসার্কাসের কামরুদ্দিন আমেদের সম্পত্তির বিনিময় হয়। স্বাধীনতার কেবলই পরে এই বিনিময় কার্য সম্পাদিত হয়। ফলে ললিতবাবুরা কলকাতায় বসবাসের মতন বিশাল বাড়ির মালিক হন। পাশাপাশি পূর্ববঙ্গ থেকে নিয়ে আসা নগদ অর্থ-কড়ি ললিতবাবুদের সমৃদ্ধি এনে দেয়। স্বাধীনতার আগে থেকেই কলকাতার সঙ্গে তাদের পরিবারের যোগাযোগ। ফলে তাদের এখানে এসে বসবাস করতে কোনও অসুবিধা হয়নি। প্রায় এক বস্ত্রে মহীকান্তের পরিবার দেশত্যাগ করে দক্ষিণ কলকাতার একটি জবরদখল কলোনিতে এসে ঘর বাঁধে। জীবিকার সন্ধানে তিনি যখন কলকাতার রাস্তায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তখন ললিতই মহীকান্তকে সরকারের সেচ দপ্তরে চাকরিতে ঢুকিয়ে দেয়। বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করি এই বিনিময়কারী উদ্বাস্তুরা অর্থনৈতিকভাবে যেমন সমৃদ্ধ ছিল তেমনি সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে তারা অনেক এগিয়ে ছিল।

মহীকান্তর ভাই নিশিকান্তর খুড়শ্বশুরের বিনিময়ের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসে। দীর্ঘদিন পরে মহীকান্তর সঙ্গে তার ভাইয়ের শ্বশুরের দেখা হলে তিনি জানান 'সাতচল্লিশের দেশভাগের পরপরই ইণ্ডিয়ায় এক মুসলমান পরিবারের সঙ্গে তাদের বাড়ির একচেঞ্জের প্রস্তাব আসে। প্রস্তাবটা আসার সঙ্গে সঙ্গে তারা সেটা লুফে নেয়।' কেননা তাদের মনে হয়েছিল ভালোয় ভালোয় চলে যেতে পারলেই তাদের ইজ্জত বাঁচবে। এই চলে আসার ক্ষেত্রে বিনিময়ই সবচেয়ে ভালো উপায়। তিনি এখানে এসে সচ্ছল জীবনযাপন করছেন একথা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে মহীকান্তর মত সম্ভ্রান্ত মানুষেরা কলোনিতে বসবাসের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

পছন্দ এবং প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে বিনিময়ের হার নির্ধারিত হয়েছে। স্থাবর সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করতে গিয়ে অনেক সময় অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। সাধারণ বিঘা প্রতিবিঘা, অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের এক বিঘা জমির বিনিময়ে পশ্চিমবঙ্গের এক বিঘা জমি— এই অনুপাতে বিনিময় হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন পূর্ববঙ্গের যে কোনও অঞ্চলের জমি বিঘার মাপে অনেক বড় ছিল। বিনিময়ের প্রচলিত এই অনুপাত ছিল কেবলমাত্র গ্রামাঞ্চলে, শহরাঞ্চলে বিনিময়ের হার ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। জমির অবস্থান, বাড়ি ঘরের অবস্থা, দোকান থাকলে তার মূল্য, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সুনাম ইত্যাদির উপর নির্ভর করে সম্পত্তির দাম নির্ধারিত হয়েছিল।

যে অঞ্চলে সম্পত্তি বিনিময় হয়েছে, সেই অঞ্চলের মোড়ল শ্রেণির কাউকে সামনে রেখে বিনিময়ের যাবতীয় কাজ করেছে যাতে কোনও সমস্যার সৃষ্টি না হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সাদা

কাগজে সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ, বিনিময়ের শর্ত লিখে রাখা হতো। অনেকটা বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে সম্পন্ন হতো এই কাজ। অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বাসভঙ্গও হয়েছে।[২১] সুধীররঞ্জন হালদারের 'অরণ্যের অন্ধকারে' উপন্যাসে, নিকুঞ্জবিহারি রায়ের 'শেষ পর্যন্ত' উপন্যাসে এ চিত্র আনা হয়েছে।

বিনিময় কার্য যেহেতু ব্যক্তিগত উদ্যোগে গৃহীত হয়েছিল তাই এই বিনিময়কারীর সংখ্যা ও বিনিময়কৃত সম্পত্তির পরিমাণ সম্পর্কে সরকারি হিসাব পাওয়া যায় না। তাই এ সম্পর্কে বিনিময়কারীদের দেওয়া মৌখিক তথ্যের উপরেই বেশি নির্ভর করতে হয়েছে। তবে মোটামুটি যে হিসেব পাওয়া যায় তাতে দেখা গিয়েছে শতকরা ৮৫ ভাগের মতো বিনিময়কারী অর্থনৈতিকভাবে সম্পন্ন;[২২] তাই তাদের ক্যাম্প কলোনিতে বাস করতে হয়নি। উভয়বঙ্গের বিনিময়কারীরা চাষযোগ্য জমি, হালের বলদ, পোষা গরু-ছাগল, পুকুর-বাগান, গাছ-গাছালি পেয়েছে তাই তারা ছিল অনেকটাই নিরাপদ। নতুন জল-হাওয়া, নতুন সামাজিক পরিবেশ, পরিবার পরিজন ও প্রতিবেশীর কাছ থেকে আলাদা থাকা, সর্বোপরি দেশছাড়ার হাহাকার ছিল এই শ্রেণির উদ্বাস্তুদের মধ্যে। কিন্তু ঘরে বাইরে তাদের সে অর্থে জীবন সংগ্রাম ছিল না, তাই হয়তো ঔপন্যাসিকের মনে বিষয়টি গভীরভাবে নাড়া দেয়নি। ফলে উপন্যাসে তার প্রভাব পড়েনি; যতটুকু পড়েছিল তার গভীরতাও কম।

গ্রন্থপঞ্জী

১. বরুন বালা, 'বাংলা উদ্বাস্তু সমস্যা', সজল বসু (সম্পা.), *উদ্বর্তন*, ২য় বর্ষ, মার্চ, ২০১১, নতুন কলোনি, নদিয়া

২. আব্দুল রহিম, *আমার দেখা পূর্ববাংলার সেকাল একাল*, বকতিয়ার প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ২৮

৩. আব্দুল রহিম, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৪২

৪. মহীতোষ বিশ্বাস, *পরতাল*, একবিংশ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ২১৮

৫. শচীন দাশ, *উদ্বাস্তু নগরীর চাঁদ*, দে'জ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৮৪

৬. প্রফুল্ল রায়, *শতধারায় বয়ে যায়*, করুণা, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৯৩

৭. অমলেন্দু দে, *প্রসঙ্গ : অনুপ্রবেশ*, বর্ণপরিচয়, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৪

৮. অমলেন্দু দে, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৫

৯. প্রফুল্ল রায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১১৩

১০. প্রফুল্ল রায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১২৩

১১. সাক্ষাৎকার : কেশবলাল বিশ্বাস, গ্রাম : রামশঙ্করপুর, পোঃ রামশঙ্করপুর, থানা : গোপালনগর, উত্তর ২৪ পরগণা, পেশা : শিক্ষকতা (অবসর প্রাপ্ত)। পূর্ব নিবাস— গ্রাম ও পোঃ দ্বিগঙ্গা, থানা : মোল্লারহাট, জেলা: খুলনা, সাক্ষাৎকার : ২৪.০৫.২০১২।

১২. প্রফুল্ল রায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১১৬

১৩. সাক্ষাৎকার : কালিপদ সরকার, গ্রামঃ শিবপুর, পোঃ বল্লভপুর, থানাঃ বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা, পেশা: কৃষিকাজ। পূর্ব নিবাস- গ্রাম: মাগুরা,পোঃ দিলপাশা, থানা : ফরিদপুর,জেলাঃ পাবনা, সাক্ষাৎকার: ২২.০৫.২০১২

১৪. অভিজিৎ সেন, *স্বপ্ন ও অন্যান্য নীলিমা*, দে'জ প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৮০

১৫. সুধীররঞ্জন হালদার, *অরণ্যের অন্ধকারে*, অদলবদল, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, পৃ. ৩৪

১৬. প্রফুল্ল রায়, *কেয়াপাতার নৌকো*, করুণা, অখণ্ড সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৫৬৪

১৭. প্রফুল্ল রায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৫৬৪

১৮. প্রফুল্ল রায়, *শতধারায় বয়ে যায়*, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১২০

১৯. মহীতোষ বিশ্বাস, *গঙ্গা খোঁজে ভগীরথ*, গ্রন্থতীর্থ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৭২

২০. প্রফুল্ল রায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১১৬

২১. গৌতম রায়, '*সংগঠনের অভিমুখ*', *পশ্চিমবঙ্গ ত্রাণ ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কর্মচারী সমিতির মুখপত্র*, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ২০

২২. সাক্ষাৎকার : কালিপদ সরকার, গ্রাম : শিবপুর, পোঃ বল্লভপুর, থানা : বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা, পেশা : কৃষিকাজ। পূর্ব নিবাস— গ্রাম : মাগুরা, পোঃ দিলপাশা, থানা : ফরিদপুর, জেলা : পাবনা, সাক্ষাৎকার: ২২.০৫.২০১২

উপসংহার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বাঙালি জীবনের সবচেয়ে আলোড়িত ঘটনা অবশ্যই দেশবিভাজন এবং দেশান্তর। দেশভাগ আর তজ্জনিত দাঙ্গা বাঙালির শিকড় ধরে টান মেরেছিল। ফলে তার আর্থসামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ভিত নড়বড়ে হয়ে যায়। সে কারণেই বাঙালির আবহমান কাল ধরে চলে আসা সভ্যতার সঙ্গে দেশ বিভাগ পরবর্তীকালের ইতিহাসের বেশ কিছু মৌলিক বিভেদ চোখে পড়ে। গোটা বাংলার সবশ্রেণির, সব ধর্মের, সব বয়সের মানুষের চালচিত্রটাই বদলে দেয় এই ভাগাভাগি। আজন্মলালিত একটি ভূখণ্ড ছেড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ চলে গেল অন্য একটি ভূখণ্ডে। দুটো ভূমিই ছিল তার স্বদেশ। একদিন আকস্মিকভাবে সে জানতে পারল যে ভূমিতে দাঁড়িয়ে তার পূর্বপুরুষেরা স্বপ্ন দেখতেন, নীল আকাশের নিচে অনন্ত বিস্তারিত মাটি ছিল যাদের সাধের আসন, ঘাসে ঘাসে পা ফেলে বনের পথে পথে যেতে যেতে তাঁরা হারিয়ে যেতেন— সেই মাটিতে তাদের ঠাঁই নেই। যার বাল্য কৈশোর যৌবন কিংবা বার্ধক্য কেটেছে সেই আলো-হাওয়া-রৌদ্রে; সেই হাওয়া-জল-ফল-তৃণ-মাটি আজ আর তার নয়— বিদেশ, চেনা পড়শি হয়ে গেল অচেনা। তখন সে পায়ে পায়ে অন্য ভূমির দিকে পা বাড়াল এক চরম অনিশ্চয়তাকে সম্বল করে।

জাতি এবং ধর্মগত বিভাজন ভারতবর্ষে নতুন নয়। তবু তার মধ্যেও হিন্দু-মুসলমানেরা পাশাপাশি সমাজ স্বতন্ত্র পরিচয়, আত্ম মর্যাদা এবং অধিকার আদায়ের প্রশ্নে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করতে চেষ্টা করে। এর পাশাপাশি একদিকে মুসলিম লিগের উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রচার অন্য দিকে হিন্দু মহাসভার হিন্দুত্ববাদের জিগির উভয় সম্প্রদায়ের সম্পর্ককে বিষিয়ে দেয়। তার ফলে কলকাতা-নোয়াখালি-বিহার সহ ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে ঘটে চলে ভয়াবহ দাঙ্গা। তখন থেকে অগণিত মানুষের দেশান্তর শুরু হয়। পূর্ববঙ্গে যায় মুসলমানেরা, আর সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আসে হিন্দুরা।

বিভাগ পরবর্তী ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা থেমে গেলেও পূর্ববঙ্গে নানা ইস্যুতে সংখ্যালঘু বিতাড়ন চলতেই থাকে। লক্ষণীয় ১৯৪৬ সালে নোয়াখালির দাঙ্গার পর থেকে ধাপে ধাপে উদ্বাস্তুদের যে আগমন ঘটে চলে, এখনও তা বন্ধ হয়নি। এরফলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি, অর্থনীতি, ভাষা, শিল্প-সংস্কৃতি, সমাজ মনন সর্বোপরি বাংলা উপন্যাসে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে।

ছিন্নমূল মানুষের জীবন এবং জীবন সংগ্রাম, মানসিক অবক্ষয়, গ্লানি, অনিবার্য পদস্খলন এ সবের

মিলিত জীবন্ত দলিল উদ্বাস্তু জীবনাশ্রিত বাংলা উপন্যাস। জাতীয় নেতাদের ভুল পদক্ষেপের উপর ভর করে অখণ্ড ভারতবর্ষের সমাধি নির্মিত হয়েছে। আর সেই সমাধিতে সমাহিত করা হয়েছে পাঞ্জাব ও বাংলার আত্মাকে। এর ফলে অগণন মানুষের জীবন-খাত নতুন ধারায় বইতে শুরু করে। জাতীয় রাজনীতির সেই অন্ধকার অধ্যায়কে সামনে রেখে দেশান্তরী মানুষের জীবনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সচেতন প্রয়াস উদ্বাস্তু-জীবনাশ্রিত বাংলা উপন্যাস। মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির ইচ্ছাপূরণের চেষ্টা দেশবিভাগের কারণ, উদ্বাস্তু সমস্যা তার ফলাফল মাত্র। উপন্যাসগুলি সেই কলঙ্কজনক অধ্যায়ের অভিশপ্ত দলিল।

একটি স্থিতিশীল নিশ্চিত আশ্রয় থেকে নিরাশ্রয় নিরাবলম্ব হয়ে এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জীবন কীভাবে অনিশ্চিত ও অসুস্থ হয়ে উঠল, মানবিক সম্পর্কের খোল-নলচে বদলে গেল, পাশাপাশি বেঁচে থাকার মরিয়া প্রয়াসে নতুন করে জেগে উঠল— এই ঐতিহাসিক সত্যের পরিচয় মেলে বাংলা উপন্যাসে। উপন্যাসগুলি উদ্বাস্তু জীবনের বাস্তব সম্মত দলিল হিসেবেও মূল্যবান। এক বিশেষ সময়ে ইতিহাসের রথের চাকায় পিষ্ট অসংখ্য মানুষের আর্তনাদ শুনতে পাওয়া যায় উপন্যাসগুলিতে। কোন অনিবার্য কারণে মানুষের এই বাস্তুচ্যুতি, কী ভয়ঙ্কর প্রতিকূলতা নিয়ে মানুষের দেশত্যাগ এসব চিত্র উঠে এসেছে উপন্যাসের কাহিনিতে। পাশাপাশি উদ্বাস্তুদের প্ল্যাটফর্মে, সরকারি আশ্রয় শিবিরে, নির্জন দ্বীপে অথবা গহন অরণ্যে যাযাবরের মত ঘুরে বেড়ানো, সবশেষে বিরূপ পরিস্থিতির কাছে আত্মসমর্পণ অথবা প্রতিবাদে ভাস্বর হয়ে ওঠা উপন্যাসগুলির মূল কথা। সামগ্রিকভাবে উপন্যাসগুলি স্বভূমি ও স্বজন হারানো মানুষের জীবন চিত্রণে ঋদ্ধ।

দেশবিভাগের বলি রাশি রাশি উন্মূল জীবন, তাড়িত, প্রতারিত মানবাত্মা, মাটির শিকড় যাদের ছিঁড়ে গেছে, বাস্তবিকভাবে যাদের সুস্থ পুনর্বাসন ঘটেনি; আশ্রয় জুটলেও স্থিতি আসেনি জীবনে, মানবিক বোধ ধ্বংস হয়ে গেছে অথবা সৃষ্টিই হয়নি, তাদের জীবন সত্য উদ্ভাসিত উপন্যাসে। উপন্যাসগুলি বাস্তুহারাদের জীবন সম্পর্কে কোনও মিথ্যা ধারণা তৈরি করেনি, বরং গৃহহারা মানুষের উলঙ্গ জীবনচর্যা নগ্নভাবে প্রকাশ করেছে। এরা সমাজ-সংসার, স্বদেশ-স্বজন এবং গৃহহারা মানুষের দল। এরা উদ্বাস্তু। এদের জীবন বড়ই অদ্ভুত। কোনও উচ্চাশা নেই, স্বপ্ন নেই, উদ্দেশ্য নেই এদের জীবনে— বেঁচে থাকাই একমাত্র উদ্দেশ্য। যে কোনও ভাবে বেঁচে থাকা। কখনও সরকারি ডোলের সাহায্যে, কখনও ভিক্ষাবৃত্তি করে, কখনও বেআইনি ব্যবসা, চুরি-ডাকাতি করে কিংবা শরীরকে পণ্য করে যারা বাঁচার পথ খুঁজেছে, তারাই উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী। এই বিচিত্র বৃত্তিধারী মানুষকে অবলম্বন

করে বাংলা উপন্যাসের নির্মম নিরাবরণ রূপটি ব্যক্ত হয়েছে। এই অর্থে ঔপন্যাসিকগণ বাস্তববাদী।

বহুবিচিত্র ঘটনা ও চরিত্র উপন্যাসের অবলম্বন। সেই সঙ্গে রয়েছে স্মৃতি কাতরতা। পূর্ববঙ্গের ফেলে আসা জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা— জ্বলন্ত ঘর-বাড়ি, প্রতিবেশীর হিংস্র হয়ে ওঠা, সম্পত্তি দখল, জীবননাশের হুমকি, নারী-ধর্ষণের স্মৃতি যেমন উঠে এসেছে, তেমনি পূর্ববঙ্গের গাছপালা, নদ-নদী, শান্ত গাছপালা, জলাভূমি সর্বোপরি হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সহাবস্থান ও সুমধুর সম্পর্কের বর্ণনা পাওয়া যায় অধিকাংশ চরিত্রের মুখে। অতীতের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে তাদের বারবার মনে হয়েছে— এখানে চেনা পড়শি নেই পরিচিত সমাজ নেই, মন খুলে কথা বলবার লোক নেই। স্মৃতির ভারে আক্রান্ত হয়ে তারা দেশে ফিরতে চেয়েছে। উপন্যাসের কাহিনিতে দেখা গিয়েছে পালা-পার্বণ, উৎসব-অনুষ্ঠানে কেউ কেউ সেখানে ফিরে গিয়েছে। ফেরার সময় তারা সঙ্গে নিয়ে এসেছে গাছের ফল-মূল কিংবা জন্ম-ভিটের একমুঠো মাটি। সেই ফল, সেই মাটির দিকে তাকিয়ে তারা আবেগে আপ্লুত হয়েছে।

পূর্ববঙ্গের অতুলনীয় সৌন্দর্য দিগন্ত বিস্তৃত প্রকৃতি, সবুজের সমারোহ, নদীর ঢেউ, পালতোলা নৌকো, খালে-বিলে ফুটে থাকা শাপলা-পদ্ম, সোনালি ধানের গুচ্ছ সর্বোপরি সহজ-সরল হৃদয়ের অনাবৃত রূপ— সে এক আশ্চর্য সৌন্দর্যের দেশ! সেই দেশের কথা, তার উৎসব-অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি, রীতি-প্রথা, সংস্কার-বিশ্বাস, ভাষারীতি সবকিছুই ধরা পড়েছে ঔপন্যাসিকের সন্ধানী দৃষ্টিতে।

আলোচ্য উপন্যাসগুলিতে উদ্বাস্তুদের দ্রুত বদলে যাবার কথা যেমন উপস্থাপিত হয়েছে তেমনি তারা পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদেরও যে বদলে দিয়েছে তার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। পূর্ববঙ্গে বংশ পরম্পরায় যে পেশাকে অবলম্বন করে তাদের জীবন-যাপন ছিল, এখানে এসে তা রক্ষিত হয়নি। কারণ বাঁচার তাগিদে যে কোনও জীবিকাকে তাদের গ্রহণ করতে হয়েছে। পূর্ববঙ্গে জাত অনুযায়ী মানুষের যে পাড়া ছিল, বাস্তুচ্যুত হবার পর তারা সেভাবে বসতি গড়তে পারেনি। উদ্বাস্তু ক্যাম্পে সরকার যেমন বর্ণ বিভাগ না করেই আশ্রয় দিয়েছে, তেমনি জবরদখল কলোনিতেও পারস্পরিক প্রয়োজনে পাশাপাশি বসতি গড়েছে। কর্মক্ষেত্রে নানা সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে মেলামেশার ফলে খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, রুচি-পছন্দ, বিশ্বাসবোধ মূল্যবোধের বদল ঘটেছে। পূর্ববঙ্গের লোকসংস্কৃতি ভুলে ক্রমে তারা নগর সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। সেখানকার আঞ্চলিক ভাষার পরিবর্তে কলকাতার কথ্য ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠা, পাশাপাশি হিন্দীভাষাকে রপ্ত করার চিত্র পাওয়া যায় উপন্যাসের কাহিনিতে।

ব্যস্ত জীবন-যাপনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে শুরু করে তারা। চারপাশের জগৎকে দেখে নিজেকে নতুনভাবে চিনতে শুরু করে এবং অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে মানুষ। শিক্ষার প্রতি তাদের ঝোঁক বাড়ে। প্রতিটি উদ্বাস্তু উপনিবেশে বিদ্যালয় স্থাপন নিম্নবর্গীয়দের সচেতনতা, শিক্ষার অগ্রগতি এবং তাদের সংঘবদ্ধতার ছবি পাওয়া যায় উপন্যাসগুলিতে।

দেশভাগের সংকটের আবর্তে নারীই ছিল সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত; দেশান্তরের অন্যতম প্রধান কারণও ছিল নারীর সম্ভ্রম রক্ষা। নারীর শরীর মনের উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে, দেশান্তরের পর তা মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি— সারা জীবন সেই যন্ত্রণা বয়ে চলেছে। আবার সংকট কাটিয়ে উঠে নিজেকে নতুন করে গড়ে তোলার কথা বাংলা উপন্যাসে এভাবে ব্যক্ত হয়েছে—

i) ধর্ষিতা নারীকে পরিবারের লোকজন ঠাঁই দিতে চায়নি, তার প্রতি অসম্মান ও অবজ্ঞা নতুন সামাজিক সংকট তৈরি করেছে। ধর্ষণজাত সন্তানকে সরকারি-বেসরকারি হোমে ঠাঁই দেওয়া হয়েছে, যা নারী মনের সংকটকে প্রবল করে তুলেছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অতীতের কলঙ্ক ঢাকতে মিথ্যে গল্প বলতে হয়েছে অন্যদের কাছে;

ii) পূর্ববঙ্গে যে নারীর স্থান ছিল অন্তঃপুর, সে বাইরের জগতে বেরিয়ে এল, ফলে নারী-পুরুষের ব্যবধান ক্রমে ঘুচে যেতে লাগল। অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে প্রয়োজনভিত্তিক মেলামেশার ফলে নারীর সংস্কার মুছে গিয়ে এতদিনের আবছায়া ধারণাগুলি ক্রমে স্পষ্ট হতে লাগল;

iii) এতদিন নারী ছিল মূলত গৃহবধূ, বাইরে বেরিয়ে কাজে যাওয়া বিশেষ চোখে পড়েনি। যারা বেরিয়েছে তাদের কাজের জগৎ ছিল নির্দিষ্ট কতকগুলি পেশার মধ্যে সীমাবদ্ধ; উদ্বাস্তু নারী সেই পেশার গণ্ডি ভেঙে দ্রুত বাইরে বেরিয়ে এল;

iii) যে সময় থেকে সে অর্থ উপার্জন করতে শুরু করল, তখন থেকে সংসারে তার গুরুত্ব বাড়ল, তার মতামত পরিবারের অন্য সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠল;

iv) ঘরদোর, স্বামী-সন্তান সামলে রোজগারের জন্য বাইরে কাজে যাবার তাড়নায় সে প্রচণ্ড কর্মব্যস্ত হয়ে উঠল;

v) চিরাচরিত বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে সমাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে তার বিশেষ ভূমিকা তৈরি হল। কলোনি রক্ষার সংগ্রামে, অন্যায়ের প্রতিবাদে, রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের চিত্র উঠে এল।

vii) মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে অন্যায়ের সঙ্গে আপসের চিত্র উপন্যাসে বিরল নয়;

দেশভাগ ও দেশত্যাগের ঘূর্ণাবর্তে-পড়া মেয়েদের কথা বাংলা উপন্যাসে অনেকটাই ব্যক্ত হয়েছে, পাশাপাশি বলাও হয়নি অনেকখানি। নারীর লাঞ্ছনার কথা উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু সংঘবদ্ধ অথবা এককভাবে নারী-ধর্ষণ এবং ধর্ষণের ফলে তার শরীরের মধ্যে যে সন্তান বেড়ে উঠেছে, অবাঞ্ছিত সন্তানকে কী দৃষ্টিতে দেখেছিল, আবার উদ্ধার করা মেয়েদের যখন গর্ভমোচন করা হয়েছিল পারিবারিক ও সাম্প্রদায়িক শুচিতার দায়ে, তখন কেমন ছিল সেইসব মেয়েদের অনুভূতি, লাঞ্ছনার মুহূর্তে কী ভেবেছিল মেয়েরা, এই লাঞ্ছনার চিহ্ন নিয়ে কেমন করে বেঁচে ছিল স্বাধীনতা উত্তরকালের উদ্বাস্তু নারী, তা অনুক্ত থেকে গিয়েছে বাংলা উপন্যাসে।

পূর্ববঙ্গের সাধারণ উদ্বাস্তুর ঠাঁই হয় সরকারি ক্যাম্পে। বাকিরা নিজেদের উদ্যোগে বাসস্থান গড়ে। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী নানাধরনের ক্যাম্প তৈরি হয়। সেই ক্যাম্পে পেশা, অর্থনৈতিক কাঠামো, সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা বিবেচনা করে উদ্বাস্তুদের ঠাঁই দেওয়া হয়েছিল। সাধারণভাবে সরকারের উদ্যোগে তৈরি পাঁচ ধরনের বাসস্থানের সন্ধান মেলে—

— ট্রানজিট ক্যাম্প;

— পি.এল.ক্যাম্প;

— উইমেন্স ক্যাম্প;

— ওয়ার্কসাইট ক্যাম্প;

— স্থায়ী পুনর্বাসন ক্যাম্প-কলোনি;

ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে যে স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে সরকার, তার মধ্যে ছিল-কৃষকদের জন্য কৃষি জমি ও বাসস্থান সম্বলিত কৃষি কলোনি, মৎস্যজীবীদের জন্য নদী সংলগ্ন অঞ্চলে মৎস্যজীবী কলোনি, পানচাষের উপযুক্ত জমিতে বারুজীবী কলোনি। তাঁতি সম্প্রদায়কে কলকাতার কাছাকাছি অঞ্চলে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল যাতে তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য সহজে বিক্রি করতে পারে। এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য, সরকার সকল প্রকার উদ্বাস্তুদের জন্য লোনের ব্যবস্থা করেছিল। সরকারের উদ্যোগের পাশাপাশি ক্যাম্পের বন্দিদশায় থাকতে না চাওয়া উদ্যমী উদ্বাস্তুরা অন্যের জমি দখল করে বাসস্থানের সমস্যা মেটায়।

প্রাথমিকভাবে শিয়ালদহ স্টেশনে আশ্রয় পাবার পর উদ্বাস্তুদের ছড়িয়ে দেওয়া হত বিভিন্ন ট্রানজিট ক্যাম্পে; কিংবা নিজেরাই নিজেদের বাসস্থান খুঁজে নিত। ক্যাম্প-কলোনিতে বসবাস রত উদ্বাস্তুদের দৈনন্দিন জীবনের চিত্র বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার অনুষঙ্গে গভীরভাবে চিত্রিত হয়েছে—.

i) সরকারি ক্যাম্পের নানা অব্যবস্থা ও সংকটের চিত্র বর্ণিত হয়েছে। ক্যাম্প-কলোনিগুলি ছিল মানুষের বসবাসের অনুপযোগী, তার মধ্যেও কীভাবে উদ্বাস্তুরা বেঁচে থাকল তার বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে;

ii) সরকারি অব্যবস্থা এবং তার বিরুদ্ধে উদ্বাস্তুদের ক্ষোভ-বিক্ষোভের বিবরণ যেমন আছে, তেমনি রয়েছে বিক্ষোভ রত উদ্বাস্তুদের দমন-পীড়নের চিত্র;

iii) আন্দামান ও দণ্ডকারণ্য— এই দুই বৃহৎ পুনর্বাসন কেন্দ্রে কীভাবে উদ্বাস্তুরা নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে, নতুন করে নিজেদের নির্মাণের গল্প বাস্তবতার আলোকে উপস্থাপিত হয়েছে।

iv) ক্যাম্প-কলোনিতে নিম্নবর্গীয়দের জীবনযন্ত্রণার ছবি এবং লড়াই-সংগ্রামে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ কাহিনির মধ্যে চোখে পড়ার মত;

v) ক্যাম্প-কলোনিতে নানা বঞ্চনার কথা উঠে এসেছে; সেই বঞ্চনা থেকে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ এবং সেখানকার কদর্য জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে;.

vi) ক্যাম্প-কলোনিবাসী বাঁচার তাগিদে অসামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, মূল্যবোধ হারানো মানুষগুলির অবক্ষয়ের কথা ঔপন্যাসিকেরা বর্ণনা করতে ভোলেন নি;

vii) জবরদখল কলোনিগুলি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, শেষপর্যন্ত উপনিবেশের বাসিন্দাদের স্থিতিশীল জীবনের বাস্তব ছবি ইতিহাসের অনুষঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে.

viii) উপন্যাসে ক্যাম্প-কলোনি জীবনে উদ্বাস্তুদের দুর্বিষহ জীবনের ছবি আঁকতে গিয়ে সরকারের অবাস্তব পরিকল্পনার কথা উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে অনেক পরিকল্পনাই উদ্বাস্তুদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে, তারা সুখী সমৃদ্ধ জীবন-যাপন করেছে; এই বিষয়টি উপন্যাসে উপেক্ষিত হয়েছে।

সাধারণভাবে এ অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায় দেশভাগের ও দেশত্যাগের ট্র্যাজিক বিষয় নিয়ে বাংলা ভাষায় বড় মাপের কোনও উপন্যাস লেখা হয়নি, লেখকেরা সমসাময়িক চাহিদা পূরণের দায়িত্ব পালন করেছেন। ফলে এই সব রচনায় প্রত্যক্ষ ঘটনার লেখচিত্র ছাড়া আর বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। যে ঐতিহাসিক শূন্যতা বাংলা সাহিত্যে আজও প্রকট হয়ে আছে তা হল বিভাগ পরবর্তীকালের কাহিনি। একটি রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনার পরিণামে সামাজিক মানুষের উৎপাটিত হওয়ার ইতিহাস গৃহচ্যুত হওয়ার যন্ত্রণা, চোখের সামনে প্রিয়জনকে নিহত হতে দেখার মানসিক আঘাত তেমনভাবে ধরা নেই।

মহৎ সৃষ্টির অনুপস্থিতির কারণ হিসাবে মনে করা হয়— লেখকেরা প্রধানত নিজ নিজ

সম্প্রদায়ের কথা লিখেছেন, তাই এ ক্ষেত্রে তারা সতর্ক থেকেছেন পাছে তাদের রচনা সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত হয়ে যায়। তাছাড়া রচনাগুলি কেবল গৃহচ্যুত মানুষের দুর্দশার কাহিনি নয়, রয়েছে হিংসার বিভৎসরূপ। লেখকেরা হিংসাকে সামনে আনতে চান নি। হিংসার বলি হওয়া মানুষ ও তাদের বিভৎস স্মৃতিকে ভুলতে চেয়েছেন। কারণ এই স্মৃতিকে মনে রাখলে জীবনটা জোড়া লাগিয়ে আবার নতুন করে শুরু করা যেত না।

এর মধ্যেও অনেকেই এই ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের স্বরূপ সন্ধান করতে চেয়েছেন দাঙ্গা, দেশভাগ, দেশত্যাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা ও হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতা এবং সম্প্রীতির আলোকে। আমাদের গবেষণায় তাদের রচনার সার্বিকরূপ যেভাবে বিধৃত হয়েছে—

১. দেশবিভাগের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের চরম অবনতি এবং তার ফলে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুর উপর সংখ্যাগুরুর সীমাহীন অত্যাচারের কাহিনি বিবৃত হয়েছে। কিন্তু পূর্ববঙ্গের সমৃদ্ধ হিন্দু সম্প্রদায় যে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা মুসলিম সমাজের উপর অসম্মান ও নির্যাতন চালিয়েছে তার বিবরণ অনুল্লিখিত থেকে গিয়েছে;

২. নিম্নবর্গীয় হিন্দুদের সঙ্গে সাধারণ মুসলিমদের দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক এবং উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি উচ্চবর্ণের হিন্দুদের নির্যাতনের ছবি দৃষ্টিগোচর হয় কোনও কোনও উপন্যাসে;.

৩. উপন্যাসগুলি গভীর জীবনবোধ, নান্দনিক সার্থকতার চেয়ে অধিকতর বক্তব্য প্রচারের বাহন হয়ে উঠেছে;ফলে তাৎক্ষণিক উত্তেজনা ও সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পারেনি;.

৪. দেশবিভাগ পরবর্তী সময়ে ছিন্নমূল মানুষের অবিরাম আগমনের ফলে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কায় পশ্চিমবঙ্গের জনমানসে ক্ষোভ ও অসহিষ্ণুতার চিত্র মূর্ত হয়েছে উপন্যাসে;.

৫. দেশহারা- আশ্রয়হারা প্রত্যাখ্যাত এই বিরাট জনগোষ্ঠীর বিপন্ন পদযাত্রার প্রতি অকৃত্রিম সমবেদনার করুণাঘন রূপ-চিত্র উপন্যাসগুলি;.

৬. সব উপন্যাসেই উদ্বাস্তু জীবনের সমস্যা ও সংকটের বিবরণ;.

৭. মূলত সরকারি শিবিরে আশ্রয়প্রাপ্ত উদ্বাস্তু, জবরদখল কলোনিবাসী এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে সম্পত্তি বিনিময়কারী উদ্বাস্তুদের কথা উঠে এসেছে উপন্যাসে। এছাড়াও বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু, যারা সরকারি সাহায্যের উপর নির্ভর না করে নিজের চেষ্টায় বেঁচে থেকেছে, তাদের জীবনের,

বিশেষ করে তাদের মানসিক সংকটের এবং জীবন-যাপনের গতি-প্রকৃতি একেবারেই অনুল্লিখিত থেকে গিয়েছে;

৮. অধিকাংশ উপন্যাসে ঐতিহাসিক চরিত্র তুলে আনা হয়েছে; এক্ষেত্রে দেশভাগের প্রেক্ষাপট ও নেতাদের দায় বিশ্লেষিত হয়েছে;

৯. লড়াই-আন্দোলনের বাস্তবচিত্র বর্ণিত হয়েছে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে সন-তারিখও নেতার নাম উল্লেখ করে কাহিনির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে;

১০. উপন্যাসের চিত্রগুলির মধ্যে নির্জন নৈরাশ্য, উদ্বাস্তুদের অস্তিত্ব সংকটের তমসাচ্ছন্ন স্বরূপ মূল প্রতিপাদ্য;

১১. দিগন্তজোড়া ভাঙনের মুখে জেগে উঠেছিল নতুন জীবনতট। প্রাথমিক পর্বের সংকট অতিক্রম করে নতুন করে নতুন জীবন প্রচ্ছদ নির্মাণের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে কতিপয় উপন্যাসে;

১২. নিম্নবর্গীয়দের ব্যথা-বেদনার কথা স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে কোনও কোনও উপন্যাসে। তাদের প্রতি সরকারের বঞ্চনা লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতায় প্রকাশিত হয়েছে;

১৩. বাংলা উপন্যাসে অনেক অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার হয়েছে, যেমন উদ্বাস্তু, ছিন্নমূল, বাস্তুহারা শরণার্থী, রিফিউজি, মোহাজের ইত্যাদি। কলোনি শব্দের অন্য অর্থ তৈরি হয়েছে; সামরিক জগতের ভাষা অবরূঢ় হয়েছে নাগরিক জীবনের উপর। ইংরেজি ক্যাশ, ডোল ইত্যাদি শব্দ নতুন মাত্রায় যুক্ত হয়েছে। মহাকাব্যের 'দণ্ডক অরণ্য', কালাপানির দেশ 'আন্দামান' পরিচিতি পেয়েছে অন্য আঙ্গিকে;

১৪. উদ্বাস্তু জীবনের অনুষঙ্গে যে বিষয়গুলি জড়িয়ে আছে তা সংশ্লিষ্ট মানুষের সুকুমার চৈতন্যকে ধ্বংস করে দেবার জন্য যথেষ্ট। উপন্যাসে তার অনিবার্য প্রতিফলন লক্ষিত হয়;

১৫. অধিকাংশ উপন্যাসের বর্ণনা ও কাহিনির বৈচিত্র্যহীনতা পাঠককে একঘেঁয়েমি মুক্ত করতে পারে না। মনে হয় যেগুলি একই ছাঁচে তৈরি, কেবল চরিত্রগুলির নামের বদল ঘটেছে;

১৬. আপনজনেরা দেশছাড়ার পরেও যারা ওপার বাংলায় থেকে গেলেন, সংখ্যালঘু হিসেবে তাদের জীবনযাপন, সামাজিক অবস্থান, অন্তরের শূন্যতার কথা উঠে আসেনি কোনও উপন্যাসে।

এসবই গবেষণায় আমাদের অন্বিষ্ট ছিল।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

১. অচ্যুত গোস্বামী, *কানাগলির কাহিনি*, র‍্যাডিক্যাল বুক, ১ম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৫৫

২. অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, *নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে*, করুণা, অখণ্ড সংস্করণ, কলকাতা, ২০০২

৩. অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, *মানুষের ঘরবাড়ি*, করুণা, ১ম সংস্করণ, কলকাতা, ২০০১

৪. অভিজিৎ সেন, *স্বপ্ন ও অন্যান্য নীলিমা*, দে'জ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০০

৫. অমিয়ভূষণ মজুমদার, *নির্বাস*, দে'জ, ১ম দে'জ সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৬

৬. কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর, *উজানতলীর উপকথা*, ১ম পর্ব, চতুর্থ দুনিয়া, ২য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৪১২ বঙ্গাব্দ

৭. কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর, *উজানতলীর উপকথা*, ২য় পর্ব, নিখিল ভারত, ১ম সংস্করণ, কলকাতা, ২০১১

৮. জ্যোতির্ময় মণ্ডল, *সুখচাঁদ*, ডানা, ২য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

৯. জ্যোতির্ময়ী দেবী, *এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা*, রূপা, ১ম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৬৮

১০. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিপাশা*, তারাশঙ্কর রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ষষ্ঠ সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮৬

১১. নকুল মল্লিক, *ক্ষমা নেই*, দলিত সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৮

১২. নরেন্দ্রনাথ মিত্র, *উপনগর*, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাস সমগ্র, ৩য় খণ্ড, আনন্দ, ১ম সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৮

১৩. নরেন্দ্রনাথ মিত্র, *দূরভাষিনী*, নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনা সমগ্র, আনন্দ, ১ম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮০

১৪. নরেন্দ্রনাথ মিত্র, *মহানগর*, নরেন্দ্রনাথ মিত্র উপন্যাস সমগ্র, ৩য় খণ্ড, আনন্দ, ১ম সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৮

১৫. নারায়ণ সান্যাল, *অরণদণ্ডক*, দে'জ, ৪র্থ সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৬

১৬. নারায়ণ সান্যাল, *বকুলতলা পি.এল.ক্যাম্প*, নাথ, ১ম সংস্করণ, ৩য় মুদ্রণ, কলকাতা, ১৯৯৭

১৭. নারায়ণ সান্যাল, *বল্মীক*, নাথ, ১ম নাথ প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৮৩

১৮. প্রফুল্ল রায়, *কেয়াপাতার নৌকো*, করুণা, ৩য় সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৭

১৯. প্রফুল্ল রায়, *নোনাজল মিঠে মাটি*, দে'জ, ৩য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮৯

২০. প্রফুল্ল রায়, *শতধারায় বয়ে যায়*, করুণা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৮

২১. প্রবোধকুমার সান্যাল, *হাসুবানু*, সাহিত্য সংস্থা, ১ম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮৭

২২. বনফুল, বনফুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, গ্রন্থালয়, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৯

২৩. বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ

২৪. মনোরঞ্জন ব্যাপারী, *চণ্ডাল জীবন*, প্রিয়শিল্প, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৯

২৫. মহীতোষ বিশ্বাস, *উচ্ছিন্ন পরবাস*, গ্রন্থতীর্থ, ১ম সংস্করণ, কলকাতা, ২০০১

২৬. মহীতোষ বিশ্বাস, *গঙ্গা খোঁজে ভগীরথ*, গ্রন্থতীর্থ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০১

২৭. মহীতোষ বিশ্বাস, *পরতাল*, একবিংশ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০১

২৮. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *সার্বজনীন*, মানিক গ্রন্থাবলী, নবম খণ্ড, গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৭৩

২৯. যতীন বালা, *শিকড় ছেঁড়া জীবন*, চতুর্থ দুনিয়া, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১০

৩০. রমেশচন্দ্র সেন, *পুব থেকে পশ্চিমে*, ভারতী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ

৩১. শঙ্খ ঘোষ, *সুপুরি বনের সারি*, অরুণা, প্রথম প্রকাশ ২য় মুদ্রণ, কলকাতা, ২০০৭

৩২. শচীন দাশ, *উদ্বাস্তু নগরীর চাঁদ*, দে'জ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৮

৩৩. শচীন দাস, *মানচিত্র বদলে যায়*, দে'জ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১৪

৩৪. শচীন দাশ, *লাশ ভাইস্যা যায়*, কৃতি, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১৪, বঙ্গাব্দ

৩৫. শক্তিপদ রাজগুরু, *মেঘে ঢাকা তারা*, দে'জ, ৩য় সংস্করণ, কলকাতা, ২০১২

৩৬. সদানন্দ পাল, *একা কুম্ভ*, একজন উদ্বাস্তু কুম্ভকারের মাটিমাখা আত্মকথা, ক্যাম্প, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৯

৩৭. সমরেশ বসু, *সুচাঁদের স্বদেশ যাত্রা*, আনন্দ, ১ম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮২

৩৮. সমীরণ পাল, *উজান গাঙের নাইয়া* , সন্তোষ পাল, প্রথম প্রকাশ, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা, ২০০৪

৩৯. সরোজকুমার রায়চৌধুরী, *মহাকাল*, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ

৪০. সুধীররঞ্জন হালদার, *অরণ্যের অন্ধকার*, অদলবদল, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৬

৪১. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *অর্জুন*, আনন্দ, ১ম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৭১

৪২. সুভাষচন্দ্র মৈত্র, *কুসুমের ঘর-সংসার*, বাতাবরণ, প্রথম প্রকাশ, বারাসত, ২০০০

৪৩. স্বপ্নময় চক্রবর্তী, *চতুষ্পাঠী*, দে'জ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৫

সহায়ক গ্রন্থ (বাংলা)

১. অক্ষয়কুমার বালা, *বাংলার লাঠিয়ালেরা*, জ্ঞান বিকাশ, প্রথম প্রকাশ, ফরিদপুর, বাংলাদেশ, ১৯৭৮

২. অর্জুন গোস্বামী (সম্পা.), *হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক, স্বপ্নপূরণ না স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস*; রক্তকরবী, কলকাতা, ২০০৪

৩. অধীর বিশ্বাস, *আল্লার জমিতে পা*, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১২

৪. অধীর বিশ্বাস, *উদ্বাস্তু পঞ্জিকা*, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১৪

৫. অধীর বিশ্বাস, *দেশভাগের স্মৃতি*

আমরা তো এখন ইণ্ডিয়ায়—১

পুণ্যগঙ্গার কাছাকাছি—২

ইলিশ মাছের নৌকো—৩

ভেসে যায় খড়কুটো— ৪

গাঙচিল, কলকাতা, ২০১০

৬. অনিলরঞ্জন হালদার, *ইতিহাসের অন্যপিঠ*, সুনীল বসু, প্রথম প্রকাশ, চাকদহ, নদিয়া, ২০০৯

৭. অনিল সিংহ, *পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু উপনিবেশ*, বুকক্লাব, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৫

৮. অনিল সিংহ, *পশ্চিমবাংলার জবরদখল উদ্বাস্তু উপনিবেশ*, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, কলকাতা, ১৯৯৭

৯. অর্পিতা বসু (সম্পা.), *উদ্বাস্তু আন্দোলন ও পুনর্বাসিত* (সাময়িকপত্র-পত্রিকায়), গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১৩

১০. অমলেন্দু দে, *দ্বিজাতি তত্ত্ব ও মুসলিম লিগ*, রত্না প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০২

১১. অমলেন্দু দে, *প্রসঙ্গ অনুপ্রবেশ*, বর্ণপরিচয়, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৪

১২. অমলেন্দু দে, *স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা : প্রয়াস ও পরিণতি*, রত্না প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৭

১৩. অমলেন্দু সেনগুপ্ত, *উত্তাল চল্লিশ ও অসমাপ্ত বিপ্লব*, পার্ল পাবলিশার্স, ১ম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮৯

১৪. অমলেন্দু সেনগুপ্ত, *জোয়ারভাটার ষাট-সত্তর*, পার্ল, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৭

১৫. অমলেশ ত্রিপাঠী, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭)*, আনন্দ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ।
১৬. অরবিন্দ পোদ্দার, *স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার শত্রুরা*, পুস্তক বিপণি, ১ম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৮
১৭. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের প্রতিমা*, দে'জ, পরিবর্ধিত ৩য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৯
১৮. অশ্রুকুমার সিকদার, *ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য*, দে'জ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৫
১৯. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, মর্ডান বুক, নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণ, পুণর্মুদ্রণ, কলকাতা, ২০১১
২০. অসিতবরণ ঠাকুর, *উদ্বাস্তু মুক্তি ও মুক্ত সমাজ*, মুক্ত সমাজ প্রকাশনী, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ২০১১
২১. আব্দুল রহিম, *আমার দেখা পূর্ববাংলার সেকাল একাল*, বকতিয়ার প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮৫
২২. আবু আল সাঈদ, *ফজুলর রহমান, অনুদার ইতিহাসের একদশক (১৯৩৭-৪৭)*, আগামী, ঢাকা ১৯৯৭
২৩. আবু মোঃ দেলোয়ার (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০০
২৪. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, আবুল মনসুর আহমদ রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ২০০১
২৫. আবুল হাশিম, *আমার জীবন ও পূর্ববংলা দেশের রাজনীতি*, নওরোজ কিতাবস্তান, ঢাকা, ১৯৫৭
২৬. আমিনুল ইসলাম, *সেইসব ইতিহাস*, পত্রলেখা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৬
২৭. আবেদ জামান, *বিশ শতকের ভারতীয় রাজনীতি*, রূপবাণী, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৮
২৮. আবেদ কামাল, *মোহাজের*, তথ্যপ্রকাশ, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ২০০০
২৯. আভা সিংহ, *অনিল সিংহ (১৯১৯-২০০৩)*, বুকক্লাব, কলকাতা, ২০০৩
৩০. আমিনুল ইসলাম, *সেইসব ইতিহাস*, পত্রলেখা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৬
৩১. ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, *কলোনির স্মৃতি : উদ্বাস্তু প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা*, ১ম খণ্ড, ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৭
৩২. উত্তম বিশ্বাস, *নিম্নবর্গ*, দলিত, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৮
৩৩. উৎপল বিশ্বাস, *নিম্নবর্গের দেশত্যাগ*, পুঁথি, ১ম সংস্করণ, গোপালগঞ্জ, বাংলাদেশ, ২০১০
৩৪. উদয়চাঁদ দাশ ও অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), *দেশ বিভাগ ও বাংলা উপন্যাস*, বর্ধমান

বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, বর্ধমান, ২০০৫

৩৫. এম.এ.রহিম, *মুসলমান সমাজের ইতিহাস*, আহামদ পাবলিশিং, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৫

৩৬. কাজী আবদুল ওদুদ, *হিন্দু মুসলমান বিরোধ*, বিশ্বভারতী, ১ম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, শান্তিনিকেতন, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ।

৩৭. কালীপদ বিশ্বাস, *যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায়*, নয়া উদ্যোগ, পরিমার্জিত সংস্করণ, কলকাতা, ২০১২

৩৮. কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, *শিকড়ের সন্ধানে*, ভাষা ও সাহিত্য; প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০২

৩৯. গোপালচন্দ্র মৌলিক, *দেশভাগ ও ননীপিসিমার কথা*, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১১

৪০. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *উপন্যাস : রবীন্দ্র চেতনার আলোকে পঞ্চাশৎ পরিক্রমা*, বিশ্বভারতী, বোলপুর, ১৯৯৩

৪১. গৌতম চট্টোপাধ্যায়, *ইতিহাস অনুসন্ধান*, ফার্মা.কে.এল.মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ২০০০

৪২. গৌতম রায়, *হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিবর্তন*, পত্রভারতী, নবতম সংস্করণ, কলকাতা, ২০০২

৪৩. জগদীশ মণ্ডল, *মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তু : কারা এবং কেন*, বঙ্গদর্পণ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৫

৪৪. জগদীশচন্দ্র মণ্ডল, *মরিচঝাঁপি নৈঃশব্দ্যের অন্তরালে (গণহত্যার ইতিহাস)*, পিপলস বুক, কলকাতা, ২০০২

৪৫. জয়া চ্যাটার্জি, *বাংলা ভাগ হল— হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতা ও দেশবিভাগ (১৯৩২-১৯৪৭)*, আবুজাফর (অনুবাদক), ১ম সংস্করণ, এল অ্যালমা, কলকাতা, ২০০৩

৪৬. তপন বাইন, *নিম্নবর্গের সমাজ জীবন : দেশকাল*, সোমপ্রকাশ, প্রথম প্রকাশ, বহিরগাছি, নদিয়া, ২০০১

৪৭. তপন রায়চৌধুরী, *বাঙালনামা*, আনন্দ, ৩য় মুদ্রণ, কলকাতা, ২০১০

৪৮. তাপস ভট্টাচার্য, *বাংলা উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবন*, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৪১১ বঙ্গাব্দ।

৪৯. তারক সরকার, *বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ ও দেশত্যাগ*, অরুণা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৯

৫০. তুষার সিংহ, *মরণজয়ী সংগ্রামে বাস্তুহারা*, দাশগুপ্ত'জ প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৯

৫১. ত্রিদিব চক্রবর্তী, নিরুপমা রায় মণ্ডল, পৌলমী ঘোষাল (সম্পা.), *ধ্বংস ও নির্মাণ বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের স্বকথিত বিবরণ*, সেরিবান, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৭

৫২. দক্ষিণারঞ্জন বসু (সম্পা.), *ছেড়ে আসা গ্রাম*, জিজ্ঞাসা, ১ম জিজ্ঞাসা সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৭৫
৫৩. দীনেশচন্দ্র সিংহ, *শ্যামাপ্রসাদ বঙ্গবিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ*, কথাশিল্পী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৬৫
৫৪. দেবজ্যোতি রায়, *কেন উদ্বাস্তু হতে হল*, বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৫
৫৫. দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), *বিংশ শতাব্দীর সমাজ বিবর্তন ও বাংলা উপন্যাস*, দে'জ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৪০৮
৫৬. দেবব্রত দত্ত, *বিজয়গড় একটি উদ্বাস্তু উপনিবেশ*, প্রগ্রেসিভ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০১
৫৭. দেবব্রত মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), *বিভাজনের পশ্চাৎপট বঙ্গভঙ্গ*, ১৯৪৭, রিডার সার্ভিস, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১৩
৫৮. দেবেশ রায়, পবিত্র সরকার (সম্পা.), *বাংলা বই*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৯
৫৯. দেবেশ রায়, *রক্তমণির হারে*, দেশভাগ-স্বাধীনতার গল্প সংকলন, সাহিত্য আকাডেমি, ১ম সংস্করণ, নতুন দিল্লী, ১৯৯৯
৬০. ধনঞ্জয় মজুমদার, *বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, স্বন্বোধি, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৭০
৬১. নজরুল ইসলাম, *বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক*, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম প্রকাশ, ৩য় মুদ্রণ, কলকাতা, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ
৬২. নন্দদুলাল মহান্ত, *মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ*, অন্নপূর্ণা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০২
৬৩. নিলিপ পোদ্দার, *সময়ের দাগ ত্রিপুরার গল্পে*, পৌলমী, প্রথম প্রকাশ, আগরতলা, ১৯৯৮
৬৪. নির্মল কুমার বসু, *সাতচল্লিশের ডায়েরি*, পুনশ্চ, সর্বশেষ সংস্করণ, কলকাতা, ২০১০
৬৫. নুরুল ইসলাম, *বাঙালীর ইতিহাস চর্চার ধারা* (১৯০১-১৯৫০), বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ।
৬৬. প্রফুল্ল চক্রবর্তী, *প্রান্তিক মানব*, প্রতিক্ষণ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৭
৬৭. প্রসূন বর্মণ (সম্পা.), *দেশভাগ-দেশত্যাগ : প্রসঙ্গ উত্তর-পূর্ব ভারত*, ভিকি, প্রথম প্রকাশ, গুয়াহাটি, ১৪২০ বঙ্গাব্দ

৬৮. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২য় সংস্করণ, ঢাকা, ২০০৫

৬৯. বদরুদ্দীন উমর, *সাম্প্রদায়িক*, নবপত্র, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৬৬

৭০. বাবুলকুমার পাল, *বরিশাল থেকে দণ্ডকারণ্য, পশ্চিমবঙ্গের কৃষিজীবী উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন ইতিহাস*, গ্রন্থমিত্র, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১০

৭১. বিনয়ভূষণ ঘোষ, *দ্বিজাতিতত্ত্ব ও বাঙালী*, রিফ্লেক্ট, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৭৯

৭২. বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, নবপত্র, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৮৬

৭৩. বিমল প্রামাণিক, *পশ্চিমবঙ্গের অশনি সংকেত বাংলাদেশ থেকে হিন্দু বিতাড়ন ও মুসলমান অনুপ্রবেশ*, জি. সি. মোদক, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৮

৭৪. বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় ও রাহুল রায় (সম্পা.), *অধ্যাপক প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী : ফিরে দেখা*, শিখা বুকস, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৩

৭৫. ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *দেশবিভাগ পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনি*, আনন্দ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৩

৭৬. মধুময় পাল (সম্পা.), *দেশভাগ বিনাশ ও বিনির্মাণ*, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১১

৭৭. মঞ্জু চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), *ইতিহাস অনুসন্ধান*, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১১

৭৮. মননকুমার মণ্ডল (সম্পা.), *পার্টিশন সাহিত্য দেশকাল স্মৃতি*, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১৪

৭৯. মণিকুন্তলা সেন, *সেদিনের কথা*, নবপত্র, ২য় প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৩

৮০. মিলন আহমদ, *স্বাধীনতা ও পূর্ব পাকিস্তান*, সম্পর্ক, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ২০০১

৮১. মণীন্দ্র সমাদ্দার, *দেশভাগের যন্ত্রণা*, উদ্বাস্তু সংগ্রাম পরিষদ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৯

৮২. মিহির সেনগুপ্ত, *বিষাদবৃক্ষ*, সুবর্ণরেখা, ২য় সংস্করণ, ৩য় মুদ্রণ, কলকাতা, ২০০৫

৮৩. যতীন সরকার, *পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ৪র্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০১৩

৮৪. রতনলাল চক্রবর্তী, *ভাষা আন্দোলনের দলিল*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ২০০০

৮৫. লাডলিমোহন রায়চৌধুরী, *ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশবিভাগ*, দে'জ প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৯

৮৬. লিয়াকত জাহাঙ্গীর খোকন, *পুববাংলার সমাজ মন*, মনন, ১ম সংস্করণ, ঢাকা, ২০০৯
৮৭. শঙ্কর ঘোষ, *হস্তান্তর*, আনন্দ, ২য় সংস্করণ, কলকাতা, ২০০১
৮৮. শঙ্করপ্রসাদ চক্রবর্তী, *দেশভাগের কবিতা*, একুশ শতক, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১০
৮৯. শঙ্করপ্রসাদ চক্রবর্তী, *বাংলা উপন্যাসে স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্তিম পর্ব*, করুণা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৬
৯০. শঙ্খ ঘোষ, *সকাল বেলার আলো*, অরুণা, ৪র্থ মুদ্রণ, কলকাতা, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ
৯১. শাওন আকন্দ (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন*, পুঁথিপত্র, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ১৪০০ বঙ্গাব্দ
৯২. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মর্ডান বুক, নবম পুনঃমুদ্রণ সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯২
৯৩. সত্যেন্দ্রনাথ রায়, *বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা*, গ্রন্থালয়, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ
৯৪. সমর দাসঠাকুর, *কলোনি জীবন*, মিলনী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯০
৯৫. সমর পাল, *আমার জীবন আমার ভাবনা*, সোহম, প্রথম প্রকাশ, বারাসাত, কলকাতা, ২০০৯
৯৬. সমরজিৎ বিশ্বাস, *বঙ্গসমাজ : জীবনধারা*, পুঁথিপত্র, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৭২
৯৭. সমরেন্দ্রনাথ বৈদ্য, *পরবাস*, সকাল,প্রথম প্রকাশ, কলকাতা ২০১০
৯৮. সমরেন্দ্র মজুমদার, *স্বাধীনতার পরের যুগ*, সোমপ্রকাশ, ১ম সংস্করণ, খুলনা, বাংলাদেশ, ১৯৮০
৯৯. সমীর সেনগুপ্ত, *পূর্ববঙ্গের সমাজমন*, গণ, ২য় সংস্করণ, হৃদয়পুর, ২০০৯
১০০. সর্বেশ্বর মণ্ডল, *বাংলার কৃষি ও কৃষক সমাজ*, নবজীবন, প্রথম প্রকার, কলকাতা, ১৯৮৬
১০১. সালাম আজাদ, *হিন্দু সম্প্রদায় কেন বাংলাদেশ ত্যাগ করছে?* পুনশ্চ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০১
১০২. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, *ইতিহাসের দিকে ফিরে ছেচল্লিশের দাঙ্গা*, র‍্যাডিক্যাল, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১০
১০৩. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, *দেশভাগ দেশত্যাগ*, অনুষ্টুপ, প্রথম প্রকাশ, ২য় মুদ্রণ, কলকাতা, ২০০৭
১০৪. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, *দেশভাগ স্মৃতি আর সত্তা*, প্রগ্রেসিভ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০১
১০৫. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, *মরিচঝাঁপি দণ্ডকবন থেকে সুন্দরবন*, হৃতাক্ষর, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১০

১০৬. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসে কালান্তর*, দে'জ, ৩য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৫

১০৭. সানজিদা আখতার, *বাংলা ছোটগল্পে দেশবিভাগ*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ২০০২

১০৮. সামীর আহমেদ, *দেশ যখন পরবাস*, সমকাল, প্রথম সংস্করণ, বারাসাত, কলকাতা, ১৯৮৮

১০৯. স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়, *কথাসাহিত্যের কথকতা*, স্টুডেন্ট লাইব্রেরী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৬২

১১০. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *দ্বিজাতিতত্ত্বের সত্য-মিথ্যা*, বিদ্যা প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩

১১১. সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত, *বঙ্গসংহার এবং*, নয়া উদ্যোগ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০২

১১২. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *অর্ধেক জীবন*, আনন্দ, ১ম সংস্করণ, কলকাতা, ২০১২

১১৩. সুনীল রায়চৌধুরী, *পূর্ববঙ্গের জনপদ*, সময়, ১ম সংস্করণ, ফরিদপুর, বাংলাদেশ, ১৯৬৪

১১৪. সুব্রত রায়চৌধুরী, *শিকড়ের সন্ধানে*, প্রশিকা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০২

১১৫. সুহানা পারভিন, *বাংলাদেশের সমাজ সংস্কৃতি*, সোহরাব হোসেন, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯০

১১৬. সেমন্তী ঘোষ (সম্পা.), *দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা*, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৮

১১৭. সেমন্তী ঘোষ, *স্বজাতি স্বদেশের খোঁজে*, দে'জ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৪১২

১১৮. সৈয়দ আবুল মকসুদ (সম্পা.), *নোয়াখালী গান্ধী মিশন ডায়েরি*, কথা, কথা সংস্করণ, কলকাতা, ২০১১

১১৯. সৌমেন চক্রবর্তী (সম্পা.), *বহুস্বরে উদ্বাস্তু সত্তায় বাঙালি*, মুক্তমন, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ।

১২০. হর্ষ দত্ত ও স্বপন বসু (সম্পা.), *বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*, পুস্তক বিপণি, ২য় সংস্করণ, কলকাতা, ২০১০

১২১. হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *উদ্বাস্তু*, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৭০

১২২. হেনা সিনহা, *বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ ও ভগ্ননীড়ের বেদনা*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১২

সহায়ক গ্রন্থ (ইংরেজি)

1. Census Report of Pakistan, 1951, Vol. 3, Dec, East Bengal Publisher, p. 114
2. Census Report of Pakistan, 1961, Vol. II, Home Affairs Division and Ministry of Home affairs, p. 21
3. Gargi Chakraborty, *Coming out of Partition: Refugee Woman in Bengal*, Bluejay Book, New Delhi, 2005
4. Indian Census Report- 1951
5. Jaya Chatterji, *Bengal Divide*, Cambridge University Press, 1st edition, New Delhi 1995
6. Jasodhara Bagchi and Subharanjan Dasgupta (ed.), *The Trauma and the triumph: Gender and Partition in Eastern India,* Street, Calcutta, 2003
7. Kanti B. Pakrasi, *The Uprooted: A sociological Study of refugees of West Bengal,* I.S.I, Indian Edition, 1971
8. Nilanjana Chatterjee, *The East Bengal Refugees: A Lesson in Survival*, Oxford University Press, New Delhi, 1974
9. Prafulla K. Chakrabarty, *The Marginal Men*, Naya Udyog, Naya Udyog Edition, Kolkata, 1999
10. R.N.Saxena, *A Study in Changing attitudes*, Asia Publishing House, 1st edition, Mumbai, 1961
11. Sukumar Biswas, *Communal Riots in Bangladesh & West Bengal (1947-1964)*, Parul, 1st Published, Kolkata, 2012
12. Tathagata Roy, *My People Uprooted : A study of Hindus in Eastern Bengal*, Ratna Prakashani, 1st edition, Calcutta, 2000
13. Urvashi Butalia, *The Other Side of Silence: Voices from the Partition,* Penguin, New Delhi, 1998
14. Relief and Rehabilitation of Displaced Person in West Bengal Statement Issued by Govt of West Bengal, December 15, 1958
15. A Master Plan for Economic Rehabilitation of Displaced Person in West Bengal, Refugee Relief and Rehabilitation Development, Government of West Bengal, July, 1973

পত্রপত্রিকা

১. *জিজ্ঞাসা*, বিশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২০০০, কলকাতা

২. *পরিয়ায়ী*, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ২০১২, কলকাতা

৩. *দেশহিতৈষী*, শারদ সংখ্যা, ২০০৯, কলকাতা

৪. *পথ*, বইমেলা সংখ্যা, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, মুর্শিদাবাদ

৫. ইউ.*সি.আর.সি.*, ১৭তম রাজ্য সম্মেলন স্মরণিকা, ২০০৭, কলকাতা

৬. *কথাকলি*, শারদ সংখ্যা, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, বনগাঁ

৭. *কোরক*, শারদ সংখ্যা, ১৪১৩, কলকাতা

৮. *চতুর্থ দুনিয়া*, চতুর্থ সংখ্যা, ২০০০ কলকাতা

৯. *নোনাজল*, ১ম বর্ষ শীত সংখ্যা, ২০১২, আন্দামান

১০. *তিতির*, দেশভাগ সংখ্যা, জুন, ২০০৬, কোচবিহার

১১. *অনসূয়া*, শীত সংখ্যা, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ, বনগাঁ

১২. *পরিকথা*, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২০০০, কলকাতা

১৩. *থিরবিজুরি*, দেশভাগ সংখ্যা, বইমেলা, ২০০১৩, অশোকনগর

১৪. *উদ্‌বর্তন*, ২য় বর্ষ, মার্চ সংখ্যা, ২০১১, নতুন কলোনি, নদিয়া

১৫. *ঈশান*, দেশভাগ সংখ্যা, ১৯৯৮, কলকাতা

১৬. *নীড়*, ১২ সংখ্যা, ২০০৯, কলকাতা

১৭. *আন্তর্জাতিক পাঠশালা*, এপ্রিল-সেপ্টেম্বর যুগ্ম সংখ্যা, ২০১৫ হাওড়া

১৮. *বিতর্কিকা*, প্রসঙ্গ : দেশভাগ, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, কলকাতা

১৯. *জলার্ক*, পঞ্চবিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগ্ম সংখ্যা, (মে-ডিসেম্বর) ২০১৫, কলকাতা

২০. *এখন পর্যাবরণ*, দেশভাগ বিশেষ সংখ্যা, ষষ্ঠ বর্ষ, ২০০৯, কলকাতা

২১. *বারোমাস*, শারদ সংখ্যা, ২০০০, কলকাতা

২২. *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, ২৯-৩০ সংখ্যা, ১৪১২-১৪১৪ বঙ্গাব্দ, ঢাকা

২৩. *সমাজ নিরীক্ষণ*, ৮৫ সংখ্যা, ২০০২, ঢাকা

২৪. *সম্মিলিত বাস্তুহারা পরিষদের প্রতিবেদন*, এপ্রিল, ১৯৫১ কলকাতা

সংবাদপত্র

১. *অমৃতবাজার পত্রিকা*, ১৯ আগস্ট, ১৯৪৬

২. *অমৃতবাজার পত্রিকা*, ১৮ আগস্ট, ১৯৪৮

৩. *অমৃতবাজার পত্রিকা*, ৮ অক্টোবর ১৯৪৮

৪ *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১৬ অক্টোবর, ১৯৪৬

৫. *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১৯ আগস্ট, ১৯৪৭

৬. *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৯ আগস্ট, ১৯৪৮

৭. *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৪ অক্টোবর ১৯৪৮

৮. *আনন্দবাজার পত্রিকা*, রবিবাসরীয়, ১৩ মার্চ, ১৯৮৮

৯. *প্রবাসী*, চৈত্র, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ

সাক্ষাৎকার

১. অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (কথাসাহিত্যিক)

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ০৮.০৭.২০১৪; বাগুইহাটি, কলকাতা

আলোচ্য বিষয় : দেশভাগের প্রেক্ষাপট এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে দেশভাগ বিষয়ক বাংলা উপন্যাস।

২. অমর মিত্র (কথা সাহিত্যিক)

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ০৬.০৭.২০১৪, বেলগাছিয়া, কলকাতা

আলোচ্য বিষয় : ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেশভাগের বেদনা।

৩. অমল দে (সম্পত্তি বিনিময়কারী), পেশা : অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকুরিজীবী; গ্রাম: মানিকনগর, পোস্ট : মানিকতলা, থানা : অশোকনগর, জেলা: উত্তর ২৪ পরগণা; বয়স : ৬৬ বছর; সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ১৬.০৫.২০১২; যশোরের অভয়নগরের ৬৪$^{১/২}$ বিঘার (৩৩ শতাংশে) বিনিময় হয়। বিনিময় হয়— ১৯৬৯ সালের এপ্রিলে।

৪. আনিসুজ্জামান (সমাজতাত্ত্বিক; বাংলাদেশ)

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ০৬.১১.২০১৪ (টেলিফোনে)

আলোচ্য বিষয় : দেশভাগের প্রেক্ষিত, হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক ভাঙনের কারণ, বাস্তুচ্যুতির

পর্ব বিভাজন, গল্প-উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবন কেমনভাবে প্রতিফলিত।

৫. আবু মোঃ দেলোয়ার (অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ১৬.১১.২০১২ ঢাকা
আলোচ্য বিষয় : বাংলাদেশের অবাঙালি মোহাজেরদের সামাজিক ও রাজনৈতিক উত্থান-পতন।

৬. কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর (কথাসাহিত্যিক)
সাক্ষাৎকার গ্রহণ : (১৯.০৬.২০১৪); বামনগাছি, উত্তর ২৪ পরগণা
আলোচ্য বিষয় : হিন্দু-মুসলমানের আলাদা বসবাসের প্রেক্ষিত, পঞ্চাশ পরবর্তী সময়ে যারা পূর্ববঙ্গে থেকে গেলেন তাদের অবস্থা নিম্নবর্গীয়দের পরে দেশত্যাগ করবার কারণ।

৭. কালিপদ সরকার (সম্পত্তি বিনিময়কারী); পেশা : কৃষিকাজ, গ্রাম : শিবপুর, পোস্ট : বল্লভপুর, থানা: বনগাঁ, জেলা: উত্তর ২৪ পরগণা। জন্ম : ১৪৩৮ বঙ্গাব্দ, ১৯ চৈত্র; সাক্ষাৎকার গ্রহণ- ১৪.০৫.২০১২। পাবনা জেলার দিলপাশা অঞ্চলের ৪৫ বিঘার (৫২ শতাংশে) সঙ্গে ৪০ বিঘার (৩৩ শতাংশে) বিনিময় হয়। বিনিময় হয়- ১৯৫৫ সালে এপ্রিল মাসে।

৮. কেশবলাল বিশ্বাস (সম্পত্তি বিনিময়কারী); পেশা : অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক, গ্রাম + পোস্ট : রামশঙ্করপুর, থানা : গোপালনগর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগণা। জন্ম- ১৯২৮ সালের ২২ জানুয়ারি; সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ২৪.০২.২০১২; ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ নিকটবর্তী ২০ বিঘার (৬৪ শতাংশে) সঙ্গে ২০ বিঘার (৩৩ শতাংশে) বিনিময় হয়। বিনিময় হয়— ১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাসে।

৯. গোলোক হালদার (সম্পত্তি বিনিময়কারী); পেশা কৃষিকাজ
গ্রাম : খারো, পোস্ট : কুমড়া কাশীপুর, থানা : হাবড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগণা
বয়স : আনুমানিক ৭২ বছর, সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ১৪.০৪.২০১২
পূর্ববঙ্গের খুলনা নিকটবর্তী ফুলতলা অঞ্চলের ২০০ বিঘা (৫২ শতাংশে) জমির সঙ্গে ১৭৫ বিঘা (৩৩ শতাংশে) জমির বিনিময় হয়। বিনিময় হয়- ১৯৬৪ সালের মার্চে।

১০. গৌতম রায় (অধ্যাপক)
সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ০২.০৮.২০১৪, ভাটপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা,
আলোচ্য বিষয় : দেশভাগ প্রসঙ্গ, উদ্বাস্তুদের আগমন এবং পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিবর্তন।

১১. জিল্লুর রহমান (ঐতিহাসিক; বাংলাদেশ)

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ১০.১১.২০১৪ (টেলিফোনে)

আলোচ্য বিষয় : দেশবিভাগ পূর্ববর্তী হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক এবং তার ক্রম অবনতি, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা, পশ্চিমবঙ্গ থেকে চলে যাওয়া মুসলিম উদ্বাস্তু।

১২. তাজিবুল ইসলাম মণ্ডল (পেশা: ব্যবসায়ী)

গ্রাম : তারাইল, পোস্ট : ফুকরা তারাইল, থানা : কাশিয়ানী,

জেলা : গোপালগঞ্জ, বাংলাদেশ।

(১৯৫০ সালে তিনি বর্ধমান থেকে পূর্ববঙ্গে চলে যান)

বয়স : ৭৯ বছর। সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ১৪.১১.২০১৬

আলোচ্য বিষয় : ব্যক্তিগত জীবনে উদ্বাস্তু হওয়ার কাহিনি।

১৩. দুলাল মজুমদার (সম্পত্তি বিনিময়কারী); পেশা : ধান চালের ব্যবসা

গ্রাম : বুধরহাটি, পোস্ট : কুমড়া কাশীপুর, থানা : হাবড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগণা। বয়স: ৭৮ বছর, সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ২৫.০৪.১২

খুলনার তালা অঞ্চলের ৬৫ বিঘা জমির (৫২শতাংশে) সঙ্গে এখানকার ৬০ বিঘার (৩৩ শতাংশ) বিনিময় হয়। বিনিময় হয়- ১৯৬৪ সালে।

১৪. দেবেশ রায় (কথা সাহিত্যিক)

সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ০২.০৬.২০১৪, বাগুইহাটি, কলকাতা। আলোচ্য বিষয় : দেশভাগের প্রেক্ষাপট, উদ্বাস্তু আগমন পর্ব এবং উদ্বাস্তুদের জীবনধারা বদলে যাওয়া।

১৫. নিমাই সরকার (গ্রাম বিনিময়কারী, মৃত নগরবাসী সরকারের পুত্র), পেশা : সরকারি চাকুরে; গ্রাম + পোস্ট- দিঘাড়ি, থানা : গোপালনগর জেলা : উত্তর ২৪ পরগণা; জন্ম : ৮৫ বছর; সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ১৮.০৫.২০১২। পাবনা জেলার কায়েমকোলা গ্রামের সঙ্গে দিঘাড়ি গ্রামের বিনিময় হয়। এই বিনিময়ের অন্যতম উদ্যোক্তা নিমাইবাবুর বাবা। বিনিময় হয়- ১৯৫০ সালের ১লা এপ্রিল।

১৬. ফয়েজউদ্দিন মুনসী, পেশা : কৃষিকাজ

গ্রাম + পোস্ট : বেদগ্রাম, থানা + জেলা : গোপালগঞ্জ, বাংলাদেশ

(১৯৫০ সালে কলকাতার পার্কসার্কাস থেকে তিনি পূর্ববঙ্গে চলে যান)

বয়স- ৮৮ বছর। সাক্ষাৎকার গ্রহণ- ১৪.১১.২০১২

আলোচ্য বিষয় : পূর্ববঙ্গের মুসলিম উদ্বাস্তু।

১৭. বদরুদ্দিন উমর (ঐতিহাসিক; বাংলাদেশ)

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ১০.১১.২০১৪ (টেলিফোনে)

আলোচ্য বিষয় : দেশভাগের প্রেক্ষিতে, হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতি, পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম উদ্বাস্তু এবং তাদের শ্রেণিগত অবস্থান, কোন শ্রেণির মানুষ দেশভাগের ফলে লাভবান হল।

১৮. মনোরঞ্জন ব্যাপারী (ঔপন্যাসিক)

সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ১৫.০৭.২০১৪, মুকুন্দপুর, কলকাতা

আলোচ্য বিষয় : নিম্নবর্গীয় উদ্বাস্তু আগমনের প্রেক্ষিত, উভয়বঙ্গে নিম্নবর্গীয়দের সামাজিক অবস্থান এবং ক্যাম্প কলোনিতে ব্যক্তিজীবনের দুর্দশা।

১৯. মাখনলাল রায় (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক)

গ্রাম + পোস্ট : ভাণ্ডার খোলা, থানা : গোপালনগর

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : (১৮.১০.২০১১)

আলোচ্য বিষয় : উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় নিম্নবর্গীয় উদ্বাস্তুদের উত্থান।

২০. মোঃ ইউনুসবাকী (পেশা: দর্জিকাজ)

জেনেভা ক্যাম্প, শেখের টেক, মোহম্মদপুর, ঢাকা

(১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে তিনি ও তার পরিবার বিহারের দাঙ্গায় আক্রান্ত হয়ে কলকাতা হয়ে ঢাকায় যান), বয়স- ৮৪ বছর, সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ১০.১১.২০১২, আলোচ্য বিষয় : বিহারি মোহাজেরদের দুরবস্থা।

২১ যতীন বালা (ঔপন্যাসিক)

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ২৩.০৬.২০১৪, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা

আলোচ্য বিষয় : দেশত্যাগের বিভিন্ন পর্যায়, নিম্নবর্গীয় উদ্বাস্তুদের প্রতি বঞ্চনা, উপন্যাসে দেশভাগের প্রতিফলন।

২২. শচীন দাশ (কথাসাহিত্যিক)

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : (২০.০৬.২০১৪), বাংলা আকাদেমি, কলকাতা,

আলোচ্য বিষয় : দেশভাগের প্রেক্ষাপট, উদ্বাস্তু আগমনের পর্যায় বিভাগ, উদ্বাস্তু জীবনের নানা সমস্যা।

২৩. শওন আকন্দ (চিত্রশিল্পী, বাংলাদেশ)

সাক্ষাৎকার গ্রহণ (০৪.১১.২০১২) গুলশান, ঢাকা

আলোচ্য বিষয় : পূর্ববঙ্গে বিহারি উদ্বাস্তুদের সামাজিক অবস্থান।

২৪. সত্য গুহ (কবি)

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ১৫.০৮.২০১৪, অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগণা

আলোচ্য বিষয় : হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের ভাঙন, সমাজ বদলের ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুদের ভূমিকা।

২৫. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রাবন্ধিক)

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ০৪.০১.২০১৪

আলোচ্য বিষয় : দাঙ্গা, দেশভাগ-দেশত্যাগ।

২৬. সাধন চট্টোপাধ্যায় (কথা সাহিত্যিক)

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ২৫.০৬.২০১৪, পানশিলা, সোদপুর, উত্তর ২৪ পরগণা

আলোচ্য বিষয় : দেশভাগের প্রেক্ষাপট, উদ্বাস্তু আগমনের পর্ব বিভাজন, বাংলা উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবনের ছবি কীভাবে চিত্রিত হয়েছে।

২৭. হরিদাসী মণ্ডল (পি.এল ক্যাম্পের জন্য তৈরি সরকার পরিচালিত তাঁতকলের প্রাক্তন কর্মী)

বয়স : ৮৪ বছর, পি.এল.ক্যাম্প, পোস্ট : হরিপুর, থানা : অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগণা।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ১২.১০.২০১২

আলোচ্য বিষয় : দেশত্যাগের পর ব্যক্তিজীবনে বিপর্যয়ের কাহিনি।

২৮. হাসান আজিজুল হক (কথাসাহিত্যিক; বাংলাদেশ)

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ২২.১০.২০১৪ (টেলিফোনে)

আলোচ্য বিষয় : দেশভাগের প্রেক্ষিত, বর্ধমানে তার শৈশবের স্মৃতি, হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিভাজন, পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুদের দেশান্তর।

২৯. হাসান ইমাম (চলচ্চিত্র অভিনেতা বাংলাদেশ)

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ২৩.১০.২০১৪ (টেলিফোনে)

আলোচ্য বিষয় : পূর্ববঙ্গে দাঙ্গার কারণ, পূর্ববঙ্গের সাহিত্যে দেশভাগের ছাপ না পড়ার কারণ, বর্তমানে হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ।

৩০. হোসেনূর রহমান (ঐতিহাসিক)

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ১৬.০৬.২০১৪, পার্ক সার্কাস, কলকাতা, আলোচ্য বিষয় : দেশভাগের প্রেক্ষাপটে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক।